মহাপীঠ তারাপীঠ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জয়তারা পাবলিশার্স
কলকাতা-৭০০ ০৬৮

শুভ প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৯৩

প্রকাশক
তারানন্দ স্বামী
জয়তারা পাবলিশার্স
৭৫, যোধপুর পার্ক
কলকাতা-৭০০ ০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্লক
রেডিয়ান্ট প্রসেস প্রাঃ লিঃ
কলকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড
হাফটোন লিমিটেড্
৫২।৩, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকতা-৭০০ ০১২

প্রধান পরিবেশক
জি. সি. লাহা
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০১৩
অন্যতম পরিবেশক
নবপত্র প্রকাশন
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বিদেশে প্রাপ্তিস্থান
১। ডাক্তার আর এন দত্ত
পেস্টন পাল্গাই, ইংলণ্ড
২। ডক্টর লুইস ক্যাপট মুশেল
ওয়েবারর্গ, গ্রীট্ গার্সাই
সুইজারল্যাণ্ড
৩। গার্ডস মাইজেম
পোর্টবারগ, সুইডেন
৪। ডাঃ উমা চৌধুরী
বি. এইচ. এভিনিউ
মিডলটন, আমেরিকা
৩। ডক্টর তপন মুখার্জী
ডিমোক্রেসী লেন,
পোটোম্যাক, আমেরিকা
৪। ডাক্তার এস সাহা
বার্টন স্ট্রিট, পার্কিস
নিউ সাউথ ওয়েলস।
অস্ট্রেলিয়া।
৭। অবনী দে
দি ওয়েস্টমল অ্যাপার্টমেন্ট
ইটোবিকোকি ওন্টেরিও,
এম নাইন সি, কানাডা

পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠের সাথে

একান্ত একাত্ম, মহান ব্রহ্মবিদ্

মহামণ্ডলেশ্বর

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের

করকমলে

MAHAPITH TARAPITH

Volume—II, 1986

Only authentic religious-biography on TARAPITH and SRI SRI BAMAKHYAPA.

By

Sri Bipul Kumar Gangopadhya

"মহাপীঠ তারাপীঠ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট মন্তব্য

'মহাপীঠ তারাপীঠ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'বার পর গত এক বছর ধরে ভারতের বহু বিশিষ্ট সাধুসন্ত মনীষী সাধক ভক্ত ও বিদেশের বহু বিশিষ্ট নরনারীর কাছ থেকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য সহ বহু পত্র লেখকের কাছে এসেছে এবং এখনও আসছে।

তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রিলোকজননী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার কৃপায় এই মহান গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। স্থানাভাবে সকল পত্র ও পত্রিকার মন্তব্য ও সমালোচনা বিশদভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। মাত্র কয়েকটি মন্তব্য ও সমালোচনা এখানে প্রকাশ করা হ'ল—

১। গুপ্তসাধক, তপমূর্তি, সাধকভাই, 'মহাপীঠ তারাপীঠ' (প্রথম খণ্ড) পেলাম। অপূর্ব সুন্দর হয়েছে। সেখানে যা ছড়ানো আছে তা তুলে আনা—এর তুলনা নেই। ভাই, বার বছর আগে বিগত হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভের সময় শুনেছিলাম এই গ্রন্থ রচনার কথা। বার বছর পর গ্রন্থখানি হাতে পেলাম।

অন্তত আমি সাক্ষী আছি—বার বছর একটানা একটা ব্রতে আপনি কেমন করে সর্বস্ব পণ করেছেন।

এত গ্রন্থ লেখা নয়, নিত্য সাধন। আর অনুভবের কথাগুলো লিখে রাখা। এবংবিধ গ্রন্থ পাঠ করলে অমাবস্যা চতুর্দশী তিথিতে সারা রাত কালীপূজোর ফল লাভ হবে।

স্বামী শিবানন্দ গিরি
২০. ১. ১৯৮৬
ভোলাগিরি স্নেহনীড়,
আগরপাড়া, কলকাতা-৫৮

২। "মনীষী সদৃশ",

লেখার মধ্যে শুধু লেখা নয় বাবা, তুমি তারাপীঠের মায়ের সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছ, এটা তোমার একজন্মের সাধনালব্ধ সম্পদ নয়।

তুমি যে ক্রমশঃ দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছ, এবারের দীর্ঘ ষোল বছরের ৺মায়ের কৃপার আদর্শ বয়ে নিয়ে। যা আমাকে প্রথম দর্শনের পর এক সুনির্দিষ্ট স্নিগ্ধ মহাসত্যের আলোকে আলোকিত করেছে। ..

ব্রহ্মময়ী তারামায়ের বহুপিপাসিত সন্তানের জীবনে এই গ্রন্থ এক চরম যুগান্তের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে অনন্তকালের জন্য। যা চিরদিন আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

পাগল যোগানন্দ বাবা, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা।
(১৪ ২. ৮৬)

৩। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থখানি পড়লাম। সাধক শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশন বড়ই মনোরম ও মর্মস্পর্শী।

যোগিনীতন্ত্রে আছে, তারাপুর পীঠে তপস্যা করলে শিঘ্রই সিদ্ধিলাভ করা যায়।

পূর্ব পূর্ব কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারাদেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি আবার অনেক নামে প্রসিদ্ধ। তারা, একজটা, নীল সরস্বতী, কামতারা, উগ্রতারা, ও তারিণী নামে খ্যাত।...এমন কি জগতগুরু আদি শঙ্করাচার্য্য তারাদেবীর আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে সাধনার ইতিবৃত্ত আছে। কলিযুগে যেখানে মহামায়াকে চর্ম্ম চক্ষে দেখা অসম্ভব, সেখানে পঞ্চতপা সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপা 'জয়তারা' মন্ত্রে সিদ্ধ হলেন ও মাকে চক্ষে দর্শন করে ইংরেজ শাসনে পরাধীনতার শৃঙ্খলা পাশে নিমজ্জমান পৌত্তলিকবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন ও জনে জনে প্রচার করলেন ভারতীয় ধর্মে মূর্তি উপাসনায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পদাঘাতে করলেন। ধর্মই ভারতের জীবনীশক্তি। ভারতের মাটি ভগবৎ মহিমায় বিকশিত।

এই সংকটময় দিনে বাবা বামদেবের আচরিত মাতৃসাধনায় 'জয়তারা' মন্ত্র আজি পশ্চিমবঙ্গের গণজাগরণের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা। বিভ্রান্ত বাঙ্গালী জাতির শক্তি সংগ্রহে গৌরবের

আধার "মহাপীঠ তারাপীঠ" গ্রন্থ প্রতি ঘরে ঘরে আদৃত হউক।
...ওঁ নমো বামদেবায় নমঃ।

মহোপাধ্যায় শ্রীমুরারী মোহন বেদান্তাদিতীর্থ, শাস্ত্রী।
সভাপতি হাওড়া পণ্ডিত সমাজ ও সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ পণ্ডিত সম্মেলন।

৪। 'বাবাজীবন'

তোমার 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থখানি বার বার পড়িয়াছি এবং সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার গ্রন্থ রচনা ও ভাষা অতীব সুন্দর। বুঝিলাম ৺তারামায়ের ইচ্ছা ও তোমার আন্তরিক ইচ্ছায় সমগ্র বিষয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি আমার সুদীর্ঘ শতাধিক বছরের জীবনে অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে এইরূপ মনোহর ভাষা ও গভীর দর্শন এবং বিশাল তথ্যের সন্ধান পাই নাই। আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

শ্রীরামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দারিয়াপুর, হুগলী। (২০. ৪. ৮৬)

৫। আমাদের এই দেশে বীরভূম জেলার তারাপীঠ এক বিশিষ্ট শক্তি পীঠরূপে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত।

এই মহাপীঠের ইতিহাসে এক লোকত্তোর মহাযোগী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই মহাযোগীর জীবনে অনেক অনেক অলৌকিক ঘটনা লোকমুখে প্রচার লাভ করিয়াছে। শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি সাধনার ইতিহাস রচনায় তারাপীঠ তথা বামাক্ষ্যাপার তাত্ত্বিক আলোচনা আবশ্যক ছিল। বর্তমান 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্হে বিজ্ঞলেখক শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণে আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাহার গ্রন্হ পাঠে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী কলকাতা-৫৫ (৬. ১০. ৮৬)

৬। কল্যাণবরেষু,

তোমার মহাপীঠ তারাপীঠ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। বর্তমান সময়ের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এই রকম একখানা তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল।

আশা করি সেই অভাব তোমার দ্বারা পূর্ণ হবে। তুমি তারা-মায়ের কৃপাধন্য সন্তান এবং মা তারা তাঁরই নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব তোমার ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে প্রকাশ করে চলেছেন। যা মানবজীবনের অধ্যাত্ম বিকাশের সহায় ও সম্পদরূপে চিরপরিচিত হয়ে থাকবে।

অমৃতানন্দ অবধূত, বহুলা, বর্ধমান। (২৫. ৮. ৮৫)

তারাপীঠ তত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব

৭। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের লেখক বিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘসাধনা, কঠোর শ্রম ও সনিষ্ঠ গবেষণা করে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠের মাহাত্ম্য ও তার সাধকমণ্ডলীর ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তার প্রথম পর্যায়।

এখানে সৃষ্টিতত্ত্ব, দশমহাবিদ্যা, মহাবিদ্যা তারা, তারাতত্ত্ব থেকে শুরু করে পুরুষোত্তম বামাক্ষ্যাপার জীবনের সাতাশ বছর কাল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

তারই মধ্যে আছে তারামন্দির নির্মাণের কাহিনী। আছে তারাপীঠের স্মরণীয় সিদ্ধসাধকদের কথা। সাধকদের এই তালিকায় রয়েছেন কামদেব তার্কিক, যাদবেন্দ্র, বিশে ক্ষ্যাপা, আনন্দনাথ, রাজা রামকৃষ্ণ, দেবদয়াল গিরি, যোগীন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভাতু গোস্বামী, অনাহারী বাবা, দ্বিতীয় আনন্দনাথ, কমলাকান্ত প্রমুখ।

অর্থাৎ লেখক চার খণ্ডে মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার মহান সাধক জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদি পর্বে তারাপীঠের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও তার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধারাটি সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপাকে বুঝতে হলে এই পটভূমিকাটি পাঠককে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। পাঁচশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে পটভূমির ছবি এঁকেছেন।

লেখকের ভাষা সুন্দর। ঝরঝরে। সৃষ্টি রহস্য, তারাতত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয়ও তাঁর লিপিকুশলতায় সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থে পরিবেশিত শ্রীশ্রীতারামা, তারামায়ের পাদপদ্ম, খাকিবাবা, বামাক্ষ্যাপা, কাশীর তারামন্দিরের তারাদেবী, গোপালবাড়ীর অন্নছত্রক্ষেত্র প্রভৃতির ছবি নিশ্চিন্তভাবেই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদটি এঁকেছেন 'তন্ত্রভিলাসীর সাধুসঙ্গ' খ্যাত সাধক শিল্পী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তুলিতে তারাপীঠের মন্দির ও তার পাশের জীয়নপুকুর আশ্চর্য ইঙ্গিতময়তায় ফুটে উঠেছে। এ প্রচ্ছদ গ্রন্থখানির মস্ত এক সম্পদ।

যুগান্তর ৫. ১১. ১৯৮৫

৮। পরম শ্রদ্ধেয়, "আপনার লিখিত 'মহাপীঠ তারাপীঠ' পুস্তকটির প্রথম খণ্ড পড়ে আমার মত মুমূর্ষুর মনে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠলো। যে সকল বস্তুর খোঁজে দুশ্চিন্তা বশে ঘুরে বেড়াতাম, সেই সকল বস্তুগুলি মহাপীঠ তারাপীঠ পুস্তকের মধ্যে পেয়ে আমার মনের সকল অভাব দূর হয়েছে। পুস্তকটি আমার এতই ভাল লেগেছে যে ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারবো না।

আমার অলৌকিক দিব্য গুরু বামদেব একদিন আমাকে বলেছিলেন, "কালে সব জানতে পারবি। এখন তা বুঝতে পারছি।... ... ..গুরুবাবা ও তারামা'র শ্রীচরণে প্রার্থণা করি, আপনি সুস্থ দেহে বিচরণ করে দিনে দিনে জগততারিণী মহামায়ার তত্ত্বকথা শুনিয়ে আনন্দ দান করবেন। মা তারা আপনার লেখনীতে প্রকাশিতা হয়ে ভক্ত মাঝে বিরাজ করবেন। আপনার দর্শনের আশায় রহিলাম।

শ্রীধনঞ্জয় মান্না, কাজীবাগান লেন, হাওড়া-৪ (২৯. ৭. ৮৫)

৯। শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ভক্তি ভাবাপ্লুত মহাপীঠ তারাপীঠ বইটি পড়ে মুগ্ধ হ'লাম।

বিদেশের পরিবেশে বহুদিন বাস করায় চিন্তাধারা কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সে কথা অস্বীকার করা যায়না।

সেই কারণেই হয়তো আপনার রচনায় আপনার জীবনের সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী হৃদয়ঙ্গম করতে একটু একটু অসুবিধা হয়েছিল। পরে অবশ্য পড়তে পড়তে সে অভাবটাপূর্ণ হয়ে গেল।

তপন কুমার মুখোপাধ্যায় (২৪. ২. ৮৬)
ডিমেক্রসী লেন, পটোম্যাক, এম, ডি, আমেরিকা।

১০। মান্যবর,

'মহাপীঠ তারাপীঠ' পুস্তকটি পাইয়া কি যে আনন্দ পাইলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে খুবই অসম্ভব।

আপনি পুস্তকে শ্রীশ্রীঠাকুর বাবার (শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের) বয়স সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন। তাহা অভ্রান্ত সত্য।

...আপনি যে মায়ের গুপ্ত তন্ত্রসাধক, এটি অনুভব করেছি।

শ্রীঅহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৩. ৬. ৮৬)
টি. সি. মুখার্জী ষ্ট্রীট, রিষড়া, হুগলী।

—o—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'মহাপীঠ তারাপীঠ' প্রসঙ্গে এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিষয়ে যে সকল মহাসাধক ও মহাসাধিকা গণ সহযোগিতা করেছেন এবং তারাপীঠ ও বীরভূম এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সকল বিশিষ্ট গুরুগণ আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি—

১। স্বামী মাধবানন্দগিরি মহারাজ (কোন্নগর আশ্রম, হুগলী, পঃ বঙ্গ)

২। আনন্দময়ী মা (কন্‌খল আশ্রম, হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশ)

৩। প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ)

৪। নগেন্দ্রনাথ বাগচি (বামামিশন, তারাপীঠ, বীরভূম)

৫। ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত (তেলিখানা শ্মশান, হরিপাল, হুগলী)

৬। অঘোরী বাবা (কল্যানী ও নৈহাটি আশ্রম, পঃ বঙ্গ)

৭। রামনাথ অঘোরী বাবা (কলকাতা-৩)

৮। ভৈরবী মা (ডানকুনি আশ্রম, হুগলী)

৯। বহেরা বাবা (কলকাতা-১৯)

১০। দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (কামারপাড়া, পশ্চিমদিনাজপুর)

১১। জগদীশ মজুমদার, (কঙ্কালীবাবা, কলকাতা-২০)

১২। যোগেশ ব্রহ্মচারী (গ্রাম্য যোগাশ্রম, বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলকাতা)

১৩। নাঙ্গাবাবা (জোড়াবাগান, কলকাতা)

১৪। বুস্তাবাবা (কলকাতা-২০)

১৫। বুড়ি মা (বালুরঘাট, পশ্চিমদিনাজপুর)

১৬। শিবানন্দ গিরি মহারাজ ('ভোলাগিরি স্নেহনীড়', আগরপাড়া, কলকাতা-৫৮)

১৭। কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (যমুনানন্দ আশ্রম, তারাপীঠ)

১৮। শম্ভুগিরি মহারাজ (ঋষি কল্পতরু আশ্রম, কেসেসোল, বাঁকুড়া)

১৯। রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় (মাতৃমন্দির, দারিয়াপুর, হুগলী)

২০। ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, সোদপুর)
২১। বিজয় অঘোরী (কলকাতা-৩৩)
২২। যোগানন্দ ভারতী (মৌনীবাবা) (প্রাচীন মায়াপুর. নবদ্বীপ)
২৩। মনোহর ক্ষ্যাপা (মার্বেল প্যালেস, কলকাতা)
২৪। ভূপতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা-২৫)
২৫। সত্যচরণ লাহিড়ি (চৌষট্টি ঘাট, কাশী)
২৬। পাহাড়ি বাবা (চুচূড়া আশ্রম, হুগলী)
২৭। স্বামী মাধবানন্দ (মানিকতলা, কলকাতা)
২৮। বাসুদেব মহারাজ (কোন্নগর আশ্রম, হুগলী)
২৯। যোগেশ পাণ্ডা (তারাপীঠ, বীরভূম)
৩০। সুধামুখী দেবী (,, ,,)
৩১। কুণ্ডলিনী দেবী (,, ,,)
৩২। শ্যামাপদ পাণ্ডা (,, ,,)
৩৩। গুরুপদ পাণ্ডা (,, ,,)
৩৪। শিশির পাণ্ডা (,, ,,)
৩৫। কাশীনাথ পাণ্ডা (,, ,,)
৩৬। সত্য পাণ্ডা (,, ,,)
৩৭। নিত্যগোপাল পান্ডা (,, ,,)
৩৮। রমাপদ পান্ডা (,, ,,)
৩৯। অন্নপূর্ণাদেবী (পান্ডা)(,, ,,)
৪০। অনিল চট্টোপাধ্যায় (শিবু পান্ডা) ,,)
৪১। কালীদাসীদেবী (কঙ্কালী মা) ,, ,,)
৪২। যোগমায়া ভৈরবী (তারাপীঠ মহাশ্মশান, বীরভূম)
৪৩। কিরণ ভৈরবী (,, ,, ,,)
৪৪। কেদার বাবা (,, ,, ,,)
৪৫। স্বামী সদানন্দ (,, ,, ,,)
৪৬। স্বামী হরানন্দ (,, ,, ,,)
৪৭। শঙ্কর বাবা (,, ,, ,,)
৪৮। রমন সাধু (,, ,, ,,)
৪৯। রবি সাধু (,, ,, ,,)
৫০। স্বামী বশিষ্ঠানন্দ (,, ,, ,,)
৫১। হীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী (লাহিড়িবাবা) ,, ,,)

৫২।	বিজয় গোঁসাই	(মুণ্ডমালিনীতলা, তারাপীঠ)
৫৩।	করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য	(সরলপুর, বীরভূম)
৫৪।	শশী মোড়ল	(" ")
৫৫।	কানাই ভট্টাচার্য্য	(" ")
৫৬।	অম্বুজাক্ষ রায়	(খরুণ, বীরভূম)
৫৭।	সিন্ধুবালা দেবী	(কুণ্ডলাগ্রাম, বীরভূম)
৫৮।	দেবকুমার রায়	(আটলাগ্রাম, বীরভূম)
৫৯।	গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য	(" ")
৬০।	আশুতোষ মণ্ডল	(" ")
৬১।	গৌড় প্রামাণিক	(তারাপুর, বীরভূম)
৬২।	আনন্দ নরসুন্দর	(" ")
৬৩।	নিত্য মিস্ত্রি	(" ")
৬৪।	শরৎচন্দ্র মজুমদার	(" ")
৬৫।	নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	(কড়কড়িয়া গ্রাম, বীরভূম)
৬৬।	কমলাক্ষ রায়	(" ")
৬৭।	শশধর সেন	(" ")
৬৮।	ভানু মণ্ডল	(" ")
৬৯।	ননী কোনাই	(" ")
৭০।	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	(" ")
৭১।	সুধাকর মুখোপাধ্যায়	(বড়শালগ্রাম, বীরভূম)
৭২।	রামগোপাল মণ্ডল	(বামদেবপুর, বীরভূম)
৭৩।	চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	(রামপুরহাট, ")
৭৪।	দেবকুমার মুখোপাধ্যায়	(" ")
৭৫।	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	(" ")
৭৬।	ডাক্তার কাশীনাথ সিংহ	(" ")
৭৭।	ভোলানাথ চক্রবর্তী	(বক্রেশ্বর, বীরভূম)
৭৮।	স্বামী অভয়ানন্দ	(" ")
৭৯।	মৌনী বাবা	(" ")
৮০।	তাপস হালদার	(সুরিচুয়া গ্রাম, বীরভূম)
৮১।	বিশ্বনাথ মাহাতো	(সুরিচুয়া গ্রাম, বীরভূম)
৮২।	ধীরাজকৃষ্ণ উকিল	(ফুল্লরাপীঠ, বীরভূম)
৮৩।	রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়	(বুতুনি গ্রাম, মানিকগঞ্জ)

৮৪। পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বামামিশন, তারাপীঠ)
৮৫। সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বামদেব সংঘ „)
৮৬। মায়ানন্দতীর্থ ভৈরবী (তারাপীঠ)
৮৭। শরৎ প্রামানিক (তারামাতা সেবক সমিতি তারাপীঠ)
৮৮। ভূষণ পাল (কবিচন্দ্রপুর, বীরভূম)
৮৯। প্রকাশ মৈত্র (চাতরা, বীরভূম)
৯০। পাগল যোগানন্দ বাবা (হাট-ন-পাড়া, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা)
৯১। বিমলানন্দগিরি (মহানন্দ মিশন, কলকাতা)
৯২। পূর্ণদাস বাউল (ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১)
৯৩। সত্যানন্দ গিরি (কালীঘাট, কলকাতা)
৯৪। দেবরানী ভট্টাচার্য্য (বেহালা, কলকাতা)
৯৫। তারাপদ চট্টোপাধ্যায় (জলঝুপি, মুর্শিদাবাদ)
৯৬। ঈশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (জানবাড়ী, হাওড়া)
৯৭। অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (বগুল, বর্ধমান)
৯৮। স্বামী নির্বেদানন্দ (সত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর, কলকাতা)
৯৯। স্বামী উমানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, বরানগর)
১০০। স্বামী অরুণানন্দ (” ”)
১০১। অর্চনাপুরী (সত্যানন্দ দেবায়তন ”)
১০২। ফুলমা (” ”)
১০৩। স্বামী নচীকেতসানন্দ (সারদাবিহার, ঠাকুরপুকুর)
১০৪। স্বামী কিরণানন্দ (কলকাতা-৩৩)
১০৫। হরিপদ চক্রবর্তী (লেক কালীবাড়ী, কলকাতা)
১০৬। জটুভাই (সেলিমপুর, কলকাতা)
১০৭। দুলুঠাকুর (কামারপাড়া, পশ্চিমদিনাজপুর)
১০৮। প্রণব কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বালুরঘাট ”)
১০৯। অরুণা মা (শিবানন্দ আশ্রম, ঋষিকেশ, উঃ প্রদেশ)
১১০। অমৃতনাথ (চোরবাগান, কলকাতা)
১১১। মা মণি (কলকাতা-১৯)
১১২। বিনয়ক্ষ্যাপা (পাদপীঠ আশ্রম, ভদ্রেশ্বর, হুগলী)
১১৩। রাধা মা (সোদপর আশ্রম, ২৪ পরগণা)
১১৪। জহুরা মা (রাণাঘাট আশ্রম, পঃ বঙ্গ)

১১৫। কানাই হালদার (কালীঘাট, কলকাতা)
১১৬। সংহিতাদেবী (স্বামী স্বরূপানন্দ আশ্রম, কাঁকুরগাছি)
১১৭। সতী মা (দুমকা আশ্রম, বিহার)
১১৮। লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী (কলকাতা-৩)
১১৯। গোবিন্দানন্দ গিরি (ভোলাগিরি আশ্রম, কলকাতা-৩১)
১২০। সাধক বাসুদেব (গোধুলিয়া আশ্রম, কাশী)
১২১। উপেন্দ্র চৌধুরী (তারামন্দির, গোপালবাড়ী, কাশী)
১২২। যোগেশ্বরী মা (রাজপুর, ২৪ পরগণা)
১২৩। গোবিন্দ ঠাকুর, (অন্নপূর্ণা মন্দির, কোদালিয়া, ২৪ পরগণা)
১২৪। বাবুলাল বোস (প্রবুদ্ধ ভবণ, কলাগাছিয়া ")
১২৫। ঠাকুর রামচন্দ্র দেব (জগন্নাথ মন্দির, কাঁচরাপাড়া, পঃ বঙ্গ)
১২৬। পরমহংস নীলকণ্ঠ (মঙ্গলেশ্বরী কালী, কলকাতা-৩১)
১২৭। ডলিমা (তারামন্দির, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২০)
১২৮। নারায়ণী মা (কলকাতা-৬৮)
১২৯। কামাক্ষ্যাবাবা (হালিশহর, পঃ বঙ্গ)
১৩০। অভয়জী (আরাধনা জগৎ, অজন্তা রোড, কলকাতা-৭৫)
১৩১। হরিহর বাবা (শিখানারায়ণ মন্দির, নেপাল)
১৩২। দ্বারিকানাথ পুরী (জুনাগর আশ্রম, সৌরাষ্ট্র, পশ্চিম ভারত)

উপরোক্ত সাধকবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ ছাড়াও কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরো শতাধিক সুহৃদবৃন্দ নানা ভাবে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন। স্থানাভাবে সবার নাম দেয়া সম্ভব হ'ল না। তবে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের চার খণ্ডের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে সংযোগকারী ও সংযোগকারিনী হিসাবে তাঁদের নাম যথাসাধ্য যুক্ত করছি। তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ লাহা এবং শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায়।

'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের (প্রথম খণ্ডের) দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ লাহা, সুজিত মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন, রেখা সেন, সতী খাস্তগীর, বিকাশকান্তি দত্ত, অজীন দাসগুপ্ত, বিনয় দাস, রণজিৎ দাসগুপ্ত,

গোপাল রায়, রণজিৎ পোদ্দার ও পঞ্চানন ঘোষ। এঁদের সবাইকে জানাই আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা।

ব্লকের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন রেডিয়ান্ট প্রসেসের অন্যতম মালিক, সুলেখক শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়। তাঁকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রুফ দেখার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅমূল্য নাগ ও মানিক বসু। এঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের (চার খণ্ডের) জন্য বিগত ষোল বছরে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ছবি তুলেছেন তাঁদের নাম প্রথম খণ্ডে দেয়া হয়েছে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে যাঁরা ছবি তুলেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বাচ্চু দাসগুপ্ত, ভগবতী প্রসাদ কাজোরিয়া, রঘনাথ বোস, পুলক সেন, স্বদেশ মিত্র ও প্রতুল সেন।

এই স্নেহভাজনদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

—o—

বিষয়সূচী

(মধ্য যুগ)

[শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মধ্যলীলা]

(বাংলা ১২৭১ সন থেকে ১২৯৯ সন পর্যন্ত। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আটাশ বছর বয়স থেকে ছাপ্পান্ন বছর পর্যন্ত।)

—o—



শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা



নরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ২৩ বছর বয়সের



স্বামী বামানন্দ ভারতী কর্তৃক প্রদত্ত তারামায়ের ছবি



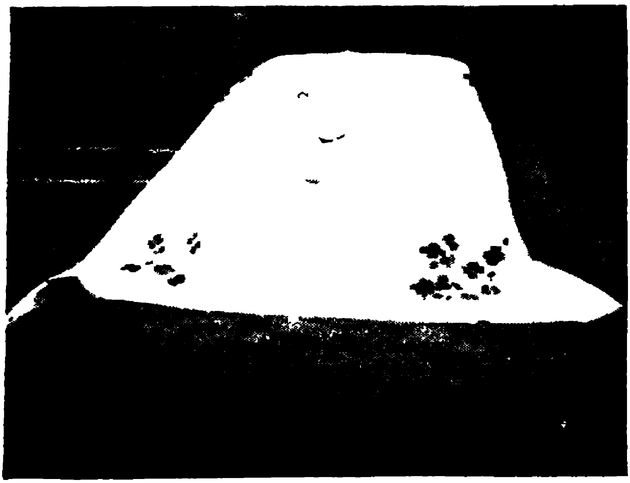
মহাসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব



শ্রীশ্রী পাহড়ী বাবা ফটো ঃ অমল বোস



পাহাড়ী বাবার আশ্রম মন্দিরে শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার ব্যবহৃত পাদুকাদ্বয়। ফটো ঃ অমল বোস



মহান সাধক কেশব সেনের জপের মালা। শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা কর্তৃক প্রদত্ত এই জপের মালা।

ফটো ঃ প্রতুল সেন



শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্ফটিকের মালা ও বামাক্ষ্যাপার বাণলিঙ্গ শিব হাতে লেখক। পাশে দুলু ঠাকুর এবং ভক্তবৃন্দ।



শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনামের ঝুলি ধরে আছেন দুলু ঠাকুরের ভাই, লেখক এবং দুলু ঠাকুর।

ফটো ঃ পুলক সেন



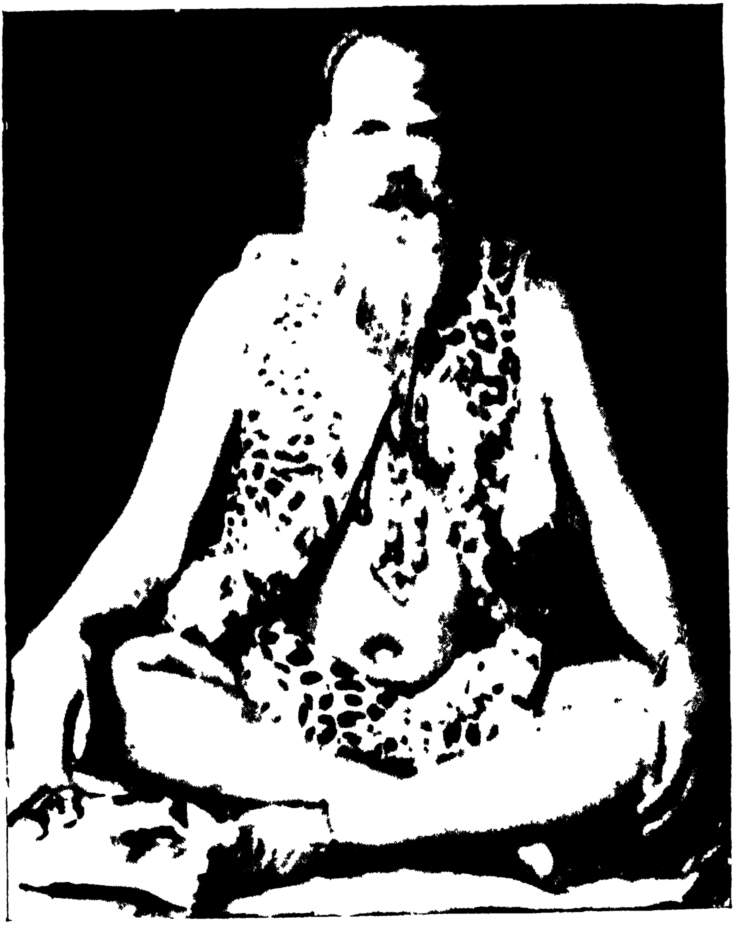
সিদ্ধ পুরুষ শ্রী দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপবিত্র স্ফটিকের মালা ও শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার দিব্য বানলিঙ্গ শিব হাতে লেখক। ফটো ঃ পুলক সেন



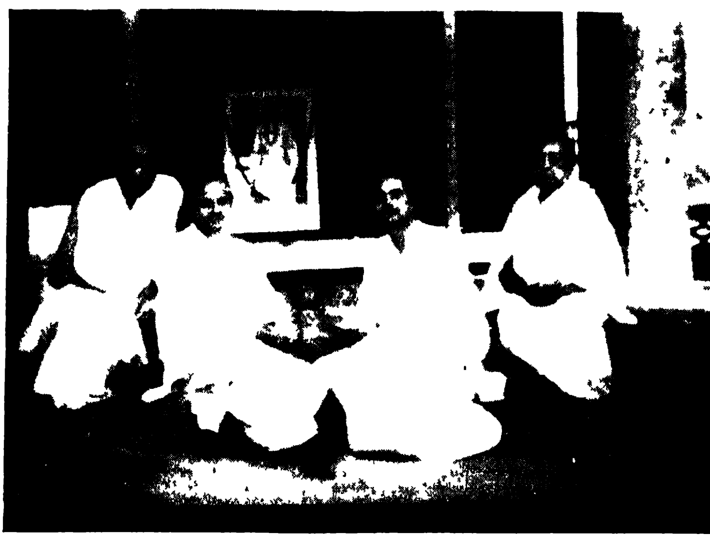
শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু



যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা



শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ

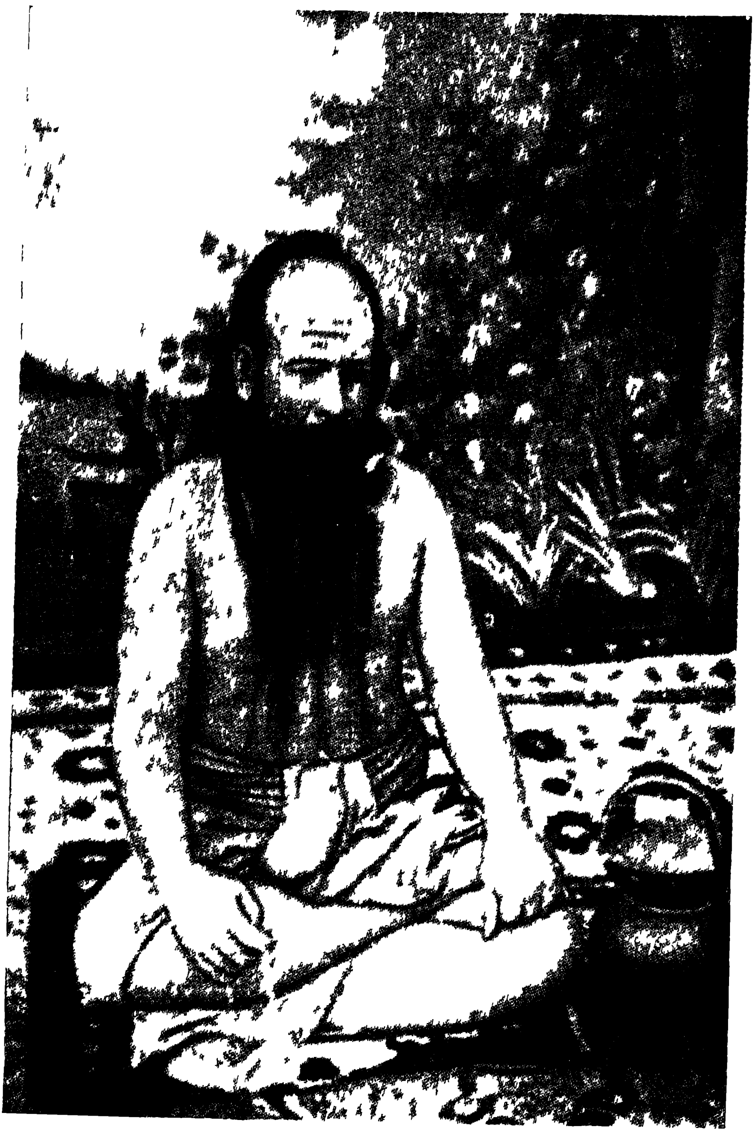


মাধবানন্দ গিরি মহারাজের সমাধি মন্দির। বামদিক থেকে উপবিষ্ট বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অহীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক এবং দুর্গাদেবী

 ফটো ঃ ভগবতী প্রসাদ কাজরীয়া



মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপা



স্বামী বামানন্দ ভারতী



মহাসাধিকা ভৈরবী মা



শ্রীশ্রী বহেরা বাবা ও লেখক



সিদ্ধ সাধিকা বুড়িমা ও পবিত্র আম্রবৃক্ষ।
বুড়িমার পাশে লেখক।

কিছু কথা

অপার করুণাময়ী, ব্রহ্মময়ী, চিরকল্যাণময়ী ও সর্বভাবময়ী তারামায়ের অসীম কৃপায় এবং শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পরম আশীর্বাদে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। দ্বিতীয় খণ্ডে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য মহাজীবনের বিশাল মধ্যলীলা বর্ণিত হয়েছে।

এই খণ্ডে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহান মধ্যলীলা ছাড়াও তাঁর পবিত্র লীলার সাথে যুক্ত আরো বহু উচ্চকোটির মহাসাধক ও মহা-সাধিকার কথা ও মনীষীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীশ্রীমাধবানন্দগিরি মহারাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), শাওন ফকীর, তারাক্ষ্যাপা, মগনানন্দ ভৈরবী, বহেরাবাবা, জয়তারাবাবা, পূর্ণানন্দ গিরি, ভৈরবী মা, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শশধর তর্কচূড়ামণি, পাহাড়ী বাবা, রামানন্দ ভারতী কেশবসাধু প্রভৃতিগণ।

বাংলা ১৩৭৬ সালের ৪ঠা পৌষ শনিবার প্রথম তারাপীঠে এসে সেদিনই সমগ্র তারাপীঠ ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহাজীবন-লীলার ওপর এক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার সংকল্প অতি আশ্চর্য্যভাবে গ্রহণ করি ('নিবেদন'—প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। তার দীর্ঘ আটান্ন বছর পূর্বেই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর মহান মর্ত্যলীলা সম্পূর্ণ করে অপ্রকট হয়েছেন। তবু জগতজননী তারামা ও পরম-পুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অসীম কৃপায় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য জীবনের অফুরন্ত লীলা সংগৃহীত হয়েছে। তার সাথে আরো সংগৃহীত হয়েছে শতাধিক মহাসাধক ও মহাসাধিকার অপূর্ব সাধন জীবনের কাহিনী। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সান্নিধ্যে ও নিগূঢ় নির্দেশে সেই সব মহান জীবন আরো মহিমান্বিত হয়েছে। শ্রীশ্রী-বামাক্ষ্যাপার পবিত্র ও দিব্য বিশাল লীলা কাহিনী শুধু তারাপীঠ বা আটলাগ্রাম থেকেই সংগৃহীত হয়নি, বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও সংগৃহীত হয়েছে।

বিশাল ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল প্রান্ত থেকেই অতি আশ্চর্য্যভাবে ও অলৌকিকভাবে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্যলীলা কাহিনী সকল সংগৃহীত হয়েছে সুদীর্ঘ ষোল বছর ধরে।

ত্রিলোক জননী তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অফুরন্ত কৃপায় এক আশ্চর্য্য ও অদৃশ্য দিব্য শক্তি এই সুদীর্ঘ কাল ধরে নেপথ্য থেকে এই অজস্র তথ্য সকল আমায় যুগিয়ে গেছে। শুধু ভারত থেকেই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল লণ্ডন থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে যিশুখৃষ্ট, ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, ও ভাস্করানন্দের তুলনামূলক আলোচনা সমৃদ্ধ (Comparative discussion) গ্রন্থও এই লেখকের কাছে সেই আশ্চর্য্য অদৃশ্য শক্তি পোঁছে দিয়েছে—ঠিক যেমনভাবে তারাসাধনার নিগূঢ়ধারার ইতিহাস ভারতের বাইরে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মহাচীন প্রভৃতি বিদেশ থেকে এসেছে এই লেখকের কাছে।

তা না হলে আমার ন্যায় এক অতি সাধারণ মানবের পক্ষে এই মহাসমুদ্র সদৃশ শ্রীশ্রীতারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অফুরন্ত লীলালহরি সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ও অসম্ভব ছিল। কলের পুতুলকে চাবি দিয়ে দম দিলে তবেই সে চলতে পারে, না হলে সে শুধুই জড় মাত্র। তেমনি অপার করুণাময়ী তারামা ও শ্রীশ্রী-বামাক্ষ্যাপা এই জড়মুখী দীন আধারে কৃপার চাবি দিয়ে এই মহা-চৈতন্য স্বরূপ মহালীলার সন্ধান দিলেন। তা না হলে এই মহাজ্ঞান, মহাপ্রেম ও মহাকরুণার লীলামণ্ডিত মহাসমুদ্রের সন্ধান কোনদিনই পাবার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পূর্ণাঙ্গ ও প্রামান্য লীলা কাহিনী (আদি মধ্য ও অন্তলীলা) রচনা করতে গিয়ে মূলত দশটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেছিঃ—

১। প্রত্যক্ষ (Direct)

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পরম পবিত্র দিব্য সঙ্গ ধন্য যে সকল শিষ্য ও ভক্তদের (সন্ন্যাসী ও গৃহী) সাক্ষাৎ লেখক লাভ করেছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপর্ণ বিশদ বিবরণ সকল।

২। পরোক্ষ (Indirect)

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে যাঁরা বাল্যকালে বা কৈশোরে দর্শন করেছেন

কিন্তু বামাক্ষ্যাপার দিব্যলীলা প্রত্যক্ষ করেন নি, অথচ তাঁদের পিতা-মাতা বা গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় স্বজন বা বিশেষ পরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে (যাঁরা তাঁর বিভিন্ন দিব্য লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন) শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার লীলাকাহিনী শুনেছেন—সেসব কাহিনীর বিবরণ।

৩। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্যসঙ্গ লাভ করেছেন ও বিশেষ কোন লীলা দর্শন করেছেন এবং নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেছেন এমন সব প্রাচীন (শতাধিক, দ্বিশতাধিক বছরের) শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার গুণমুগ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাসাধিকাদের অভিজ্ঞতামণ্ডিত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিবরণ। যা তাঁরা এই লেখককে বলেছেন।

৪। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য কৃপাধন্য যে সকল শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধগণ তাঁর জীবনকাহিনী যথাসাধ্য রচনা করেছেন, সেই-সকল কাহিনীর মধ্যে যে সকল তথ্যপূর্ণ ও বাস্তব ভিত্তিক এবং মূলত বহু পরিচিত ও বহুজন স্বীকৃত, সেই সকল কাহিনীর বিবরণ।

৫। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জীবনলীলার কাহিনী নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে যে সকল কাহিনী মূলত প্রামান্য ও বাস্তবভিত্তিক এবং তথ্যপূর্ণ—সেই সকল কাহিনীর বিবরণ।

৬। ভারতের বিভিন্ন সাধন কাহিনী ও সাধকদের জীবনী গ্রন্থ থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জীবনলীলা সম্পর্কে যে সকল বিশিষ্ট কাহিনী পাওয়া গেছে, সেই সবের তথ্যপূর্ণ বিবরণ।

৭। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অলৌকিক লীলা ও জীবনকাহিনী সম্পর্কে তৎকালীন যে সকল সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল—সেইসবের তথ্যপূর্ণ বিবরণ।

৮। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্থূলদেহ অপ্রকট হবার পর তাঁর স্মরণে বিভিন্ন স্মরণ সভায় যে সকল অপ্রকাশিত লীলাকাহিনী বর্ণিত হয়েছে সে সবের বিবরণ।

৯। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অজস্র অলৌকিক লীলা ও যোগবিভূতি সম্পর্কে ও তাঁর দিব্য কৃপা প্রসঙ্গে যে সকল কিংবদন্তী রয়েছে, সেই সবের মধ্যে যে সকল যথার্থ তথ্যপর্ণ ও বহুজন স্বীকৃত ও

বিভিন্ন লীলা কাহিনীর যোগসূত্র স্বরূপ—সেই সকল কাহিনীর বিবরণ।

১০। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিদেহলীলার যে সকল কাহিনী এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেই সকল কাহিনীর তথ্যপূর্ণ বিবরণ।

উপরোক্ত এই দশটি বিষয়ের ওপর মূলত নির্ভর ক'রে মহাপীঠ তারাপীঠের প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য ও পবিত্র মহাজীবনী রচিত হয়েছে।

উপরোক্ত দশটি বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেখক পত্র মারফৎ ও লোক মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং পরে নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই দশটি বিষয়ের অসংখ্য তথ্য সমৃদ্ধ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা কিন্তু সহজসাধ্য হয়নি।

লীলাময়ী তারামায়ের ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার রঙ্গ চিরদিনই অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও নিগূঢ় রহস্যময়। এই অপ্রাকৃত লীলার দ্বন্দ্ব যেমন মধুর তেমনই ভয়ঙ্কর। অত্যন্ত কঠিন প্রতিকূলতা যেন তাঁদের লীলার এক অপরিহার্য অঙ্গ। বহিরঙ্গে, আপাত দৃষ্টিতে তাঁদের কৃপালীলাও যেন ভীষণ অগ্নিবর্ষী কিন্তু পরিণামে মধুর অমৃতময়। কিন্তু ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণের মধ্যে দিয়েই সুদীর্ঘ কাল ধরে সাধনা করতে হয় অমৃতলাভের জন্য।

এটা ভারতীয় সাধনারও এক চিরন্তন ধারা। যে দিব্য বস্তু যত দুর্লভ সেই মহাদুর্লভ বস্তু লাভের জন্য তত কঠিন সাধনাই সুনির্দিষ্ট। পরিণামে (অবশ্য কৃপা না হলে টিকে থাকাও যায় না) মধুর আনন্দ ও অমৃতলাভ হয়।

ত্রিলোকজননী তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা এই দীনের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মহান ঐতিহ্যের পূর্ণ মর্যাদা রেখেছেন। সুদীর্ঘ ষোল বছর ধরে এই ভয়ঙ্কর কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে সার্বিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে।

একদিকে সমগ্র মহাপীঠ তারাপীঠের বিরাট আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্যসকল সংগ্রহ করা, তার সাথে মহাপীঠ তারাপীঠকে কেন্দ্র করে শতাধিক সিদ্ধ সাধক সাধিকাদের সাধনকাহিনী সংগ্রহ করা ও কালানুসারে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করা, সর্বোপরি তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ-

পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার আদি, মধ্য ও অন্তলীলা সমন্বিত বিশাল জীবনলীলার অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্য সকল সমগ্র ভারত থেকে সংগ্রহ করা এবং উপরোক্ত দশটি বিষয়ভিত্তিকে কালানুসারে ও ক্রমানুসারে সুগ্রথিত ক'রে রচনা করা এবং তার সাথে আরো শতাধিক দুর্লভ মহাপুরুষ ও মহাসাধিকাদের সাক্ষাৎকার ও শতাধিক দুর্লভ ছবি সংগ্রহ করা প্রভৃতি সব একই সাথে চলেছে বিগত ষোল বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন ও সার্বিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে। তার সাথে এই জগৎ সংসারের অশান্তির অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও স্বার্থপরতার প্রাচুর্য্যের মধ্যে সর্বতোভাবে রাখলেন তারামা সুদীর্ঘ চৌদ্দবছর ধরে।

তবু ত্রিলোকতারিণী তারামা ও করুণাময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার ঐশী কৃপা শক্তিতে শেষপর্যন্ত সকল বাধাবিপত্তি ও ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে পরম লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়েছি। আর গড়ে উঠেছে "মহাপীঠ তারাপীঠে"র পূর্ণাঙ্গ মহাসৌধ।

তারামায়ের অসীম কৃপায়, জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছি সেই বিখ্যাত প্রবচনটি—"তাঁর কৃপা হলে মূকও মুখর হতে পারে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়।" তারামায়ের অপার কৃপায় আমার মত এক অতি সাধারণ দীন ও অনিত্য জগতের লোক পেয়েছে নিত্য জগতের সন্ধান। গৃহ-মুখী ও স্নেহকাতর মোহযুক্ত মন পেয়েছে মোহমুক্তির মহাআস্বাদ। জড়মুখী লেখনী পেয়েছে চৈতন্যের প্রাণবন্ত গতি। আর সংসারের সঙ্গ জর্জর মূক মন আজ নিঃসঙ্গতার আনন্দে মুখর। সর্বোপরি বিষয় বিষে কাতর পার্থিব রসনা আজ তারানামের পরমার্থিক অমৃত আস্বাদে বিভোর ও মুখর হয়েছে।

তাই করুণাময়ী তারামায়ের মহাকৃপায় আমার মত সর্বতোভাবে পঙ্গু আজ "মহাপীঠ তারাপীঠ" এর মহাগিরি অতিক্রম করে তারা-মায়ের নিত্য অমৃতময় চরণকমলে পরম শান্তি লাভ করে চিরতরে ধন্য হয়েছে। ত্রিলোক জননী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামা-ক্ষ্যাপার এই বিশাল দিব্যলীলা সকল পাঠ করে চিরশান্তি আনন্দ ও অমৃতলাভ করুক আর্ত, তৃষিত ও তাপিত বিশ্ববাসী—এই পরম প্রার্থনা রইল তারামায়ের রাতুল চরণে।

জয় মা তারা জয় বাম।

মহাপীঠ তারাপীঠ

(মধ্য যুগ)

লীলাময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্তহীন লীলা যেমন বিচিত্র তেমনি বৈচিত্র্যময়। এই অফুরন্ত লীলা ক্রমশঃ বিরাটরূপে জনকল্যাণে নেমে আসে ঐশী নির্দিষ্ট হয়ে। এই লীলার তাৎপর্য এত গভীর যে তা সাধারণ গৃহী ভক্তের কাছে চিন্তার অতীত।

তাঁর সাধনতত্ত্ব যেমন অতি নিগূঢ় তেমনি তাঁর বিশাল বৈচিত্র্যময় লীলাও অত্যন্ত গভীর রহস্যময়। একদিকে তিনি পূর্ণ নিরালম্ব যোগী, অবধূত চূড়ামণি, অন্যদিকে তিনি কলনাথের নাথ। তাছাড়া তন্ত্র নির্দিষ্ট সকল ভয়ঙ্কর কঠিন সাধনাও তাঁর করায়ত্ত্ব।

কৌলসাধনার বিভিন্ন ধারা অর্থাৎ শব সাধন, লতা সাধন, চিতা সাধন, মুণ্ড সাধন, যোগিনী সাধন প্রভৃতি সকল ভয়ঙ্কর সাধনাই তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এ সকল সাধনা ও সিদ্ধি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। যাঁর কাছে অষ্টসিদ্ধিও হাত জোড় করে থাকে এবং যিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও তন্ত্রের মহাসমন্বয়স্বরূপ মহাসমুদ্র—সেই পরম ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মময়ী তারামা'র অভেদ স্বরূপের কাছে উপরোক্ত সকল সাধনাই অকিঞ্চিৎকর।

আবার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অফুরন্ত লীলাও যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি গভীর রহস্যময়। আপাতবিরোধী রূপ তাঁর সকল লীলার মধ্যে। বহিরঙ্গে ভয়ঙ্কর উগ্র, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুক্ষ ও কর্কশ তিনি, কিন্তু অন্তরঙ্গে স্নেহবিহ্বল ও অপার করুণাঘন রূপ তাঁর। নীরবে তাঁর কৃপাশক্তি অন্তসলিলার ন্যায় শতশত সাধক, সাধিকা, সন্ন্যাসী ও সহস্র সহস্র গৃহী ভক্তজনের ওপর বয়ে গেছে। এমন কি অজস্র পাপী, দুষ্কৃতিকারী, পাষণ্ডদেরও উপর বয়ে গেছে তাঁর অলৌকিক করুণাঘন কৃপাশক্তি।

পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য

ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর পর এযুগে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাই হলেন একমাত্র পরম করুণাঘন মহাপুরুষ যিনি নির্বিচারে তাঁর মহাকরুণার মহাশক্তি সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী ভক্ত থেকে শুরু করে সকল রকম পাপীতাপীকে অকাতরে' বিনাদ্বিধায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে এসে যোগী থেকে ভোগী, ভোগী থেকে রোগী ও সর্বস্তরের মহাপাপী পর্যন্ত কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি। সকলেই তাঁর মহাকৃপাশক্তি লাভ করে ধন্য হয়েছেন, পবিত্র হয়েছেন। মুক্ত হয়েছেন রোগ শোক জরা ব্যাধি ও জগতের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে।

অজস্র সাধু সন্ন্যাসীগণ পেয়েছেন তাঁর দিব্য সান্নিধ্য ও মহান কৃপা এবং সাধনপথের আরো গভীর পথ নির্দেশ। অসংখ্য গৃহী-ভক্তজন পেয়েছেন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রার্থিত বস্তু। আর অগণিত পাপীতাপী পেয়েছে মহামুক্তি। উপরন্তু সবাইকে এগিয়ে দিয়েছেন ত্রিলোকতারিণী তারামায়ের চিরআনন্দ, চিরশান্তি ও চিরপবিত্র চরণকমলে। 'তারা' নামের মহাশক্তি ও মহাআনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন সবাইকে তাঁর অফুরন্ত দিব্যলীলার মধ্য দিয়ে। সবাইকে বলেছেন, 'ওরে, আমি কেউ নই। সব ঐ তারাবেটীর খেলা। তাঁকে ধর, সব পাবি।'

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সবকিছুই তারামা। তাই সবাইকে মহাকৃপা-শক্তি দিয়ে তারামা'র দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। ফলে তাঁদের ইহ-কালেরই শুধু ব্যবস্থা করে দেননি, পরকালের মহামুক্তিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাঁরা নিতান্ত পার্থিব চাহিদা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ রোগমুক্তি, আর্থিক স্বচ্ছলতা, বিপদ থেকে ত্রাণ প্রভৃতি—তাঁদের সেইসকল তো তিনি পূরণ করে দিয়েছেনই, উপরন্তু অশেষ করুণা করে তাঁদের অপার্থিব জগতের সন্ধান দিয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুর এই আবর্ত থেকে চিরমুক্তির পথ দেখিয়েছেন সংসারের অগ্নিময় সমুদ্র থেকে। 'তারা' নামের তরীতে তাঁদের তুলে দিয়েছেন পরম করুণা করে। আর তাঁদের এই ভয়ঙ্কর জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দুঃখ কষ্টের আগুনের সমুদ্রে ডুবে যেতে হবে না।

অমৃতময় 'তারা' নামের সাথে নামী যে অভেদ। ত্রিলোক-জননী, ব্রহ্মময়ী, অপার করুণাময়ী তারামা সেই তাপিত সন্তানদের তাঁর 'তারা' নামের চির অক্ষয়, চিরশান্তিময়, চিরআনন্দময় তরীতে

তুলে নিয়ে ভবসাগর পার করে তাঁর নিত্য আনন্দময় 'তারালোকে' সানন্দে রেখে দেন।

এই অসীম করুণার মহাশক্তি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অফুরন্ত ধারায় বিতরণ করেছেন। কিন্তু বিতরণ করবার পদ্ধতিটি বিচিত্র রহস্যে ঢাকা। আপাতবিরোধী এই করুণার সহস্র-ধারা। বাইরে অত্যন্ত রুক্ষ, কর্কশ ও কঠিন হয়ে আছেন কিন্তু অন্তরে মহাপ্রেমের করুণা দিয়ে প্রার্থীর প্রার্থণা পূরণ করে দিচ্ছেন। উপরন্তু তাঁর ভবব্যাধিও দূর করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কাউকে ভীষণ ধমক দিয়ে, কাউকে গালাগাল দিয়ে, কাউকে চড়চাপড় মেরে, কাউকে চ্যালা কাঠ দিয়ে মেরে, কাউকে ঢিল ছুড়ে মেরে, কাউকে পদাঘাত করে, আবার কাউকে চিমটে দিয়ে মেরে সেই প্রার্থীর প্রার্থিত বস্তু পরম করুণা করে মিলিয়ে দিয়েছেন। আরো কত ভাবে যে কত জনকে কৃপা করেছেন তার হিসেব নেই।

এই মহাসমুদ্রের মত মহাপ্রেম বুকে নিয়ে এত কাঠিন্যের অভিনয় তিনি সমগ্র জীবন ধরে কিভাবে করে গেছেন তা ভাবলে দেহে মনে প্রাণে শিহরণ জাগে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ও মহাকরুণার ইতিহাসে এই আপাত বিরোধীভাবের এই দ্বন্দ্বমধুর রূপের তুলনা নেই।

ভগবান বুদ্ধ যিনি করুণার অবতার রূপে জগৎপূজ্য, তিনি কিন্তু সর্বদা তাঁর করুণাঘন রূপ নিয়েই সমগ্র জীবন শান্ত সমাহিতভাবে কাটিয়ে গেছেন। তাই ভেতরে ও বাইরে তথাগতের একই শান্ত সৌম্যমূর্তি।

ঈশ্বরের প্রেমময় পুত্র, ঈশ্বর প্রতীম যিশুর মহান প্রেম ও করুণা জগতে সর্বজনবিদিত। তিনিও শান্ত মধুর ভাব নিয়ে ও করুণাঘন রূপ নিয়েই জগতে তাঁর পবিত্র দিব্যলীলা করে গেছেন। ভেতরে ও বাইরে তাঁর করুণাঘন রূপ সর্বজনবিদিত।

এমন কি যিনি শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ অবতার রূপে নিত্য পূজিত, শ্রীরাধার মহাভাবের প্রাণবন্ত মহাবিগ্রহ—সেই যুগাবতার ও প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অফুরন্ত করুণামণ্ডিত অলৌকিক লীলার সাথে তাঁর দিব্য ও পবিত্র, মধুর অনুপম গৌরকান্তি রূপ ও অমৃতময় মধুর বচন এক হয়ে গেছে। তাঁর করুণাঘন লীলা, দিব্য রূপ ও বাক্য এবং ব্যবহারের মধ্যে কোন আপাতবিরোধ নেই। তাঁর মদনমোহন রূপ ও অপার করুণা ও সুধামাখা মধুর কথা প্রভৃতি সবই একসূত্রে গাঁথা।

ভারতের সাধনার মেরুচূড়ামণি মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামীও তাঁর অসীম করুণা ধারা ভারতের ও দেশবিদেশের বহু জনগণের ওপর অকাতরে বর্ষণ করেছেন দীর্ঘ দু'শো বছবেরও ওপর। কিন্তু এই মহাযোগীরও দিব্য মূর্তির রূপ ছিল শান্ত, গম্ভীর ও সমাহিত।

বাইরে ভীষণ অগ্নিস্রাবী জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ও ভেতরে অপার শান্ত মধুর অমৃতময় মহান মহাসমুদ্র—এই দুই প্রচণ্ড বিপরীত রূপ নিয়ে যিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে একভাবে অফুরন্ত দিব্য লীলা করলেন, সেই সদা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, নিত্য মহাপ্রেমে অবস্থিত পুরুষোত্তম শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার এই ভয়ঙ্কর আপাতবিরোধী রূপের তুলনা জগতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে নেই। তাঁর তুলনা কেবল তিনিই। এই মহাসমুদ্রস্বরূপ মহাপ্রেমের মহাশক্তি বুকে নিয়ে, আগ্নেয়গিরির রুদ্র রূপ নিয়ে, বর্ষার অবিরল ধারার মত অপার করুণা অকাতরে নির্বিচারে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ও অজস্র মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এমনি-ভাবে বিলিয়ে দিতে আজ পর্যন্ত আর কাউকে দেখা যায়নি। তিনি পুরুষোত্তম বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যে ব্রহ্মের নিরাকার ও সাকার রূপ সমন্বিত ব্রহ্মময়ী তারামায়ের প্রাণবন্ত বিগ্রহ। মূলত তারামাই তো তিনি, অন্তরঙ্গে তারামাই তো বামাক্ষ্যাপা। তাই 'বামা' তাঁর 'বামা' লীলায় এবার ক্ষ্যাপার সাজে মুখর। শিবানী ক্ষেপী এবার ক্ষ্যাপার বেশে এলেন। জগতে তারা নাম, তারাতত্ত্ব প্রচার ও জীব মুক্তির জন্য ও জগৎ কল্যাণের জন্য স্বয়ং তারামাই এলেন বামাক্ষ্যাপা রূপে। তা না হলে এই অতুলনীয় মহাদিব্য লীলা ও মহাকরুণার অসংখ্য অলৌকিক লীলা এমন সুদুর্লভ অপূর্ব আপাত বিরোধী রূপ নিয়ে এমন নিটোলভাবে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের অধ্যাত্ম জগতে সর্বস্তরে অনুষ্ঠিত হতে পারতো না।

'বাম' রূপে 'বামা'র তাই এই অফুরন্ত দিব্য লীলা জগতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। একদিন তা শুধু সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করবে না, সমগ্র জগতকেই সবলে আকর্ষণ করবে আধ্যাত্মিক জগতের মহাকুলকুণ্ডলিনীরূপে মহাপীঠ 'তারাপীঠে'।

'জয় মা তারা জয় বাম' নামের মহা অমৃত স্বরূপ মহামন্ত্রে সমগ্র বিশ্ব রোমাঞ্চিত হবে। লীলাময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ঐশী শক্তির কৃপায় সেই অমৃতযোগ সমাগত।

অগ্নি পরীক্ষা

আনুমানিক বাংলা ১২৭১ সালের মধ্যভাগে মহাপীঠ, তারাপীঠের মহাশ্মশানে বীরভূমের বসুয়া বিষ্ণুপুর থেকে এলেন এক সুন্দরী যুবতী ভৈরবী। নাম ক্ষেপী ভৈরবী। তারাপীঠ শ্মশান বহিরঙ্গে অত্যন্ত ভয়াবহ। শব, শিবা, সারমেয়, শবাস্থি, শকুনি ও, সর্পসঙ্কুল এই বিরাট মহাশ্মশান। অসংখ্য নরকপাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। নিবিড় অরণ্যের গভীর আঁধার ও ঘোর নির্জনতা দিনের বেলাতেই এই মহাশ্মশানে বিরাজমান। গা ছম্ ছম্ করা এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে মুষ্টিমেয় শ্মশানযাত্রী ভয়ে ভয়ে কোন ক্রমে শবের মুখে আগুন ছুঁয়েই পালিয়ে আসেন মহাশ্মশান থেকে। শবের শেষ পরিণতি দেখবার পূর্বেই নিজেদের শেষ পরিণতির আসু সম্ভাবনায় তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে অতি দ্রুত মহাশ্মশান থেকে বের হয়ে চলে যান।

রাতের বেলায় ঘনঘোর অন্ধকারে আবৃত এই মহাশ্মশান হয়ে ওঠে আরো ভয়ঙ্কর। মহাশ্মশান জাগ্রত হয়ে ওঠে অসংখ্য অশরীরীর অবাধ বিচরণে ও অপ্রাকৃত আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাসে। তার সাথে শিবা ও সারমেয়র শব মাংস নিয়ে বিভৎস চিৎকার ও অসংখ্য বিষধর সর্পের ক্রুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শব্দ ও শকুনি শাবকদের ভয়ঙ্কর করুণ ক্রন্দন ধ্বনি তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে মহাশ্মশানের রূপ ও পরিবেশ এককথায় ভয়াবহ।

কিন্তু এই ভয়াবহ পরিবেশকে জয় করে শ্রীবাম প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে মহাশ্মশানে সর্বদা বিরাজ করছেন। অন্যান্য সাধকদেরও শক্তি ও সাহস দিচ্ছেন। যুবতী ক্ষেপী ভৈরবী (সাধারণ লোকে তাঁকে পাগলী মা বলে ডাকে) এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে এলেন, বীরাচারী সাধকের সন্ধানে। কিন্তু মহাশশ্মানে বীরাচারী সাধকদের মধ্যমণি হলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। বীরাচারেরও ঊর্দ্ধে এই দিব্যাচারী শিবাবতারের স্থান। তারাপীঠ মহাশ্মশানের জাগ্রত ভৈরব হলেন তিনি। গভীর রাতে এই জাগ্রত মহাশ্মশানের ঘোর রবকে ছাপিয়ে ওঠে বামাক্ষ্যাপার মেঘমন্দ্রিত গভীর গম্ভীর গগনভেদী কন্ঠস্বর—'তারা

'জয়তারা' 'জয় জয় তারা', 'শ্রীদুর্গা জয় তারা'—এই মহারবে মহা-শ্মশান পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। নাদ সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপার মেঘ গর্জনের ন্যায় এই কন্ঠস্বর দূর নভোমণ্ডলে গিয়ে প্রতিধ্বণিত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঘোর অন্ধকারে আবৃত গভীর নিশিথে শুধু তারাপীঠ নয়, তারাপীঠ থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত গ্রাম-বাসীগণও সেই গভীর গম্ভীর স্বর শুনতে পেয়ে অসীম শ্রদ্ধার সাথে বলাবলি করেন, 'ঐ যে বামাক্ষ্যাপা ডাকছেন'।

সেই তারাময় শ্রীবামকেও এবার তারামা ফেললেন জগতের প্রথম রিপু 'কাম'এর ভয়াবহ প্রলোভনে তথা ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষায়। কিন্তু সাধকের পক্ষে মহাশশ্মানের ভয়ঙ্কর ভয়ের চেয়েও ভয়াবহ এই সুন্দরী যুবতী নারীর প্রলোভন। শুধু সাধনরত সাধকদেরই নয়, সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষদেরও এতবড় ভয়ঙ্কর প্রলোভন তথা শত্রু আর নেই। সকলযুগে সকল সাধক মহাপুরুষদের চিরন্তন শত্রু এই মোহিনী নারী। রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমন কি মুণিঋষিগণও এই ভয়াবহ প্রলোভন রূপ অগ্নিপরীক্ষা থেকে বাদ যাননি। তাঁদের প্রত্যেককে জগতের এই কঠিনতম পরীক্ষা দিতে হয়েছে। অনেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অনেকে একবারে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কামের দুরন্ত আকর্ষণে সাধনচ্যুত হয়েছেন। আবার নতুন করে তাঁরা সাধন শুরু করে সিদ্ধ হয়েছেন। অনেকে আবার সিদ্ধিলাভ করবার পরও এই দুরন্ত কামের কাছে সাময়িকভাবে হার মেনেছেন। মহর্ষি ব্যাসদেবের এবং শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত তাঁর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই কামকে জয় করাই হ'ল জগতের কঠিনতম তপস্যা। শাস্ত্রে দুরন্ত কাম রিপুকে ভয়ঙ্কর অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নি দিয়ে যেমন অগ্নিকে নির্বাপিত করা যায় না, তেমনি 'কাম'কে ভোগ করে 'কাম' জয় করা যায় না। যতই 'কামকে' ভোগ করা হবে, ততই 'কাম' অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হবে।
তাই ঈশ্বরের সাধনার পথে কঠোরতম তপস্যা হ'ল 'কামকে' জয় করা।

অটুট ব্রহ্মচর্য ছাড়া ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব। 'কাম' প্রতিহত হলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। আবার ক্রোধ থেকে লোভের উৎপত্তি হয়। লোভ থেকে মোহ, মোহ থেকে মদ এবং মদ থেকে মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতি) সৃষ্টি হয়।

এই ষড়রিপু পরস্পর যুক্ত হয়ে আছে জীবের মধ্যে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হ'ল কাম, ক্রোধ ও লোভ। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, 'কাম ক্রোধ লোভ হ'ল নরকের দ্বার'। এই নরকের দ্বার অতিক্রম করতে না পারলে ঈশ্বরের পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। ঈশ্বর দর্শন তো অনেক দূরের কথা। তাই ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে যেমনি, তেমনি সিদ্ধসাধকদের পক্ষেও কামের জ্বলন্ত বিগ্রহ 'নারী' চরম শত্রু স্বরূপ। তাই কামাগ্নির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য সাধককে 'নারীর মুখদর্শন করতেও শাস্ত্র নিষেধ করেছে। কামাগ্নিস্বরূপ এই নারী থেকে সাধককে সর্বদা দূরে থাকতে শাস্ত্র কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। তাই ব্রহ্মচর্য তথা পৌরুষের চিরশত্রু হ'ল নারী। বিশেষ করে সে নারী যদি সুন্দরী ও পূর্ণ যুবতী হয়। এমন আপাতমধুর এবং পরিণামে জ্বলন্ত গরল আর কিছু নেই। ব্রহ্মচর্য ও পৌরুষের পক্ষে চিরশত্রু হ'ল এই নারীর প্রলোভন।

সাধককে ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত করতে; সাধনচ্যুত করে ভ্রষ্ট করতে এই মোহময়ী নারীর মত ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আর কেউ নেই। ঈশ্বরের কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী।

যে নারী গৃহস্থের ক্ষেত্রে শ্রী, সৌন্দর্য, শান্তি, ও কল্যাণময়ীরূপে চিহ্নিতা, সেই নারীই আবার ঈশ্বরের পথে ও সাধনপথে সাধকদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বিঘ্নকারিণী ও সর্বাপেক্ষা বিপদজনক।

সেইজন্য কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী সাধক উভয়ের পক্ষেই কঠোরতম ব্রহ্মচর্য ও সংযমের ক্ষেত্রে নারী থেকে দূরে থাকা উচিত।

গৃহী সাধকদের পক্ষে এই অগ্নিপরীক্ষা আরো ভয়ঙ্কর আরো কঠিন। "রমণীর সাথে থাকে না করে রমণ"—এই মহান আদর্শ হ'ল সাধক গৃহস্থের। গৃহে থেকে স্ত্রীকে পাশে রেখে যিনি কঠোরতম সংযম ও ব্রহ্মচর্য অটুট রাখতে পারেন তিনি সন্ন্যাসীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অবশ্য ঈশ্বরদর্শন লাভ করে ধন্য হ'ন। ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে বহু গৃহীসাধক এই মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের সংখ্যা সিদ্ধ সন্ন্যাসীদের চেয়ে কম নয়।

যা হোক, সুন্দরী যুবতী ক্ষেপী ভৈরবী পূর্ণ যুবক শ্রীবামকে দেখে মুগ্ধ হ'লেন। ভাববিহ্বলা হ'লেন। শ্রীবামের বহিরঙ্গ রূপ দেখে মুগ্ধ হ'লেন সম্পূর্ণভাবে। শ্রীবামের অন্তরঙ্গ স্বরূপ উপলব্ধি

করবার ক্ষমতা তাঁর হ'ল না। তারাপীঠ মহাশ্মশানে তখন মদন গোঁসাই প্রভৃতি আরো অনেক সাধক তপস্যারত ছিলেন। মদন গোঁসাই, ডাবুকের কৈলাসপতির শিষ্য। কিছুকাল পূর্বে তারাপীঠের মহাশ্মশানে এসেছেন গুরুর নির্দেশে সাধনার জন্য। তিনি শ্রীবামের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। শ্রীবাম তাঁকে অগ্রজ জ্ঞানে 'দাদা' সম্বোধন করেন এবং তাঁকে সাধনার ব্যাপারে সাহায্য করেন। উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। যুবতী ও সুন্দরী ক্ষেপী ভৈরবী মদন গোঁসাই ও অন্যান্যদের দেখবার পর বামকে দেখেই মুগ্ধ হলেন। আঠাশ বছরের পূর্ণ যুবক শ্রীবামের স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশদাম, ঘনকৃষ্ণ শশ্রু ও অনুপম লাবণ্যময় দিব্য মুখশ্রী দেখে ভৈরবী চমৎকৃত হলেন এবং পরিপূর্ণভাবে মুগ্ধ হ'লেন।

ভৈরবী এরপর নিজের রূপলাবণ্য দিয়ে বামকে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হলেন এবং নানা ছলাকলা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বীর-সাধক বামদেব বুঝতে পারলেন এই ভৈরবীর আসল উদ্দেশ্য কি! ভৈরবী মূলত কামাতুরা, তাই ভৈরবী বীরাচারের সাধনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপোযুক্তা। শুধু তাই নয়, এই সুন্দরী যুবতী ভৈরবী যে কোন সাধকের পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলকারিণী, তা তিনি বুঝতে পারলেন। তাই মদন গোঁসাই ও অন্যসকলকে সাবধান করে দিলেন এই ক্ষেপী ভৈরবী সম্পর্কে।

তাই শ্রীবাম এই ক্ষেপী ভৈরবীর নাম দিলেন 'কালনেমি'। ত্রেতাযুগে লঙ্কার রাজা রাবণের মামা 'কালনেমি' যেমন লঙ্কা ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়েছিলেন, তেমনি 'কালনেমি' স্বরূপা এই সুন্দরী যুবতী ভৈরবীও সাধকের সাধনার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিণী রূপে চিহ্নিতা। কিন্তু এই কামাসক্তা এবং পূর্ণ যুবতী ও সুন্দরী ভৈরবী একেবারে নাছোড়বান্দা। শ্রীবামকে বীরাচার সাধনের নাম করে নানাভাবে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজদেহের উদগ্র রূপ শ্রীবামের সামনে মেলে ধরতে লাগলেন নানা-ভাবে। নিজের কাম চরিতার্থতার জন্য নানা ছলাকলার আশ্রয় নিতে লাগলো। এবার বাম তাঁর ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ ধারণ করলেন। কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন ভৈরবীকে। ভৈরবীকে জানিয়ে দিলেন যে মহান বীরাচারে সাধনার জন্য দেহে মনে যে কঠোরতম

সংযম, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার প্রয়োজন তা তার নেই। দেহে থেকেও যে দেহ-বোধহীন উপলব্ধির প্রয়োজন তাও তার নেই। সুতরাং শ্রীবামের পেছনে কামাসক্ত হয়ে ঘুরে কোন লাভ হবে না। উপরন্তু শ্রীবাম ভৈরবীকে আরও কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তার ফলে যে বিপদ ও আঘাত আসবে তার ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতা ভৈরবীর নেই।

তখন ভৈরবী নিরস্ত হ'ল। বুঝতে পারলেন যে শ্রীবাম বড় কঠিন ঠাঁই। হিমালয়ের মতই তিনি অচল অটল। কারণ শ্রীবামের দিব্য শক্তি যে স্বয়ং তারামা। তাই শ্রীবাম মাঝে মাঝে বলেন, "তারামা আমার আশ্চর্য ভৈরবী।" অর্থাৎ তারামা তাঁর দিব্য মহাশক্তি। শ্রীবাম 'আশ্চর্য্য' শব্দটি 'দিব্য' পবিত্র অর্থে ব্যবহার করেন এবং 'ভৈরবী' শব্দটি মহাশক্তি অর্থে বলেন। সুতরাং শ্রী বামের স্থূল ভৈরবী মানবীর প্রয়োজন নেই। স্বয়ং তারামায়ের শক্তিতে তিনি শক্তিবান। ভৈরবী তখন শ্রীবামকে ছেড়ে মদন গোঁসাইকে মুগ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। শ্রীবাম মদন গোঁসাইকে এই 'কালনেমি' ভৈরবী সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন।

কিন্তু সর্বভয়জয়ী, সর্বরিপুজয়ী শিবস্বরূপ শ্রীবামের পক্ষে যা সম্ভব, তা কি একজন সাধারণ সাধকের পক্ষে সম্ভব? তাই সর্বগ্রাসী দুরন্ত প্রথম রিপু 'কাম' এর ভুবনমোহন ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন ডাবুকের কৈলাসপতির শিষ্য সাধকপ্রবর মদন গোঁসাই। ত্রিলোকতারিণী তারামা'র অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীবাম উত্তীর্ণ হলেন। তারামা জগতকে দেখালেন যে, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান 'বামা' জগতের সকল রকম ভয় ও সকল রিপুর ঊর্দ্ধে বিরাজমান।

যিনি জগত কল্যাণে জগত উদ্ধারে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁকেও জগতের সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়---এই মহান শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত শ্রীবামের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারামা জগতকে দেখালেন।

উত্তরকালে শ্রীবাম আরেকবার এই অগ্নিপরীক্ষায় পড়েছিলেন কিন্তু সেবারও সসম্মানে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। যথাস্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে।

—o—

মদন গোঁসাই

মদন গোঁসাই বাংলা ১২৭১ সালে তাঁর গুরু ডাবুকের কৈলাস-পতির নির্দেশে তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করতে আসেন। মদন গোঁসাইয়ের সাথে শ্রীবামের শীঘ্রই হৃদ্যতা হয়। মদন গোঁসাই শ্রীবামের চেয়ে বয়সে বড়। তাই শ্রীবাম তাঁকে 'দাদা গোঁসাই' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু সম্বোধন যাই হোক, উভয়ের মধ্যে এক সুন্দর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে।

শ্রীবাম মদন গোঁসাইয়ের সাধনার ক্ষেত্রে উত্তর সাধকের কাজ করতে লাগলেন। সাধকপ্রবর মদন গোঁসাইয়ের সাধনা দ্রুত এগিয়ে চললো সিদ্ধির পথে।

মদন গোঁসাইয়ের পূর্ব ইতিহাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মদন গোঁসাইয়ের বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলার 'কাঁদি'র অন্তর্গত অলিগ্রাম ভরতপুরে। ধর্মপ্রাণ মদন গোঁসাই যৌবনে সংসারধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বিবাহ হয় 'কাঁদি'র সিদ্ধান্ত বংশে।

কিছুকাল পর মদন গোঁসাই সংসার ছেড়ে ডাবুকের কৈলাসপতির অধ্যাত্ম আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৈলাসপতি দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরীক্ষা করে অবশেষে মদন গোঁসাইকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার পর পর মদন গোঁসাইকে কৈলাসপতি সাধনার জন্য তারাপীঠ মহাশশ্মানে প্রেরণ করেন।

এই মহাশ্মশানে সাধনকালীন শ্রীবামের সাথে পরিচয় ও ক্রমে ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মদন গোঁসাইয়ের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য জেনে শ্রীবামও আনন্দিত হয়ে তাঁর উত্তরসাধকের কাজ করতে লাগলেন, যদিও সম্বোধনে অগ্রজ অনুজের সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে স্থাপিত। শ্রীবাম কখনো 'মদন দাদা', কখনো 'দাদা গোঁসাই' বলে ডাকেন এবং মদন গোঁসাইও তাঁকে অনুজের মত স্নেহ করে কখনো 'বামা' কখনো 'বামাভাই' বলে ডাকেন।

মদন গোঁসাই মূলত পশ্বাচারী। কিন্তু শ্রীবাম পশ্বাচার, বীরা-চারের বহু ঊর্দ্ধে দিব্যাচারী। শ্রীবাম রাজযোগী এবং মহাকৌল। ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব তাঁর করায়ত্ত। তিনি

কুলনাথের নাথ। পশ্বাচারী মদন গোঁসাই তাই শ্রীবামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। শ্রীবামকে তিনি একজন সিদ্ধ সাধক ও ভক্তরূপে ভেবেছেন। শ্রীবামও নিজ স্বরূপ গোপন রেখে সাধারণ সাধক ভক্তের ন্যায় তাঁর সাথে ব্যবহার করেছেন। তবু, উভয়ের মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

শ্রীবাম ও মদন গোঁসাই উভয়েই সংগীতে বিশেষ পারদর্শী। ফলে উভয়ে প্রাণ ভরে তারামায়ের নামগান করেন। কিন্তু এই গভীর ঘোর মহাশ্মশানে সাধনার জন্য এবং তারামায়ের নামগান ও সৎপ্রসঙ্গ করবার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের অভাব উভয়ে অনুভব করলেন। তখন শ্রীবাম ও মদন গোঁসাই তারাপীঠ মহাশশ্মানের নিত্য পরিত্যক্ত মড়ার তালাই, বাঁশ, দড়ি, কাঠ প্রভৃতি জিনিষ সংগ্রহ করে শিমূলতলায় একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরী করলেন।

শ্রীবাম এই কুঁড়ে ঘরের নাম দিলেন 'যোগেন্দ্র ঝোপড়া'। মদন গোঁসাই এই ঘরে সাধনা করতে লাগলেন। শ্রীবামের কোন বহিরঙ্গ সাধনা নেই। তাঁর সবই অন্তরঙ্গের সাধনা। তাই মদন গোঁসাই শ্রীবামের সাধনা দেখতে পেলেন না। এই কুঁড়ে ঘরের একদিকে মদন গোঁসাইয়ের সাধনা চলতে লাগলো, অন্যদিকে তারামায়ের নামগান ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ চলতে লাগলো।

রাতের বেলা মড়া পোড়াবার কাঠ দিয়ে ধুনি জ্বেলে সেই ধুনির পাশে বসে উভয়ে ঘোর অন্ধকারে আবৃত এই জাগ্রত মহাশ্মশানে বসে জপ ধ্যান করেন। কখনো নামগান ও সৎপ্রসঙ্গ করেন। এই-ভাবে শ্রীবামের সহযোগিতায় মদন গোঁসাই সুন্দরভাবে সিদ্ধির দিকে এগিয়ে চললো।

মদন গোঁসাই তারামায়ের কৃপায় এবং শ্রীবামের দিব্য সাহচর্যে তারাপীঠ মহাশ্মশানের ভয়ঙ্কর পরিবেশ এবং ভীষণ ভয়কে জয় করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এবার এল ভয়ের চেয়ে আরো ভয়াবহ ব্যাপার। তা হ'ল সুন্দরী যুবতী নারীর প্রাণান্তকর প্রলোভন। সাধাণরত সাধকের এতবড় শত্রু আর নেই।

এই সুন্দরী যুবতী ভৈরবী এলেন বীরভূমের বসুয়া বিষ্ণুপুর থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে। ভৈরবীর নাম 'ক্ষেপী ভৈরবী'। লোকে তাঁকে 'পাগলী মা' বলে ডাকে।

ভৈরবী একে অপূর্ব সুন্দরী, তাতে পূর্ণ যৌবনা। ভৈরবীর তারাপীঠ মহাশশ্মানে আসবার উদ্দেশ্য বীরাচারে সাধনার জন্য সঙ্গীর খোঁজ করা। কিন্তু এই সুন্দরী ভৈরবী কঠোর সংযমী ও ব্রহ্মচর্য পরায়ণা নন। তিনি প্রবৃত্তি মার্গের সাধিকা। ফলে তাঁর মধ্যে ভোগাসক্তি ও রূপমুগ্ধতার দোষ রয়েছে। সেজন্য প্রথম তিনটি রিপু অর্থাৎ কাম ক্রোধ ও লোভের বশীভূতা এই ভৈরবী। ভৈরবী প্রথমে শ্রীবামের দিব্যকান্তি ও উগ্র তেজদীপ্ত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে শ্রীবামকে আকর্ষণ করবার জন্য তার রূপ-যৌবনকে নানাভাবে প্রদর্শন করতে লাগলো।

কিন্তু তারাময় শ্রীবামের পক্ষে এই প্রবৃত্তিমুখী ভৈরবীর আসল স্বরূপ দর্শন করতে সময় লাগলো না। তিনি ভৈরবীর কোন প্রলোভন, ছলাকলায় ভুললেন না। উপরন্তু ভৈরবীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে দূর করে দিলেন। ভৈরবী তা সত্ত্বেও শ্রীবামের সঙ্গ কামনা করে নানাভাবে শ্রীবামকে মুগ্ধ করবার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলো। অবশেষে শ্রীবাম রুদ্ররূপ ধারণ করে ভৈরবীকে চরম ভয় দেখালে তখন ভৈরবী নিরস্ত হ'ল। ভৈরবী হতাশ হয়ে অবশেষে মদন গোঁসাইকে প্রলোভনে ফেলবার জন্য সচেষ্ট হ'ল।

শ্রীবাম তা বুঝতে পেরে মদন গোঁসাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "মদন দাদা সাবধান, এই ভৈরবী সাক্ষাৎ 'কালনেমি।" এই ভৈরবী যে অমঙ্গলকারিণী তা শ্রীবাম বুঝতে পেরেই তার নাম দিয়েছেন 'কালনেমি।' কিন্তু তারামায়ের কি বিচিত্র খেলা! মদন গোঁসাই শ্রীবামের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে 'কালনেমি' স্বরূপিনী ক্ষেপী ভৈরবীর রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে তার প্রলোভনের ভয়ঙ্কর ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন।

আপাত মধুর ও পরিণামে ভীষণ বিষ এই মোহিনী নারীর প্রলোভন। এই বিষের প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যুগে যুগে কত সাধক, যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, গুণী, মনীষী তার সংখ্যা নেই। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধির দ্বারপ্রান্ত থেকে মোহিনী নারীর রূপে বিভ্রান্ত হয়ে সাধনচ্যুত হয়ে চরম অধঃপতনে নেমে গেছেন। যুগ যুগ ধরে জগতের সাধনক্ষেত্রে এই চরম বেদনা ও ব্যর্থতার নিদারুণ ইতিহাসের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এই ব্যর্থতার করুণ ঐতিহ্যের ধারা বহন করে মাতৃ-সাধনার পথে অগ্রসরমান সাধক মদন গোঁসাই মোহময়ী নারী ভৈরবীর রূপ যৌবনের ফাঁদে ধরা পড়লেন। ভৈরবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সাধনচ্যুত হলেন শ্রীবামের নিষেধ অগ্রাহ্য করে। মহামায়ার কি বিচিত্র মায়া নারী।

নারীর দ্বারা জগতে সৃষ্টি স্থিতি চলছে। যে নারীর গর্ভে পুরুষের জন্ম, যে নারীকে মাতৃরূপে তথা জগতজননীরূপে ধ্যান করে পুরুষ সাধনা করেন, আবার সেই নারীর প্রলোভনে পড়েই পুরুষ কামাসক্ত হয়ে সাধনচ্যুত হয়ে লয় হচ্ছেন।

নারীর মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে সৃষ্টি স্থিতি লয়। নারীর এই লক্ষ্মী ও উর্বশী রূপের মধ্যেই পুরুষ আবদ্ধ চিরকাল। শাস্ত্রে এই নারীকে অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

যে অগ্নির দ্বারা জগৎ সংসার চলছে, যে অগ্নির দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করছে, সেই অগ্নিতেই আবার মানুষ পুড়ে শেষ হচ্ছে।

একই অগ্নি ব্যবহার ভেদে কোথাও জীবনদায়িণী, কোথাও জীবন পালিনী, আবার কোথাও জীবননাশিণী। ব্যবহার ভেদেই এরূপ হয়।

এই ব্যবহার ভেদের মূল সত্যটি যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই অগ্নিস্বরূপা নারীকে ক্ষেত্র অনুসারে ঠিক ঠিক মত ব্যবহার করে সার্বিক কল্যাণপ্রদ ফললাভ করেছেন।

নারীর মধ্যে যেমন লক্ষ্মীরূপ রয়েছে অর্থাৎ শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, কল্যাণময়ী রূপ রয়েছে, তেমনি নারীর মধ্যে উর্বশী রূপও রয়েছে। নারীর এই উর্বশী রূপ হ'ল মোহিনী রূপ। নারী এখানে আপাতমধুরা কিন্তু পরিণামে বিষময়ী, ভয়ঙ্করী ও অমঙ্গলকারিণী।

নারীর এই উর্বশী রূপ তথা জীবননাশিনী রূপটিই হ'ল পুরুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ও ভয়ঙ্কর। পৌরুষের চিরন্তন শত্রু নারীর এই উর্বশী রূপ। পুরুষাকারের এতবড় শত্রু আর নেই। নারীর এই উর্বশী রূপ কঠোর সংযমী ও জিতেন্দ্রীয় পুরুষকেও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। তাছাড়া জ্ঞানীকে অজ্ঞানে, যোগীকে ভোগে, বীর্যবানকে বীর্যহীনে, উৎসাহীকে নিরুৎসাহে, অনাসক্তকে আসক্তিতে ও মুক্তিকামীকে বন্ধনে আবদ্ধ করে। যুগে

যুগে নারীর এই ভয়ঙ্কর লোভনীয় কামনামদির উগ্র অশুভময়ী ভীষণ উর্বশী রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পুড়ে মরেছে, কত সাধক, যোগী জ্ঞানীগুণী তার সংখ্যা নেই।

এই জগৎ মোহিনী মায়ার পদতলে বিসর্জন দিয়েছে তাঁদের সকল সংযম, শক্তি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রতিভা।

তার কারণ তাঁরা নারীর সত্যস্বরূপটি যথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলে তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের সর্বস্ব। অথচ নারীর সত্যস্বরূপ কল্যাণময়ী মাতৃরূপটি সামনে রেখে কামকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে রূপান্তরিত করে সেইভাবে ব্যবহার করতে পারলে নারীর এই উর্বশী রূপ তাঁদের কাছে পদানত হ'ত। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। ফলে মূল লক্ষ্য থেকে, আদর্শ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে সম্পর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেছেন।

তাঁরা মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হয়ে কামকে ভোগ করে কামকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কামের দ্বারা কামকে জয় করা যায় না। যেমন ঘৃতের দ্বারা অগ্নিকে নেভানো যায় না। বরং অগ্নিশিখা আরও বেড়েই যায় তাতে।

কামকে দমন করা যায় প্রেমের দ্বারা। নারীর প্রলয়ঙ্করী উর্বশী রূপকে একমাত্র জয় করা যায় দেহাতীত প্রেমের দ্বারা। প্রেম হ'ল নিত্য শুদ্ধ নিত্য পবিত্র নিষ্কাম আনন্দধারা। এই প্রেম হ'ল আত্মার সাথে আত্মীয়তা। এই স্বর্গীয় প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ শীতল ধারায় কামের আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়। দেহকে আশ্রয় করেই সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে যে সাধক কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করে দেহাতীতে চলে যেতে পারেন তিনিই হলেন যথার্থ বীর সাধক। তিনিই বীরাচারী সাধকরূপে সুচিহ্নিত। তিনি নারীকে ভোগ রূপে গ্রহণ করেন না। প্রেমরূপে তথা শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। এই পরমার্থ প্রেমই হ'ল শক্তি। এই মহান নিষ্কাম প্রেমে স্বয়ং ঈশ্বরও বিগলিত হন। কারণ এই বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেমই হ'ল ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ তাই প্রেম। প্রেমই হ'ল আনন্দ। ঈশ্বর তাই প্রেমময় আনন্দময়। তাই তন্ত্রমতে এই বীর সাধক প্রেমরূপিণী তথা শক্তিরূপিণী নারীকে বীরের মত গ্রহণ করে তাঁকে ভৈরবী শক্তিতে রূপান্তরিত করে আত্মস্বরূপে মগ্ন হন। প্রেম তাঁকে পৌঁছে দেয় স্বরূপে। এই

দেহাতীত নিষ্কাম প্রেমশক্তিই সাধককে বীরের মত সগৌরবে পৌঁছে দেয় তাঁর ইষ্টের চরণে। বীর সাধক হন সিদ্ধ। সুতরাং এই বীরাচারী সাধকই একমাত্র নারীর উর্বশীরূপকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে সমর্থ হন। নারীর লক্ষ্মী রূপকে গ্রহণ করে প্রেমের দিব্য ধারায় শক্তিময়ী সহ নিজ ইষ্টের চরণে পোঁছে যান। এই বীরভাবের পরিণতি মঙ্গলময়, শান্তিময় ও আনন্দময়। যার চরম পরিণতি নিষ্কাম শুদ্ধ পবিত্র জ্ঞানমণ্ডিত সাত্ত্বিক রূপ। বীরাচারে সাধক তখন দিব্য আনন্দে সদা বিভোর থাকেন।

মদন গোঁসাই এই বীর সাধক নন। তিনি বীরাচারের প্রাথমিক রূপ পশ্বাচারী মাত্র। এই জীবভাব যুক্ত পশ্বাচারী সাধকের ক্ষেত্রে নারী গ্রহণ তন্ত্রমতে সম্পূর্ণ নিষেধ। এমন কি অহঙ্কারের প্রতীক স্বরূপ 'মদ' গ্রহণও নিষেধ।

করণ জীবভাব প্রধান পশ্বাচারী সাধকের পক্ষে সাধনার প্রথম অবস্থায় নারী ও সুরা ভীষণ ক্ষতিকারক। পশ্বাচার থেকে বীরাচার এবং বীরাচার থেকে দিব্যাচারে সাধককে উত্তীর্ণ হতে হবে। পশুত্ব থেকে মানবত্ব, মানবত্ব থেকে দেবত্ব লাভই হ'ল সাধকের চরম লক্ষ্য। জীবত্ব থেকে শিবত্ব লাভই সাধকের চরম ও পরম লক্ষ্য। তন্ত্রমতে সাধারণত প্রতিটি মানুষ পশুভাবাপন্ন। তন্ত্র তাই প্রাথমিক স্তরে মানুষকে পশু আখ্যা দিয়েছে। পশ্বাচার সাধনা হ'ল এই পশুত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানবত্ব লাভ করা অর্থাৎ Animality থেকে Rationality-তে পৌঁছে যাওয়া—পশ্বাচার থেকে বীরাচারে উত্তীর্ণ হওয়া। তারপর বীরাচার থেকে আবার দিব্যাচারে উত্তীর্ণ হ'তে হবে সাধককে। অর্থাৎ Rationlity থেকে Divinity-তে পৌঁছতে হবে। তখন সাধক নরত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হবেন। লাভ করবেন ভূমানন্দ। তখন তাঁর হবে সহজ ব্রাহ্মীস্থিতি। আপ্তকাম হয়ে তিনি ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকবেন সর্বক্ষণ।

তাই সাধনার প্রথম অবস্থায় মানুষের মধ্যে যখন পশুত্বের ভাগ প্রধান থাকে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপুর প্রভাব বেশী থাকে তখন অর্থাৎ পশ্বাচার সাধন অবস্থায় দেহে মনে কঠোর সংযম, ব্রহ্মচর্য, ও সাত্ত্বিক আহার বিহার অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। এইসময় সাত্ত্বিক পরিবেশে সাধককে

থাকতে হবে। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ও নারী এবং সুরা থেকে সাধককে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকতে হবে। পশ্বাচারে সিদ্ধ হলে পর বীরাচারে উত্তীর্ণ হয়ে, বীরভাব নিয়ে দেহে মনে কঠোরতম সংযম ও ব্রহ্মচর্য নিয়ে প্রেম ভক্তি ও শক্তির মাধ্যমে বীর সাধক বীরাচারে নারীকে শক্তিময়ীরূপে গ্রহণ করতে পারেন সিদ্ধিলাভের জন্য। কিন্তু তার পূর্বে অর্থাৎ পশ্বাচার অবস্থায় কিছুতেই নারী ও সুরা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এই পশ্বাচার অবস্থায় পশ্বাচারী সাধকের মধ্যে ষড়রিপুর প্রভাব খুব বেশী থাকে। ফলে পতনের সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। ফলে সামান্য প্রলোভনেই সে সহজেই কামের দ্বারা চালিত হয়, উগ্রপশুভাব জাগ্রত হয়। তার ফলে তাঁর দেহমন এই সময় সহজেই নারী ও সুরার স্পর্শে উত্তেজিত হয়ে কামাসক্ত হয়। তাঁর দেহ মনের সংযম, ব্রহ্মচর্য, সাত্ত্বিকভাব প্রভৃতি সকল শুভশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর পক্ষে আর পশ্বাচার থেকে পূর্ণ বীরাচারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না।

তাই এই 'তন্ত্র' যাকে একটি পরীক্ষিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান (A complete applied spiritual science) বলা হয়, সেই তন্ত্রমতে সাধারণ মানুষের দেহে মনে শতকরা সত্তর ভাগ পশুত্ব (Animality), বিশভাগ মনুষত্ব (Humanity) এবং শতকরা দশ ভাগ দেবত্ব (Divinity) থাকে। সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবন পশুত্বের পিঞ্জরে আমৃত্যু আবদ্ধ থাকে। তাই মানুষ জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জিভূত সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ। ফলে এই সংস্কারের বিশাল পাহাড় অতিক্রম করে দেহে মনের সত্তরভাগ পশুত্বের বন্ধন মোচন করা খুবই কঠিন, তা সাধনা সাপেক্ষ। এই সময় মানুষ মূলত প্রবৃত্তিমুখী থাকে। তার মনও সর্বদা প্রবৃত্তি মার্গে থাকে। পার্থিব স্থূল ভোগ ও বিষয়-আশয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। মানব দেহ মনের নিগূঢ় রহস্য এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে।

তন্ত্রমতে এই অবস্থায় অর্থাৎ এই পশুত্বের অবস্থায় মানুষের মন মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের মধ্যে অবস্থান করে (গুহ্য, লিঙ্গ ও নাভির মধ্যে থাকে)।

তন্ত্রমতে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় মানবদেহের মধ্যেই পশুত্ব নরত্ব ও দেবত্ব—এই তিনটি ভাগ সর্বদা বিরাজমান। মানুষের পা থেকে

নাভি পর্যন্ত পশুত্ব (Animality)—এই অবস্থায় মানুষের মন মূলাধারে স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে থাকে।

নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত নরত্ব (Humanity)—এই অবস্থায় মানুষের মন মণিপুর থেকে অনাহত চক্রে থাকে।

আর কন্ঠ থেকে মস্তক পর্যন্ত বিরাজ করছে দেবত্ব (Divinity) মন এই অবস্থায় বিশুদ্বাক্ষ্য চক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে থাকে। পরে সহস্রারে লীন হয়।

এই পশুলোক, নরলোক ও দেবলোক নিয়েই মানুষের প্রতিদিন চলছে। এই মহান অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তথা তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানুষের দেহমনের সহজাত প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের সাবিক কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এই পশুত্ব থেকে অর্থাৎ জীবত্ব থেকে মানুষকে শিবত্বে (Animality থেকে Divinity-তে) পৌঁছে যাবার সুস্থ সুন্দর সবল ও সফল পথনির্দেশ করেছে। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে মানুষ এই বহু আকাঙ্খিত বহু প্রত্যাশিত দেবত্বে পৌঁছে যেতে পারবে। ফলে আর তাকে জন্ম মৃত্যু রোগ শোক জরা ব্যাধি ও ষড়রিপুর দাসত্বের অন্ধকারের ঘোর আবর্তে বার বার এসে পড়তে হবে না।

সে লাভ করবে তাঁর নিত্য আনন্দময় শাশ্বত স্বরূপ। এই দেবত্বই হ'ল মানুষের নিজস্ব নিত্য চিরন্তন আনন্দময় স্বরূপ।

মায়া বশে মানুষ আজ তার এই স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। তাই এত দুঃখ কষ্ট রোগ শোক দুর্ভোগ মানুষ ভোগ করছে। এই মায়াকে জয় করবার জন্য, কঠিন পশুত্বকে জয় করবার জন্য মানুষের মানবিক সাধনা হ'ল পশ্বাচারের সাধনা। কঠোর সংযম, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ তিতিক্ষা, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা, সৎ-প্রসঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবৃত্তিমুখী দেহমনকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। বীরাচারের দিকে সে অগ্রসর হবে। তারপর উপরোক্তভাবে বীরাচারে শক্তিগ্রহণ করে সে সিদ্ধ হয়ে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হবে। শিবত্ব লাভ করে সে হবে পূর্ণ। এই জীবত্ব থেকে শিবত্ব লাভই হ'ল তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

মদন গোঁসাইয়ের সাধনা মূলত এই জীবত্ব থেকেই শুরু। তাই তিনি পশ্বাচারী। সাধন পথের প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছেন।

বীরাচারে স্বতঃসিদ্ধ এবং দিব্যাচারী শ্রীবাম তাঁর উত্তর সাধকের কাজ করে ধীরে ধীরে তাঁকে পশ্বাচারে সিদ্ধ করতে সচেষ্ট রয়েছেন। কিন্তু তারামায়ের বিচিত্র লীলা বোঝা ভার। পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী ক্ষেপী ভৈরবীর আগমনে মদন গোঁসাইয়ের সাধনার পথে এল চরম সংকট। বীরাচারে সাধনার জন্য ভৈরবী প্রথমে শ্রীবামকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর রূপ-যৌবনের প্রলোভনের ফাঁদে শ্রীবামকে ফেলতে সচেষ্ট হ'ল। কিন্তু শিবস্বরূপ শ্রীবামকে উপলব্ধি করবার শক্তি ভৈরবীর নেই। ভৈরবীকে দেখেই শ্রীবাম বুঝতে পেরেছেন যে, ভৈরবী বীরাচারে সাধনার উপযুক্ত নয়। সে পশ্বাচারেও সিদ্ধ হতে পারেনি। তাই ভৈরবীর নাম দিলেন 'কালনেমি'। ফলে শ্রীবাম অত্যন্ত কঠোর হয়ে ভৈরবীকে তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দিলেন। শ্রীবামের কাছে পরাজিত ও ব্যর্থ ভৈরবী এবার মদন গোঁসাইয়ের দিকে নজর দিলেন। শ্রীবাম বুঝতে পেরে মদন গোঁসাইকে সাবধান করে বললেন "দাদা সাবধান।" কারণ এই রূপবতী ও যুবতী ভৈরবী যে কোন সাধকের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট-কারিণী। ভৈরবীর লক্ষণও অশুভ কারক।

মদন গোঁসাই কিন্তু শ্রীবামের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও ভৈরবীর রূপ যৌবনে মুগ্ধ হলেন। তিনি ক্ষেপী ভৈরবীকে বীরাচারে সাধনার জন্য তাঁর ভৈরবীরূপে গ্রহণ করলেন। ভৈরবীর রূপের আগুণে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিলেন। পতঙ্গের যে দশা হয়, মদন গোঁসাইয়ের-ও তাই হ'ল। মদন গোঁসাই ভৈরবীর আগুনে পুড়ে গেলেন। তার সাথে সাথে তাঁর সাধনা সংযম শক্তি সব নষ্ট হয়ে গেল। মদন গোঁসাই সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'য়ে গেলেন। বীরাচারে সাধনার অবাস্তব পরিকল্পনা বিলীন হয়ে গেল। নিকৃষ্ট দেহ সুখ ভোগে তা পর্য-বসিত হ'ল। তারামায়ের এই কঠিন পরীক্ষায় মদন গোঁসাই সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। শ্রীবাম প্রত্যক্ষ করলেন মদন গোঁসাইয়ের এই শোচনীয় পরিণতি। তিনি উপলব্ধি করলেন যে এ জীবনে মদন গোঁসাইয়ের সাধনা আর হবে না। এখানেই সব শেষ হয়ে গেল।

মদন গোঁসাইয়ের সাথে ভৈরবীর এই যে মিলন, তা বীরাচারের নিষ্কাম শক্তির মহামিলন নয়। তা নিতান্ত প্রাকৃত সকাম মিলন। ফলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ তো দূরের কথা, উপরোক্ত উভয়ের মোহ ঘটিত ব্যাপার চরিতার্থ হতেই উভয়ের মধ্যে গোলমাল ও অশান্তি

সুরু হ'ল। জগতে এই ধরণের প্রেমহীন প্রাকৃত মিলন কখনো স্থায়ী হয় না। তাই এখানেও হ'ল না। সকাম মিলন চিরদিনই আত্মসুখের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যে মূহুর্তে তা চরিতার্থ হয় সেই মুহুর্তে তা টুঁটে যায়। মদন গোঁসাই ও ক্ষেপী ভৈরবীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। মদন গোঁসাইয়ের সাথে ক্ষেপী ভৈরবীর কলহ ও অশান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল।

মদন গোঁসাইয়ের মাধ্যমে ভৈরবীর প্রাথিত বস্তু লাভ হতেই ভৈরবী অন্য মধুকরের সন্ধানে অগ্রসর হ'ল। ভৈরবীর আর কোন আকর্ষণ রইলো না মদন গোঁসাইয়ের ওপর। মদন গোঁসাই তা তিক্তভাবে বুঝতে পেরে ভৈরবীর ওপর আরো ক্ষেপে গেলেন। উভয় উভয়কে চরম শত্রু ব'লে মনে করতে লাগলেন। ক্রমে অশান্তি চরমে এসে দাঁড়ালো। এই সময় ক্ষেপী ভৈরবী সহসা একদিন তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে অদৃশ্য হ'ল। ভৈরবীর অভাবে এই ক'দিনের পার্থিব ভোগে অভ্যস্ত হয়ে মদন গোঁসাই অন্য ভৈরবীর সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। ভাবলেন অন্য ভৈরবী নিয়ে আবার এভাবে সাধনা করবেন।

ফলে এই মিথ্যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মদনে জর্জর মদন গোঁসাই তাঁর প্রতিদিনের ভিক্ষের সময় গৃহস্থের ঘরের যুবতী মেয়েদের ওপর দৃষ্টি দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁর এই কামভাবাপন্ন চঞ্চল দৃষ্টি ও তাঁর মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন গৃহস্থগণ। ফলে তাঁর প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁরা বিরক্ত হলেন। অনেকে তাঁর ওপর সতর্কদৃষ্টি রাখলেন। তার ফলে একদিন তিনি ধরা পড়লেন গ্রামবাসীদের হাতে। গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড ভাবে তাঁকে মারলেন। শ্রীবাম সংবাদ পেয়ে তারাপীঠের পার্শ্বে বেজুড়িয়ার মাঠে গেলেন। দেখলেন রক্তাক্ত কলেবরে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে আছেন মদন গোঁসাই। করুণাময় শ্রীবাম মদন গোঁসাইকে কাঁধে তুলে শিমূল তলায় 'যোগেন্দ্র ঝোপড়া'তে নিয়ে এলেন। দিনরাত সেবা করে একটু ভাল করলেন। মদন গোঁসাইয়ের মধ্যে এই পতনের জন্য তীব্র অনুশোচনা এলো। তাঁর সাধনা ও শক্তিই শুধু নষ্ট হ'ল না, তাঁর জীবনও শেষ হয়ে গেল এর ফলে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শেষবারের মত গুরু কৈলাসপতিকে দর্শন করতে চাইলেন।

কিন্তু কৈলাসপতি তখন দক্ষিণ গ্রামে ছিলেন না। মদন গোঁসাই মানসনয়নে গুরুমূর্তি ধ্যান করতে লাগলেন। করুণাময় শ্রীবাম উপলব্ধি করলেন যে মদন গোঁসাইয়ের শেষ সময় উপস্থিত। তিনি তারানাম শোনাতে লাগলেন। তারাময় শ্রীবামের পবিত্র ও দিব্য শ্রীমুখ থেকে অমৃতময় তারানাম শুনতে শুনতে মদন গোঁসাই দেহ-ত্যাগ করলেন।

শ্রীবাম সযত্নে মদন গোঁসাইকে সমাধি দিলেন। একটি সদ্য প্রস্ফুটিত সুন্দর সাধন আধার কাম ও প্রলোভনের ঝড়ে অকালে ঝরে পড়ে গেল।

মদন গোঁসাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পাবার পূর্বেই তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর অন্তরে এই নিদারুণ শোক সংবাদ ভেসে উঠেছিল। তিনি শ্বশুর-বাড়ীতেই ছিলেন। তিন দিন তিনি অন্নজল স্পর্শ না করে শুধু কায়মনোবাক্যে প্রিয়তম স্বামীর ধ্যান করে অতিবাহিত করলেন। স্বামীর চিন্তা করতে করতে স্বেচ্ছায় তিনি দেহত্যাগ করলেন। সাধ্বী নারীর এই তেজস্বিতা ও স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের মহান শক্তি দেখে সবাই স্তম্ভিত হলেন।

শ্রীবাম মদন গোঁসাইকে অগ্রজরূপে সম্মান করতেন বলে কিছু-কাল পরে মদন গোঁসাইয়ের সমাধির ওপর একটি স্তূপ নির্মাণ করে দেন।

—o—

সিদ্ধসাধিকা জয়কালীদেবীর দেহত্যাগ

শ্রীবামের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জয়কালী দেবী আজন্ম সিদ্ধ সাধিকারূপে সুচিহ্নিত। বাল্যকালে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসে সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হন। পিতা সর্বানন্দও তাঁর এই সাধিকা কন্যার অধ্যাত্মজীবন সর্বতোভাবে সমর্থন করেন। পিতার দেহ-ত্যাগের পর জয়কালীদেবী সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। কঠোর সাধনায় তিনি নিমগ্না হন এবং ইষ্টলাভ করে দিব্য আনন্দে বিভোর হলেন। এই তেজদৃপ্তা সন্ন্যাসিনী জয়কালীর দিব্য পবিত্র রূপ যাঁরা দর্শন করেন তাঁরাই শ্রদ্ধানত হন। তিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করতেন এবং তাঁর কপালে সিঁদুর ফোঁটা এবং হাতে ত্রিশূল শোভা পেত। এই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মস্থানে ও তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেন।

কিছুকাল পর এই সিদ্ধ সাধিকা যৌবনেই দেহ ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই তিনি তারাপীঠে এসে বসবাস করতে থাকেন। যেদিন দেহত্যাগ করবেন সেদিন সকালবেলা সবাইকে দেহত্যাগের কথা জানালেন। আকস্মিক এই ভয়ঙ্কর সংবাদে সবাই স্তম্ভিত ও ব্যাথিত হলেন। তাঁর প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁরা অনেকেই তাঁকে এই অসময়ে দেহত্যাগ করা থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দেহবোধহীন মহান সিদ্ধ-সাধিকা তাঁর স্থির সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

অপরাহ্নকালে মহাশ্মশানে প্রবেশ করে শিমুলতলায় যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হ'ন। ধ্যানশেষে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে স্থূলদেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মময়ী তারামায়ের অমৃতময় কোলে চলে গেলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছামৃত্যুর সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

শ্রীবাম অন্তর্যামী। তিনি সবই জানতেন। জ্যেষ্ঠাভগ্নী যে তারা-ময়ী ছিলেন তা তাঁর চেয়ে আর কেউ বেশী উপলব্ধি করতে পারেন নি। চিরন্তনী তারামায়ের অংশ তারামায়ের সাথেই মিশে গেল।

ভালই হ'ল। পার্থিব জগতের সকল দুঃখ কষ্ট অশান্তি জ্বালা যন্ত্রণায় বাইরে এভাবে যেতে পারলেই তো মহাশান্তি মহাআনন্দ লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর শেষকৃত্য পিতা ৺সর্বানন্দের পাশেই সম্পন্ন হ'ল। শ্রীবাম ব্রহ্মময়ী তারামায়ের ধ্যানে মগ্ন হলেন।

এদিকে এই নিদারুণ সংবাদে জননী রাজকুমারী দেবী শোকে দুঃখে পাথর হয়ে গেলেন। কনিষ্ঠা ভগ্নীত্রয় দুর্গা, দ্রবময়ী ও সুন্দরী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এই অকাল বিয়োগে দুঃখে শোকে আকুল হলেন। একমাত্র তারাময় শ্রীবামই এই শোকদুঃখের অতীতে রইলেন। কারণ তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন নিত্যের অংশ অনিত্য জগতে এসে তাঁর পার্থিব কাজ শেষ করে আবার নিত্যের সাথেই মিশে পূর্ণ হয়ে গেল। এ তো বিয়োগ নয়। এ যে যোগ এবং মহাযোগ।

—০—

রাতনা ও ডাবুকে গমন

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ শ্রীবামের শিক্ষাগুরু। তিনি কিছুদিন পূর্বে শ্রীবামকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন (১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এবার কয়েকদিনের জন্য তাঁর নিজ গ্রাম রাতনায় যাবেন স্থির করলেন। যাবার পথে ডাবুকে গিয়ে ডাবুকের কৈলাসপতির সাথেও সাক্ষাৎ করবেন বলে মনস্থ করলেন। মোক্ষদানন্দ শ্রীবামকেও অনুরোধ করলেন যাবার জন্য। তারাময় শ্রীবাম তারামায়ের ইচ্ছায় রাজী হলেন। মদন গোঁসাইয়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর শ্রীবামের মনও বিষণ্ণ রয়েছে। তাই প্রিয়তম পুত্রকে তারামা অনুমতি দিলেন এই বিষন্নতা দূর করবার জন্য।

উভয়ে তারাপীঠের অদূরে ডাবুকেশ্বর মন্দিরে এলেন। ডাবুকের কৈলাসপতি অর্থাৎ কৈলাসানন্দ স্বামী মোক্ষদানন্দ ও শ্রীবামকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ডাবুকের কৈলাসপতির ইতিবৃত্ত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। শ্রীবাম কৈলাসানন্দকে 'রাজা গোঁসাই' বলে ডাকেন। কৈলাসানন্দ বীরাচারী। বীরাচারে তিনি সিদ্ধ। তিনি রাজসিক সাধক। ডাবুক গ্রামে (দক্ষিণ গ্রামে) তিনি অনাদি লিঙ্গ শিব আবিস্কার করে বিখ্যাত হন। শিবের নাম দেন 'ডাবু-কেশ্বর'। কাশ্মীরের মহারাজার সাহায্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে বিরাট শিবমন্দির নির্মাণ করেন। অনাদি লিঙ্গ ডাবুকেশ্বরের সংস্কার করে নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। উত্তরকালে তাঁর অনুরোধে শ্রীবাম এই অনাদিলিঙ্গ শিব ডাবুকেশ্বরের সংস্কার করে দেন। কৈলাসানন্দ স্বামীর এই মহান কীর্তির জন্য তিনি 'ডাবুকের কৈলাসপতি' নামে বিখ্যাত হন।

কাশ্মীরের মহারাজা ও তাঁর বীরভূমের বহু ধনী শিষ্য ভক্তের সহযোগিতায় তিনি ডাবুকেশ্বরের নিত্যসেবা পূজা চালিয়ে যান।

ডাবুকের কৈলাসপতি তারাপীঠেও সাধনা করেছেন দীর্ঘকাল ধরে এবং তারাপীঠের মহাশ্মশানে তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করেন।

কয়েকদিন আনন্দের মধ্যে ডাবুকে কাটিয়ে অদূরবর্ত্তী রাতনা গ্রামে রওনা হলেন শ্রীবাম ও মোক্ষদানন্দ। কৈলাসপতি সসম্মানে বিদায় দিলেন।

রাতনা গ্রামে এলেন মোক্ষদানন্দ ও শ্রীবাম। রাতনা গ্রাম মোক্ষদানন্দের জন্মভূমি। তাঁর গ্রামজীবনের বহু ঘটনা ও সাধনার ক্ষেত্র এই রাতনা। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে মোক্ষদানন্দ শ্রীবামকে বললেন নানা কথা। কয়েকদিন পর শ্রীবাম তারাপীঠে তারামায়ের কোলে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হলেন।

মোক্ষদানন্দও আর কালবিলম্ব না করে শ্রীবামকে নিয়ে সানন্দে তারাপীঠে ফিরে এলেন।

ইতিপূর্বে কাশীতে মোক্ষদানন্দের সাথে গিয়ে যে তিক্ততা ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছিল, এবার করুনাময় শ্রীবাম তা মুছে ফেললেন। এক স্নিগ্ধ-মধুর সম্পর্ক আবার উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠলো।

—০—

অহেতুক লাঞ্ছনা

বাংলা ১২৭২ সালের বর্ষাকাল। বৃষ্টি আশানুরূপ হ'ল না। বীরভূমের লোক চিন্তিত হলেন। হেমন্ত ও শীতও কেটে গেল বৃষ্টিবিহীন। বীরভূমে অজন্মা দেখা গেল। চালের দাম দ্রুত বেড়ে গেল। প্রায় ছয়টাকা মন হ'ল চালের। ফলে দরিদ্র লোক ও চাষীর ঘরে হাহাকার পড়ে গেল। তাঁদের ঘরে এমন টাকা নেই যে ছয় টাকা মন চাল কেনেন। এর অনিবার্য প্রভাব তারা-পীঠেও এসে লাগলো।

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দও সস্ত্রীক অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে পড়লেন। কিন্তু তারামা প্রাণমন শ্রীবাম এই আকালে নির্বিকার হয়ে রইলেন। ভরত মৈত্রর অন্যায় আদেশের জন্য সকল দিন শ্রীবামের তারামায়ের প্রসাদ জোটে না। তবু তিনি কখনো অনাহারে কখনো অর্ধাহারে থেকেও নির্বিকার হয়ে রইলেন। কিন্তু সস্ত্রীক বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হ'ল। এই সময় ডাবুকের কৈলাসপতি তারাপীঠ এলেন। এখানকার দুরবস্থা দেখে তিনি মোক্ষদানন্দ ও শ্রীবামকে ডাবুকে নিমন্ত্রণ করলেন। মোক্ষদানন্দের অনুরোধে শ্রীবাম মোক্ষদানন্দের সাথে ডাবুকে গেলেন।

রাজসিক সাধক কৈলাসপতি এইসময় তাঁর ধনী শিষ্যদের বাড়ীতে পালা করে লোকজনসহ থাকতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীবাম ও মোক্ষদানন্দের পক্ষে তা অসম্মানজনক মনে হওয়ায় উভয়ে তারাপীঠে ফিরে এলেন। শ্রীবাম আবার যথারীতি অনাহার ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। এই দুরাবস্থার মধ্যে একদিন শ্রীবাম অনাহারে শিমূলতলায় শুয়ে আছেন। তার আগের দিনও অনাহারে কাটিয়েছেন। হঠাৎ যেন শুনলেন তারা মা বলছেন, 'ক্ষ্যাপা, আয় খাবি।'

এই সুপরিচিত দিব্যমধুর কন্ঠস্বর শুনে শ্রীবাম মনের আনন্দে শিশুর মত তারামায়ের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন নাটোররাজ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিত ও বিশিষ্ট তান্ত্রিক ঈশান ভট্টাচার্য্য তারামায়ের

ভোগ নিবেদন করছেন। শ্রীবাম সাথে সাথে খেতে বসে গেলেন। তাই দেখে ঈশান ভট্টাচার্য্য চিৎকার করে বললেন, "এই ক্ষ্যাপা, বার হ, বার হ শীঘ্র।" শ্রীবাম অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মহাক্রোধে ঈশান ভট্টাচার্য্য তাঁর হাতের পূজোর ঘন্টা দিয়ে শ্রীবামের মাথায় জোরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে শ্রীবামের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। এদিকে ঈশান ভট্টাচার্য্যের চিৎকার শুনে উপস্থিত মন্দিরের পাণ্ডারা এবং নাটোর রাজ এষ্টেটের কিছু কর্মচারী, পেয়াদা এবং দ্বারোয়ান প্রভৃতি একযোগে এসে শ্রীবামকে মারতে এলো চিৎকার করে। তারা শ্রীবামের শরীরে আঘাত করতে লাগলো। এই সময় প্রবীন রামেশ্বর পাণ্ডা এই আঘাত থেকে শ্রীবামকে বের করে চলে যাবার পথ করে দিলেন।

তারপর আবার ভোগ রান্না করে তারামাকে ভোগ দেয়া হ'ল। এদিকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে শ্রীবাম শ্বেত-শিমূল বৃক্ষের তলায় এসে শুয়ে রইলেন। একে দু'দিন ধরে উপ-বাসী, তার উপর আবার এই অমানুষিক রক্তঝরা প্রহার! তারা-মায়ের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হ'ল শ্রীবামের।

এইভাবে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে তারামা মার খাওয়া-লেন! শ্রীবামের সবই তারামা। তাই অভিমানে আপন মনে তারামাকে বকতে লাগলেন। সেদিন আর মন্দিরে তারামাকে দর্শন করতে গেলেন না। তারামায়ের প্রসাদও বন্ধ। দু'দিনের উপবাসী শ্রীবাম অভিমানে সুপ্রাচীন মহাশ্বেত শিমুলবৃক্ষমূলে পড়ে রইলেন অনাদৃত ও অবহেলিত হয়ে।

একে উপবাসী তাতে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণায় জর্জর। তবু তারই মাঝে তারামায়ের ধ্যানে বিভোর হয়ে রইলেন। রাত গভীর হ'ল। অনশনক্লিষ্ট ব্যাথাভরা দেহে তন্দ্রা নেমে এলো। সহসা তন্দ্রার মধ্যে তিনি দেখলেন একটি শ্যামবর্ণা দিব্য জ্যোতির্ময়ী বালিকা তাঁর কছে এসে বসলেন এবং তাঁর মাথায় ও গায়ে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বালিকার চোখে মুখে অপার মাতৃ-স্নেহ ঝরে পড়ছে। বালিকার নরম হাতের অমৃতস্পর্শে শ্রীবামের সর্বাঙ্গের অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ও রক্তজমাট কালশিটের দাগ সব আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেলো। শ্রীবাম বুঝতে পারলেন সব।

মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুর মত পরম আনন্দে গভীর নিদ্রায় অভি-ভূত হলেন।

তারাপীঠের অধিশ্বরী ত্রিলোকজননী তারামায়ের পরম পবিত্র স্পর্শে তাঁর দিব্যলীলার মহাক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠের মহাশ্মশান প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো গভীর রাতে।

—০—

স্বপ্নাদেশ

এদিকে নাটোরের আকাশে বাতাসেও তখন গভীর রাতের ঘুমন্ত পরশ। নিশুতিরাতে সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ নিথর। জীব জগৎ সুসুপ্তির কোলে অচেতন।

নাটোরের মহারাণী অন্নদাসুন্দরী (মতান্তরে স্বর্ণকুমারী) আপন কক্ষে গভীর নিদ্রিতা। সহসা স্বপ্নে দেখলেন ত্রিলোকজননী তারা-মায়ের বিষণ্ণ মূর্তি। তারামা তাঁকে বিষণ্ণকন্ঠে বললেন, "আমি দু'দিন উপবাসী। খোঁজ করিস"। রাণী চমকে উঠলেন এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে। তারামায়ের মূর্তিও সাথে সাথে মিলিয়ে গেল।

রাণী শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। সদাজাগ্রত পরমপবিত্র মহাপীঠ তারাপীঠের চিরঅধিশ্বরী জগতজননী তারামা দু'দিন ধরে উপবাসী রয়েছেন। এযে অতন্ত অমঙ্গল ও চরম বেদনার কথা।

ভোর হ'তেই তিনি দেওয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তারাপীঠে কেন তারামা উপবাসী রয়েছেন তা জানবার জন্য এবং প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে দেওয়ানকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের কাছারিতে টেলিগ্রাম করলেন দেওয়ানজী। তারাপীঠ

রঘুনাথগঞ্জের কাছারির অন্তর্গত। টেলিগ্রাম পেয়ে নায়েব ভরত মৈত্র ভীষণ চিন্তিত হলেন। তখনই সদলবলে তারাপীঠ রওনা হলেন।

তারাপীঠে এসে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে তারামায়ের পুজোয় তেমন কোন বিঘ্ন ঘটেনি। তবে তারামায়ের ভক্ত বামাক্ষ্যাপা দু'তিন দিন ধরে শিমুলতলায় অনাহারে পড়ে আছে। বামাক্ষ্যাপার অনাহারে থাকবার কারণও তাঁকে পুরোহিত ও পাণ্ডারা জানালেন।

ভরত মৈত্র শ্রীবামকে ভাল করেই জানেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি ছল করে শ্রীবামকে তাঁর পাচক করবার জন্য তারাপীঠ থেকে রঘুনাথগঞ্জের কাছারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীবামকে সেখানে নিয়ে তিনি ব্যর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীবামকে তারাপীঠে ফেরৎ পাঠান এবং শ্রীবামকে তারামায়ের নিত্য অন্ন প্রসাদ দিতে বারণ করে আদেশ পাঠান ('পাচক রূপে শ্রীবাম'—প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

যা হোক তিনি সকল ঘটনাই নাটোরের মহারাণীকে সাথে সাথে জানালেন। রাণীর আদেশে তক্ষুনি পুরোহিত ও দারোয়ানকে বরখাস্ত করা হ'ল, শ্রীবামকে অপমান ও আঘাত করবার জন্য। বামাক্ষ্যাপা যে একজন অসাধারণ মাতৃসাধক তা রাণীমা উপলব্ধি করতে পারলেন। যাঁর অনাহারে স্বয়ং জগতজননীও অনাহারে থাকেন দিনের পর দিন, তিনি নিঃসন্দেহে সিদ্ধ মহাপুরুষ। নাটোর থেকে আগত রাণীর প্রতিনিধি নায়েব, গোমস্তা এবং অন্যান্য রাজ-কর্মচারীগণ পাণ্ডাদের জানালেন যে রাণীর আদেশে এখন থেকে তারামায়ের নিত্যপূজা ও ভোগ বামাক্ষ্যাপাই দেবেন। তিনি যেভাবে যেমনভাবে খুশি পূজা ও ভোগ দিন না কেন তা নিয়ে তারাপীঠের কেউ কোন কথা বলতে পারবেন না। তাঁকে সহযোগিতা করবার জন্য একজন নিত্য পুরোহিতও থাকবেন। যেদিন বামাক্ষ্যাপা পূজো করবেন না বা ভোগ নিবেদন করবেন না সেদিন তাঁর হয়ে পুরোহিত তারামাকে পূজো ও ভোগ নিবেদন করবেন। রাণীমা আরও আদেশ দিলেন যে তারামায়ের ভোগের প্রসাদ সর্বাগ্রে বামা-ক্ষ্যাপাকে দেওয়া হবে। মধ্যাহ্নের অন্নপ্রসাদ একথালা ও সায়াহ্নের শীতলী প্রসাদ (লুচি বা রুটি ও মিষ্টি প্রভৃতি) বামাক্ষ্যাপাকে সর্বপ্রথম দেওয়া হবে। তিনি ইচ্ছে হলে মন্দিরে এসে এই প্রসাদ নেবেন নতুবা যেখানে তিনি বলবেন সেখানেই ভোগ প্রসাদ দেওয়া হবে।

তাছাড়া প্রতিমাসে চারটাকা দক্ষিণাস্বরূপ বামাক্ষ্যাপার জন্য বরাদ্দ করলেন রাণীমা। এইভাবে তিন তিনবার অগ্নিপরীক্ষার পর তারামা শ্রীবামের সারাজীবনের অন্ন সংস্থান ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

নাটোরের মহারাণীর এই আদেশে সবাই খুব অবাক হলেন। যাঁরা এতদিন নিতান্ত অবহেলা ভরে শ্রীবামকে দেখতেন তাঁরা এবার তারামায়ের স্বপ্নাদেশ ও রাণীমার আদেশ শুনে শ্রীবামকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। বিশেষ করে পাণ্ডারা ও রঘুনাথগঞ্জের কাছারির নায়েব ভরত মৈত্র।

এখন অনেকের মত ভরত মৈত্রও উপলব্ধি করলেন যে, শ্রীবাম সত্যিই তারামায়ের সিদ্ধ সাধক সন্তান। তারামায়ের বীর সন্তান। ভরত মৈত্র ইতিপূর্বে শ্রীবামকে তাঁর পাচক করবার জন্য ও তারা-মায়ের অন্নপ্রসাদ বন্ধ করবার আদেশ দেবার জন্য অনুতপ্ত হয়ে শ্রীবামের কাছে ক্ষমা চাইলেন। করুণাময় শ্রীবাম সানন্দে ক্ষমা করলেন ভরত মৈত্রকে। নাটোরের মহারাণীর আদেশমত শ্রীবামকে দিয়ে তারামায়ের বিশেষ পুজো ও ভোগ দেওয়ালেন ভরত মৈত্র। তারামায়ের এই স্বপ্নাদেশের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ফলে বহুলোক শ্রীবামকে দর্শন করতে তারাপীঠে আসতে লাগ-লেন। চির নিভৃত-প্রিয় শ্রীবাম বিরক্ত হলেন। কিন্তু লীলাময়ী তাঁরামায়ের ইচ্ছায় শ্রীবামের মহিমা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—o—

বিচিত্র পূজা

শ্রীবামের তারামায়ের নিত্য পূজা ও ভোগরাগ নিবেদনের কথা থাকলেও শ্রীবাম খেয়াল খুশি মত মাঝে মাঝে পূজা করেন। অন্য সময় নাটোর রাজ কর্তৃক নিয়োজিত তন্ত্রসাধক ঈশান ভট্টাচার্য্যই পূজো করতে লাগলেন। শ্রীবাম স্বেচ্ছাময়। ধরাবাঁধা নিয়মে তিনি চলতে পারেন না। চিরস্বাধীন শ্রীবাম তাই আপন খেয়াল খুশি মত মাঝে মাঝে তারামন্দিরে এসে পূজা করেন তারামাকে মনের আনন্দে।

শ্রীবামের ভাব, ভাষা, পূজা সবই বিচিত্র রহস্যময়। সাধারণের চোখে তা একান্ত দুর্বোধ্য। তাঁরা শ্রীবামের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তাঁদের চোখে শ্রীবামের পূজা, আচার, ব্যবহার ও ভোগ নিবেদন প্রভৃতি সবই অশাস্ত্রীয়।

সর্বভূতে সমভাব ও সমদর্শী শ্রীবাম একদিন আপন খেয়ালে পূজো করবার জন্য তারামায়ের মন্দিরে এলেন। শ্রীবামের পূজো দেখতে ভীড় করলেন পাণ্ডারা ও অন্যান্য লোকজন।

নিষ্ঠাবান পূজারী, পাণ্ডা ও দর্শকদের কাছে শ্রীবামের পূজা সবই বিপরীত। পূজোয় আচমন, ভূতশুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, স্বস্তিবাচন অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি কিছুই নেই শ্রীবামের পূজোয়। যাহোক শ্রীবাম পূজোয় বসলেন। সবাই কৌতূহলে তাকিয়ে আছেন শ্রীবামের পূজার দিকে। শ্রীবাম আসনে বসে ফুল বেলপাতা জবা তুলসী সব চন্দনে মাখিয়ে দুই হাতে নিয়ে তারামাকে বললেন,

"দিবা কেলি মুণ্ডমালী
আমি হেগে পুটি পূজা করি।"

এই বলে তারামায়ের গায়ে ছুড়ে মারলেন। উপস্থিত সবাই পূজার এই বিচিত্র মন্ত্র শুনে অবহেলা ভরে হাসতে লাগলেন। বামের শাস্ত্র জ্ঞান নেই, তাই পূজাবিধি মন্ত্রবিধি কিছুই বাম জানেনা— এই তাঁদের অভিমত। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সবাই পরম বিস্ময়ে দেখলেন যে, শ্রীবামের ছুড়ে মারা ফুল, বেলপাতা, জবা, তুলসী সব

একত্রে মালার ন্যায় সুসজ্জিত হয়ে তারামায়ের গলায় শোভা পেতে লাগলো। সবাই স্তম্ভিত হলেন এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে। তারপর কোশার জল সম্পূর্ণ পান করে শ্রীবাম এবার বিচিত্র মন্ত্র •পড়তে লাগলেন তারামায়ের বলিদানের খড়্গের ওপর ফুলদিয়ে। প্রথম ফুল দিয়ে বললেন, কালা কাকায় নমঃ (কালাচাঁদ কর্মকার, শনি ও মঙ্গল বারে এই খাঁড়া দিয়ে পাঠা বলি দেয়)। তারপর বলির পাঠাকে সামনে আনা হ'ল। পাঠার ঘাড়ে ফুল দিয়ে বললেন, হরিশ চাটুর্য্যে নমঃ (হরিশ চাটুর্য্যে পাঠা যোগাড় করে)। তারপর পাঠার শিং-এ সিদুর দিয়ে ও ফুল দিয়ে শ্রীবাম বললেন, "ওঁ অনন্তায় নমঃ" (অনন্ত লেট পর্ব পূজায় বলির জন্য পাঠা কিনে নিয়ে আসে)।

এইভাবে পূজারী, পালাদার, পাণ্ডা, পাচক, বাঁজনাদার প্রভৃতি প্রত্যেকের নামে একটি করে ফুল দিলেন তারামায়ের কাছে এদের মঙ্গল কামনা করে। তারপর তারামাকে মুঠোমুঠো ফুলদিয়ে বলতে লাগলেন বিচিত্র মন্ত্র, "ইদম নৈবেদ্য, আশ্চর্য্য ফল, আতপ মিস্টান্ন, এতদ সরবৎ, ইদম সুন্দরীম ছোলা ভিজাং তারায়ৈ নিবে-দয়ামি স্বাহা।"

পূজা শেষ করে এবার হাতে রক্তচন্দন, জবা, বেলপাতা, নিয়ে তারা তারা মা মা বলে নাদধ্বনি দিলেন। নাদসিদ্ধ শ্রীবামের এই বজ্রকন্ঠেরধ্বনিতে সমগ্র তারা মন্দির কেঁপে উঠলো।

শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয়ে নেমে এল তারানামের অমৃত ধারা।

কোন কোন দিন খড়ম পায়ে দিয়ে মন্দিরে আসেন শ্রীবাম। হঠাৎ এসে তারামায়ের সামনে দাড়িয়ে, "এই লে ফুল, এই লে বেলপাতা"---এই বলে তারা মায়ের গায়ে ফুল বেলপাতা ছুড়ে দিয়ে চলে যান।

শোনা যায়, একদিন হঠাৎ এমনি খেয়ালের বশে তারামায়ের ব্রহ্মশিলার গায়ে পেচ্ছাব করে দিলেন শ্রীবাম তারামা'র ওপর অভিমান করে। এতে পুরোহিত প্রতিবাদ করলেন। সদাজাগ্রত এই ব্রহ্মশিলা অপবিত্র হ'ল বলে পুরোহিত প্রতিবাদে মুখর হলেন। তাই শুনে রেগে গিয়ে পুরোহিতকে শ্রীবাম বললেন, "বেশ করেছি। আমি আমার মায়ের গায়ে মুতেছি। তোর কিরে শালা?"

পুরোহিত এতে অসন্তুষ্ট হয়ে নাটোর রাজাকে সব জানালেন। রাজা তারামায়ের ব্রহ্মশিলাকে শুদ্ধ করবার জন্য কাশী থেকে পাঁচ-জন পণ্ডিতকে আনবার ব্যবস্থা করলে, সহসা তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন যে এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। তখন নাটোরের মহারাজ উপলব্ধি করলেন যে শ্রীবাম তারামায়ের কোলের ছেলে। তিনি তারাপীঠের পাণ্ডাদের ও পুরোহিতকে নির্দেশ পাঠালেন যে, বামাক্ষ্যাপা বাবা যে ভাবেই পূজো করুণ, তাকে কেউ যেন বিরক্ত না করেন এবং এ ব্যাপারে কারোর কোন প্রতিবাদও করবার দরকার নেই। ফলে শ্রীবামের এই রকম বিচিত্র পূজা তারামা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে লাগলেন।

—০—

শ্রীবামের স্বরূপ দর্শনে মোক্ষদানন্দ

বাংলা ১২৭৩ সাল। মোক্ষদানন্দের জীবনের একটি বিশিষ্ট স্মরণীয় বছর। তাঁর স্নেহের শিষ্য প্রতিম শ্রীবামের স্বরূপ দর্শন করে ধন্য হলেন বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দ। বিগত বছরে তারামায়ের স্বপ্না-দেশের ফলে মোক্ষদানন্দ তাঁর অনুগত ভক্ত বাম সম্পর্কে চিন্তা করে-ছিলেন যে বাম তারামায়ের শরণাগত ভক্ত এবং তারামায়ের কৃপায় সিদ্ধ হয়েছে। এর বেশী আর কিছু তিনি ভাবেননি। কিন্তু এবার লীলাময়ী তারামায়ের বিচিত্র খেলায় মোক্ষদানন্দ শ্রীবামের স্বরূপ-দর্শন করে ধন্য হলেন।

একদিন রাতে শ্রীবাম তারামায়ের বিরামখানায় বসে আছেন আপন মনে। বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ তখন চন্দ্রচড় শিবমন্দিরে বসে জপধ্যান

করছেন। গভীর রাতে মোক্ষদানন্দ শ্রীবামকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গাঁজার কলকে হাতে দিয়ে সাদরে বললেন, "বাম গাঁজা খাও"।

শ্রীবাম আশ্চর্য্য হলেন। বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ স্বভাবত ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির। তাই এই রাশভারি বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দের এই বিপরীত ব্যবহার দেখে তিনি যথেষ্ট বিস্মিত হলেন। শ্রীবাম এর কারণ জানতে চাইলেন। মোক্ষদানন্দ তখন ভাববিহ্বল হয়ে সানন্দে সজল নয়নে শ্রীবামকে বললেন যে তিনি চন্দ্ররূপ রূপে বামকে দর্শন করেছেন। জপধ্যানরত মোক্ষদানন্দকে বামই চন্দ্র-চূড় শিব রূপে এই গাঁজা দিতে বলেছেন।

সেজন্য মোক্ষদানন্দ এত শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে শ্রীবামকে গাঁজা খেতে দিলেন।

এ সম্পর্কে আরেকটি প্রচলিত কাহিনী আছে। একদিন সকালে মোক্ষদানন্দ চন্দ্রচূড় শিবমন্দিরে পূজা সম্পন্ন করে চন্দ্রচূড় শিবের ধ্যান করছেন। এমন সময় শ্রীবাম শিব মন্দিরের ছোট্ট দরজার সামনে এসে দাড়ালেন। তাঁর সর্বাঙ্গে ভষ্মমাখা। ধ্যানস্থ মোক্ষদা-নন্দের উদ্দেশ্যে শান্ত স্বরে তিনি বললেন, "কর্তা-বাবা, একটু গাঁজা দিবেন না?" মোক্ষদানন্দ মৌন হয়ে রইলেন। কিন্তু শ্রীবাম বার বার গাঁজা চাইতে লাগলেন। তখন মোক্ষদানন্দ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই কি গাঁজা চাইবার সময়? কেবল গাঁজা ও মদ, আর কিছু চিন্তা নেই।"

মোক্ষদানন্দের তিরস্কার শুনে শ্রীবাম চন্দ্রচূড় শিব মন্দিরের দরজা থেকে সরে এসে মন্দিরের উঠানে বসলেন। মোক্ষদানন্দ পুনরায় ধ্যানস্থ হ'বার জন্য সচেষ্ট হলেন। সহসা তিনি উপলব্ধি করলেন যে কে যেন তাঁর জিহ্বাকে ভেতরের দিকে টানছে। ফলে তাঁর ক্রমশঃ শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। বিপর্যস্ত মোক্ষদানন্দের মনে হ'ল তাঁর অন্তিম সময় আগত। তিনি কাতরভাবে মহাশিব চন্দ্রচূড়কে ডাকতে লাগলেন। সহসা চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গের ওপর তিনি মহাশিবের দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করলেন। শ্রীবামকে ভর্ৎসনা করবার জন্য তিনি তিরস্কার করলেন। মোক্ষদানন্দ মনে প্রাণে ক্ষমা চাইলেন।

শ্রীবামকে তিরস্কার করা যে তাঁকেই তিরস্কার করা এই

অভেদজ্ঞান ও অদ্বৈত রূপ দেবাদিদেব মহাদেব মোক্ষদানন্দকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

মোক্ষদানন্দ তখন শ্রীবামের উদ্দেশ্যে মনে মনে ক্ষমা চাইতেই তাঁর জিবের জড়তা ও শ্বাসকষ্ট কেটে গেল। তিনি পূর্বের মত সুস্থ হলেন।

শ্রীবামের প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে মোক্ষদানন্দ তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে শিবমন্দিরের বাইরে এসে দেখেন যে শ্রীবাম মন্দিরের একমাত্র পশ্চিম মুখী দরজার চাতালে চুপ করে বসে আছেন।

মোক্ষদানন্দ তখন সজল নয়নে ভাবে বিহ্বল হয়ে গাঁজা তৈরী করে সাদরে শ্রীবামকে সেবন করালেন এবং বললেন, "বাম, তোকে এতদিন চিনতে পারিনি"। তারপর বললেন পূর্বোক্ত ঘটনাটি। অবশেষে সাশ্রুনয়নে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দ বামকে বললেন, "বাম, তুমিই এই পীঠের ভৈরব।"

তারাপীঠের ভূতপূর্ব প্রধান কৌল ও বেদজ্ঞ ও সুপণ্ডিত বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দের এই গভীর শ্রদ্ধা ভক্তিযুক্ত উক্তির উত্তরে শ্রীবাম চুপ করে রইলেন। একটু পরে শুধু বললেন, "কর্তাবাবা বড় ভাল লোক, গাঁজা দিলেন। কি দিব্য গাঁজা, কেমন সুন্দর বাবার ভোগ হইল।"

শিবাবতার শ্রীবাম সবই জানেন। লীলাময়ী তারামা তাঁর স্বরূপ দর্শন করালেন মোক্ষদানন্দকে। শ্রীবামের আসন্ন বিশাল লীলার ক্ষেত্রে এই স্বরূপ দর্শনের প্রয়োজন ছিল।

—o—

ভয়ঙ্কর প্রলোভন

বাংলা ১২৭৩ সাল শুধু মোক্ষদানন্দের জীবনেই চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো না, শ্রীবামের জীবনেও চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো গভীর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

শ্রীবামের স্বরূপ দর্শন করে মোক্ষদানন্দ হলেন ধন্য। আর জগতের সর্বধিক কঠিনতম তপস্যা কামজয় করে শ্রীবাম আবার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

তারামায়ের স্বপ্নাদেশ ও নাটোরের মহারাণীর আদেশের ফলে শ্রীবামের প্রতি পাণ্ডাদের, নাটোরের রাজকর্মচারী ও স্থানীয় জমিদার ও সাধারণ লোকদের কিছুটা শ্রদ্ধা ভক্তি এলেও শ্রীবাম মাহাত্ম্য তাঁরা তখনো উপলব্ধি করতে পারেননি।

সেই উপলব্ধির জন্য শ্রীবামের আরেক লীলা প্রকাশের প্রয়োজন হ'ল। তারামায়ের বিচিত্র লীলায় অচিরে তা প্রকাশ পেল।

নাটোরের রাজকর্মচারী তথা তহশিলদার নীলমাধব শ্রীবাম কামজয়ী কিনা তা পরীক্ষা করতে মনস্থ করলো। নারী দ্বারা শ্রীবাম যদি ব্রহ্মচর্য ভ্রষ্ট হ'ন তবে বোঝা যাবে শ্রীবাম কামজয়ী নয় এবং সত্যিকারের সিদ্ধ সাধকও নন। শ্রীবামের এত নাম যশের ফলে নীলমাধবের অন্তরে বামবিদ্বেষ যেন আরো বেড়ে উঠলো। নীলমাধব ভাবলো বাম কোন কাজ করে না। অথচ প্রতিদিন তাকে দিনে তারামায়ের অন্ন প্রসাদ ও রাতে শীতলীর লুচি দুধ মিষ্টি প্রভৃতি বামের কাছে পাঠাতে হয়। উপরন্তু বামের এই নাম যশ খ্যাতি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। শ্রীবামকে লোকের কাছে হেয় করবার জন্য নীলমাধব এক চক্রান্ত করলো নীলমাধবের এই হীন চক্রান্তে আরো কয়েকজন কুচক্রীও যোগ দিল।

নীল মাধব 'সুন্দরী' নামে এক কুলটা কামিনীকে নিয়োগ করলো শ্রীবামকে ভ্রষ্ট করবার জন্য। 'সুন্দরী' বারাঙ্গনা একে রূপবতী তাতে পূর্ণ যুবতী। 'যৌবন মদেমত্তা' বারবিলাসিনী 'সুন্দরী'

ঠিক করলো যে, তার রূপযৌবনের জালে যে কোন প্রকারে শ্রীবামকে আবদ্ধ করবে।

তারাপীঠ মহাশ্মশানের গভীর নির্জনতার মধ্যে সুন্দরী দিনে রাতে নানা ভাবে শ্রীবামকে প্রলোভিত করতে সচেষ্ট হ'ল। কিন্তু কিছুতেই শ্রীবামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না। একদিন রাতে মহাশ্মশানের প্রাণ কেন্দ্রে শ্রীবাম শুয়ে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেমন বালক, জড়, পিশাচ ও উন্মাদ ভাব অবস্থা, তেমনি ব্রহ্মের ক্ষেত্রস্বরূপ মহাশ্মশানেরও তাই। কখন কোন অবস্থায় মহা-শ্মশান প্রকাশ পায় তা শ্রীবাম জানেন। তাই মহাশ্মশানের সাথে শ্রীবাম একাত্ম হয়ে রয়েছেন। যাহোক, সুন্দরী বেপরোয়া হয়ে গভীর রাতে মহাশ্মশানে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে একদিন উপস্থিত হ'ল শ্রীবামের কাছে। অন্তর্যামী শ্রীবাম বুঝতে পারলেন সব। কামাতুরা এই গণিকাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন। সুন্দরী এসে শ্রীবামকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত নির্লজ্জের মত পুরুষাঙ্গ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলনা। অপরিসীম বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইতি মধ্যে শ্রীবাম জেগে ওঠার ভান করে বলে উঠলেন, "কে মা এসেছিস ? ---এই বলে শিশু যেমন মায়ের স্তন পান করে, ঠিক সেই ভাব নিয়ে সুন্দরীর স্তন পান করতে লাগলেন। ক্রমে এত প্রচণ্ড জোরে স্তন পান করতে লাগলেন যে তা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো।

সীমাহীন যন্ত্রণায় সুন্দরী প্রাণের দায়ে চিৎকার করতে লাগলো। দ্বাপরে শিশুকৃষ্ণ রাক্ষসী পুতনার স্তন পান করতে করতে তাকে বধ করেছিলেন। কিন্তু কলিতে শ্রীবাম ততদূর করলেন না। সুন্দরীকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রেখে ছেড়ে দিলেন।

এদিকে সুন্দরীর চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে এলেন তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন দেহপসারিণী সন্দরী নগ্না হয়ে পড়ে আছে আর তার স্তন থেকে ভীষণ রক্ত ঝরছে এবং তীব্র যন্ত্রণায় সন্দরী চিৎকার করছে।

শ্রীবাম গম্ভীর স্বরে সুন্দরীকে বললেন, "যা মা, ছেলের সাথে আর এরূপ করিস না।"

তখন তারা বুঝতে পারলেন আসল ব্যাপার। শ্রীবামের পরম

পবিত্র স্পর্শে ও এই মাতৃসম্বোধনে এই নির্লজ্জা নারীর মধ্যে লজ্জা এল। তার রূপ যৌবনের মিথ্যে অহংকারও চূর্ণ হ'ল। শুধু তাই নয়, এই ক্লেদাক্ত দেহপসারিণীর জীবনের ওপর এল তীব্র ঘৃণা। অনুশোচনায় শ্রীবামের পদদ্বয় ধরে ক্ষমা চাইলেন। করুণা-ময় বাম ক্ষমা করলেন। উল্টো আশির্বাদও করলেন, তারামা তোকে কৃপা করবেন।"

সুন্দরী মহাশ্মশান থেকে ফিরলো সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে। মহাশ্মশানে তার জন্মান্তর হ'ল। নীলমাধব ও তার সঙ্গী কুচক্রী-দের তীব্র ভৎ'সনা করলো। বললো, "যাঁকে তোমরা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছ, সে দেবতা, মনুষ্যের মধ্যে ভগবান।" তারপর ফিরে গেল নিজগৃহে। এরপর 'সুন্দরী' দেহব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সৎ ও ভদ্র জীবন যাপন করতে লাগলো। ক্রমে তারামায়ের মহাপবিত্র ও জাগ্রত মহানাম জপ করে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দিল।

শোনা যায় শেষ জীবনে 'সুন্দরী' (মতান্তরে 'তারা সুন্দরী') একজন শুদ্ধ সাধিকাতে রূপান্তরিত হয়েছিল তারামায়ের কৃপায়। এদিকে জব্দ হ'ল নীলমাধব ও তার সঙ্গীগণ। দুষ্ট নীলমাধব তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি কিছুকালের মধ্যেই পেল। ঘুষের দায়ে তাঁর চাকরী গেল। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে, রোগে জর্জরিত হয়ে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবশেষে তাকে মরতে হ'ল।

পরপর দু'বার শ্রীবাম জগতের এই কঠিনতম সাধনা, 'কাম'-কে জয় করলেন। 'কাম'-এর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। উত্তর কালে আরো একাধিকবার তাঁকে এই কামজয়ের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। প্রতিবারই জগতের সর্বাধিক দুরন্ত রিপু 'কাম' তাঁর পদানত হয়েছে। শিবাবতার শ্রীবামের জ্ঞাননেত্রের অগ্নিতে 'কাম' দগ্ধ হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে। শুধু কামই নয়। পুরো ষড়রিপুই শ্রীবামের কাছে সম্পূর্ণ পদানত হয়েছে চিরতরে।

—o—

মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষদাহন

মহাপীঠ তারাপীঠ মহশ্মশানে বিরাজ করছে এক বিশাল সুপ্রাচীন পরম পবিত্র মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষ। মহাশ্মশানের প্রাণকেন্দ্র এই মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষ। এই মহাপবিত্র বৃক্ষের পৌরানিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য অপরিসীম।

সত্যযুগে মহামুণি বশিষ্ঠদেব শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশে মহাচীন থেকে এই মহাপীঠে এসে এই মহাবৃক্ষের নিচে তারামায়ের সাধনা করেন চীনাচারে এবং তারামায়ের দর্শন লাভ করে সিদ্ধ হ'ন।

তারপর কবীন্দ্র কর্ণাভরণম থেকে কলিযুগে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা পর্যন্ত এগার হাজার মহান সাধকবৃন্দ এই মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষের নিচে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন ('মহাশ্বেত শিমূল বৃক্ষ—দ্রষ্টব্য, প্রথম খণ্ড')। একদা এই পরম পবিত্র মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষের নিচে বিরাজমান ছিল তারামায়ের ব্রহ্মশীলা ও শ্রীপাদপদ্ম।

উত্তরকালে তারাপীঠ মহাশ্মশানের প্রাণকেন্দ্র এই শিমুল বৃক্ষ থেকেই এই দিব্যস্থানের নাম হয় শিমুলতলা।

এই সুপ্রাচীন মহাপবিত্র মহাশ্বেত শিমূল বৃক্ষের কথা তন্ত্রশাস্ত্রেও উল্লেখ রয়েছে।

'শাল্মলীদহন' তন্ত্রে লেখা রয়েছে যে কলি যুগে সিদ্ধপুরুষ এবং সাধকরুদ্র বামাক্ষ্যাপা এই বহু প্রাচীন শ্বেত শাল্মলী বৃক্ষ তথা শিমুল বৃক্ষ দগ্ধ করে নাশ করবেন।

তারাপীঠের মহাকৌল এবং বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মোক্ষদানন্দ তাঁর স্নেহভাজন শ্রীবাম কর্তৃক এই শ্বেতশিমুল বৃক্ষ দাহণের মধ্য দিয়ে সচক্ষে দেখলেন বহুযুগ পূর্বে তন্ত্রের ভবিষ্যত বাণীর চরম সার্থকতা। তার সাথে উপলব্ধি করলেন যে শ্রীবাম সাধক শ্রেষ্ট এবং তারাপীঠের প্রধান কৌলের পূর্ণ অধিকারী।

আনুমানিক বাংলা ১২৭৪ সালে একদিন রাতে শ্রীবাম গঞ্জিকা সেবন করে তার আগুণ এই বিশাল বৃক্ষের শুষ্ক কোটরে ঢেলে দিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর পূর্ববর্তী বহু সাধকই এই শ্বেতশিমল বৃক্ষের

শুষ্ক কোটরে এভাবে আগুণ ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু কখনো এই বিশাল বৃক্ষে আগুন ধরেনি। এই বিশাল শ্বেত শিমুল বৃক্ষ দৈর্ঘ্যে এত বড় ছিল যে তারাপীঠের চারপাঁচ মাইল দূর থেকেও এই সুপ্রাচীন বিশাল বৃক্ষ দেখা যেত। অনেক প্রাচীন ব্যক্তির মতে বহু দূরবর্তী রামপুরহাট থেকেও এই বহু প্রাচীন বিশাল শ্বেত শিমুল বৃক্ষ দৃষ্টি গোচর হ'ত। এই বৃক্ষের গোড়া এত বিশাল ছিল যে দু'জন পুরুষ তাঁদের চারহাত যুক্ত করেও বৃক্ষের বেড় পেত না। যাহোক, সেই রাতে শ্রীবাম এই মহাবৃক্ষের শুষ্ক কোটরে অগ্নি ঢেলে দিলেন। অন্য কোন দিন না ধরলেও সেদিন যেন নিয়তি নির্দিষ্ট হয়েই বৃক্ষের কোটরে আগুন জ্বলে উঠলো। শ্রীবাম কন্টক স্বরূপ এই সংসার বৃক্ষে তাঁর জ্ঞানাগ্নি ঢেলে দিলেন।

পরদিন সেই আগুন এই বিশাল প্রাচীন মহাবৃক্ষের শীর্ষদেশে প্রজ্বলিত হ'ল।

তারাপীঠের পাণ্ডাবর্গ ও অন্যান্য স্থানীয় লোক এই বিরাট অগ্নি-শিখা দেখে অত্যন্ত ভয় পেলেন। তারাপীঠ মহাশ্মশানের অনতিদূরে তাঁদের বাসগৃহ। মাঝখানে জীবিত কুণ্ড ও তারামায়ের ও চন্দ্র-চূড়ের মন্দির মাত্র। আগুনের সুবিশাল লেলিহান শিখা দেখে সবাই অত্যন্ত ভীত হলেন। জীবিত কুণ্ড থেকে জল নিয়ে বা দ্বারকা নদী থেকে জল নিয়ে এই বিরাট অগ্নি কুণ্ড নির্বাপিত করা অসম্ভব। এই ভয়ঙ্কর অগ্নিরাশি যদি বাতাসে জীবিত কুণ্ডের দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে পড়ে তবে পাণ্ডাদের সকলের খড়ের ঘর সহজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পাণ্ডারা ও স্থানীয় লোকজন ভীতশঙ্কিত চিত্তে দূর থেকে হায় হায় করতে লাগলেন এই প্রজ্বলিত বিশাল অগ্নিরাশি দেখে। পাণ্ডারা বুঝলেন এই অগ্নি কাণ্ডের মূলে শ্রীবামই রয়েছেন। শ্রীবামের অগ্নি দাহ করবার পূর্ব অভ্যাস তাঁরা জানেন ('অগ্নিদাহে শ্রীবাম' দ্রষ্ঠব্য—প্রথম খণ্ড)। তাঁরা ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে অকথ্য ভাষায় শ্রীবামের কাছে এসে গালাগাল দিতে লাগলেন। এমনকি উত্তেজনার চরমমূহুর্তে শ্রীবামের দিব্য অঙ্গে আঘাতও করলেন।

অসীম ক্ষমার অবতার শ্রীবাম সবই সহ্য করলেন এবং তারামাকে জানালেন যেন এই বিশাল অগ্নিশিখা কারোর গৃহ স্পর্শ না করে।

তারামা কৃপা করলেন। সহসা দক্ষিণের প্রচণ্ড বাতাস এসে প্রজ্বলিত শ্বেতশিমুল বৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশ সরলপুরের মাঠে নিয়ে ফেলে দিল। দরিদ্র পাণ্ডাদের ও অন্য কোন লোকের একটি কুড়ে ঘরও পুড়লো না। অথচ যে বিশাল অগ্নিশিখা ছিল তা সমগ্র তারাপীঠ ও আশে 'পাশের সকল ঘরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতো। কিন্তু তারামায়ের কৃপায় কিছুই হ'ল না। তিন দিন ধরে এই বিরাট অগ্নিশিখা জ্বলতে লাগলো মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষের সর্বাঙ্গে। শ্রীবাম এই প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে তারামায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শণ করে আনন্দে আপ্লুত হলেন।

সরলপুরের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে দাড়িয়ে নিঃসঙ্গ নিঃশঙ্ক শ্রীবাম অসীম অনন্ত ভাবময়ী তারামায়ের এই দিব্য মূর্তি দর্শন করে সজল নয়নে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুদীর্ঘ তিনদিন পর এই বিশাল অগ্নি নির্বাপিত হ'ল। সমগ্র মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষ ভষ্মীভূত হ'ল। সেই উষ্ণভষ্ম পাহাড়ের ন্যায় শিমুল তলায় শোভা পেতে লাগলো। সবাই বিষ্মিত হয়ে দেখলেন যে শিমুল তলা সংলগ্ন শ্রীবামের প্রিয় 'যোগেন্দ্র ঝোপড়া' কুড়ে ঘরটিও সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। অথচ শিমুল বৃক্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটে এই কুড়ে ঘরটি স্বভাবতই ভষ্মীভূত হ'বার কথা। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে।

এই মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষ প্রসঙ্গে আরেকটি কাহিনী পাওয়া যায়। তাহ'ল, একদা শ্রীবাম শিমুল বৃক্ষ ছেদন করে বৃক্ষের গলায় মাকনা পরিয়ে তা দ্বারকানদীর জলে ভাসিয়ে দেন। কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোন প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

যাহোক, মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষ দাহন করে শ্রীবাম 'শাল্মলী দহণ' তন্ত্রের ভবিষ্যতবাণী সফল করলেন। আচার্য্য মোক্ষদানন্দও উপলব্ধি করলেন যে তাঁর প্রিয় স্নেহের পাত্র বামাক্ষ্যাপা শুধু সিদ্ধ পুরুষ নয়, সে সাধকরুদ্র অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব।

তিনি কিছুদিন পূর্বেই চন্দ্রচড় শিবের মন্দিরে শ্রীবামের স্বরূপ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। এবার শল্মলী দাহন হওয়ায় তিনি শ্রীবামের স্বরূপ গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন। তারাপীঠের প্রধান কৌল রূপে যে শ্রীবাম সুচিহ্নিত তাও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলেন।

—০—

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন

আনুমাণিক বাংলা ১২৭৪ সাল থেকে শ্রীবাম ক্রমে কঠোর-কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হ'ন। ক্রমশঃ তাঁর সাধনা কঠোর থেকে কঠোর-তর হতে লাগলো। উগ্র হতে উগ্রতর হতে লাগলো। বাংলা ১২৭৪ সাল থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর কৃচ্ছ্রসাধনা প্রচণ্ড উগ্র রূপ ধারণ করলো। একে শ্রীবামের বিশাল ভৈরব মূর্তি, তার ওপর এই ভয়ঙ্কর কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য মস্তকে বিশাল জটাজুট সমন্বিত সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি ও নিবিড় ঘন শ্মশ্রু এবং তার সাথে তাঁর বিশাল নয়নদ্বয় সদা আরক্তিম ও তেজপুঞ্জ। সেই তীব্র তেজদৃপ্ত দৃষ্টি সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে না।

তাই গভীর ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা তাঁর সম্পর্কে তারাপীঠের সাধারণ মানুষদের।

শ্রীবাম এ সময় পশ্বাচার থেকে বীরাচার ও বীরাচার থেকে দিব্যাচারের ক্রমিক ধারা তন্ত্রমতে আপন ঐশী শক্তি বলে সুসম্পন্ন করলেন। গুরু তথা ইষ্টরূপে স্বয়ং ত্রিলোকজননী তারামা তাঁকে ধরে থেকে সব ক্রমিক স্তর যথারীতি উত্তীর্ণ করে দিলেন।

এই নিভৃত সাধনা সবার অগোচরেই সুসম্পন্ন হ'ল। শ্রীবাম এখন সর্বদা হলেন তারাময়। তাঁর তারাসাধনা তথা পূর্ণ ব্রহ্ম-সাধনা সম্পূর্ণ হ'ল। তাই তিনি শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যানে জ্ঞানে মনে প্রাণে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত তারাময় হয়ে থাকেন।

তারাসাধনা তথা পরম ব্রহ্মস্বরূপ অভেদ সাধনার ফলে তিনি আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষে পশুতে প্রকৃতিতে সর্বদা তাঁর ইষ্টদেবী তারামাকেই দর্শন করে দিব্যভাবে মগ্ন থাকেন ব্রহ্মানন্দে।

তাঁর দেহবোধ এ সময় পরিপূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। খাদ্য অখাদ্য সবই তাঁর কাছে এক আস্বাদ। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা জীবিত কুণ্ডের জলে কুম্ভক করে ডুবে থাকেন। কখনো দ্বারকা নদীর জলে ভাসতে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা। আবার কখনো ভাসতে ভাসতে চলে যান উদয়পুর পর্যন্ত। সেখানে উদয়পুরের জাগ্রতা

দক্ষিণাকালী দর্শন করে আবার ভাসতে ভাসতে চলে আসেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে। কখনো মহাশ্মশানের 'যোগেন্দ্র ঝোপড়ায়' কখনো বা ব্রজ-বাসী কৈলাসপতির ব্যবহৃত কুড়ে ঘরে থাকেন। আবার কখনো উন্মুক্ত আকাশতলে বা শিমুলতলায় স্তব্ধ ভাবে মগ্ন থাকেন দীর্ঘকাল। আবার কখনো জীবিত কুণ্ডের ঘাটে, কখনো বা বিরামখানায় কখনো বা তারামন্দিরের উত্তর পূর্ব ভিতে থাকেন। তাঁর দিনরাত্রি ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন বোধই নেই। ফলে তারামায়ের বরাদ্ধ প্রসাদ তার কাছে এলে কখনো শ্রীবাম সামান্য গ্রহণ করেন, কখনো পড়ে থাকে, কখনো বিলিয়ে দেন তাঁর শ্মশান পারিষদদের মধ্যে অর্থাৎ সারমেয়দের মধ্যে।

গভীর রাতে তাঁর 'তারা', 'জয়তারা', 'শ্রীদুর্গা জয়তারা' প্রভৃতি নাদধ্বনিতে সমগ্র তারাপীঠ মহাশ্মশান কেঁপে ওঠে। শুধু তারাপীঠ নয় বহু ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামের নরনারীগণও সেই মেঘ গর্জন স্বরূপ বজ্রকণ্ঠ শুনে পরস্পর বলতে থাকেন "ঐ যে বামাক্ষ্যাপা ডাকছেন।"

কখনো রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করেন আপন মনে মহাশ্মশানে ঘুরতে ঘুরতে। মাঝে মাঝে মেঘমন্দ্রিত স্বরে তার ইষ্টদেবী তারামাকেও ডাকেন প্রাণভরে। ক্রমেই শ্রীবাম লোকচক্ষুর অন্তরালে ডুবে যেতে লাগলেন। ব্রহ্মময়ী তারামায়ের মধ্যে ক্রমশঃ জীব জগত ব্রহ্ম সবই দেখতে লাগলেন অভেদ ভাবে। এই পরম বিশ্বানুভূতির মধ্যে শ্রীবাম ক্রমেই মগ্ন হতে লাগলেন।

তাঁর কাছে এখন তারা ব্রহ্ম, তারাই জগৎ, তারাই জীব। সবই সেই এক তারামা।

অবশেষে এই ব্রহ্মানুভূতির মধ্য দিয়ে শ্রীবাম তারাবিদ্যা তথা ব্রহ্মবিদ্যা তথা লয় বিদ্যায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হলেন। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রূপে চিহ্নিত হলেন তিনি তারাপীঠের সাধক সমাজে। রাজযোগী রূপে শ্রীবাম হলেন সুচিহ্নিত। পরিপূর্ণভাবে যোগ ও তন্ত্রের সমাহার হ'ল তাঁর মাঝে। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাঁর হ'ল সম্পূর্ণ করায়ত্ত।

একাধারে দিব্যাচারী, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ও মহা প্রেমিক, মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী রূপে তিনি হলেন চিহ্নিত। তন্ত্রমতে তিনি হলেন কুলনাথের নাথ। দ্বিতীয় মহেশস্বরূপ হলেন পুরুষোত্তম শ্রীবাম। তারামায়ের রাতুল চরণদ্বয় থেকে প্রতিমুহূর্তে যে অফুরন্ত অনন্ত হর্ষ সমগ্র

বিশ্ব চরাচরে প্রবাহিত হচ্ছে, তার দিব্য লহরি শ্রীবামকেও মহাহর্ষে নিমগ্ন করে।

শ্রীবামের বিশাল ভৈরব কান্তির মধ্যেও সেই অসীম হর্ষ প্রবাহিত হয়। এই ব্রহ্মানন্দ কেবল উপলব্ধি সাপেক্ষ।

এই ব্রহ্মানন্দের সুতীব্র জোয়ারে শ্রীবামের দিব্যদেহের প্রতিটি অণুপরমাণু পর্যন্ত তারাময় হয়ে যায়। এক তারামা ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখেন না, শোনেন না, ভাবেন না, বলেন না, জানেন না। এই কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে বহিরঙ্গে তিনি ও তারামা মা ও ছেলে---এই দ্বৈত হলেও অন্তরঙ্গে তিনি ও তারামা অদ্বৈত হয়ে যান। তাই তারামা ও শ্রীবাম এক অখণ্ড নিত্য শাশ্বত ব্রহ্মসত্তা। এখানে বামা-ই বাম, বাম-ই বামা। সর্বদা তারাভাবে বিভোর শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয় জ্যোতিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ। তারানামের অমৃতধারায় তাঁর হৃদয় সর্বদা পরিপূর্ণ। তাই তাঁর দেহে মনে প্রাণে ক্ষুধা ক্লান্তি শ্রান্তির চিহ্নমাত্র নেই। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার প্রচণ্ড বারিধারা, শীতের ভীষণ প্রকোপ তাই শ্রীবামকে টলাতে পারে না। এমনকি মহাশ্মশানের বিষধর সর্প ও নররক্ত খাদক অজস্র মশার ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কামড়ও তাঁর দেহানুভূতিতে আসেনা।

এই ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধন ও উগ্রসাধনা এবং সমদর্শনের মধ্য দিয়ে বহিরঙ্গে তাঁর তেজদীপ্ত রূপের সাথে অন্তরঙ্গে দিব্য আনন্দ ও অমৃত ধারায় হয়েছে এক মধুর সমন্বয়।

কিন্তু তারাপীঠের সাধকগণ ও সাধারণ মানুষ বহিরঙ্গে শ্রীবামের বিশাল বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, অজস্র কুঞ্চিত কেশদাম ও ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যবদন ও বিশাল তেজদৃপ্ত নয়নদ্বয় দেখে যেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি ভয়ও পান। আবার অন্তরঙ্গে, তাঁরা বিস্ময়ে দেখেন এই বিশাল ভীমকান্তি রূপের মধ্যে শিশুর মত সরলতা, কাতরতা, ও তারামায়ের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেমভক্তি ভালবাসা ও পরিপূর্ণ নির্ভরতা বিরাজমান। বহিরঙ্গে কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধক শ্রীবামের অতি উগ্ররূপের সাথে অন্তরঙ্গের এই স্নিগ্ধ মধুর ও অমৃতময় শিশুর রূপের এই বিরাট বৈপরীত্যভাব দেখে সাধারণ লোক স্তম্ভিত হন। এই দুই বিপরীত রূপের নিগূঢ় তাৎপর্য তাঁরা উপলব্ধি করতে না পেরে শ্রীবামকে 'ক্ষ্যাপা' বলে ভাবেন।

তাই বামাক্ষ্যাপার সব কাজই বিপরীত---এই ভাব নিয়ে তাঁরা শ্রীবামকে দেখেন। সুতরাং শ্রীবামের ভাব, ভাষা, আচার ব্যবহার বসন ভূষণ সবই তাঁদের চোখে অস্বাভাবিক। অতএব তারাপীঠের স্থানীয় লোকজন, পাণ্ডাগন, এমনকি অনেক সাধকবৃন্দও শ্রীবামকে একজন 'ক্ষ্যাপা' ছাড়া ভাবতে পারেন না। তাই শিববতার শ্রীবাম-কে কেউ ডাকেন 'বামা', কেউ ডাকেন 'পাগলা', কেউ ডাকেন 'বামাপাগলা' প্রভৃতি নামে।

শ্রীবাম যেমন শিশুর মত সরল। তেমনি শিশুর মতই নগ্ন। তারামায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক পেটের ছেলের মতই। সর্বদা শিশুর মত মা মা করছেন। একদিকে কঠোর সাধক অন্যদিকে আত্ম-ভোলা শিশু। এই দুই মহান ভাবের মহাসমন্বয়ে লীলাময় শ্রীবাম সদা সমুজ্জ্বল।

—o—

তারা মন্দিরে বাজ ফেলা

আনুমানিক বাংলা ১২৭৫ সালের গ্রীষ্মকাল। চারদিক প্রচণ্ড উত্তাপে যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরেই ভীষণ খরা চলছে। এমন কি কালবৈশাখীও হয়নি। বীরভূমের নানা স্থানে ও তারাপীঠের আশে পাশের বিভিন্ন স্থানেও ভীষণ খরা চলছে। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে এল কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'ল না।

বৃষ্টির অভাবে সকল জলাশয় ও ধানক্ষেত সব শুকিয়ে গেল। মাঠের বীজধান মাঠেই শুকিয়ে ঝরে গেল। এই অজন্মার ফলে চাষীরা ও সাধারণ গ্রামবাসীরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লো। সারাবছর কি খেয়ে সবাই বেঁচে থাকবে, এই দুশ্চিন্তায় সবাই বিহ্বল হয়ে পড়লো। কোন উপায় না দেখে সবাই এসে শ্রীবামের কাছে উপস্থিত হ'ল। কাতরভাবে বললো, "ক্ষ্যাপাবাবা, বৃষ্টির অভাবে চাষবাস সব বন্ধ। ক্ষেতের বীজধান সব মরে গেছে। বৃষ্টি না হলে সব না খেয়ে মরে যাব। তারামাকে তুমি বল যাতে বৃষ্টি হয়। তারামা থাকতে, তুমি থাকতে আমরা কি সবাই উপোস করে মরবো?"

শ্রীবাম করুণার অবতার। তার ওপর তারামায়ের আশ্রিত এই সরল গ্রামবাসীগণের কাতর আর্তনাদ তাঁর অন্তরে প্রবল সাড়া জাগালো। শ্রীবাম তাঁদের সান্তনা দিয়ে তারামাকে কখনো কাতর ভাবে কখনো উগ্রভাব ধারণ করে বকতে লাগলেন। সহসা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুই বেটি দিনরাত বসে বসে খাচ্ছিস, আর তোর সব সন্তানরা উপোস করে মরছে। দাড়া তোর মাথায় বাজ ফেলবো" ইত্যাদি। সবাই ভীম ভৈরব শ্রীবামের উগ্ররূপ দেখে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো। চাষীরা ও গ্রামের লোকেরা সব বাড়ী ফিরে গেল। বাক্‌সিদ্ধ শ্রীবামের কথা কি তারামা মিথ্যে হতে দিতে পারেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের এক কোণে এক টুক্‌রো মেঘ দেখা দিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অগ্নিবৃষ্টি ও ধূসর আকাশকে অগ্রাহ্য করে সেই মেঘ তারাপীঠ ও আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিশাল

ঘোর কালো রূপ ধারণ করলো। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি শুরু হ'ল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সহসা তীব্র মেঘগর্জন শোনা-গেল। সাথে সাথে বিদুতের প্রচণ্ড ঝলকানিতে সমগ্র তারাপীঠ আলোকিত হয়ে উঠলো, ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো তারামায়ের মন্দিরের ঊর্দ্ধদেশে। তারামন্দিরের একদিকের কার্ণিশ ভেঙ্গে পড়লো। মন্দিরের ভেতরের তারামা'র ভোগমূর্তির কিন্তু কোন ক্ষতি হ'লনা। বাজপড়ার ভীষণ শব্দে পাণ্ডারা ও স্থানীয় লোকজন ছুটে এলেন। একদিকে বৃষ্টির জন্য সকলের অসীম আনন্দ অন্যদিকে তারামায়ের মন্দিরে বাজ পড়ার জন্য ভীষণ বেদনা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে সবাই এলেন তারা মন্দিরে।

তারামায়ের ভোগমূর্তি অক্ষত দেখে সবাই স্বস্তি পেলেন। কিন্তু মন্দির বিদীর্ণ হওয়ায় সবার মনে অশান্তি রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে তারা মন্দিরে বাজ পড়ায় শ্রীবাম ছুটে এলেন। সন্তপ্ত হৃদয়ে ও সজল নয়নে তারামায়ের চরণ কমলে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন এই বাজ ফেলবার কথা বলবার জন্য। কিন্তু তারামায়ের প্রশান্ত উজ্জ্বল ও আনন্দময় মূর্তি দেখে শ্রীবাম বুঝলেন যে এই খরা বৃষ্টি ও বজ্রপাত তারামায়েরই এক দিব্যলীলা মাত্র।

প্রিয়তম পুত্র বামের বাক্‌সিদ্ধ প্রচারের জন্যই এই করুণাঘন লীলা তারামা সানন্দে ঘটালেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কাহিনী পাওয়া যায়। তাহ'ল শ্রীবাম সহসা উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে তারামাকে গালাগালি দিতে দিতে তারামন্দিরে এসে তারামাকে বলেন, "সর্বনাশী, রাক্ষসী, তুই আমার সর্বনাশ করেছিস, আজ আমি তোর সর্বনাশ করবো। তোর মন্দিরে বাজ ফেলবো।" ইত্যাদি।

সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দশীর দিন। সেদিন রাতে মেঘমুক্ত নীলাকাশে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক প্লাবিত হ'ল। সহসা নীলাকাশ থেকে এক বিশাল আলোর দ্যুতি বিকট শব্দ করে তারা-মন্দিরের চূড়ায় সশব্দে পতিত হ'ল। সমগ্র তারাপীঠ কেঁপে উঠলো।

শ্রীবাম তখন মন্দিরে ছিলেন। তারামা'র ভোগ মর্তির বা শ্রীবামের কোন ক্ষতি হয়নি।

উপরোক্ত এই কাহিনীটি কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারণ শ্রীবাম অকারণে উগ্র হয়ে তারামাকে অভিশাপ দিয়ে তারামন্দিরে বাজ ফেলবেন—এটা যুক্তি গ্রাহ্য, নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারামা তাঁর সর্বনাশ করেছেন, এই অজুহাতে ব্যক্তি-গত আক্রোশ বা অভিমানে এমন কাজ, তারা অন্তপ্রাণ ও তারা সর্বস্ব এবং তারাময় শ্রীবামের পক্ষে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। যার সবই তারামা এবং যাঁর জীবন সর্বস্ব তারামা এবং যাঁর আপ-নার চেয়েও আপন হলেন তারামা, সেই শ্রীবাম কখনোই আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে তারামাকে অভিশাপ দিতে পারেন না। সুতরাং উপরোক্ত দ্বিতীয় কাহিনীটি যুক্তি যুক্ত ও গ্রহণ যোগ্য নয়।

উপরোক্ত প্রথম কাহিনীটিই যথার্থ গ্রহণ যোগ্য। কারণ শ্রীবাম এখানে নিজের জন্য নয়, তারামা'র আশ্রিত, আর্ত ও বিপন্ন চাষী ও গ্রামবাসীদের জন্য বৃষ্টি চেয়ে তারামা'র ওপর অভিমান করে বাজ ফেলবার কথা বলেছেন। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মহাপুরুষগণ চিরকাল-ই কারণ মুখী বুদ্ধির দ্বারা চালিত হ'ন। অকারণে কোন কথা বা কাজ করেন না। তাই এই বিপন্ন চাষীদের কারণে তিনি তারামায়ের ওপর অভিমান করে উপরোক্ত কথা বলে-ছেন। এটা গ্রহণ করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

সুতরাং উপরোক্ত প্রথম কাহিনীটিই যথার্থ গ্রহণযোগ্য রূপে জন-মানসে বিবেচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীবামের স্নেহধন্য ও সান্নিধ্য ধন্য সরলপুরের শতাধিক বছরের প্রাচীন ব্যক্তি শশী মোড়ল লেখককে বলেছেন যে তারা মন্দিরে মোট তিনবার বাজ পড়েছিল। বংশ পরম্পরায় তিনি তা জেনেছিলেন।

—o—

লীলাময় শ্রীবামের নিত্যকর্ম

লীলাময় শ্রীবাম কঠোর কৃচ্ছতার মধ্যে থাকাকালীন তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন বিচিত্র তেমনি বৈচিত্র্যময়। এক বিচিত্র দ্বন্দ্বমুখর এই নিত্যকর্মটি। তাঁর এই আপাত বিরোধী দৈনন্দিন কাজকর্ম, আচার ব্যবহার সবই এক নিগূঢ় রহস্যের আবরণে ঢাকা। সাধারণ মানুষ এই রহস্যভেদ করতে অক্ষম হয়ে ক্ষ্যাপার ক্ষাপামী বলে মনে করেন। শ্রীবাম ইচ্ছে করেই যেন তাঁর চারদিকে এক রহস্যের জালটেনে দিয়েছেন।

তাই শ্রীবামের বহুমুখী সাধনার নিগূঢ় ধারা তাঁরা দেখতে পাননি। তারা শুধু দেখছেন শ্রীবামের দৈনন্দিন জীবনধারা।

মোক্ষদানন্দ ও তাঁর পত্নী এবং প্রবীন পাণ্ডাবর্গ ও তাঁদের পত্নীগণ এবং স্থানীয় জনগণ সাধারণত প্রতিদিন দেখেন যে, শ্রীবাম প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে তারামায়ের মধুর নাম করেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত কোন ঋতুতেই তা বন্ধ হয় না। তারপর প্রাতঃকৃত্য করতে যান। কোনদিন শ্মশানে, কোনদিন সরলপুরের মাঠে, কোনদিন কবিচন্দ্র-পুরে যান প্রাতঃকৃত্য করতে।

যেদিন তাঁর মল পরিষ্কার হয়, সেদিন বালকের ন্যায় আনন্দে বলেন, "তারামা আজ মাখন দিয়েছেন।" আবার যেদিন কোষ্ঠ পরিস্কার হয় না, সেদিন বলেন, "তারামা কুচলে বড়ি করেছেন।" তারপর কিছু তামাক সেবন করে এবং কিছু জলযোগ অর্থাৎ মুড়ি গুড় জুটলে তা সেবা করে, তারপর জীবিত কুণ্ড ঘাটে স্নান করতে নামেন। আবার কখনো দ্বারকা নদীতেও স্নান করেন। পৈতা ও গামছা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে স্নান করতে নামেন।

স্নান করতে নেমে শ্রীবাম বারবার মাথা ডুবিয়ে স্নান শুরু করেন। ডুব দেবার সময় এক ডুবে "এক ব্রহ্ম", দুই ডুবে "দুর্গা মা", তিন ডুবে 'ত্রিনয়না', চারডুবে "চতুর্ভুজা", পাঁচ ডুবে "পঞ্চ নদী"—এরূপ বলতে বলতে স্নান করতে থাকেন।

কোনদিন কিছুক্ষণ আবার কোনদিন বহুক্ষণ ধরে স্নান করেন খেয়াল খুশি মত। কখনো আপন খেয়ালে জলে ভাসেন। আবার

কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কুম্ভক করে জলের মধ্যে ডুবে থাকেন।

তিনি যে হঠযোগ সিদ্ধ ছিলেন, তা তাঁর এসব নানান ধরণের মুদ্রার দ্বারা বোঝা যায়। শ্রীবাম শুধু হঠযোগেই সিদ্ধ নন, তিনি রাজযোগেও সিদ্ধ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী যেমন কাশীতে গঙ্গায় অধিকাংশ সময় জলে ভেসে থাকতেন। তেমনি শ্রীবামও গঙ্গা সদৃশ দ্বারকা নদীতে বা জীবিত কুণ্ডে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকেন।

যাহোক, স্নান সেরে সিক্ত দেহে তারামায়ের মন্দিরে এসে তারামা'র মূর্তির সামনে দাড়িয়ে শিশুর মত মা মা শব্দে সজল নয়নে ডাকতে থাকেন। তারপর ভাবাবেগে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলতে থাকেন; মা মা, আমায় দয়া কর মা। আমি নিতান্তই তোর অনুগত। মা আমি লেখা পড়া জানি না, সাধন ভজন জানি না, আমি তোকে ছাড়া কাউকে জানি না, আমায় দয়া কর মা। মা, আমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান দরকার নাই, আমি ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, শৌচা-শৌচ জানি না। আমি কেবল তোকে জানি। মা কেউ নাই মা, কেবল তুই আছিস।

বেটি, আমায় দয়া করবি না?—কেন করবি না? তোকে করতেই হবে। আমি যে তোর নিতান্তই শরণাগত। মা আমি তোর ক্ষ্যাপা ছেলে, তুই দীনতারিণী, পতিত পাবনী, মা কুপুত্র সদাই হয় কুমাতা কখনো নয়। তবে কেন দয়া করবি না?—এই ভাবে আবদার করে শিশুর মত অবিরল কাঁদতে থাকেন। বিশাল দু' নয়ন বেয়ে অজস্র ধারা ঝরে পড়তে থাকে। যাঁরা সেই সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁদেরও এই কাতর প্রার্থনা শুনে নয়ন সজল হয়ে ওঠে। আবার কখনো শুধু অনুরাগেই নয়, রাগের সাথেও প্রাণ-ভরে তারামায়ের সাথে ঝগড়া করেন।

তারামাকে রেগে গিয়ে বলেন, "বোদা বেটি, মুণ্ডমালী, জীবে-কেলী, বদ, তুই মন্দিরের বাহির হ দেখিনি, এই লাঠির আঘাতে তোকে ঠিক করবো" ইত্যাদি।

জগত জননী তারামায়ের ওপর শ্রীবামের এই রাগ অনুরাগেরই নামান্তর। তারামা'র প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা, শিশুর মত ভালবাসা

ও সরলতা এবং শরণাগতি ছাড়া এভাবে মায়ের ওপর রাগ করে যা খুশি বলা সম্ভব নয়।

তাই তারামা'র সাথে শ্রীবামের সম্পর্ক ঠিক পেটের ছেলের মতই। তারামায়ের অফুরন্ত অমৃত স্নেহধারায় পুষ্ট শ্রীবাম। তারামা'র কোলের ছেলে শ্রীবাম। তাই 'বামা'র আনন্দ ও অমৃতময় চরণদ্বয় লাভ করে বাম হলেন ক্ষ্যাপা। তাই একদিকে 'বামাচরণ' নাম যেমন সার্থক তেমনি অন্যদিকে সার্থক 'বামাক্ষ্যাপা' নাম-ও।

কোনদিন স্নান করে খেয়াল বশে হঠাৎ পূজো করতে আসেন তারামাকে। সেদিন আর এভাবে প্রার্থনা না করে পূজো করতে বসে যান। তাঁর পূজোও বিচিত্র। আসন শুদ্ধি, আচমন, ভূতশুদ্ধি, গ্রন্থি ও শিখা বন্ধন, স্বস্তিবাচন প্রভৃতি সংস্কার যুক্ত পূজো নয় শ্রীবামের। তাঁর পূজো সংস্কার মুক্ত। সহজ সরল দিব্যভাবের পূজো। আচার নিয়ম শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথ সব লয় করে, সম্পূর্ণ অভেদ জ্ঞানে শ্রীবাম ব্রহ্মময়ী তাবার পূজো করেন। দু'হাতে কলকে ফুল নিয়ে তারামায়ের সামনে দাড়িয়ে বললেন," হল্‌দে হল্‌দে কলকে ফুল তারায়ৈ স্বাহা।" তারপর জবা ফুল নিয়ে বললেন, "লাল লাল জবা ফুল তারায়ৈ স্বাহা।" তারপর তারামাকে বললেন", "এই ধূপ নে, চন্দন নে, আতপ নে বেলপাতা নে।"

এরপর পাণ্ডাদের ও বাজনাদারদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই পাণ্ডা বাবারা লাও, এই বাজনাদার বাবারা-ও লাও"—প্রভৃতি বলে পূজো শেষ করলেন। তারামাকে ভোগ নিবেদনও করেন অপূর্ব দিব্যভাবে। মা অন্তপ্রাণ ছেলে যেমন করে মা'কে খাওয়ান, ঠিক তেমনি করে বাম তারামাকে খাওয়ান। মূলত বহিরঙ্গকে উপলক্ষ্য করে শ্রীবাম অন্তরঙ্গের পূজো করেন।

শ্রীবামের পূর্ণ পরিস্ফট ভক্তিই হ'ল ফুল। সে ভক্তি ভেতরের ষড়রিপুকে দমন করছে বলে কখনো হলদে তথা কালো রূপ, কখনো অনুরাগে আরক্তিম তথা জবা রূপ।

পূর্ণজ্ঞানই হ'ল শ্রীবামের ধূপ। যে ধূপ সর্বভূতে সর্বরূপে এক তারার-ই দর্শন করছে আত্মজ্ঞানের শিখায় ক্ষুদ্র আমিত্বকে পুড়িয়ে। পূর্ণ কর্মই হ'ল তাঁর চন্দন। যে চন্দন তারা নামের দিব্য পবিত্র ঘর্ষণে লয় হয়ে শরণাগতির সুগন্ধ অবিরাম বিতরণ করছে। পর্ণ

রাজযোগ-ই হ'ল শ্রীবামের আতপ। যে আতপ ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ (অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ) দেহের মধ্যে অবস্থিত ; জ্যোতির্ময় আত্মার সাথে পরমাত্মা তথা ব্রহ্মময়ী তারামায়ের সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ ঘটাচ্ছে। আর পূর্ণ প্রেম-ই হ'ল শ্রীবামের বেলপাতা। যে বেলপাতা সৃষ্টি স্থিতি লয় তথা সত্ত্ব রজঃ তমের মধ্যে এক ব্রহ্ম-স্বরূপ তারামা'কে-ই ঈশ্বর জীব ও জগৎ রূপে তথা অভেদ রূপে উপলব্ধি করে সর্বভূতে সমপ্রেম পূর্ণরূপে দান করছে অবিরাম। তাই এই বহিরঙ্গ পূজার মধ্য দিয়ে শ্রীবাম অন্তরঙ্গের সুগভীর ও নিগূঢ় রহস্যময় পরিপূর্ণ পূজা সুসম্পন্ন করলেন।

তাই শ্রীবাম তারামায়ের একধারে পূর্ণ ভক্ত, পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণ কর্মযোগী ও পূর্ণ রাজযোগী এবং পূর্ণ প্রেমিক সন্তান। তারা সমুদ্রে শ্রীবাম যেন নিত্য আন্দোলিত অবিরাম আনন্দময় অফুরন্ত প্রাণবন্ত ঢেউ।

বহিরঙ্গে তারামাকে এইভাবে পূজো করে অর্থাৎ ফুল ধূপ চন্দন আতপ বেলপাতা এবং পাণ্ডাগণ ও বাজনাদারগণ সহ সামগ্রিক পূজো করে, অন্তরঙ্গে শ্রীবাম যেন মূলত ঈশ্বর জগৎ ও জীবেরই পূজো করলেন এক ও অভেদ জ্ঞানে। ফলে একের মাঝে তিন বা তিনের মাঝে 'এক'—এর মহাপূজা হ'ল। তাই সর্বতোভাবে এই পূজা আত্মতত্ত্ব তথা ব্রহ্মতত্ত্ব তথা তারাতত্ত্বেরই মহাপূজা তথা সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

—০—

মহাতীর্থ কপিলেশ্বরে গমন

'মহাপীঠ তারাপীঠ' থেকে মহাতীর্থ কপিলেশ্বর প্রায় তিরিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কপিলেশ্বর শিব ক্ষেত্র। এই মহাতীর্থ মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে অবস্থিত। অদূরে বড়নগরে মহাশক্তি পীঠে কিরীটেশ্বরী অবস্থিত। সতীদেবীর কিরীট এই পীঠে পতিত হয়েছিল।

কিরীটেশ্বরী যেমন জাগ্রত তেমনি তার অদূরবর্তী কপিলেশ্বর শিবও সদা জাগ্রত বহু যুগ ধরে। পুণ্য সলিলা ভাগিরথীর পবিত্র তীরে অবস্থিত এই কপিলেশ্বর। যে গ্রামে এই মহা শৈবতীর্থ অবস্থিত তার নাম শক্তিপুর। শক্তিপুর গ্রামের অদূরে বড়নগর। শ্রীবাম এলেন এই অনাদি লিঙ্গ কপিলেশ্বরে। এই অনাদিলিঙ্গ শিবের নাম কপিলেশ্বর হ'বার মূলে রয়েছে এক সুপ্রাচীন কাহিনী। মহর্ষি কপিল যিনি মূলত শিবের উপাসক ছিলেন, তিনি এই মহালিঙ্গ তথা অনাদিলিঙ্গ শিবকে আরাধনা করে তাঁর দর্শন ও কৃপা পেয়েছিলেন বলে এই অনাদিলিঙ্গের নাম হয় কপিলেশ্বর। ত্রেতা যুগে এই স্থানে কপিলমুণি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানেই সগরের ষাটহাজার পুত্র ধ্বংস হয়েছিল বলে প্রকাশ এবং এখানেই ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে নিয়ে এসে তাঁর পূর্ব পুরুষদের উদ্ধার করেন। সেই সুপ্রাচীন যুগে এই মহাপবিত্র ক্ষেত্রের পূর্বদিককে পাতাল বলা হত।

এই পবিত্র ভূমিতে কপিল মুণির আরাধনার পর আরো অনেক মণি ঋষি তপস্যা করেন। পরবর্তীকালে কাপালিকগণ এই অনাদিলিঙ্গ কপিলেশ্বরকে আরাধনা করেন বলে কপিলেশ্বরের আরেক নাম হয় কপালেশ্বর। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের সুপ্রাচীন তন্ত্রের প্রভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তা হ'ল মহাযান হীনযান ও বজ্রযান। এই বজ্রযান শাখা তন্ত্রের বজ্রতারার উপাসক হ'ন। বৌদ্ধদের বহু পূর্বে থেকেই বঙ্গদেশে বজ্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল। কপিলেশ্বর ক্ষেত্র এই বজ্রতন্ত্রভূমি রূপে স্মরণাতীত কাল থেকে সুচিহ্নিত। বৌদ্ধগণ চীনে ও তিব্বতে বজ্রতারা দেবীর উপাসনা করেন। বুদ্ধের জ্ঞানেশ্বরী রূপে বৌদ্ধগণ বজ্রতারার উপাসনা করেন সপ্তম শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে শিবশক্তির উপাসক রাজা রামজীবন রায় তারাপীঠে তারামায়ের মন্দির তৈরী করেন এবং নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন (প্রথম খণ্ড দ্রষ্ঠব্য), সেই সাধক ভক্তই কপিলেশ্বর শিব মন্দিরও নির্মাণ করে নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

রাজা রামজীবন তারাপীঠে মন্দির নির্মাণের পর অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে বীরভূমের কলেশ্বরে শিবের সাধনায় রত হ'ন। সেই সময় এক দৈব নির্দেশে তিনি কপিলেশ্বরে আসেন। এখানে অলৌকিক ভাবে মহর্ষি কপিলের দর্শণ পান এবং তারই নির্দেশে অনাদিলিঙ্গ কপিলেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন এবং নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

তারপর বীরভূমের কলেশ্বরে বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন এবং অলৌকিক ভাবে পূর্ব দৈববানী অনুসারে কলেশ্বর শিবের আবির্ভাব ঘটে গঙ্গাগর্ভ থেকে কলেশ্বর মন্দিরে। কপিলেশ্বর শিব প্রসঙ্গে প্রাচীন তন্ত্রে ও বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। তারমধ্যে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র, কায়স্থকারিকর 'চন্দ্রচূড় মাহাত্ম্য', বীরভূম বিবরণ, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যাহোক শিবাবতার শ্রীবাম এলেন অনাদিলিঙ্গ কপিলেশ্বর দর্শণে। সদাজাগ্রত এই মহালিঙ্গ দর্শণ করে তিনি ভাবে আপ্লুত হলেন। কয়েকদিন তপস্যাও করেন। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ নিগূঢ় সাধন ক্রিয়াও তিনি এই সুপ্রাচীন তপস্যা ক্ষেত্রে সম্পন্ন করেন। শোনা যায় ব্রজবাসী কৈলাসপতিও এই সাধন ক্ষেত্রে তপস্যা করে গেছেন। উত্তরকালে শ্রীবামের নির্দেশে তাঁর প্রধান শিষ্য মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা এই পবিত্র দিব্য ভূমিতে দীর্ঘকাল তপস্যা করে আপ্তকাম হ'ন। শ্রীবাম কয়েকদিন পর এই মহাজাগ্রত শিবক্ষেত্র থেকে তারাপীঠে ফিরে আসেন।

তারাপীঠ কপিলেশ্বর ও কলেশ্বর যেন এক ঐশী শক্তিতে একসূত্রে গাঁথা।

শিবশক্তির উপাসক, ভক্ত ও সাধক রাজা রামজীবন রায়ের মাধ্যমেই তিন তিনটি মহাপবিত্র ক্ষেত্রে মন্দির ও নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা হ'ল সপ্তদশ শতাব্দীতে।

একা রাজা রামজীবনই এই তিনস্থানে মন্দির ও সেবা পূজার ব্যবস্থা করলেন। তিনি যে তারামা ও মহাশিবের মহা কৃপাপ্রাপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, শ্রীবাম বলেন যে সত্যি-কারের অন্তরের সেবার ইচ্ছে থাকলে তা জন্মজন্মান্তরেও কাজ করে যায়।

মহান ভক্ত ও সাধক ও দানবীর রাজা রামজীবন রায়ের ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

ভারত বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দ্বারকানাথ বীর-ভূমের উপরোক্ত কলেশ্বর শিবের অপার্থিব সংস্কার করেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য তথা সুলেখক ও সাধক প্রবর লালগোলার মহারাজা শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় এই কলেশ্বর শিবমন্দির সংস্কার ও নিত্য সেবা পূজার সুব্যবস্থা করেন।

তাঁর গুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দ্বারিকা নাথ কলেশ্বরের ভাবগম্ভীর পরিবেশে কথা প্রসঙ্গে একদা বলেন যে তারাপীঠ, কলেশ্বর ও কপিলেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা সেই রাজা রামজীবন রায়-ই পুনরায় তাঁর ঐশী নির্দিষ্ট কাজ এবার রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় রূপে সুসম্পন্ন করলেন। রাজা রামজীবনেরই নব কলেবর হলেন রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়। দেহ আসে যায় কিন্তু অমর আত্মা নিত্য শাশ্বত রূপে বিরাজ করেন তাঁর সকল প্রারব্ধ-সহ। শ্রীবামও রাজা রামজীবনের মহান সেবার উচ্চ প্রশংসা বারংবার করেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ লালগোলার মহারাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং "সিদ্ধ সাধক তারাক্ষ্যাপা গ্রন্থের" লেখক ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

—০—

তারাশিলায় মূত্রত্যাগ

শ্রীবামের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও উগ্রভাব তারামায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে কেটে গেল। সাধারণত সরল শিশুর মতই শান্তস্নিগ্ধ থাকেন তিনি। কিন্তু অন্যায় অবিচার দেখলে সাময়িকভাবে উগ্ররূপ ধারণ করেন। না হলে অন্য সময় সদাশিব তিনি। তাছাড়া কুচক্রী ও ঘোর বিষয়ী লোকদের উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তাঁর কাছে আসতে দেখলেই তিনি উগ্ররূপ ধারণ করেন। তাদের চেলাকাঠ বা চিমটে নিয়ে তাড়া করেন। ফলে তারা রণেভঙ্গ দেয় বাধ্য হয়ে। এই উগ্রভাবের অনেকটাই তাঁর বাহ্যিক অভিনয়। অন্তরে তিনি সদা প্রেমময়। সত্যিকারের সৎগৃহস্থ ও ভক্ত এবং শরণাগত তাঁর কাছ থেকে প্রেমপূর্ণ ব্যবহারই লাভ করেন। মাঝে মাঝে ভাবের আবেশে তারামন্দিরে চলে আসেন। তারামায়ের সাথে ছোট্ট ছেলের মতই আবদার করে কথা বলেন। কখনো খেয়াল বশে তাঁর বিচিত্র পূজাও করেন।

একদিন হঠাৎ খেয়াল বশে তারামায়ের ওপর অভিমান করে সদা পবিত্র ও মহাজাগ্রত ব্রহ্ম শিলায় মূত্র ত্যাগ করলেন। উপস্থিত পূজারী ও পাণ্ডাগণ স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হলেন। তারামায়ের ব্রহ্ম শিলাকে অপবিত্র করবার জন্য শ্রীবামকে অনুযোগ করে বললেন, "এ কি করলে ক্ষ্যাপা? তারামায়ের ব্রহ্মশিলায় পেচ্ছাব করে মাকে অপবিত্র করলে?" একথা শুনে সহসা শ্রীবাম উগ্র হয়ে উঠলেন। বললেন, "বেশ করেছি, আমার মায়ের গায়ে আমি মুতেছি। তোর কিরে শাল? পুরোহিত তবু সাহস ভরে অনুযোগ করে বললেন, "কিন্তু ছেলে হয়ে এভাবে তারামায়ের গায়ে পেচ্ছাব করা কি উচিত? মা যে অপবিত্র হ'ল। উত্তরে শ্রীবাম যা বললেন তা গভীর তাৎপর্যময়। তিনি বললেন, "জগতে কোন মানুষ মায়ের কোলে মুতেনি রে শাল? ছেলে মায়ের কোলে মোতেই, তাই বলে মা কি কখনো অপবিত্র হয় রে শাল?"

কিন্তু পুরোহিত ও পাণ্ডাবর্গ এই গভীর উচ্চভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম নন। ফলে তাঁরা একজোট হয়ে তারামায়ের সদাজাগ্রত

ও পরম পবিত্র ব্রহ্মশিলাকে অপবিত্র করবার জন্য শ্রীবামের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন নাটোর রাজের (ছোটতরফের) কাছে। নাটোর রাজ এই সংবাদ শুনে কাশী থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আনিয়ে তারাশিলাঁ কে শুদ্ধ করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সহসা তিনি তারামায়ের সপ্নাদেশ পেলেন, "আমাকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা করিস না।"

ফলে তিনি পূর্ব ব্যবস্থা রদ করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তারামায়ের সাথে শ্রীবামের সম্পর্ক ঠিক মা ও তাঁর পেটের ছেলের মতই। তিনি আদেশ পাঠালেন যে শ্রীবামের কোন ইচ্ছা বা কাজে কেউ যেন বাধা না দেয়। এই ঘটনার পর শ্রীবামের প্রতি নাটোর রাজের ও নাটোরের রাণীর ও নাটোরের রাজপরিবারের শ্রদ্ধা ভক্তি আরো বৃদ্ধি পেল।

পরবর্তীকালে শ্রীবাম আরো একাধিকবার তারামায়ের ব্রহ্মশিলায় মূত্রত্যাগ করেছেন। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

—o—

বামের কারণ লীলা

শ্রীবামের কাছে ক্রমশঃ কৌতূহলী এবং কিছু অনুগত লোকের আনাগোনা শুরু হ'ল। এদের অধিকাংশ লোকেরই কিন্তু শ্রীবামের অধ্যাত্ম শক্তি সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই। তারা আসতে লাগলো মদ গাঁজা প্রভৃতির লোভে। তবে তারা বিস্মিত হয়ে যায় শ্রীবামকে অপরিসীম মদ গাঁজা চরস প্রভৃতি খেতে দেখে এবং আরো বিস্মিত হয় এসব সীমাহীন খেয়েও শ্রীবাম যথারীতি ধীরস্থির অটল থাকেন।

কৈশোর থেকেই শ্রীবাম গাঁজায় অভ্যস্থ হ'ন। এ সম্পর্কে এক কৌতুককর কথা জানা যায় শ্রীবামের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ শ্রীনগেনপাণ্ডা বর্ণিত কাহিনীর মাধ্যমে। শ্রীবামের পিতৃদেব কৈশোরেই নাকি শ্রীবামকে গাঁজা সেবনে হাতেখড়ি দেন। শ্রীবামকে তিনি, "জ্যেষ্ঠ পুত্র কুল শ্রেষ্ঠ গাঁজা খাঁ"—এই বলে প্রথম গাঁজায় অভিসিক্ত করেন।

যৌবনে শ্রীবাম তারাপীঠে আসা যাওয়া করতে করতে এবং সাধুদের সঙ্গ করতে করতে মদ ও চরসে অভ্যস্থ হ'ন।

পরবর্তী কালে সাধন কালীন অবস্থায় ব্রজবাসী কৈলাসপতি ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দকে কারণ ও গাঁজা সেবা করাবার সময় নিজেও প্রচুর পরিমাণে সেবা করতেন।

তারপর তথাকথিত সাধনা ও সিদ্ধি লাভের পর সদানন্দ শ্রীবাম অন্তরঙ্গে তারামায়ের নামের ব্রহ্মকারণ যেমন অফুরন্ত পান করতে লাগলেন তেমনি বহিরঙ্গেও সীমাহীন 'কারণ' পান করতে লাগলেন। তারসাথে গাঁজা আফিং চরসও প্রচুর পরিমাণে সেবা করতে লাগলেন।

সাধারণ মাতাল বা গাঁজা খোর তার সামান্য এক অংশও খেলে সাথে সাথে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কিন্তু শ্রীবামের কিছুই হয় না। তিনি যে সদাই তারাময়। তাঁর কাছে এক তারামা-ই ত্রি-জগতের সবকিছুর কারণ। তাই এই "কারণ" কে সকল কারণ জেনে শ্রীবাম একদিকে দিব্য প্রেম ভক্তির 'ব্রহ্ম কারণ', অন্যদিকে তারা পূজার উপকরণ স্বরূপ এই 'কারণ'-কে একই সাথে মহা

কারণ' করে কুলকুণ্ডলিণীতে হোম করে সর্ব কারণস্বরূপিণী তারা মায়ের সাথে একাত্ম হয়ে পরিপূর্ণ আত্মস্থ হয়ে যান ব্রহ্মানন্দে। তাই তাঁর এই 'কারণ' পানের কোন সীমা পরিসীমা থাকে না।

তাই তাঁর লৌকিক জড়দেহ তাঁর চৈতন্যময় দিব্যদেহ স্বরূপ তারামা'র সাথে তাল রেখে চলেন। সুতরাং শ্রীবাম মাতাল হন না। বরং তিনি হ'ন মা-তাল অর্থাৎ মায়ের সাথে সর্বদা তাল রেখে চলেন।

তাই ত্রিজগতের সকল কারণের কারণ 'পরম কারণ' তারামাকে শ্রীবাম সব কারণ নিবেদন করে সর্বদা সদানন্দময় হয়ে থাকেন। তাই শ্রীবাম-ই সর্বাংশে যথার্থ 'কারণ' পান করেন। 'কারণ' বামকে কখনো পান করতে পারেনি। সুতরাং শ্রীবামই মদ খেয়েছেন, মদ শ্রীবামকে খেতে পারেনি। তাই মদ গাঁজা আফিং চরস প্রভৃতির বিকার শ্রীবামে কখনো ঘটেনি।

সুতরাং শ্রীবাম যথার্থ বীর সাধক। তন্ত্রে বীরাচারে মদ তথা 'কারণ' পানের নির্দেশ আছে। কিন্তু তা সীমিত ও শোধিত রূপে অর্থাৎ ইষ্টদেবীকে নিবেদন করে পান করবার নির্দেশ রয়েছে। এই সীমিত ও শোধিত মদ বীর সাধকের শরীর ও মনের পক্ষে পুষ্টি কারক ও শক্তিদায়ক এবং আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধক।

এই শোধিত ও পরিমিত 'কারণ' যথার্থ অমৃত তুল্য। কিন্তু এই মদ বা 'কারণ'-কে ইষ্টদেবীকে নিবেদন না করে অর্থাৎ শোধন না করে এবং মাত্রাহীন পান করলে তা বিষতুল্য হয়ে যায়। পরিণামে মৃত্যু হয়। যে লোক এই অশোধিত ও অপরিমিত মদ পান করে তার মদ খাওয়াই সার হয়, সাধনা আর হয় না। সিদ্ধি লাভ তো বহু দূরের কথা। তার ফলে সে আর মদ খায় না। মদই তাকে খায় শেষ পর্যন্ত। মদের বিকারের মধ্য দিয়েই তাঁর চরম পরিণতি রোগ ও মৃত্যু ঘটে। এ জন্মে আর সাধনা ও সিদ্ধি ঘটেনা।

তন্ত্র সাধনা করতে গিয়ে এভাবে বহু দূর্বল সাধক লোভের বশে এই অশোধিত ও অপরিমিত মদ খেয়ে শেষ পর্যন্ত কঠিন রোগে জর্জরিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। তারা আর 'সাধন সর্বস্ব' হতে পারেনি। 'কারণ সর্বস্ব' হয়ে তন্ত্রের মহান মর্য্যাদা নষ্ট করে ও

নিজেদের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের অবমাননা করে শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে হতাশায় বিদায় নিয়েছে। এরা তন্ত্রের পশ্বাচারী। অথচ তন্ত্রে পশ্বাচারীদের সর্বতোভাবে সংযম ও ব্রহ্মচর্য সাধনের' নির্দেশ রয়েছে। তন্ত্র সাধনার এই প্রাথমিক অবস্থায় তন্ত্রে মদ স্পর্শ সম্পূর্ণ নিষেধ। কেবল মাত্র বীরাচার সাধনের ক্ষেত্রে শোধিত ও সীমিত মদ বা 'কারণ' পানের নির্দেশ আছে। অথচ এই দুর্বল পশ্বাচারী সাধকগণ তন্ত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কারণ পান করে সাধন ভ্রষ্ট হয়েছে। এরা বীরাচার সাধনের সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত। আবার যথার্থ পশ্বাচারীও নয়। ফলে তন্ত্র সাধনার নামে কেবল মদ্য পান করে এই ভ্রষ্ট সাধকগণ তন্ত্রের মর্য্যদা ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে নষ্ট করেছে।

সুতরাং তন্ত্রনির্দিষ্ট বীরাচারের আদর্শ রূপে এবং যথার্থ 'কারণ' পান কাকে বলে শ্রীবাম তা তাঁর এই কারণ লীলায় দেখালেন সুদীর্ঘ কাল ধরে।

শ্রীবাম মূলত বীরাচারের বহুঊর্দ্ধে বিরাজমান মহান দিব্যাচারী। তাই তিনি সকল কিছুর উর্দ্ধে। ব্রহ্মস্বরূপিণী তারামাতে-ই তাঁর সর্বদা ব্রাহ্মীস্থিতি। তাই তাঁর 'কারণ লীলা' সকল সীমা পরিসীমার বহু ঊর্দ্ধে।

তন্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং শিব। সেই শিবের অবতার তিনি। তাই তাঁর অলৌকিক লীলা সর্বদা প্রবাহমান। তিনি একাধারে সাধন-সিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, ও যোগসিদ্ধ, নিরালম্ব অবধূত ও কুলনাথের নাথ। জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও রাজযোগের মহান সমন্বয় তাঁর মাঝে হয়েছে। তিনি ত্রিসপ্ত চক্রভেদ করে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ অতিক্রম করে আত্মানন্দ তথা তারানন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

তাই তথা কথিত 'কারণ' পানের সকল সীমার ঊর্দ্ধে তিনি বিরাজমান। তাই 'তারাকারণ'-এ সর্বদা বিভোর তিনি। সুতরাং জাগতিক রাশি রাশি মদ, গাঁজা, চরস, আফিং তাঁকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাই সাধারণ লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে দেখেন ২০/২২ বোতল মদ, ৭/৮ ভরি গাঁজা, ৫/৬ ভরি চরস, ৪/৫ হাড়ি পচাই মদ, ও ২/৩ ভরি আফিং খেয়েও শ্রীবাম শান্ত সমাহিত রয়েছেন অচল অটল ভাবে।

এই অমানুষিক ও অলৌকিক ব্যাপার শুধু দু'এক বার নয়, পরবর্তী সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে অজস্রবার তাঁর বহু ভক্ত শিষ্য ও গুণমুগ্ধ সিদ্ধ সাধক সাধিকাগণ এবং সমবেত দর্শক মণ্ডলী স্তম্ভিত হয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীবামের এই অলৌকিক শক্তি উত্তরকালে কিম্বদন্তীরূপে সারা ভারতের সাধু সন্ন্যাসী, রাজা মহা-রাজা ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর অপরিসীম যোগ বিভূতির খ্যাতির পাশাপাশি তাঁর এই অলৌকিক ও অফুরন্ত 'কারণ' লীলার খ্যাতিও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

ভারতবর্ষের যোগবিভূতির ইতিহাসে এই ধরনের একই সাথে এই যুগ্ম যোগ বিভূতির অফুরন্ত অলৌকিক লীলা, আর কোন মহাপুরুষের মধ্যে এভাবে যুগল রূপে ঘটেনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে অবিরাম গতিতে। সেদিক থেকে প্রবাদ পুরুষ শ্রীবাম এক ও অদ্বিতীয়।

কখনো শ্রীবাম তারানামে বিভোর হয়ে আপন খেয়ালে প্রচুর পরিমাণ 'কারণ' পান করে তারপর ভরি ভরি আফিং আবার মদের সাথে গুলে পান করলেন নির্বিকার ভাবে। এই অবস্থায় যে কোন পাকা মাতালেরও মৃত্যু ঘটা স্বাভাবিক। উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী ভয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন শ্রীবামের মুখের দিকে। কিন্তু তিলমাত্র বিকার বা মৃত্যুর লক্ষণ নেই শ্রীবামের বিশাল ভৈরব মূর্তির মধ্যে। প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল আরক্তিম নয়নে এক অপার্থিব জ্যোতি। মাঝে মাঝে তারানাম উচ্চারণ করছেন মেঘমন্দ্রিত স্বরে। সেই দিব্য মধুর নাদধ্বনি শুনে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ শিউরে উঠছেন এক অভতপর্ব আনন্দে।

কখনো শ্রীবাম প্রচুর পরিমাণে 'কারণ' পাণ করে তারপর অপরিমিত গাঁজা সেবন করতে লাগলেন। মদের পর গাঁজা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক ব্যাপার। মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিন্তু সীমাহীন মদ, গাঁজা, আফিং, চরস প্রভৃতি সবই যেন শ্রীবামের কাছে সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

একবার এক ভক্ত শ্রীবামকে দু'টিন দেশী মদ শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ

পাঠান তারাপীঠে। কলীরা মদ ঢেলে রেখে টিনগুলো খালি করে দিতে বললো সেবক ভক্তদের। কিন্তু জনৈক সেবক পাণ্ডা কুলী-দের বললেন যে টিনগুলো রেখে যেতে। পরে টিনগুলো খালি করে ফেরৎ পাঠানো হবে। কিন্তু কুলীরা তখনি মদ ঢেলে টিনগুলো নিয়ে যেতে চায়। অথচ তখন বড় বড় টিনও নেই এত মদ রাখ-বার জন্য। ফলে সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু এই সমস্যা সহসা শ্রীবাম সমাধান করে দিলেন। তিনি কুলীদের বললেন, "তারামা'র মুখে এই টিনগুলো ঢেলে দে।"

এই বলে তিনি হা করলেন। কুলীরা টিনের পর টিন মদ শ্রীবামের মুখে ঢেলে দিতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত মদ তিনি খেয়ে ফেললেন। উপস্থিত সকল ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ এবং কুলীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল শ্রীবামের এই অমানুষিক ও অলৌকিক খাওয়া দেখে। এমনি ভাবে আরো অসংখ্য বার তিনি অপরিমিত কারণ পান করেছেন। মাত্রাহীণ গাঁজা চরস আফিং খেয়েছেন। কালক্রমে তাঁর এই সীমাহীন ও অতি বিস্ময়কর 'কারণ' পান ও মাত্রাহীন মাদকদ্রব্য সেবন সারাদেশে কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে কত সাধু সন্ন্যাসী, রাজা মহারাজা ও সাধারণ ভক্তগণ যে তা প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে আছেন তার ঠিক নেই। তাঁর এই অলৌকিক শক্তি দেখে বহু অহঙ্কারী, লোভী, ভোগী ও নাস্তিক লোকও স্তব্ধ হয়ে গেছে এবং কালক্রমে শ্রীবামের চরণে আশ্রয় নিয়ে তারামা'র কৃপা লাভ করে জীবন ধন্য করেছে। শ্রীবামের অজস্র অলৌকিক লীলার অন্যতম লীলারূপে তাই এই 'কারণ লীলা' উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

—: —

আবার প্রলোভন

একদিন শ্রীবাম মহাশ্মশানে শিমুলতলায় শয়ান রয়েছেন। রাতের নিবিড় আঁধারে চারদিক আবৃত। মহাশ্মশান ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এক সুন্দরী ভৈরবী এই সময় শ্রীবামের কাছে এসে তাঁর পদতলে বসলো। শ্রীবামের বিশাল পৌরুষমণ্ডিত তেজ-দৃপ্ত দেহ দেখে ভৈরবী আকৃষ্ট হ'ল।

ভৈরবী এক অসামান্যা সুন্দরী তাতে পূর্ণযুবতী। তাই শ্রীবামের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সহজেই বৃদ্ধি পেল। ভৈরবী স্বেচ্ছায় শ্রীবামের পদযুগল সেবা করতে লাগলো। অন্তর্যামী শ্রীবাম বুঝতে পারলেন ভৈরবীর উদ্দেশ্য। তাই কামাসক্তা ভৈরবীর চৈতন্যদানের জন্য শ্রীবাম ভৈরবীকে বললেন "মা, আমার ভৈরবীর প্রয়োজন নাই। তুমি অন্য কোথাও যাও।" কিন্তু ভৈরবী ভাবলো এটা বামের মনের কথা নয়। তাই ভৈরবী পদসেবা করে যেতে লাগলো নীরবে। বারবার বলা সত্ত্বেও ভৈরবী যখন শ্রীবামের পদসেবা করে যেতে লাগলো, তখন শ্রী বাম সহসা উগ্র রূপ ধারণ করলেন। প্রচণ্ড গর্জন করে উঠে দাড়ালেন। তারপর রুক্ষস্বরে বললেন "দাঁড়াতো চিমটে নিয়ে আসি।"

শ্রীবামের এই ভয়ঙ্কর ভৈরবমূর্তি দেখে তখন অত্যন্ত ভয় পেল ভৈরবী। শ্রীবামের ভীষণ উগ্ররূপ ভৈরবীর কামভাবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল।

ভৈরবী লুটিয়ে পড়লো শ্রীবামের পদতলে। ক্ষমা চাইলো কাতর ভাবে তার এই অন্যায় আচরণের জন্য। করুণাসিন্ধু শ্রীবাম ক্ষমা করলেন অনুতপ্তা ভৈরবীকে। চির ক্ষমাসুন্দর শ্রীবামের আশির্বাদে ভৈরবীর নবজন্ম হ'ল এই মহাজাগ্রত মহাশ্মশানে। শ্রীবামকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে ভৈরবী চলে গেল মহাশ্মশান থেকে। উত্তরকালে শ্রীবামের কৃপায় এই ভৈরবী তার সঠিক সাধন পথ লাভ করে এবং কঠোর সাধনা করে ইষ্ট লাভে সক্ষম হয়।

—০—

শ্রীবাম কর্তৃক গণপতির সিদ্ধাই হরণ

তারামায়ের মন্দিরের অদূরে উত্তর দিকে মুণ্ডমালিনীতলা নামে এক বহু প্রাচীন সিদ্ধস্থান বিরাজমান। এই সুপ্রাচীন ক্ষেত্র এককালে তারাপীঠ মহাশ্মশানের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে এই সিদ্ধস্থান পৃথক মর্যাদা লাভ করে।

বহুকাল ধরে বহু সাধক সাধিকার সাধন স্থান ও আবাস রূপে এই পবিত্র স্থানটি চিহ্নিত হয়ে আছে।

বহু বিশিষ্ট সাধকের সমাধি এই সিদ্ধস্থানে রয়েছে।

মুণ্ডমালিনীতলার চারপাশে নিবিড় শান্ত পরিবেশ। নানান রকম ফুল ও ফলের গাছ ও অজস্র বাঁশঝাড় এই শান্ত মনোরম স্থানটিকে ছায়াস্নিগ্ধ করে রেখেছে।

মুণ্ডমালিনীতলার সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে তারামায়ের সুদৃশ্য মন্দির। পেছনে অর্থাৎ উত্তরে উদয়পুর গ্রাম তথা সিদ্ধকালীপীঠ এবং পূর্বে সরলপুর গ্রামের বিশাল উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র ও পশ্চিমে পবিত্র দ্বারকানদী।

মুণ্ডমালিনী তলা প্রসঙ্গে একটি পবিত্র প্রবাদ রয়েছে। কিম্বদন্তী আছে যে, একদা উদয়পুরের কালীমন্দির যাবার পথে তারামা এই স্হানে তাঁর মুণ্ডমালা খুলে অবগাহন করেছিলেন।

তারামায়ের এই পরম পবিত্র মুণ্ডমালার স্পর্শের জন্য এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম মুণ্ডমালিনীতলা হয়।

এই মুণ্ডমালিনীতলা একদা তারাপীঠ মহাশ্মশানের সাথে সংযুক্ত ছিল।

সেই সময়ে তারাপীঠ মহাশ্মশান ছিল ভয়াবহ এবং বিশাল বিস্তৃত (দ্রষ্টব্য—"তারাপীঠ মহাশ্মশান" প্রথম খণ্ড)।

উত্তর-দক্ষিণে তিন ক্রোশ জুড়ে এই বিশাল মহাশ্মশান বিরাজমান ছিল। এই বিরাট মহাশ্মশানের মধ্যে তখন মুণ্ডমালিনীতলাও শ্মাশানরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কালক্রমে জনবসতির দরুণ এবং চাষবাসের দরুণ তারাপীঠ

মহাশ্মশানের আয়তন কমে যায়। তার ফলে তারাপীঠ মহাশ্মশানও মুণ্ডমালিনীতলা থেকে পৃথক হয়ে যায়।

তারাপীঠ ও মুণ্ডমালিনীতলার মাঝখানে শস্যক্ষেত্র ও তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট যাবার প্রাচীন গ্রাম্য পথ। এই পায়ে হাটা-পথ ও গরুর গাড়ীর পথ দিয়ে লোকে তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট যাতায়াত করেন।

এই প্রাচীন হাটাপথটি মুণ্ডমালিনীতলার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে সরলপুর হয়ে রামপুরহাট চলে গেছে। এই প্রাচীন হাটা পথ দিয়ে যুগ যুগ ধরে শত সহস্র সাধক তারাপীঠে যাতায়াত করেছেন। শ্রীবামও এই পথ দিয়ে রামপুরহাটে বহুবার যাতায়াত করেন এবং বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের সাথে কাশী যাবার সময় এই প্রাচীন পথ দিয়েই গিয়েছিলেন (পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে রামপুরহাট থেকে তারাপীঠ পিচের রাস্তা হয়। বামদেব রোড নামে তা সুপরিচিত হয়। ফলে এই প্রাচীন পথ ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। বিস্তৃত বিবরণ—চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। যাহোক, শ্রীবাম প্রায়ই এই শান্তমনোরম নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন মুণ্ডমালিনীতলায় যান।

এই নির্জন ধ্যান গম্ভীর সাধন ক্ষেত্রটি শ্রীবামের বিশেষ প্রিয়। মাঝে মাঝে মুণ্ডমালিনীতলায় গিয়ে তারামাকে পূজো দিয়ে আসেন।

কখনো দ্বারকানদীতে ভাসতে ভাসতে তারাপীঠ থেকে উদয়পুরে কালীস্থানে যাবার পথে মুণ্ডমালিনীতলা ঘুরে যান।

এই সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক বাংলা ১২৭৬ সালে গণপতি সিদ্ধাই নামে একজন সিদ্ধাই সাধু মুণ্ডমালিনীতলায় এসে বাস করতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁর সিদ্ধাইয়ের খ্যাতি আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সিদ্ধাইয়ের প্রভাবে আশে পাশের গ্রামের ভক্ত গৃহী লোকেরা তাঁকে দেবতার মত সম্মান করতে লাগলো।

গণপতির চেহারাও দেবতার মতই সুন্দর। তার ওপর রাজসিক ভাবে থাকেন। তার ফলে গণপতির চেহারা ও সিদ্ধাই শক্তির প্রভাবে তাঁর বেশ খ্যাতি লাভ হ'ল চারপাশে।

সিদ্ধাই যে সিদ্ধিলাভ নয় এবং সিদ্ধিলাভ থেকে এই সিদ্ধাই যে সাধককে সারিয়ে নিয়ে যায় ও অধঃপতিত করে, এই জ্ঞান গ্রামের সাধারণ ধর্মপ্রাণ নরনারীর নেই। তারা সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তিকেই সিদ্ধিলাভের মাপকাঠি ধরে নেয়।

ফলে যাঁর মধ্যে সিদ্ধাই শক্তি দেখে তাঁকেই সিদ্ধপুরুষ ভেবে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তার নিদর্শন স্বরূপ ফল ফুল মিষ্টি টাকা ভেট দেন তাঁকে। তাছাড়া সেবাযত্ন প্রভৃতি তো আছেই।

গণপতির সিদ্ধাইয়ের প্রবল প্রভাবে গ্রামবাসীরা তাঁকেও সেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা যত্ন করতে লাগলো।

একদিন গণপতি সিদ্ধাই সকাল বেলা মুণ্ডমালিনীতলা থেকে তারাপীঠে আসছেন শিষ্য ভক্ত পরিবৃত হয়ে।

সহসা একজন ভক্ত গণপতি সিদ্ধাইকে সশ্রদ্ধভাবে বললেন, "গোঁসাই ঠাকুর, আপনি বলে ক্ষেপাটাকে মদ খাওয়া ছাড়িই দেন। বামুনের ছেল্যা, মদ খেছে বটে।"

"ক্ষেপাটা" মানে পরমপুরুষ শ্রীবামকে উদ্দেশ্য করে একথা ভক্ত লোকটি গণপতিকে বললো।

একে শিবাবতার শ্রীবাম নিজেকে ধরা ছোঁয়া দেন না, এক গভীর রহস্যের আবরণে সর্বদা নিজেকে ঢেকে রাখেন। তার ওপর এসব সাধারণ গ্রামবাসীর শ্রীবামকে উপলব্ধি করবার মত জ্ঞানও নেই। ফলে শ্রীবাম এঁদের চোখে এখনও 'ক্ষ্যাপাটা' হয়ে আছেন।

শ্রীবামের ভাব ভাষা ভঙ্গি সবই এদের জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে। তাই শ্রীবাম এদের চোখে এক অস্বাভাবিক তথা 'ক্ষ্যাপা' যুবক মাত্র।

সুতরাং 'ক্ষেপাটা' কথার মধ্য দিয়ে এদের অজ্ঞতা ও অবহেলা ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।

এরা এখনও শ্রীবামের দিব্য অলৌকিক শক্তির পরিচয় পায়নি। তাই মহাসিদ্ধ সাধক ও তারাপীঠ ভৈরব শ্রীবামের মাহাত্ম্য এরা জানে না। শ্রীবামের জনপ্রিয়তা তাই এদের কাছে নেই। তাই গণপতি সিদ্ধাইয়ের জনপ্রিয়তা ও নাম ডাক এদের মধ্যে বিশেষভাবে বিরাজ করছে।

যাহোক, এমনি সব কথা শুনতে শুনতে গণপতি সিদ্ধাই তারাপীঠে শ্রীবামের কাছে শিষ্যভক্তসহ উপস্থিত হলেন। শ্রীবাম তখন 'কারণ' পান করছেন এবং হাতের পাত্রটি নিয়ে পুনরায় খাবার যোগাড় করছেন।

এমন সময় গণপতি তাঁর শিষ্য ভক্তদের সম্মুখে শ্রীবামকে ধমক দিয়ে বললেন, "এই ক্ষেপা মদ খাস্‌নি।"

গণপতি সিদ্ধাইয়ের এই কথা শুনে শ্রীবাম যেন স্তম্ভিত হলেন। তারপর যেন ভয় পেয়ে বললেন, "আর খাবনি বাবা।"

এই বলেই মদের পাত্রটি ফেলে দিলেন। মদের ছিঁটে গণপতি সিদ্ধাইয়ের কাপড়ে লাগলো।

গণপতি আর কোন কথা না বলে শিষ্য ভক্তের দল নিয়ে চলে গেলেন। `

সেদিন গভীর রাতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্রীবাম আপন মনে তারামায়ের ধ্যানে বিভোর হয়ে রয়েছেন। এই সময় গণপতি সিদ্ধাই একা এলেন শ্রীবামের কাছে।

শ্রীবামের পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন আর সকাতরে বলতে লাগলেন, "বাবা আমার অপরাধ হয়েছে, আমার সিদ্ধাই ফিরিয়ে দিন বাবা, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।"

করুণাময় শ্রীবাম গণপতির কথা শুনে বললেন, "তারা মা লিঁয়ে লিঁয়েছেন, তাঁর কাছে কাঁদুন বাবা। তুমি কেনে মরবে বাবা? যা গেছে ভাল হয়েছে বটে। ইবার তারা সাধন লাও বাবা, সব পাবে।"

শ্রীবামের একথা শুনে গণগতি কোন দিকে চলে গেল। পরদিন থেকে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেল না।

শ্রীবাম গণপতির সাময়িক সিদ্ধাইয়ের তুচ্ছ ক্ষমতা ও অহঙ্কারকে হরণ করে গণপতিকে মোহমুক্ত করে চিরন্তনী তারামায়ের চরণ কমলে নিবেদন করে দিলেন। এতে গণপতির সার্বিক মঙ্গল হ'ল।

শ্রীবামের এই মহানলীলা জীবের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠিত হ'ল। শ্রীবামের যোগবিভূতি প্রচারধর্মী নয়। শিবাবতার শ্রীবামের অসীম যোগবিভূতি তাঁর একটি সহজাত ব্যাপার।

শাস্ত্রে ঈশ্বরকে অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নির যত কাছে যাওয়া যায় ততই অগ্নির উত্তাপ পাওয়া যায়।

তেমনি ঈশ্বরকল্প সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কাছে গেলে ঈশ্বরের উত্তাপ পাওয়া যায়। যতই তাঁদের কাছে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই তাঁদের যোগবিভূতির স্বতস্ফূর্ত দিব্য উত্তাপ পাওয়া যায়।

তাই গণপতির ক্ষণিক সিদ্ধাই শ্রীবামের কাছে এসেই শ্রীবামের চিরন্তন যোগবিভূতির ঐশ্বরিক শক্তির দিব্য উত্তাপে পুড়ে গেল।

শ্রীবামের ব্রহ্মঅগ্নির উত্তাপে মোহমুক্ত হ'ল গণপতি। শ্রীবামের

করুণা হস্তের পরশে ও আশির্বাদে মোহমুক্ত গণপতি সাধনার শ্বাশত পথে চলে গেলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটি জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিদেহলীলার অন্যতম লীলা পরিকর ও মহানসিদ্ধ পুরুষ ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবামের জননীরূপে তারামা

শ্রীবামের জননী রাজকুমারী দেবী মাঝে মাঝে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র শ্রীবামকে দেখতে তারাপীঠে আসেন।

ছেলের জন্য প্রথম দিকে যে তীব্র উৎকন্ঠা ও দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা ছিল তা আর রাজকুমারী দেবীর এখন নেই।

তারামা বহুদিন পূর্বে রাজকুমারী দেবীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শান্ত ও নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলেন।

তারামা তাঁকে স্বপ্নে বলেছিলেন, "বামার জন্য ভাবিস না। বামা আমার কোলে।"

সেই থেকে রাজকুমারী দেবী শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তারামা'র কোলের ছেলে ও তারামা'র কোলেই আছে, তাই ভাবনার কিছু নেই।

এমন পবিত্র নির্ভরতা না থাকলে কি আর শ্রীবামের গর্ভধারিণী হ'ন।

শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্য দু'এক মাস অন্তর রাজকুমারী দেবী তারাপীঠে আসেন।

পূর্বে শ্রীবাম মাঝে মাঝে আটলাগ্রামে যেতেন, এখন আর প্রায় যান না।

তাই বৃদ্ধা জননী রাজকুমারী দেবী মাঝে মাঝে তারাপীঠে এসে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্নেহের দুলালকে দেখে যান দু'চোখ ভরে।

একদিন শ্রীবাম শিমুলতলায় তাঁর ঝোঁপড়া বা কুঁড়েঘরে (খড় ও বাঁশের খুটি দিয়ে তৈরী) বসে আছেন আপন মনে, এমন সময় শ্রীবাম দেখলেন তাঁর জননী রাজকুমারী দেবী আসছেন। বৃদ্ধা রাজকুমারী, তাঁর প্রাণের ছেলে বামকে সস্নেহে আদর করে কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর মাতৃভক্ত শ্রীবাম ও তাঁর জননী রাজকুমারী দেবী নানান সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগলেন।

রাজকুমারী দেবী তাঁর সংসারের ব্যাপার নিয়েও বড় ছেলে বামের সাথে কথা বার্তা বললেন। তারপর ছেলের জন্য যে সব খাবার তৈরী করে এনেছিলেন তা সস্নেহে শ্রীবামকে খাওয়ালেন।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা রাজকুমারী দেবী বামের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে তারাপীঠ শ্মশান থেকে আটলা গ্রামের পথে রওনা হয়ে গেলেন। মাতৃভক্ত শ্রীবাম কিছুদূর পর্যন্ত জননীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন প্রসন্ন মনে। বেশ কিছু দিন পর শ্রীবাম এবার তাঁর গর্ভধারিণীকে দর্শন করে খুবই আনন্দিত হয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীবাম দেখলেন জননী রাজকুমারী দেবী ফিরে আসছেন। একটু অবাক হলেন তিনি। জননীকে ফিরে আসতে দেখে। শ্রীবাম ভাবলেন, মা হয়তো কিছু বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই আবার ফিরে আসছেন। রাজকুমারী দেবী কাছে আসতেই শ্রীবাম ফিরে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছেলের কথা শুনে রাজকুমারী দেবী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। পাগল ছেলে বলে কি? এতদিন বাদে তিনি সবে এই মাত্র এলেন, আর পাগল ছেলে 'বামা' বলে কিনা "আবার ফিরে এলে যে? কিছু বলতে ভুলে গিয়েছিলে নাকি?"

পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত বৃদ্ধা জননীর সরল পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীবাম স্তম্ভিত হয়ে যান। মুহূর্তে বুঝতে পারলেন সব কিছু।

এতক্ষণ স্বয়ং জগত জননী তারামা-ই তাঁর এই গর্ভধারিনীর রূপ ধরে তাঁর সাথে খেলা করে গেলেন। তারামায়ের ভুবনমোহিনী মায়ার জন্য শ্রীবাম তা বুঝতে পারেন নি।

তাছাড়া এই ব্যাপারটি এমনই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে শ্রীবামের পক্ষেও চিন্তা করবার অবকাশ মেলেনি।

তারামা'র অপার করুণা ও স্নেহভালবাসা দেখে আনন্দে আবেশে ভক্তিতে শ্রীবাম একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর বিশাল নয়নদ্বয় বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

বৃদ্ধাজননী রজকুমারী দেবী তো হ'তবাক। তাঁর এই পাগল ছেলের কথা ও কান্নার কোন মানেই তিনি খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, এই জন্যই তাঁর এই পরমস্নেহের দুলালকে সবাই 'ক্ষ্যাপা' বলে। তখন শ্রান্ত ক্লান্ত বৃদ্ধা জননী রাজকুমারী দেবী নিজেই পাগল ছেলের মাথায় গায়ে তাঁর স্হেমাথা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

তারপর তাঁর আদরের ক্ষ্যাপা ছেলেকে নিজের হাতের তৈরী খাবার খাইয়ে দিলেন পরম স্নেহভরে। শ্রীবাম পরম আনন্দে শিশুর মত প্রাণ ভরে তা খেলেন। জননীর রূপ ধরে একটু পূর্বে স্বয়ং তারামা তাঁকে খাইয়ে গেছেন। এবার স্বয়ং গর্ভধারিনী জননীই তাঁকে খাইয়ে দিচ্ছেন। আনন্দে অশ্রুতে শ্রীবাম বিগলিত হলেন।

শ্রীবাম প্রত্যক্ষ করলেন যে জগত জননীরই আরেক রূপ হলেন গর্ভধারিনী।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীবামকে খাইয়ে ও সংসারের দু' একটি কথাবার্তা বলে তারামায়ের মন্দিরে প্রণাম করে বৃদ্ধা রাজকুমারী দেবী আটলায় ফিরে গেলেন।

উত্তরকালে শ্রীবাম তারামায়ের এই অপরিসীম স্নেহ-করুণা ও ভালবাসা ভরা লীলার কথা, আবেগে ও ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর অন্যতম ভক্ত ও সেবক কুণ্ডলা গ্রাম নিবাসী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে এই অমৃতময় কাহিনীটি বলেছিলেন। লেখক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী, প্রায় শত বছর বয়স্কা সিন্দুবালা দেবীর কাছ থেকে উপরোক্ত কাহিনীটি প্রাপ্ত হ'ন (১৩৭৭-এ), এজন্য লেখক সিন্দুবালা দেবী ও তাঁর পুত্রদ্বয় ও কন্যাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সিন্ধুবালা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধক প্রবর রমাপতি চট্টোপাধ্যায় ও তারামায়ের নিত্যসেবিকা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। শ্রীবাম স্নেহধন্য আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনী যথাস্থানে (তৃতীয় খণ্ডে) বর্ণিত হবে।

—o—

শ্রীবামের ডাবুকেশ্বর সংস্কার

ডাবুকের কৈলাসপতিকে শ্রীবাম 'রাজা গোঁসাই' বলে সম্বোধন করেন। কৈলাসপতি রাজসিক সাধু। তাঁর জীবন ও সাধন ও সিদ্ধি খুবই অসাধারণ (দ্রষ্টব্য প্রথমখণ্ড)। শতাধিক বছর বয়স্ক ও সিদ্ধ সাধক ডাবুকের কৈলাসপতি শ্রীবামকে ডাবুকে আসবার আমন্ত্রণ পাঠালেন। যে অনাদি লিঙ্গ শিব তিনি আবিস্কার করেছেন ডাবুকে, সেই ডাবুকেশ্বরের সংস্কার সাধন তিনি শ্রীবামকে দিয়ে সুসম্পন্ন করাতে ইচ্ছুক।

এই প্রাজ্ঞ সিদ্ধ সাধক জানেন যে শ্রীবাম একাধারে মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক।

তিনিই তারাপীঠের মহাকৌল। শিবস্বরূপত্ব লাভ করেছেন শ্রীবাম। তাই শতাধিক বছর বয়স হলেও এই প্রবীন ও প্রাজ্ঞ সাধক শ্রীবামের ন্যায় নবীন মহাসাধককে দিয়েই ডাবুকেশ্বর সংস্কারে ব্রতী হলেন।

শ্রীবাম এলেন। সাথে কয়েকজন ভক্তবৃন্দ। শ্রীবাম যথারীতি ডাবুকেশ্বর শিবের সংস্কার সাধন করে দিলেন।

ডাবুকের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে। শ্রীবাম কয়েকটি সারমেয় পরিবৃত হয়ে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া মাত্রই কর্মকর্তাগণ তাঁকে খেতে বসিয়ে দেন। এতে বিরক্ত হয়ে শ্রীবাম বলেন, "তোদের কত খাবার আছে নিয়ে আয়।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যত খাবার দেয়া হচ্ছে শ্রীবাম মূহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলেন। তখন কৈলাসপতির কাছে খবর গেল। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসে শ্রীবামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শ্রীবামকে সসম্মানে মন্দিরে নিয়ে যান।

ডাবুকের কৈলাসপতি খুবই আনন্দিত হলেন। শ্রীবামকে তিনি আরো কয়েকদিন ডাবুকে রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু তারাময় শ্রীবাম তারাপীঠে ফিরে যেতে ইচ্ছুক।

বাধ্য হয়ে ডাবুকের কৈলাসপতি যথারীতি শ্রীবামকে সম্মান জানিয়ে বিদায় দিলেন? উত্তরকালে ডাবুকে শ্রীবামের একাধিক অলৌকিক লীলা সংঘটিত হয়। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক শ্রীবামের ভ্রাতষ্পুত্রী অন্নপূর্ণাদেবীর নাতি শ্রীদেবকুমার রায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

তারাময় শ্রীবাম

শ্রীবামের দেহ মন প্রাণ আত্মা এক "তারা"-তে-ই বাঁধা। তাঁর দেহ তারা, মন তারা, প্রাণ তাঁরা, ভাব তারা, ভাবনা তারা, ধ্যান তারা, ধারণা তারা, জ্ঞান তারা, এক কথায় তাঁর সর্বস্ব হলেন তারামা।

এ শুধু অন্তরঙ্গেই নয়, বহিরঙ্গেও তিনি সম্পূর্ণ তারাময়। তিনি সর্বভূতে তারামাকে-ই সর্বক্ষণ দেখেন। এক তারা মায়ের মধ্যেই তিনি জীব জগত ব্রহ্ম সব দর্শন করেন। তাই তাঁর কাছে তারাই ব্রহ্ম, তারাই জীব, তারাই জগৎ। এই 'এক'-এ 'তিন' ও তিন-এ 'এক'-এর অদ্বৈত ভাব সাধনায় তিনি সদাই বিভোর।

তাই আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অনলে অনিলে বলনে চলনে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হাসিতে অশ্রুতে স্মরণে মননে জীবনে মরণে সর্ব ক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় তিনি এক তারামাকেই দেখেন। সর্বক্ষণ এক তারাভাবে বিভোর। এই ভাবমুখে থাকাকালীন কখনো তিনি বালক বৎ, কখনো শিলাচ বৎ, কখনো জড়বৎ আবার কখনো উন্মাদ বৎ, হয়ে বিরাজ করেন—যা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের 'সহজ অবস্থা' রূপে সুচিহ্নিত। কিন্তু এই চারটি ভাবাবস্থাতেও তিনি সর্বদা তারাময়। প্রতিটি ভাব অবস্থার মধ্যে সর্বভাবময়ী তারামাকেই তিনি সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করছেন।

বালকভাবে থাকাকালীন ছোট্ট বালকের ন্যায় মা মা করছেন, তারামা ছাড়া আর কিছু জানেন না।

যখন মহাশ্মশানে কুকুরের সাথে একত্রে নির্বিকার ভাবে খাদ্য গ্রহণ করছেন তখনও 'তারা' 'জয়তারা' বলছেন। আবার যখন জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে থাকেন তখনও অন্তর্মুখীন হয়ে ব্রহ্মময়ী তারার ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

আবার যখন উন্মাদের ন্যায় মহাশ্মশানে সব ভেদাভেদ বর্জিত হয়ে বিচরণ করেন তখনও 'জয় জয় তারা, শ্রীদুর্গা জয়তারা রবে চার দিক কাঁপিয়ে দেন।

তাই তারামা-ই যেন তাঁর কাছে বাবা-মা সব। সগুণা, নিগুণা, ত্রিগুণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা।

সর্বভ'বময়ী আবার সর্বভাবাতীতা। এক কথায় তারামা-ই শ্রীবামের সবকিছু।

সুতরাং সর্বক্ষণ একব্রহ্ম তারাভাবে তাঁকে থাকতে দেখে বহু ভারত বিখ্যাত সাধক সাধিকা তাঁকে শুধু একজন বিরাট সিদ্ধ-মহাপুরুষ বলে ক্ষান্ত হয়নি। উপরন্তু তাঁকে শিবাবতার স্বরূপ বলে সুচিহ্নিত করেছেন।

সাধারণ কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্বক্ষণ এক ব্রহ্মভাবে থাকতে পারেন না।

তাঁকে অন্য ভাবেও থাকতে হয়; শিষ্য ভক্ত আশ্রম মঠ মন্দির প্রভৃতির ব্যাপারে।

তাই একমাত্র শিবাবতার ছাড়া অন্য কোন উচ্চ কোটির মহা-সাধকের পক্ষেও এই একব্রহ্মভাবে সর্বক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীবাম তাঁরও বহু ঊর্দ্ধে।

তাঁকে শিবাবতার বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে তিনি তারামার অভিন্ন স্বরূপ। মূলত তারামা-ই শ্রীবাম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন জগতে তারা নাম, তারাভাব ও তারা মাহাত্ম্য প্রচার করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মূলত কালীই, তেমনি শ্রীবামও মূলত বামা-ই অর্থাৎ তারা-ই।

তাই শ্রীবাম সম্পূর্ণরূপে তারাময়।

এমন কি তাঁর চলনে বলনেও সেই নিদর্শন সদা প্রাণবন্ত।

শ্রীবাম চলতে গিয়ে দু'হাতের প্রথম পর্ব দু'টি তুলে পা বাড়িয়ে বলেন, 'কালীতারা' অর্থাৎ যখন ডান পা বাড়ান তখন বলেন 'কালী' আর যখন বাম পা বাড়ান, তখন বলেন 'তারা'।

আবার কখনো বলেন, "বামা বামে দক্ষিণা দক্ষিণে।"

শ্রীবামের এই উক্তির মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে। বহিরঙ্গে এর অর্থ হ'ল, বামা তথা তারামা বামপদ প্রসারিত করে আছেন এবং কালী দক্ষিণ পদ শিবের বুকে প্রসারিত করে আছেন।

বামা উত্তরমুখী অর্থাৎ কৈলাস মুখী আর কালী দক্ষিণ মুখী। কিন্তু অন্তরঙ্গে এর অর্থ আরো গভীর।

বামা তথা তারামা বামে আছেন অর্থাৎ তাঁর বামাগতি। তার অর্থ প্রবৃত্তির বিপরীতে নিবৃত্তি ময়ী হলেন তারামা।

তাই তিনি হলেন "বিপরীত রতাতুরা" অর্থাৎ রতির বিপরীতে তিনি বিরাজ করেন।

তাই কামের বিপরীতে অর্থাৎ নিস্কাম না হতে পারলে তারা বিদ্যা করায়ত্ব করা যায় না।

বীরভাবে যে সাধক নিস্কাম হয়ে কাম তথা প্রবৃত্তির বিপরীতে অবস্থান করে সাধনা করবে, সেই কঠোর বীর সাধকই তারাদেবীর কৃপা লাভ করবে। তাই শ্রীবামের বামাগতি অর্থাৎ তিনি বীরভাবে অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে তারাবিদ্যার অধিকারী। মূলত শ্রীবামের 'বামা'-ই একমাত্র গতি। এর সুক্ষ্ম ইঙ্গিত তিনি দেন উপরোক্ত কথার মাধ্যমে।

কিন্তু শ্রীবামের এই সুক্ষ্ম ইঙ্গিত লোকে বুঝতে পারেন না। তবে তাঁরা বুঝতে পারেন যে বামের যথার্থ বামাগতি অর্থাৎ বামের এক মাত্র গতি তারামা-ই।

তারামা ছাড়া শ্রীবাম আর কিছু জানেন না। তাই শ্রীবামের ভাবে অভাবে রাগে অনুরাগে আহার বিহার শয়নে স্বপনে জাগরণে চিন্তায় ধ্যানে জ্ঞানে সর্বদা-ই তারামা বিরাজ করেন।

'বামা বামে দক্ষিণা দক্ষিণে'----এই কথার আরো গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

পরমব্রহ্ম অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হলেন। তিনি সগুন ব্রহ্ম হলেন। সৃষ্টির মানসে প্রকৃতি পুরুষ হলেন। তাঁর বাম অঙ্গ হলেন প্রকৃতি আর ডান অঙ্গ হলেন পুরুষ। এই প্রকৃতি পুরুষ থেকে জীব জগত সৃষ্টি হ'ল। এই পরমপুরুষও পরমা প্রকৃতি হলেন নারায়ণ নারায়ণী।

তাই 'বামা বামে' মানে পরমাপ্রকৃতি ব্রহ্মময়ী তথা মহাশক্তি তারাদেবী।

আর 'দক্ষিণা দক্ষিণে' মানে পরম পুরুষ মহাকালী তথা মহাশিব। পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ও শিবাবতার শ্রীবাম এই শিবশক্তিতত্ত্বের ইঙ্গিত-ই দিলেন এই গভীর উক্তির মধ্য দিয়ে।

শুধু তাই নয়, স্থূলদেহে দ্বিসপ্ত চক্র এবং সূক্ষ্ম দেহে আরো সপ্ত চক্র এই ত্রিসপ্তচক্র ভেদ করে তিনি যে শিবস্বরূপত্ব লাভ করেছেন ও তাঁর মধ্যে যে শিবশক্তির মহামিলন ঘটেছে এবং 'সোহংতত্ত্বমসি'-র এক ও অদ্বৈতভাব তাঁর অন্তরঙ্গে বিরাজিত, তার নিগূঢ় ইঙ্গিতও তিনি উপরোক্ত উক্তির মধ্যে দিয়েছেন। তারাময় শ্রীবামের যে ক্ষিতি থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পূর্ণ করায়ত্ব এবং তিনি মহাকৌল ও কুলনাথের নাথ, তাঁর উপরোক্ত স্মরণীয় উক্তির মধ্যে সেই আভাসও মেলে।

তন্ত্রনির্দিষ্ট পথে যাঁরা অর্ধনারীশ্বর সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা শ্রীবামের এই 'বামা বামে দক্ষিণা দক্ষিণে' কথার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু আর বাদবাকি সবাই তা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই তাঁদের কাছে শ্রীবাম শুধু 'ক্ষ্যাপা' মাত্র। তাই শ্রীবাম তথা বামাক্ষ্যাপার কাছাকাছি থেকেও অনেক লোক তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেনি। অনেক উচ্চস্তরের সাধকও শ্রীবামকে প্রথমে চিনতে পারেন নি।

তাঁদের মধ্যে ঈশান ভট্টাচার্য্য, ডাবুকের কৈলাসপতি, মোক্ষদানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক ও বৈদান্তিকগণও রয়েছেন।

তাঁদের চোখে শ্রীবাম একজন তারামার ভক্ত ও ক্ষ্যাপা ছেলে মাত্র। তাই সেই ভাব অনুসারে তারাময় শ্রীবামকে তাঁরা তাঁদের খেয়াল খুশি মত কখনো আদর কখনো অনাদর অবহেলা কখনো অপমান করতেন। অনেক পরে তাঁরা শ্রীবামের স্বরূপ আংশিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারাপীঠের পাণ্ডাবর্গ ও সাধারণ লোকদের তো কথাই নেই, এমন কি শ্রীবামের প্রায় সমসাময়িক সাধকবৃন্দের মধ্যেও অনেকে এই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ও শিবাবতার শ্রীবামকে চিনতে বা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

তাঁদের মধ্যে পঞ্চানন মিশ্র, ললিত গোঁসাই, কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, চক্রবর্তী বাবা প্রভৃতি অন্যতম। আসলে সতত ভাব মুখে থাকা ও ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকা তারাময় শ্রীবামকে উপলব্ধি করবার মত শক্তিধর মহাসাধক সেই সময়ে কেউ যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু তারামায়ের বিচিত্র লীলায় ও শ্রীবামের গভীর অন্তর্মুখীনতার ফলে এক গভীর রহস্যের আবরণ সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীবামের চারপাশে। সেই আবরণ উপরোক্ত কেউ ভেদ করতে পারেন নি।

তাই মহাকৌল মহাযোগী ও নিরালম্ব অবধূত এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীবামের কথার শব্দার্থ ও মর্মার্থ তাঁরা কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। যেমন তাঁরা পারেন নি তারাময় শ্রীবামের আরেকটি গভীর ও নিগূঢ় তাৎপর্যময় উক্তি, "তারামা আমার আশ্চর্য ভৈরবী" —এই উক্তি উপলব্ধি করতে। এর অর্থ তারামা শ্রীবামের দিব্য ও পবিত্র ভাগবতী শক্তি। শ্রীবাম 'আশ্চর্য' কথাটি দিব্য ও পরম পবিত্র অর্থে উচ্চারণ করতেন। 'ভৈরবী' কথার অর্থ হ'ল শক্তি। তাই বহিরঙ্গে তাঁর সাধনার জন্য তথাকথিত ভৈরবী নারীর প্রয়োজন ছিল না।

পরম দিব্য ও পবিত্র ভাগবতী শক্তি স্বরূপিনী স্বয়ং তারামা শ্রীবামের সাধনশক্তি হাতে ধরে করিয়ে দিয়েছেন।

তাই তারাময় শ্রীবামের মন্ত্র গুরু ইষ্ট একাধারে স্বয়ং তারামা।

সুতরাং বহিরঙ্গে তিনি ও তারামা----এই মাতৃভাবের সাধনায় দ্বৈত রূপ থাকলেও, অন্তরঙ্গে শ্রীবাম অদ্বৈত। সেখানে ব্রহ্মময়ী তারা ও তারাময় শ্রীবাম এক ও অভেদ।

তাই একাধারে তিনি সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম সিদ্ধ। সুতরাং তারাময় তথা ব্রহ্মময় ও সদা মুক্তপুরুষ শ্রীবাম ঈশ্বর পাননি, তিনি ঈশ্বরই হয়েছেন। তারাময় শ্রীবাম 'তারা'--ই হয়েছেন।

ঢেউ যেমন সাগরের চিন্তা করতে করতে সে সাগরই হয়ে যায় সাগরে মিশে গিয়ে—তেমনি ব্রহ্মময়ী তারাসাগরে মিশে গিয়ে শ্রীবাম তারা-ই হয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আরো গভীরে প্রবেশ করে বলা যায় স্বয়ং তারা-ই শ্রীবাম হয়ে এসেছেন তাঁর-ই লীলা করতে। তাঁরই লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করতে। তাঁরই লীলা আস্বাদন করতে।

—o—

শ্রীবামদর্শনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনুমানিক বাংলা ১২৭৯ সনে (ইংরেজী—১৮৭২ খৃষ্ঠাব্দ) এক প্রসন্ন প্রভাতে শ্রীবাম দর্শনে এলেন জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চান্ন বছরের এই প্রবীন ধর্মনেতা বাংলার ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে এক সর্বজনবিদিত মহান নেতা রূপে সুপরিচিত।

একাধারে জ্ঞান ও কর্মের মহান সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছে। গৃহী হয়েও তাই তিনি মহর্ষি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে সাক্ষাত করে বলেছিলেন, "কলির জনক।"

সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন তারাপীঠে শ্রীবামের কাছে। মহর্ষি যাচ্ছিলেন বোলপুর থেকে রায়পুরে—লর্ড এস পি সিংহের আমন্ত্রণে।

সহসা শুনতে পান, তারাপীঠে একজন শক্তিধর সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। নাম বামাক্ষ্যাপা।

তাই শুনে তাঁর অন্তরে জাগলো এই মাতৃসাধককে দেখবার বাসনা। চলে এলেন বহু কষ্ট করে মহাপীঠ তারাপীঠে।

মহাশ্মশানে শ্রীবাম আপনভাবে বিভোর হয়ে বসে আছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বছর কয়েক পূর্বে তাঁর নিজ গৃহেই দর্শন করেছিলেন আরেক মাতৃসাধক তথা মহাতান্ত্রিক ও মহা-বৈষ্ণব এবং মহান ব্রহ্মবাদ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। এবার দেখলেন মহাপীঠ তারাপীঠের ঘোর মহাশ্মশানে যুগগুরু বামাক্ষ্যাপাকে।

শ্রীবামের বিশাল শ্যামকান্তি রূপ ও আরক্তিম নয়ন এবং দিব্যভাব দর্শন করে মুগ্ধ হলেন মহর্ষি। উভয় উভয়কে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শ্রীবাম জিজ্ঞেস করলেন মহর্ষিকে তাঁর আগমনের কারণ।

মহর্ষি শ্রীবামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন যে, কোন পার্থিব কারণে তিনি আসেন নি। শুধু সাধু দর্শনের জন্যই তাঁর আগমন।

শ্রীবাম মহর্ষির এই নিস্কাম ভাব ও নির্লিপ্ততা দেখে খুশি হলেন।

তিনি মহর্ষিকে বললেন, "তুমি তো রায়পুরে যাবে সিংহ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। যাবার পথে দেখবে এক বিশাল ডাঙ্গা। তার মাঝে দাড়িয়ে আছে এক বিরাট ছাতিম বৃক্ষ। তার নিচে বসে ধ্যান করবে। আত্ম-দর্শন ও জ্যোতি-দর্শন করে শান্তি পাবে। ওখানেই তোমার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবে। শান্তি লাভ করবে।"

মহর্ষি চমৎকৃত হলেন শ্রীবামের কথা শুনে।

কিছুক্ষণ পর শ্রীবামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারামা'র মন্দির দর্শন করে মহর্ষি ফিরে গেলেন বোলপুর। পরে রায়পুর যেতে যেতে পথে দেখতে পেলেন শ্রীবাম কথিত সেই বিশাল ছাতিম বৃক্ষটিকে। শ্রীবামের নির্দেশমত তিনি সেই বৃক্ষমূলে ধ্যান মগ্ন হলেন। দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকবার পর সহসা লাভ করলেন দিব্য আনন্দ। জ্যোতি দর্শনও হ'ল তারপর। মহর্ষি শ্রীবামের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করে খুবই আনন্দিত হলেন।

তিনি স্থির করলেন শ্রীবামের উপদেশ মত এই পবিত্র নির্জন প্রান্তরে এই ছাতিম বৃক্ষমূলেই তিনি স্থাপন করবেন আশ্রম। কিছু দিনের মধ্যে তিনি এখানে আশ্রম স্থাপন করলেন (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে)। এই ব্রহ্মচর্য আশ্রম-ই পরবর্তীকালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনরূপে জগৎবিখ্যাত হয়।

শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য ধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বাংলা ১২২৪ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই পালন করেন। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই তাঁকে ভোগ বিমুখ করে তোলে। বাংলা ১২৫০ সনের ৭ই পৌষ তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে। তাঁর দীক্ষা গুরু হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

দেবেন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও তেজস্বী ছিলেন। তাঁর পিতৃবন্ধু রাজা রামমোহন রায় এজন্য তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

বাংলা ১২৫৩ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিরতরে হারাণ। বিশাল ঋণ রেখে দ্বারকানাথ

পরলোক গমন করেন। পিতার বিশাল ঋণ তিনি আইনত শোধ করতে বাধ্য না থাকলেও স্বেচ্ছায় তিনি সকল পিতৃঋণ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে, ধীরে ধীরে পিতার সকল ঋণ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে শোধ করে দেন দীর্ঘকাল ধরে। চরম বিলাসী পিতার পুত্র হয়েও তিনি ছিলেন নিস্কাম ও নির্লিপ্ত পুরুষ। তাঁর এই অনাসক্তির জন্য ও সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি "মহর্ষি" উপাধী প্রাপ্ত হ'ন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতারূপে তিনি সমগ্র দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত হ'ন।

তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কেশব সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতিগণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর কালে অবশ্য এই ব্রাহ্ম সমাজ তিন ধারায় বিভক্ত হয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নামে জনজীবনে চিহ্নিত হয়।

১২৭৯ সালে ৫৫ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগার বছর মাত্র। বাংলা ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ ৮৮ বছর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মে লীন হ'ন।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক সত্যপ্রকাশ চক্রবর্তীর কাছে। সংযোগকারী রূপে সংগীত শিল্পী কৃষ্ণগোপাল ঘোষের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম-কৃপাধন্য মহাত্মা শাওন ফকির

আনুমানিক বাংলা ১২৮০ সালে (ইং ১৮৭৩ খৃঃ) একটি পঁচিশ বছরের যুবক তারাপীঠে এল শ্রীবামের কাছে। অধ্যাত্মপথের পথিক এই মুমুক্ষুভক্ত চাইলো দিব্যজ্ঞানের পথ। ঈশ্বর লাভই তার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীবাম দেখামাত্র চিনতে পারলেন তাঁর চিহ্নিত সন্তানকে। তিনি যুবককে থাকতে বললেন তাঁর কাছে।

যুবকের নাম শাওন মিঞা। শাওন মিঞার জীবন কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। শাওন মিঞার জন্ম ১২৫৫ সালে (ইং ১৮৪৮ খৃঃ) পূর্ব-বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলায়, এক জোলা পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তার মন ঈশ্বরমুখী। তবু জাগতিক জীবনে অন্নের জন্য কর্মবশে জোলার কাজ করতে থাকে। কখনো নৌকার মাঝির কাজও করতে হয়। কিন্তু দেহ যে কাজ-ই করুক মন কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সর্বদা ব্যাকুল। চোখের জলে বালক শাওনের দিন কাটে। ঈশ্বরের পথের সন্ধান করে বেড়ায়। কোন পথে যাবে কি ভাবে ডাকবে কিছুই সে জানে না। এমনিভাবে শাওনের দিন কাটতে থাকে।

ক্রমে শাওন যুবকে পরিণত হ'ল। শাওন চলে এল পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার বিষ্টুপুর গ্রামে জনৈক ভক্তপ্রাণ মুসলমান শাওনকে তাঁর মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে ঘর জমাই করে কাছে রাখলেন। এখানে শাওন মাঝির কাজ করতে লাগলো। তারই মধ্যে, মাঝে মাঝে শাওন কোলকাতার শিয়ালদহের নিকট মৌলালীর মসজিদে যাতায়াত শুরু করলো। শাওনের শ্বশুর শাওনের ভক্তিভাব দেখে মৌলালীর মসজিদের সাথে যোগাযোগ করে দেন। শাওন এখানে এলে নিয়মিত নমাজ পড়ে ও ধর্মকথা শোনে। এই সময় সহসা কলেরায় শাওনের স্ত্রী, শ্বশুর ও অনেক আত্মীয়স্বজন মারা গেলেন। গভীর ব্যথা ও বেদনায় যুবক শাওন মূক হয়ে যায়। পার্থিব জীবনের অসারতা ও অনিত্যতা তাকে সংসার বিমুখ করে তোলে। নিঃসঙ্গ শাওন সংসার জীবনের এই অনিত্যতা উপলব্ধি করে আরো গভীর ভাবে ধর্মজগতে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হ'ল।

মানসিক শান্তি ও স্থির লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সৎগুরুর সন্ধানে ভীষণ

ব্যাকুল হ'ল শাওন। তার তীব্র ব্যাকুলতা ও আর্তি মৌলালীর মসজিদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একদিন এক বিশিষ্ট ফকীর (মূলত তিনি সুফী সম্প্রদায়ের) শাওনকে ডেকে বললেন, "তোমার গুরু বীরভূমের তারাপীঠের মহাসিদ্ধপুরুষ বামাক্ষ্যাপা। তুমি সেখানে যাও। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।"

শাওনের মধ্যে কিন্তু দ্বিধা এল। সে সেই সিদ্ধপুরুষ ফকির-সাহেবকে বললো, "বামাক্ষ্যাপা তো জাতিতে হিন্দু। তিনি কি করে আমাকে পথ দেখাবেন ? তাছাড়া তিনি কি আমার অধ্যাত্ম জগতের পথ প্রদর্শক হ'তে রাজী হবেন ?"

ফকীর সাহেব মৃদু হেসে বললেন, "বামাক্ষ্যাপার কাছে কোন জাতি ভেদ নেই। সব ধর্মের সব পথের সাধক ও ভক্ত তাঁর কাছে যাতায়াত করে সমান কৃপালাভ করেন। তাই জাতধর্ম বলে তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁর কাছে জগতে একটি-ই মাত্র জাতি-সে হ'ল মানুষ জাতি। সুতরাং যে মানুষ সাধন পথের পথিক, যে ভক্ত, যে পরমাত্মার সন্ধান চায়, সেই তাঁর প্রিয়।"

সুফী ভাবধারার এই দিব্য ভাবের পথিক, সিদ্ধসাধক ফকীর সাহেবের কথা শুনে শাওন শান্তি পেল। ফকীর সাহেবের আশিস নিয়ে শাওন চলে এল মহাপীঠ তারাপীঠে। তারপরে শ্রীবামের কাছে চাইলো আধ্যাত্মিক কৃপা ও দীক্ষা।

যা হোক, কৃপাসিন্ধু শ্রীবাম কিছুদিন শাওনকে কাছে রেখে ধীরে ধীরে গড়তে লাগলেন অধ্যাত্ম পথের উপযুক্ত করে। যথাসময়ে তাকে দিলেন দুর্ল্লভ তারাবিদ্যা। শাওনের পবিত্র আধারে ঢেলে দিলেন জ্ঞান ও কর্মের দিব্য শক্তি। তার সাথে শ্রীবাম দিলেন অমৃতের দিব্য সন্ধান। তারামা'র আনন্দ অমৃত রূপ দর্শন করিয়ে শাওনকে করলেন ধন্য।

তারা অন্ত প্রাণ হ'ল মাতৃসাধক শাওন ফকীর। শাওনের ঘটলো সার্বিক নবজন্ম।

ভেতরে বাইরে সে অবিরাম আনন্দের মধ্যে নিমগ্ন হ'ল।

শাওন ফকীর সুকন্ঠের অধিকারী। তারানামের মধুর সুরের ধারায় শাওন সর্বদা আপ্লুত হ'ল।

তাঁর মধুর কন্ঠের গান শুনে তারাপীঠের সাধু সমাজ ও ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হলেন।

সর্বদা তারানাম গানে মাতোয়ারা হলেন সাধক শাওন।

প্রাণপ্রিয় গুরু শ্রীবামের নির্দেশে শাওন সানন্দে পরিধান করলেন আলখাল্লার আকারে রক্তবস্ত্র আর গলায় ধারণ করলেন শ্রীগুরু প্রদত্ত রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে শোভা পেল 'একতারা' যন্ত্র। সর্বমত ও পথের সমন্বয় স্বরূপ বীরভূমের বাউল ফকীরের চিরন্তন উদার রূপ যেন পরিস্ফুট হ'ল শাওন ফকীরের মাঝে। সব ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে এক নিত্য শাশ্বত সত্যের চিরন্তন আলোক বর্তিকা তাঁর সামনে মেলে ধরলেন নিত্য গুরু শ্রীবাম। বীরাচারী ফকীরের বেশে পরিব্রাজনা শুরু করলেন শ্রীবামের দিব্য পরশ ধন্য সিদ্ধ সাধক শাওন ফকীর। শাওন এখন একাধারে সিদ্ধসাধক ও শিল্পী। মহাপীঠ তারাপীঠের শিমুল-তলায় শ্রীগুরু বামের কৃপায় সে লাভ করেছে তাঁর বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট বস্তু। শুধু তাই নয়, তাঁর ধ্যান ধারণার বাইরে এমন অকল্পনীয় আনন্দের বন্যা তাঁর মধ্যে সর্বদা শ্রীগুরু শ্রীবাম সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, শাওন এখন সকল চাওয়া পাওয়ার ঊর্দ্ধে বিরাজ করছেন মহানন্দে। সর্বদা ঘুরে ঘুরে তারানাম গান বিতরণ করছেন ঘরে ঘরে।

ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী তথা সর্বভাবময়ী তারামা ও ইষ্টস্বরূপ পরমগুরু শ্রীবামের নাম গানে শাওন ফকীর এখন সর্বদা বিভোর।

শাওনের তেজদৃপ্ত অথচ মধুর মূর্তি ও অপূর্ব সুমিষ্ট কন্ঠস্বর সর্বস্তরের নরনারীকে করছে মুগ্ধ। এমন কি স্বয়ং শ্রীবামও তাঁর প্রিয়শিষ্য শাওনের গান শুনতে খুব ভালবাসেন। শাওনের রচিত মধুর তারানামের সংগীত শুনে শ্রীবামও হ'ন ভাবাবিষ্ট। তাঁর বিশাল নয়ন-দ্বয় থেকে ঝরে পড়ে অফুরন্ত আনন্দাশ্রু।

কিছু কাল পর শ্রীগুরু বামের নির্দেশে শাওন ফকীর ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। এই সময় সারা ভারতবর্ষ তিনি পরিব্রাজনা করেন।

হাতে একতারা যন্ত্র আর কন্ঠে তারামায়ের মধুর নাম এবং অন্তরে শ্রীগুরু বামপ্রদত্ত মহামন্ত্র নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তিনি ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে শ্রীগুরু বামের ইচ্ছায় শাওন ফকীর তারাপীঠে ফিরে এলেন।

ইষ্টদেবী তারামা ও ইষ্টস্বরূপ পরম প্রেমময় গুরু শ্রীবামের কোলে কিছুকাল কাটিয়ে আবার শাওন ফকীর পরিব্রাজনায় বের হ'ন।

মাঝে মাঝে ২৪ পরগণার বিষ্টুপুর গ্রামের সেই শ্বশুরগৃহের ছোট আঁটচালায় এসে থাকেন। আপন সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকেন।

শ্রীবাম যতদিন স্থূল দেহে বিরাজ করেন ততদিন তিনি মাঝে মাঝে তারাপীঠে যাতায়াত করেন। সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব সকলও গুরুকৃপায় লাভ করেন। সেই অনুসারে সাধনার আরো গভীরে নিমগ্ন হ'ন। সুদীর্ঘকাল পরে হ'ন আপ্তকাম।

শ্রীবাম স্থূল দেহে অপ্রকট হলে তিনি সেই সংবাদ জানতে পেরে তারাপীঠে তার পরদিনই বিকেলে চলে আসেন। তখন শ্রীবামের সমাধি দেবার মহালগ্ন উপস্থিত।

সবার সাথে প্রিয়শিষ্য শাওন ফকীরও হাত মেলান। তারপরও একাধিকবাব মাঝে মাঝে ইষ্টক্ষেত্রে তারাপীঠে এসে থাকেন। প্রিয়তম শ্রীগুরুর ধ্যানে নিমগ্ন হ'ন।

যতদূর সম্ভব জানা যায় যে, সিদ্ধসাধক শাওন ফকীর-ই হলেন তারাপীঠের সদা জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সর্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য।

আত্মপ্রচার বিমুখ শাওন ফকীর অসাধারণ গুপ্ত সাধকরূপে সুচিহ্নিত। নিজেকে তিনি একান্তভাবে নিজ নিগূঢ় সত্ত্বায় সর্বদা আবৃত করে রাখতেন।

জীবনের শেষ ভাগে ২৪ পরগণার বিষ্টুপুর গ্রামের সেই কুঁড়ে ঘরে মাঝে মাঝে এসে বাস করতে লাগলেন। এই কুড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে তিনি তারা নাম জপ ধ্যানে ও নামগানে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন।

মাঝে মাঝে আবার বিষ্টুপুর ছেড়ে পুরী চলে নান। পুরী থেকে মাইল ৭।৮ দূরে রেতনা গ্রামে শাওন ফকীর দরগা তৈরী করেন। তাঁর কিছু মুসলমান ভক্ত সেখানে অবস্থান করেন।

পুরীর যবন হরিদাসের সাধন মন্দিরে অর্থাৎ সিদ্ধ বকুলের পাশে প্রায়ই এসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন জ্ঞান ও ভক্তি সিদ্ধ প্রবীন মহাত্মা শাওন ফকীর।

কখনো মধুর স্বরে গান করে শোনান যবন হরিদাসের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে।

শাওন ফকীরের প্রতিষ্ঠিত দরগা, "শাওন পীর দরগা" নামে বর্তমানে সুপরিচিত।

শাওন ফকীরকে একদা তাঁর গুরু শ্রীবাম সেই সুবিখ্যাত ও মহা পবিত্র মহাশ্বেত শিমুল বৃক্ষের একটি পবিত্র ফুল দিয়েছিলেন।

সেই আশ্চর্য্য দিব্য শিমুল ফুলটি অবিকৃত অবস্থায় সুদীর্ঘকাল শাওন ফকীরের কাছে থাকে। একটি কাঁচের আধারে মহাত্মা শাওন ফকীর তা সংরক্ষিত করে রাখেন। পুরীর শাওনপীর দরগায় শাওন ফকীরের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

বাংলা ১৩৮০ সালে আনুমানিক একশো পঁচিশ বছর বয়সে ২৪ পরগণার সেই বহু স্মৃতি বিজড়িত বিষ্টুপুর গ্রামেই মহাত্মা শাওন ফকীর মহাসমাধি লাভ করেন।

ত্রিলোক জননী তারামায়ের এক অসাধারণ গুপ্তযোগী ও সাধক সন্তান এবং পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রথম মন্ত্রশিষ্য ও জ্ঞান ও ভক্তি সিদ্ধ মহাত্মা শাওন ফকীর নিত্য অমৃতময় তারামণ্ডলে প্রবিষ্ট হলেন। মিলিত হলেন ইষ্টদেবী তারামা ও পরম গুরু শ্রীবামের সাথে অমৃত আনন্দে।

শোনা যায়, আজো পুরীতে শাওন পীরের দরগায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের ভক্তরা এসে যে যা মানত করেন, তাই পূর্ণ করেন বিদেহী শাওন ফকীর। তাঁর দিব্য পবিত্রদর্শন অনেকে আজও লাভ করে ধন্য হ'ন। শাওন ফকীরের বিদেহ লীলা তাই অব্যহত ও অম্লান। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক ভবানীপুর নিবাসী সাধক প্রবর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সান্যালের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবামের তারা মূর্তিতে পুনরায় মূত্রত্যাগ

তারাপীঠের অদূরে খরুণ গ্রাম। হঠাৎ খরুণ গ্রামে ভীষণ কলেরা শুরু হ'ল। অনেক লোক মরতে লাগলো কলেরায়। আতঙ্কিত হয়ে গ্রামের লোকেরা তারামাকে পূজো দেবার জন্য পূজোর উপাচার সহ তারাপীঠে এলেন। শ্রীবাম শিমূল তলায় বসে আছেন। তারামা'র ভাবে বিভোর হয়ে আছেন।

তাঁরা শিমুলতলায় শ্রীবামের কাছে এসে বললেন, "বাবা, আমাদের গাঁয়ে মহামারীতে লোক মরছে। আপনি তারামা'র পূজোটা দেন বটে।"

করুণাময় শ্রীবাম গ্রামের এই দুঃখী লোকদের বেদনা উপলব্ধি করলেন।

তিনি তারামায়ের মন্দিরে এলেন। সাথে পূজোর উপাচার সহ খরুণ গ্রামের লোকজনও এলেন।

শ্রীবাম পূজোর উপাচার সব তারামায়ের শিলামূর্তির সামনে রেখে তারামা'র সামনে দাড়িয়ে বললেন, "মা চরণের লোক ফট্ হলছে মা, তার লেগে খরুন বাবারা সাদা সাদা ফুল, হলদে হলদে কলকে ফুল লিয়ে আলছে। তু ল্যা মা। অদের ঠাণ্ডা করে দ্যা মা।" বলতে বলতে মূত্রত্যাগ করে ফেললেন।

যাঁরা পূজো দিতে এসেছিলেন তাঁরা ভয় পেলেন এই দৃশ্য দেখে। তাঁদের একজন বললেন, "কি করলেন বাবা?"

উত্তরে শ্রীবাম বললেন, "তারামা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন বাবা।"

উপস্থিত দর্শক ও ভক্তবৃন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বামাক্ষ্যাপার এই অসম সাহস দেখে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন না যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপা একমাত্র ব্রহ্মময়ী তারামা ছাড়া বিশ্বজগতে আর কিছু দেখেন না। তাঁর কাছে তারামা-ই একাধারে ব্রহ্ম জগত জীব সব।

তাই শ্রীবাম সম্পূর্ণ ভাবে দ্বিধাহীন, ভেদহীন, শুচি অশুচির অতীত। সুতরাং শ্রীবাম সম্পূর্ণভাবে অভেদভাবে বিভোর। সর্বপাশ, মক্ত, পরম আনন্দময় পরমপুরুষ তিনি।

যাহোক, শ্রীবাম উপরোক্ত কাজ করে তারামন্দির থেকে নেমে আবার মহাশ্মশানে শিমুলতলায় চলে গেলেন। খরুণের গ্রামবাসীগণ শঙ্কিত হয়ে দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তে গ্রামে চলে গেলেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সেদিন থেকে খরুণে কলেরা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামবাসীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

শ্রীবামের এই দিব্য প্রার্থনা ও মূত্রত্যাগ যে তারামা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছেন তা গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারলেন।

যিনি ত্রিলোকজননী তারামাকে নিজ মূত্রদ্বারা "ঠাণ্ডা" করেন, তিনি যে তারামায়ের অভেদস্বরূপ তা কিন্তু খরুনবাসীরা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অশেষ কৃপাধন্য ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূতের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে মহাযোগী বহেরা বাবা

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ পরমপ্রাজ্ঞ মহান কর্মযোগী আনুমানিক বাংলা ১২৮১ সালে মহাপীঠ তারাপীঠে এলেন।

ব্রহ্মময়ী তারামা'কে প্রণাম করে তিনি এলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করতে। উভয়ে উভয়ের দর্শনে আত্মানন্দে বিভোর হলেন। বহেরা বাবা বামাক্ষ্যাপা বাবাকে কিছু মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার আনন্দে ভোজন করালেন। শ্রীবাম জানেন, বহেরা বাবাও পদব্রজে রামপুরহাট থেকে তারাপীঠে এসেছেন। তাই

তিনিও তাঁর সেবাযত্নের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটি দিন ও রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল নানান সৎপ্রসঙ্গে তা কেউ বুঝতে করতে পারলেন না।

একদিন বহেরা বাবা স্বয়ং পায়েস রান্না করে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে ভোজন করিয়ে অসীম তৃপ্তিলাভ করলেন।

কয়েকটি দিন শ্রীশ্রীব্যমাক্ষ্যাপার সাথে নিবিড় আনন্দে কাটিয়ে মহাযোগী বহেরা বাবা তারাপীঠ থেকে বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাও তাঁকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বিদায় দিলেন। পরবর্তীকালে বহেরা বাবা আরো কয়েকবার তারাপীঠে আসেন। তাছাড়া সূক্ষ্ম দেহেও তিনি বহুবার তারাপীঠে যাতায়াত করেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা স্থূলদেহে অপ্রকট হ'বার পরও বহেরা বাবা একাধিকবার সূক্ষ্মদেহে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। এমন কি তারাপীঠে প্রথমবার ১২৮১ সালে যাবার শতবর্ষ পরেও বাংলা ১৩৮১ সালে ফাল্গুন মাসে লেখককে এই প্রাচীন মহাযোগী বহেরাবা জানান যে এখনও বামাক্ষ্যাপাজী'র সাথে তাঁর সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে।

মহাযোগী বহেরা বাবার দিব্য জীবন কাহিনী অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ।

বহেরাবাবার আবির্ভাব ঘটে বিহারের ছাপরা জেলার বোনপুর গ্রামের বাঙালী পট্টিতে।

ভারতবর্ষের কিছু দিব্য পবিত্র ক্ষেত্র রয়েছে যা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতকে করেছে পরিপুষ্ট। যেমন বাংলার হুগলী জেলা, নদীয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলা, বীরভূম জেলা, ফরিদপুর জেলা, ২৪ পরগণা জেলা প্রভৃতি মহান ক্ষেত্রগুলোতে বাংলা তথা তারতবর্ষের বহু মহাপুরুষ, মহামানব ও মনীষী, শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে।

তেমনি বিহারের ছাপরা জেলা ও এক মহান উন্নতক্ষেত্র। বহেরাবাবা, হরিহরবাবা প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে এই পবিত্রভূমি। ছাপরা জেলার 'সরযু ব্রাহ্মণগণ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণরূপে বহুদিন ধরে সমাজে সুচিহ্নিত এই পবিত্র 'সরযু' বংশে মহাযোগী বহেরা বাবার আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক বাংলা ১১৮৬ সালে। মাত্র ১০।১১ বছরে, এক সিদ্ধ সাধকের সাথে তিনি সংসার ত্যাগ করে সাধনার পথে অগ্রসর হ'ন। বহেরা বাবা বহু তীর্থ, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে সেই সিদ্ধযোগীর সাথে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে ও মানস সরোবরের উত্তরে দিব্য ও পবিত্র 'জ্ঞানগঞ্জে' এসে উপস্থিত হলেন। এই মহাপবিত্র ক্ষেত্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম শক্তির

প্রধান কেন্দ্র। এখানে বহু প্রাচীন অতি উচ্চ কোটি ও সিদ্ধযোগী মহাত্মাগণ সাধনরত আছেন। এখানে শত শত বছরের সিদ্ধ যোগীগণ জগৎকল্যাণে রত রয়েছেন।

দু'শো, চারশো, পাঁচশো, ও হাজার বছরের মহান যোগীগণ এখানে বিরাজ করছেন। বহু উচ্চ কোটির প্রাচীন সিদ্ধ সাধিকাগণও এখানে আছেন রোগ, জরা মৃত্যু অতিক্রম করে। এই অধ্যাত্ম মহাকেন্দ্রে জলবিজ্ঞান, সূর্যবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতির অতি দূরূহ কঠিন সাধনা সকল সম্পন্ন হয়।

বহেরা বাবা এখানে প্রাচীন সিদ্ধ মহাত্মা 'গুরং' বাবার নির্দেশ অনুসারে কঠিন যোগ সাধনায় সুদীর্ঘকাল ব্যাপৃত হ'ন এবং অবশেষে সিদ্ধ হ'ন। তিনি বায়ুবিজ্ঞানে সিদ্ধ হ'ন। এই পঞ্চ-ভৌতিক দেহকে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি সূক্ষ্ম দেহে গিয়ে আবার পঞ্চভূত থেকে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম, Soil, water, light, air, vacant) নিজ স্থূল দেহকে তৈরী করে নেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বায়ুবিজ্ঞান সিদ্ধ বহেরা বাবা তাতে সিদ্ধ হ'ন। তিনি শতশত বছর রোগ, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করে নিজ অধ্যাত্ম শক্তির অলৌকিক প্রভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করেন।

অসাধারণ যোগবিভূতি সম্পন্ন পুরুষ 'বহেরা' বাবার নাম কিন্তু 'সরযু তেওয়ারী' যোগ সাধনার এক অতি কঠিন সময়ে জ্ঞানগঞ্জে তিনি যখন মগ্ন ছিলেন, তখন চিত্ত বিক্ষেপের জন্য মন স্থির করে সমাধিতে মগ্ন হ'তে পারছিলেন না। তখন দ্বিশতাধিক বছর বয়স্ক তাঁর গুরু তাঁর কানে যাতে কোন শব্দ প্রবেশ করে চিত্ত বিক্ষেপ না ঘটায় সেজন্য বললেন, 'তু বহেরা বন্ যা।' সাথে সাথে জগতের সকল শব্দ তাঁর কানে স্তব্ধ হয়ে গেল। গভীর নিস্তব্ধতার নিঃসীম নীরবতার মধ্যে তিনি ডুবে গেলেন। সিদ্ধি লাভের পর তিনি সবই শুনতে পেলেন আবার কিন্তু তাঁর গুরুদত্ত নাম 'বহেরা''-ই রয়েগেল। সেই থেকে তিনি 'বহেরা বাবা' নামে ভারত বিখ্যাত হ'ন। তাঁর অলৌকিক লীলা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

বহেরা বাবা সিদ্ধিলাভ করে তিব্বতের কৈলাস, মানস সরোবর ও ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরে আসেন।

সুদীর্ঘকাল পর তাঁর এই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু দেহে বাধ্যর্ক্যের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। তিনি ব্রাহ্মণের দশ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সংসার জীবনে প্রবেশ করলেও তাঁর অধ্যাত্ম জীবন ও জনজীবনে লোকগুরুর গুরু-দায়িত্বমণ্ডিত মহাজীবন যুগ্মভাবে চলতে থাকে।

তাঁর অলৌকিক লীলা ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ঐশী কৃপায় মুগ্ধ ও ধন্য হ'ন ভারতবর্ষের সর্বস্তরের নরনারী।

বহু সাধক মনীষী তাঁর কাছে নিগূঢ় যোগ সাধনা শিক্ষা লাভ করতে আসতে থাকেন। উপযুক্ত আধারে তিনি তাঁর ঐশী শক্তি ঢেলে দিতে লাগলেন।

এই সময় ভারত বিখ্যাত আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও মনীষী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন এবং মহাযোগী বহেরা বাবাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করে বহেরা বাবা আনন্দিত হ'ন। এই শান্ত মনোরম নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্রহ্মচর্য ও অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল বলে তিনি মন্তব্য করেন। তখন মাত্র কয়েকজন আশ্রমিক এই গভীর নির্জন ক্ষেত্রে শান্ত চিত্তে সাধন জীবনে অগ্রসর হচ্ছেন।

দু'একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অতিবাহিত করে বহেরা বাবা বিদায় নেন।

কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সংযোগ অক্ষুন্ন থাকে। পরবর্তীকালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের সময় মহর্ষিদেব বহেরা বাবাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নিয়ে আসেন এবং তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশির্বাদ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যে দীর্ঘজীবি হবেন না তা তিনি দেখা মাত্র বুঝতে পারেন এবং এই ব্যাপারে মহর্ষিদেবকে আভাসও দেন। তবু মহর্ষিদেবের অনুরোধে তিনি এই নবদম্পতিকে আশির্বাদ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ও পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের অনেকেই তাঁর কাছ থেকে 'দীক্ষা' গ্রহণ করেছিলেন বলে বহেরা-বাবা এই লেখককে জানান (১৩৮১ সনে)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞান ও ভক্তি মার্গেই সিদ্ধ ছিলেন না, তিনি যোগ মার্গেও বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই যোগমার্গে বিচরণের ক্ষেত্রে 'জ্ঞানগঞ্জে'র মহাযোগী বহেরা বাবারও অবদান ছিল। তিনি মহর্ষি দেবকেও যোগের বহু নিগূঢ় ক্রিয়া দান করেন। মহর্ষিদেব তাতে আপ্তকাম হ'ন। তিনি মাটির স্পন্দন থেকে কোন লোক তাঁর কাছে আসছেন তা তিনি বুঝতে পারতেন। একবার কোলকাতা থেকে চারজন লোক মহর্ষিদেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ট্রেনে বোলপুর রওনা হ'ন সকাল বেলা। ঐ দিন সকালেই তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পাচককে ডেকে বলেন, "চারজন লোক আসছেন কোলকাতা থেকে। তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করে রাখো। সন্ধ্যাবেলা আসবেন।"

ঠিক সন্ধ্যাবেলা তাঁরা কোলকাতা থেকে প্রথমে ট্রেনে এবং পরে বোলপুর থেকে গরুর গাড়ি করে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আসেন। তাঁরা না জানিয়ে এসেছিলেন কিন্তু সাথে সাথে খাবারের ব্যবস্থা তৈরী দেখে তাঁরা বিস্মিত হ'ন। পাচকের মুখে মহর্ষিদেবের উপরোক্ত কথা শুনে তাঁরা আরো বিস্মিত হ'ন। পরে কথা প্রসঙ্গে এই ব্যাপার মহর্ষিদেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে তিনি মাটি থেকে স্পন্দন পান।

যোগসিদ্ধ ছাড়া এই অতিন্দ্রীয় শক্তি লাভ হয় না। মহর্ষিদেব যোগ ও ভোগ উভয়কে সমানভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পবিত্র গৃহে পদার্পণ করে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন। 'তুমি কালির জনক'। মহর্ষিদেব হিমালয়ে গিয়েও বহুবার নির্জনে সাধনা করেন। যাহোক, বহেরা বাবার সাথে মহর্ষিদেবের আত্মিক যোগ তাঁর আমৃত্যু ছিল।

বহেরা বাবার সাথে জ্ঞানগঞ্জের সূক্ষ্ম যোগাযোগ বরাবর অক্ষুন্ন থাকে। মাঝে মাঝে তাঁর প্রধান গুরু ভাইরা তাঁর সাথে দেখা করে যেতেন সাধারণ মানুষের বেশে। কখনো পাগলের বেশ ধরেও আসতেন। বহেরাবাবার গুরুদেব, 'গুরুং' বাবা প্রসঙ্গে বহেরু বাবা বলেন যে গুরুদেব অতি উচ্চ কোটির মহাপুরুষ। তাঁর বয়স চারশো বছর। সেই গুরুং বাবা ও কয়েকবার লীলার ছলে তাঁর প্রিয় শিষ্য বহেরা বাবাকে দেখে যান বহেরাবাবার বিভিন্ন ভক্তদের গৃহে এসে বিচিত্র বেশে।

অন্য কেউ চিনতে পারেন নি কিন্তু সত্য দ্রষ্টা যোগী ও ঋষি বহেরা বাবা তাঁকে চিনতে পেরে সসম্মানে ঘরে নিয়ে আসেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর ঘর খুলে দেয়া হ'ল। দেখা গেলে তাঁর গুরুদেব বদ্ধঘর থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী তাই দেখে ও শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান।

বহেরা বাবার অজস্র অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর অন্যতম ভক্ত ও ভারত বিখ্যাত শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা।

তিনি বহেরা বাবার বিশেষ ভক্ত ও ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট স্হপতি বালীগঞ্জ প্লেস নিবাসী শ্রীফণী মুখোপাধ্যায়র কাছে প্রথমে বহেরা বাবার কথা জানতে পারেন। ফণীবাবুকে জি. ডি. বিড়লা বিশেষ স্নেহ করতেন। ফণীবাবু বিড়লাদের বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন। তাঁর মধ্যে দিল্লীর বিড়লা মন্দির, বৃন্দাবনের বিড়লা মন্দির, পাটনা, হরিদ্বার প্রভৃতির বিড়লা মন্দিরগুলো অন্যতম। তিনি ফণীবাবুকে বলেন, "ফণী যদি তোমার বহেরা বাবা সত্যিই অন্তর্যামী ও শক্তিধর মহাযোগী হ'ন তবে তাঁকে শিবমন্দিরে নিয়ে এস (উত্তর কলিকাতার এক শিব মন্দিরে)। যদি একই সাথে আমার গাড়ী ও তোমার গাড়ী (যে গাড়িতে বহেরা বাবা থাকবেন) এসে সেই মন্দিরে প্রবেশ করে এবং আমি যা মনে মনে ভাবছি তা ঘটে তবে স্বীকার করবো তিনি অন্তর্যামী ও শক্তিধর যোগী।" ফণীবাবু রাজী হলেন। বহেরা বাবা তখন তাঁর কোলকাতার বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে রয়েছেন। প্রতিদিন দেশের সর্বস্তরের শত শত ভক্ত নরনারী আসছেন তাঁকে দর্শন করতে ও তাঁর ঐশী কৃপালাভের জন্য। তবু তাঁর মধ্যে সময় করে ফণীবাবু বহেরা বাবাকে ঘন শ্যাম দাস বিড়লার কথা জানালেন। বহেরা বাবা মৃদু হেসে রাজী হলেন।

ঠিক সময়ে ফণীবাবু দক্ষিণ কোলকাতার বালীগঞ্জ প্লেস থেকে তাঁর গাড়ীতে বাহরা বাবাকে নিয়ে উত্তর কলকাতার সেই শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং ঠিক সেই সময়ে জি.ডি. বিড়লা তাঁর বিড়লা বাড়ী থেকেও রওনা হলেন। স্বভাবত জি. ডি. বিড়লারই পূর্বে পৌছবার কথা সেই নির্দিষ্ট শিবমন্দিরে কিন্তু দেখা গেল বিড়লাজী'র গাড়ি বারবার গতিরুদ্ধ হচ্ছে। অবশেষে একই সময়ে দু'খানা গাড়ি সেই শিব মন্দিরে প্রবেশ করলো। মহাযোগী বহেরা বাবা গাড়ি থেকে নেমে

নেমে জি. ডি. বিড়লাকে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এবার তোমার মনে যে বাসনা আছে তাও পূর্ণ হবে। তোমার গাড়ীর পিছনের ক্যারিয়ারে যে একশো আটটি পদ্মফুল রেখেছ তা বেরকরে আমায় প্রণাম কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।" জি. ডি. বিড়লা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বহেরা বাবার এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে মহাযোগী বহেরা বাবা সত্যিই অন্তর্যামী ও মহাপুরুষ। তিনি সেই পদ্মফুল দিয়ে সিদ্ধমহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। পরে জি, ডি, বিড়লা বহেরা বাবার বিশেষ অনুরক্ত হ'ন। ক্রমে বিড়লা পরিবারের অনেকে তাঁর ভক্ত হ'ন এবং বহেরা বাবার অনেক অলৌকিক শক্তি দেখে মুগ্ধ হ'ন। ভারতের গোয়েঙ্কা পরিবারও তাঁর বিশেষ ভক্ত হ'ন।

কিন্তু বহেরা বাবার কাছে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সমান।

কোলকাতায় তাঁর প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল বালীগঞ্জ প্লেসের ভক্ত প্রবর ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোট্ট দোতালাবাড়ীর একতলাটি। প্রতিদিন শত শত লোক তাঁদের নানান সমস্যা নিয়ে আসতেন তাঁর কাছে। তিনি হাসি মুখে করুণাভরে তা সমাধান করতেন।

বহেরা বাবা দুর্গার উপাসক ছিলেন। হিমালয়ের উত্তরে সউচ্চ স্থানে জ্ঞানগঞ্জে তাঁর ইষ্টদেবী দুর্গাদেবী তথা 'লক্করমুণ্ডীমায়ী' বিরাজমানা। বহেরা বাবা প্রায়ই তাঁর ভক্তদের প্রদত্ত ফুল ফল মিষ্টির এক অংশ তাঁর ইষ্টদেবীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন, কলকাতা বা অন্যত্র বসেই সবার সামনে থেকেই। মুহূর্তে সেই সব জিনিষ সবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত এবং হাজার হাজার মাইল দূরে তিব্বতের জ্ঞানগঞ্জে অবস্থিত লক্কর মুণ্ডীমায়ী তথা দুর্গাদেবীর পদতলে গিয়ে পৌঁছতো ভক্তদের কল্যাণার্থে। কখনো কখনো সেখান থেকে প্রসাদ এনেও ভক্তদের দিতেন। মুহূর্তের মধ্যে এসব ঘটতো।

বহেরা বাবার কলকাতা, হাওড়া, পাটনা, দিল্লী, বেনারস, লক্ষ্ণৌ কানপুর, প্রভৃতি স্থানের অজস্র ভক্ত নরনারী তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

বহেরা বাবার অপার করুণা ঘন মূর্তি যিনি একবার দর্শন করতেন তিনিই বহেরা বাবাকে তাঁর একান্ত আপনজন মনে করতেন। সর্বদা বহেরা বাবা তাঁর পাশে আছেন উপলব্ধি করতেন এবং বিপদে আপদে

সর্বদা বহেরা বাবা তাঁকে এবং তাঁর সংসারকে রক্ষা করছেন তা নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধিও করতেন। হয়তো তখন বহেরা বাবা পাটনায় রয়েছেন কিন্তু ভক্তকে রক্ষা করছেন কোলকাতায়।

বহেরা বাবা একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করে বিরাজ করতেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এবং সেইসব জায়গায় যথারীতি অজস্র ভক্ত দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন।

কোলকাতার জনৈক পোর্ট ট্রাস্টের বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার লেখককে জানান তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা। তিনি কাজের ব্যাপারে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন। সেখানে সহসা ভক্তপরিবৃত বহেরা বাবাকে দেখতে পান। বহেরা বাবা তাঁকে যথারীতি আশির্বাদ করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তাও বললেন। এই ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী বহেরা বাবার বিশেষ ভক্ত। পরদিন তিনি কোলকাতায় ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন দার্জিলিং-এ বহেরা বাবাকে দেখবার কথা।

তাঁর স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জানালেন যে বহেরাবাবা বালীগঞ্জ প্লেসে ফণীবাবুর বাড়ীতেই আছেন এবং তিনি দর্শনও করে এসেছেন। উভয়ে বহেরা বাবার কাছে এলেন বালীগঞ্জ প্লেসে। বহেরা বাবা সব শুনে হেসে বললেন, "এইসা তো হোতাই হ্যায়" (এ রকম তো হয়ই)। বহেরা বাবার অপার করুণাধন্য ভক্তপ্রবর ফণীবাবু ও তাঁর সমগ্র পরিবার সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরের ওপর একান্তভাবে তাঁর সম্পূর্ণ আশ্রিত। ফণীবাবুর স্ত্রী অনুপমা দেবী বহেরাবাবার কাছে থেকে দীক্ষালাভ করেন। বহেরাবাবার অলৌকিক লীলা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ে ফণীবাবু, তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী, এবং তাঁর তিন পুত্র ও পুত্রবধূ ও কন্যাদের ওপর। এই পরিবারের সকল বিপদ আপদ বহেরা বাবার কৃপার পরশে কেটে যায়।

ফণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র যুবক রঙিন মুখোপাধ্যায় সুইজারল্যাণ্ডে কর্মরত অবস্থায় সহসা কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয় ঠিক সেই সময় সুইজারল্যাণ্ডের হাসপাতালে সে তার মাথার পাশে বহেরা বাবাকে দেখে এবং বহেরা বাবা তাকে অভয় প্রদান করেন ও মাথায় আশির্বাদ করে অদৃশ্য হ'ন।

যুবক রঙিন বাড়ীর কারোকে এই বসন্ত হবার কথা জানায়নি। চিন্তা করবে বলে। অথচ অন্তর্যামী বহেরা বাবা তখন পাটনাতে বসেই

তা জেনেছেন এবং রোগ ভাল করবার ব্যবস্থা করে গেলেন সুইজার-ল্যাণ্ডে এসে সূক্ষ্ম দেহে।

বহেরা বাবা কলকাতায় এসেই ফণীবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে রঙিনের বসন্ত হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের হাসপাতালে আছে। তিনি দেখা করে এসেছেন, ভাল হয়ে যাবে অল্পদিনেই। কয়েক দিন পর রঙিনের চিঠিতে সেইকথা জানা গেল। এমনি ভাবে অজস্র করুণা ধারা ফণীবাবুর ও তাঁর সমস্ত পরিবারের উপর দীর্ঘকাল ধরে ঝরে পড়ে। বহেরা বাবার যোগসিদ্ধ দেহ, তাই তাঁর চেহারা একই রকম রয়েছে সুদীর্ঘ কাল ধরে।

বহেরা বাবার শিষ্যা অনুপমা দেবী ১৯৭৪ সালে লেখককে বলেন, "বাবা, আমি অল্প বয়সে এই বাড়ীতে বধু হয়ে আসি। সারাজীবন বহেরা বাবার একই রকম চেহারা দেখলুম। বৃদ্ধা হয়েও তাই দেখছি।"

বহেরা বাবা প্রতি বছর মাসখানেকের জন্য কোলকাতায় ফণীবাবুর বাড়ীতে আসতেন। মাসাধিক কাল ধরে কলকাতা, হাওড়া ও বহুদূরবর্তী স্থান থেকে হাজার হাজার নরনারী আসতেন তাঁর দর্শন ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে। অনেক সাধু মহাত্মাও আসতেন তাঁর কাছে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্য।

অনেক অশরীরী এবং এমন কি দেবদেবীও আসতেন তাঁর কাছে। প্রতিদিন ভোর ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বহেরা বাবার কাছে অজস্র নর নারী আসতেন। তার পর বহেরা বাবা দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম করতেন। বহেরা বাবার শিষ্যা ও ফণীবাবুর স্ত্রী অনুপমা দেবী কথা প্রসঙ্গে লেখককে জানান, একদিন অনুপমা দেবী তাঁর গুরুদেব বহেরা বাবাকে ভোরবেলা পাথরের বাটিতে চা দিতে গেছেন। বহেরা বাবা চা-গ্রহণ করছেন। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হ'ল গুরুদেবের একটি অলৌকিক শক্তি দেখবার। তাঁর বিশেষ অনুরোধে বহেরা বাবা। দেখালেন যে তাঁর দেহ সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময়। সেই তীব্র আলো তিনি সহ্য করতে না পেরে বহেরা বাবাকে এই মহাজ্যোতি সম্বরণ করতে বললেন। একটু পরে ধীরে ধীরে সেই জ্যোতি মিলিয়ে গেল বহেরা বাবার দিব্যদেহে। আরেক দিনের ঘটনা। ফণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বধু মীনাক্ষীর গভীর রাতে সহসা ঘুম ভেঙ্গে যায়। একতলার বহেরা বাবার ঘর থেকে অনেক লোকজনের কথা বার্তা শুনতে পায়। মীনাক্ষী

বিস্মিত হ'ল, এত গভীর রাতে কারা এল বহেরা বাবার কাছে! তাই জানবার জন্য মীনাক্ষী দোতালা থেকে একতলায় নেমে এল। সহসা দেখতে পেল একাধিক অশরীরী ছায়া মূর্তি তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে। মীনাক্ষী ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে পড়লো বহেরা বাবার দরজার কাছে। দোতালায় ফিরে যাবার মত সাহস ও শক্তি তখন যেন তার নেই। অন্তর্যামী বহেরা বাবা তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখতে পেলেন। তখুনি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তাঁর স্নেহধন্যা মীনাক্ষীকে বললেন, "এভাবে কখনো এসো না। এই সময় অনেক অশরীরী আসে আমার কাছে তাঁদের মুক্তির জন্য। তোমার ক্ষতি হতে পারে। শিঘ্র ওপরে যাও।" মীণাক্ষী দ্রুত পায়ে দোতালায় তাঁর ঘরে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। স্বামী ও শাশুড়ীকে পরে সব বললো।

পরদিন বহেরা বাবা তাঁর কন্যা সমা শিষ্যা অনুপমা দেবী ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধু মীনাক্ষীকে ডাকলেন। বৃদ্ধা অনুপমা দেবীকে তিনি 'খুকুমণি' বলে ডাকেন। 'খুকুমণি' ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধু মীনাক্ষীর অনুরোধে বহেরা বাবা জানালেন যে তিনি প্রায় সারারাত জেগে থাকেন, এই অশরীরীদের আর্তি ও মুক্তির জন্য। অনেক সময় অনেক দেবদেবীও আসেন তাঁর কাছে।

দিনে শত শত দেহী ও রাতে অজস্র বিদেহীদের সমস্যা সমাধানে মহাযোগী বহেরা বাবা থাকেন নিত্য কর্মমুখর। বহেরা বাবার স্নেহ যেমন শাসনও তেমনি। অবিশ্বাসী ও দুষ্টু প্রকৃতির লোকদের তিনি কঠোর শাস্তি দি:তেন। একবার দু'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কোলকাতার বালীগঞ্জ প্লেসে বহেরা বাবার কাছে এলেন। বহেরা বাবার আলৌকিক শক্তি সর্ম্পকে পরোক্ষভাবে উপহাস করলেন। অন্তর্যামী বহেরা বাবা বুঝতে পারলেন সব। এদের একটু জব্দ করবার জন্য তিনি দু'জনকে হাতে হাত মেলাতে বললেন। সাথে সাথে হাত আটকে গেল। ঘন্টা চারেক কান্নাকাটি করবার পর হাত খুলে দিলেন।

বাংলা ১৩৮১ সাল থেকে ১৩৮৬ সাল পর্যন্ত (ইংরেজী ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত) দীর্ঘ ছয় বছর এই লেখক মহাযোগী বহেরা বাবার নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন এবং বহেরা বাবার অজস্র অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন বহুবার। যে কোন লোক বহেরা বাবার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং বহেরা বাবার সম্মুখীন হতেন, সাথে

সাথে বহেরা বাবার যোগদৃষ্টিতে সেই লোকের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত ভেসে উঠতো এবং তা তিনি সেই লোককে বলে দিতেন প্রয়োজন মত। বহেরা বাবার এই অসীম অলৌকিক শক্তির পরিচয় লেখকও পেয়েছেন অজস্রবার।

বাংলা ১৩৮১ সালে ফাল্গুন মাসে (ইংরেজী মার্চ, ১৯৭৪) ফণীবাবু লেখককে বহেরা বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অন্তর্যামী বহেরা বাবা লেখককে দেখা মাত্র সানন্দে স্বেচ্ছায় তারাপীঠের কথা, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা বলতে থাকেন। এমন কি 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থ সম্পর্কেও অনেক কথা আশ্চর্য ভাবে বললেন। লেখককে "যোগীবাবা" বলে সম্বোধন করলেন। ফণীবাবুকে বললেন যে 'যোগীবাবা'র সাথে পরে আমি নিভৃতে যোগতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। ফণীবাবু এই অভূতপূর্ব কথা শুনে খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি সানন্দে লেখককে বললেন যে এই রকম কথা এতকাল পর এই প্রথম শুনলুম। তারপর ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত ঘটনা সকল বহেরা বাবা স্বয়ং লেখককে জানান।

দীর্ঘ ছয় বছর ধরে লেখক তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে এসে অশেষ উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর দিব্য কৃপা শক্তি লাভ করে ধন্য হয়েছেন। লেখকের পরিচিত তিন শতাধিক নর নারী বহেরা বাবার অলৌকিক শক্তি ও কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। বাহেরা বাবা যোগ ও তন্ত্রে সিদ্ধ।

বহেরা বাবার অসংখ্য লীলাকথা লিখে করা যাবেনা। সব কিছু লিখতে গেলে বিশাল গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। বহেরা বাবার কৃপা-ধন্য হয়েছেন ভারতের ও বিদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বহু মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, শিল্পী, লেখক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্বস্তরের লোক কোলকাতায় ফণীবাবু বাড়ীতে মহাযোগী বহেরা বাবাকে দর্শন করে ও কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বহেরাবাবার দ্বিতীয় আশ্রম গড়ে ওঠে হাওড়ায়।

১৯৭৯ সালের ২রা ডিসেম্বর রবিবার মহাযোগী বহেরা বাবা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মলীন হলেন কোলকাতায়। বেলভিউ নার্সিং হোম-এ। মহা সমাধির দু'দিন পূর্বে লেখক শেষ প্রণাম জানিয়ে আসেন ভারত বিখ্যাত দু'শতাধিক বছর বয়স্ক মহাযোগী বহেরা বাবাকে।

লেখকের সাথে ছিলেন বন্ধুবর শিবাজী গুপ্ত। তাঁর স্ত্রী বহেরা বাবার কৃপায় নবজীবন লাভ করেছেন।

বহেরা বাবা তাঁর দেহত্যাগের ইঙ্গিত একবছর পূর্বেই দিয়েছিলেন লেখককে (কখনো 'যোগীবাবা' কখনো 'বিপুলবাবা' বলে ডেকে ইঙ্গিত দেন)। তেমনি এক সম্বোধনের মাঝে ১৯৭৯ সালে বহেরা বাবা তাঁর দেহত্যাগের ইঙ্গিত দিলে, জনৈক ভক্ত তাঁকে বলেন, ''বাবা, আপনার গুরুদেব গুরুং বাবার তো চারশো বছর বয়স হয়েছে, আপনি বলেছেন। তাহলে তাঁর শিষ্য হিসাবে আপনি অন্তত দু'শো বছর থাকুন। "তারপর দেহত্যাগ করবেন।" তার উত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন "হামারা তো দু'শো হো গিয়া" (আমর তো দুশ বছর হয়ে গেছে)।

স্থূল দেহে সুদীর্ঘ দুশো বছর কাটিয়ে গেলেও আজো মহাযোগী বহেরা বাবার মহান নিত্যলীলা তাঁর লক্ষ লক্ষ আশ্রিত সন্তানের উদ্দেশ্যে অব্যাহত রয়েছে। বহেরাবাবার দিব্য কৃপায় কলকাতার গড়িয়ায় তাঁর স্মরণে আরেকটি আশ্রম গড়ে উঠেছে কিছুকাল পূর্বে।

উপরোক্ত কাহিনী ও সংযোগের জন্য লেখক শ্রীশ্রীবহেরা বাবা এবং তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত ফনী মুখোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী এবং কনিষ্ঠ পুত্র রঙিন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য পাহাড়িবাবা

আনুমানিক ১২৮২ সনে একজন মহান তাপস তারাপীঠে এলেন। মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা দেখামাত্র চিনতে পারলেন তাঁর আপন সন্তানকে। শ্রীবাম এই উন্নত সাধককে দিলেন নিগূঢ় তারাবিদ্যা। কঠোর সংযমী ও ব্রহ্মচারী এই তাপসকে শ্রীবাম স্নেহভরে ডাকেন 'নরোত্তম বাবা' বলে। সুদীর্ঘ আঠারো বছর নরোত্তম বাবা শ্রীগুরু বামের দিব্যসঙ্গধন্য হ'ন।

তারামা ও শ্রীবামের অপার কৃপায় তন্ত্র ও যোগ উভয় পথেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

উত্তর কালে তিনি ভারত বিখ্যাত সিদ্ধযোগী ও মহাপুরুষ "পাহাড়ি বাবা" স্বরূপে বিখ্যাত হ'ন।

পাহাড়ি বাবার সাধন ইতিহাস যেমনি বিশাল তেমনি বৈচিত্র্যময়।

পাহাড়ি বাবার জন্ম আনুমানিক বাংলা ১২৫০ সালে। তাঁর জন্ম বঙ্গদেশে। তাঁর বাঙ্গালী শরীর। মাত্র দু'বছর বয়সে তাঁর সাধনা শুরু হয়। তাঁর সমগ্র সাধন জীবনে আটজন মহাপুরুষকে সাধনার বিভিন্ন পথে গুরু করেছিলেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর তৃতীয় গুরু ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি যোগ, তন্ত্র, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রহ্ম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন সাধনপন্থায় সিদ্ধ হ'ন। ফলে তাঁর দীর্ঘ জীবনে ভারতের বহু সাধনার ধারার মহাসমন্বয় ঘটেছে।

তিনি যোগ ও তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার চরণতলে বসে। সুদীর্ঘ আঠারো বছর তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হ'ন। সেই সময়ের (বাংলা ১২৮২—ইং ১৮৭৫) তারাপীঠের মহাস্মশান ও দ্বারকানদী প্রসঙ্গে তিনি উত্তরকালে লেখককে বলেন যে তখন পাঁচটি গ্রাম নিয়ে অর্থাৎ তারাপুর, সরলপুর, উদয়পুর, কবিচন্দ্রপুর ও কড়কত্রিয়া নিয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশান ছিল। যেমন বিশাল তেমনি ভীষণ ছিল তারাপীঠের সেই মহাশ্মশান।

দ্বারকানদী তারাপীঠ মহাশ্মশানের পাশেই ছিল। বিশাল ছিল সেই দ্বারকানদী। এখন চারমাইল সরে গেছে এবং সরু হয়ে

গেছে। আর এই নালী—যাকে লোকে এখন দ্বারকানদী বলে, সেটি ছিল মন্দিরের গায়ে। এখন থেকে একশো দশ বছর পূর্বের কথা। শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা প্রসঙ্গে পাহাড়ি বাবা বলেন, "বামদেব বলতেন "তারা নাম কর। তাতেই সব হবে।"

পাহাড়ি বাবা আরো বলেন, "আমরা শ্রীগুরু বামদেবকে যোগ তন্ত্র কিছুই সাধনা করতে দেখিনি। অথচ তিনি সবেতেই সিদ্ধ। স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিলেন তিনি। তিনি ঈশ্বর কোটির পুরুষ ছিলেন।"

একবার তারাপীঠে থাকাকালীন পাহাড়ি বাবা শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার জন্য একজোড়া খড়ম তৈরী করিয়ে অনেক অনুনয় করে তাঁর পায়ে পরিয়ে দেন। ৭/৮ মিনিট পর বামাক্ষ্যাপা বললেন, "এটা কি পরাইলি রে। গাছের কাঠ, জন্তুর চামড়া, এসব পরতে ভাল লাগেনা।" এই বলে খড়ম জোড়া পা থেকে খুলে ফেললেন। আর পরলেন না। সর্বভাবের ও ব্রহ্মের সর্বানুভূতির পরম বিগ্রহ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা প্রেম ও করুণা ছিল এমনি ভাবে জীব জগতের সবার ওপর।

সেই সাত আট মিনিটের শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য পরশধন্য খড়ম জোড়াটি পাহাড়ি বাবা সযত্নে রক্ষা করে শতাধিক বছর ধরে নিত্য পূজা করেন। তাঁর গুরুভক্তি সত্যিই আদর্শনীয়।

১৯৮২ সালের ১৫ই আগষ্ট চুঁচুড়ার অন্তর্গত নোনাপুকুরের আশ্রমে বসে প্রায় একশো চল্লিশ বছর বয়স্ক পাহাড়ি বাবা উপরোক্ত কথা প্রসঙ্গে লেখককে সেই পবিত্র খড়ম জোড়া দেখান এবং লেখক পাহাড়ি বাবা ও সেই খড়ম জোড়ার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

সাধনা প্রসঙ্গে পাহাড়ি বাবা বলেন, "গুরুমুখী সাধনাই হ'ল আসল কথা। তা নিগূঢ় রহস্যময়। গুরুর শ্রীপদ ছাড়া শিষ্য গুরুর মুখ দেখবেনা। তাহলে সে পতিত হ'ল। সে শিষ্য রইলো না। ভারতবর্ষের স ধনার সকল কিছুই গুরুমুখী।" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সন্ন্যাসী শিষ্য প্রসঙ্গে পাহাড়ি বাবা বলেন, "বামদেবের নয়জন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল।"

তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য পাহাড়িবাবা, লালক্ষ্যাপা বিশেক্ষ্যাপা, তারাক্ষ্যাপা (জুড়নপুর), তারাক্ষ্যাপা (বসিরহাট) ভগবান ব্রহ্মচারী প্রভৃতিগণ। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জীবিত অবস্থায় দু'জন সন্ন্যাসী শিষ্য দেহত্যাগ করেন। বাকি ৭ জন সন্ন্যাসী

শিষ্যদের প্রায় সকলকে নিজ নিজ স্থানে পাঠিয়ে দেন বামাক্ষ্যাপা তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েকদিন পূর্বে।

ব্রহ্মচারী তারানাথকে (তারাক্ষ্যাপা) জুড়নপুর, মণি গোঁসাইকে (তারাক্ষ্যাপা, বসিরহাট) বসিরহাটে পাঠিয়ে দেন। এমনিভাবে লালক্ষ্যাপা, বিশেক্ষ্যাপা প্রভৃতিদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন।

মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পূর্বে তিনি সন্ন্যাসী শিষ্যদের জানান, "আমার দেহত্যাগের পর তোরা খুব প্রয়োজন না হলে গুরুস্থানে আসবিনা।" তাই তাঁর মহাপ্রয়াণের সময়ে প্রায় কোন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল না।

পাহাড়ি বাবাকে (নরোত্তম বাবা) শ্রীবাম তাঁর অনেক পূর্বেই আরো বহুভাবের সাধনার জন্য বিভিন্ন পন্থায় সিদ্ধিলাভের জন্য ও ঐশী নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাঁকে তারাপীঠ থেকে বিদায় দেন। শ্রীবাম জানতেন তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম বাবাকে (পাহাড়ি বাবা) দিয়ে তারামা বহুভাবের সাধনা করিয়ে নেবেন। সাধন জগতে মহা ঐশ্বর্যশালী করবেন।

শ্রীবামের দিব্যদৃষ্টির ফলশ্রুতি যথার্থভাবে পরবর্তী কালে দেখা যায় পাহাড়ী বাবার মধ্যে।

শ্রীবামের কাছে দীর্ঘ আঠারো বছর অবস্থান করে এবং তন্ত্র ও যোগ পথে সিদ্ধিলাভ করে নরোত্তম বাবা (পাহাড়ি বাবা) তারাপীঠ থেকে বিদায় নিয়ে বিভিন্ন সাধন পথে অগ্রসর হ'ন এবং প্রতি ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রের অন্যতম বিশিষ্ট সিদ্ধ মহাপুরুষকে গুরু রূপে গ্রহণ করেন। এভাবে তাঁর সর্বমোট আটজন মহান সিদ্ধগুরু লাভ হয়। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ছাড়াও মহাযোগী গম্ভীরনাথ, মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা, শঙ্করতীর্থ জিউ মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁর গুরু ছিলেন।

তাছাড়া কাশীর চলন্ত শিব শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শন ও কৃপালাভ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মা সারদামণির দিব্য সান্নিধ্য লাভ করেন একাধিকবার। এঁদের ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর বহু ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ ও মহাসাধিকার সান্নিধ্যে তিনি আসেন।

পাহাড়ি বাবা বিভিন্নপথে সিদ্ধিলাভের পর হিমালয়ের সকল বিশিষ্ট তীর্থে বহুবার পরিভ্রমণ করেন। কেদারনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ, পঞ্চকেদার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখী, কৈলাস, মানস সরোবর, বদ্রীনাথ প্রভৃতি বহু পবিত্র তীর্থ তিনি একাধিক বার ভ্রমণ করেন।

দেবতাত্মা হিমালয়ের পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম সব দিকেই তিনি পরিভ্রমণ করেন। কাশ্মীরের বৈষ্ণদেবী তীর্থও পরিভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সকলও তিনি দর্শন করেন।

মানস সরোবর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মানস সরোবর এগার মাইল লম্বা। এখন আরো ছোট হয়ে গেছে। মানস সরোবরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। কৈলাস মানস সরোবরে তিব্বতী ও মঙ্গলীয় ভাষা চালু আছে।'' নরোত্তম বাবা শতাধিক বছর ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করেন বলে ভারতবর্ষের সাধক সমাজে তাঁর নাম হয় পাহাড়ি বাবা।

তাছাড়া নেপাল ও ভারতবর্ষের হিমালয়ের অজস্র পাহাড়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন সুদীর্ঘকালে ধরে। তার ফলে তাঁকে অনেকে নেপালীবাবা বলেও ডাকেন।

পাহাড়ি বাবা তন্ত্রের অঘোর পন্থাতেও সাধনা করে আপ্তকাম হ'ন। তাই তিনি লেখককে বলেন "আমরা অঘোরী"।

পাহাড়ি বাবা ১৯৮২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লেখককে পুনরায় তাঁর উপরোক্ত আটজন গুরু প্রসঙ্গে বলেন, ''আটজন গুরুকে সমাধি দিয়েছি—ছয়জনকে মাটিতে সমাজ দিয়েছি, আর বাকি দু'জনকে জল সমাধি দিয়েছি।"

শ্রীশ্রীবামা ক্ষ্যাপার প্রিয় শিষ্যদ্বয় তথা তাঁর অন্যতম গুরু ভাইদ্বয় লাল ক্ষ্যাপা ও নিশে ক্ষ্যাপা সুদীর্ঘকাল পাহাড়ি বাবার সাধনসঙ্গী ছিলেন।

১৯৮০ সালের ৪ঠা জুলাই লালক্ষ্যাপা সমাধি নেন। তারপর নিশে ক্ষ্যাপাও সমাধি নেন কিছুকাল পর। ১৯৮২ সালে পাহাড়িবাবা পুনরায় পঞ্চকেদার, যমুনেত্রী, বৈষ্ণদেবী ঘুরে এলেন। পাহাড়ি বাবা বহু সাধন পথে সিদ্ধিলাভের পর অলৌকিক যোগ শক্তির অধিকারী হ'ন। তিনি সুমেরু মঠেরও অধ্যক্ষ হ'ন।

পাহাড়িবাবা অত্যন্ত তেজস্বী এবং আনন্দময় পুরুষ। তাঁর মহান করুণা ও ক্ষমাসুন্দর রূপ ও উদার প্রকৃতি যথার্থ আদর্শনীয়। তিনি সুরসিকও বটে।

ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ বালানন্দ ব্রহ্মচারী (মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরুদেব) পাহাড়ি বাবার অন্যতম গুরুভাই ছিলেন। উভয়ের গুরুদেব

শঙ্কর তীর্থ জিউ মহারাজ। একবার শিষ্য পাহাড়ি বাবাকে শঙ্কর তীর্থ জিউ মহারাজ লাড্ডুপাকিয়ে আশ্রমে উপস্থিত তিনশো অতিথিকে দিতে বললেন। এত অতিথি অথচ বোঁদে রয়েছে মাত্র তিরিশ জনের মতঁ। তাই পাহাড়ি বাবা ছোট করে লাড্ডু পাকাতে লাগলেন।

এই ছোট করে লাড্ডু পাকাতে দেখে তাঁর অন্যতম গুরু শঙ্করতীর্থ মহারাজ তাঁকে বললেন, "পাহাড়ি, তোর লাড্ডু পাকানো দেখে মনে হচ্ছে তোর বাঙ্গালী শরীর। এই বড় বড় করে লাড্ডু পাকিয়ে (হাতে দিয়ে খুব বড় সাইজ দেখিয়ে) অতিথিদের দিয়ে যা। একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে বিলি করে যা।"—শিষ্য পাহাড়ীবাবা তাই করলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার। সব অতিথি তৃপ্তি করে খেলেন বড় বড় সাইজের লাড্ড়ু। যা দিয়ে মাত্র তিরিশ জনকে খাওয়ানো যায়। তাই দিয়ে তিনশো জনকে খাওয়ানো হ'ল।

পাহাড়ি বাবার সাথে তাঁর গুরুভাই বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। দেওঘরের যে গুহায় তিনি একদা বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে যোগ সাধনা দেখিয়ে ছিলেন, উত্তরকালে তিনি তাঁর কৃপাধন্য শিষ্য সাগর নিয়োগীকে সেই গুহা দেখিয়ে বলেন, "এখানে শঙ্করতীর্থ জিউ বসতেন, এখানে বালানন্দ বসতো আরে এখানে তাঁর শিষ্য মোহনানন্দ বসতো।"

পাহাড়িবাবা যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির দিব্য সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

তাঁর চুঁচুড়ার নোনাপুকুরের আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের পাশ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা গরুর গাড়িতে করে কামারকুণ্ড হয়ে গঙ্গা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। ঐ পথ ছিল গরুর গাড়ীর পথ। প্রায় একশো দশ বছর পূর্বের কথা (১২৮০ সন, ইং—১৮৭৩ সাল)।

ঠাকুরের সাথে একবার তিনি গরুর গাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুরের চেয়ে অনেক বেশী সান্নিধ্য ও কথাবার্তা হয়েছে মা সারদামণির সাথে।

এই প্রসঙ্গে (১৯৮২ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর এই নোনাপুকুরের আশ্রমে বসে) তিনি লেখককে বলেন "শ্রীশ্রীমা-ই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের গুরু। ঠাকুর শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। স্বামীজী শ্রীশ্রীমা'র কাছেই রাজযোগ লাভ করেন। শ্রীশ্রীমা'র কথা তো মনে হচ্ছে এই কাল পরশুর কথা যেন। চোখের সামনে সব ভাসছে।"

যদিও মা সারদামণি মহাপ্রয়াণ করেছেন তার বাষট্টি বছর পূর্বে (১৩২৭ সন)।

পাহাড়ি বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চেয়ে প্রায় ৮ বছরের ছোট ছিলেন।

পাহাড়ি বাবা লেখককে আরো জানান যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও পাদস্পর্শ ধন্য এই পবিত্র আশ্রম। এখান দিয়েই তিনি সপ্তগ্রামের পথে যান। পাহাড়ি বাবার অসাধারণ যোগবিভতির খ্যাতি ভারতবিখ্যাত। তিনি পাহাড় কন্দর থেকে বহু দুরারোগ্য রোগের শেকড় ও নানান বনৌষধি সংগ্রহ করে তা থেকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ তৈরী করে সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে বিতরণ করেন এবং তাঁরা রোগ মুক্ত হ'ন। ফলে তাঁর চঁুচুড়ার আশ্রমে আর্ত নরনারীর ভীড় লেগেই থাকে। তাছাড়া কাশী, দিল্লী, বোম্বে প্রভৃতি স্থানেও বহু ওষুধ পাঠানো হয়। তাছাড়া মন্ত্র, স্তব, দৈব ওষুধ প্রভৃতি দিয়েও বহু লোককে পাহাড়ি বাবা নিরাময় করেন।

পাহাড়ি বাবার অন্যতম কৃপাধন্য শিষ্য ও ভক্ত চুঁচুড়ার নোনা পুকুরের অধিবাসী শ্রীসাগর নিয়োগী লেখককে জানালেন যে তাঁর বর্তমান বয়স ৬১ বছর (১৯৮২ সালে)। কয়েক বছর পূর্বে তিনি তিনবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। বাঁচবার বা চলবার কোন শক্তি ছিল না। সহসা এখানে পাহাড়ি বাবার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পাহাড়ি বাবার নির্দেশ মত তিনি চলতে লাগলেন। ক্রমে আশ্চর্য ভাবে তিনি হিমালয়ে গিয়ে পিতামাতার পিণ্ডদান করতে সমর্থ হ'ন ত্রিবেণীতে (ভারত নেপাল সীমান্তে)।

ক্রমে পাহাড়ি বাবা কৃপা করে দীক্ষা দিলেন। পাহাড়ি বাবা প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় হোম করেন আশ্রমে। তাঁর হোমাগ্নি শিখাও গভীর তাৎপর্য মণ্ডিত। হোমের মাধ্যমে তিনি বৃষ্টি স্তম্ভনও করতেন। তাঁর আশ্রমের চারপাশে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তাঁর আশ্রমে উন্মুক্ত স্থানে হোমাগ্নির প্রজ্বলিত শিখা বিরাজমান। এই হোমের ভস্ম খুবই পবিত্র ও দিব্য বস্তু। এই হোম করে কবচ দিলেন পাহাড়ি বাবা, তাঁর শিষ্য সাগর নিয়োগীকে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন। সেই থেকে তিনি আশ্রমে শ্রীগুরুর চরণে রয়ে গেলেন। অদূরে তাঁর বাড়ী। তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে দেহ ত্যাগ করেছেন। তিনি আশ্রমে থেকে মনপ্রাণ দিয়ে শ্রীগুরুর সেবা ও আশ্রমের উন্নতি কল্পে

নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত করেছেন। তারই মাঝে জপ ধ্যান করেন।

এই রকম ভাবে পাহাড়ি বাবার দিব্য কৃপা বহু ভক্তবৃন্দ লাভ করেছেন।

ভারতে পাহাড়ি বাবার একাধিক স্থানে আশ্রম আছে বলে জানা যায়। মজঃফরপুর তার অন্যতম।

পাহাড়ি বাবার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য শিষ্যা ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা কম নয়।

প্রায় একশো চল্লিশ বছরের প্রাচীন মহাপুরুষ পাহাড়ি বাবার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পাহাড়ি বাবা লেখককে বললেন, "পরমানন্দ গেল, শঙ্করানন্দ গেল, বিশুদ্ধানন্দ গেল, নিজ হাতে ওদের সমাধি দিয়েছি।"

১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পাহাড়ি বাবা তাঁর আরাধ্যাদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার মহাক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠ ঘুরে আসেন।

তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মহান ক্ষেত্রও এই তারাপীঠ। তিনি তারাপীঠে গিয়ে শিষ্য সাগর নিয়োগীকে দেখান কোথায় কোথায় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বসতেন, কাজ করতেন এবং তিনি কোথায় বসে জপধ্যান প্রভৃতি করতেন।

১৯৮২ সালের ১৫ই আগস্ট চুঁচুড়ার আশ্রমে বসে পাহাড়ি বাবার প্রথম সাক্ষাতকার লেখক গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৮২) গ্রহণ করেন। উপরোক্ত সকল তথ্য পাহাড়িবাবা স্বয়ং লেখককে বলেন। তাঁর শিষ্য সাগর নিয়োগী ও পাহাড়িবাবার ভক্ত নারায়ণ বাবু তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বলেন।

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতকারটির সময় পাহাড়িবাবা দীর্ঘসাড়ে তিন ঘন্টা (বেলা দেড়টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) ধরে বিচিত্র ভাবে রুক্ষ কঠিন সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর শিষ্য ভক্তদের সামনে লেখককে হিন্দু ষড়দর্শনের সকল দিক নিয়ে অতি কঠিন পরীক্ষা করেন। তারপর প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজ ইষ্ট গুরু ও সাধনার সকল কথা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার উপরোক্ত খড়ম জোড়া পূজার আসন থেকে নামিয়ে এনে লেখককে ছবি তুলতে দেন 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের জন্য।

সাক্ষাতকারের পর, দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে কঠোর সমালোচকের ভূমিকা নেবার কি প্রয়োজন ছিল পাহাড়ি বাবার, তা লেখক প্রসাদ গ্রহণ কালে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন এই একশো চল্লিশ বছর বয়স্ক সিদ্ধ মহাপুরুষ পাহাড়ি বাবাকে। উত্তরে পাহাড়ি বাবা মৃদুহেসে বললেন, "বাবা, এই ধরনের দার্শনিক আলোচনা বহুদিন হয়নি, তাই আপনার সাথে একটু বাজিয়ে নিলুম। আর আপনাকেও পরীক্ষা করলুম। শাস্ত্রে আছে, 'আপন সাধন কথা, বলিবেনা যথাতথা'। 'সাধুদের কাছে নিজ ইস্ট, গুরুকরণ, মন্ত্র, সাধনা, সিদ্ধি, উপলব্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলো অতি নিগূঢ় ও পবিত্র এবং গোপনীয় ব্যাপার।

সাধুরা তাঁদের এই কঠিন সাধনলব্ধ বস্তু সযত্নে অন্তরে রাখেন। কারোকে বলেন না বা দেন না। ঐশী নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত আধার না হলে তা বলা বা দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাতে সাধুর ক্ষতি হয়।

আপনি যে তারামা ও গুরু বামাক্ষ্যাপার ইচ্ছায় ঐশী নির্দিষ্ট হয়েই এসেছেন তা আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই বুঝেছিলুম। তবু আপনার 'একাগ্রতা' ও 'নিষ্ঠা' এবং 'জ্ঞান' ও 'তন্ময়তা' একটু পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হ'ল। ভালই হ'ল। সংশয় রইলোনা। তাই প্রাণ খুলে এতকাল বাদে সর্বপ্রথম এভাবে এসব কথা বললুম। গেরুয়া পরলেই কি বাবা শুধু 'মহাপুরুষ' হয়? বা দাড়ি জটা রাখলেই কি 'মহাপুরুষ' হয়? সাধনা হ'ল অন্তরে, মনের তন্ময়তায়। আর কঠোর একাগ্রতা আর নিষ্ঠাই হ'ল সেই সিদ্ধির দ্বার। তারামা ও বামদেব একযুগ ধরে আপনাকে সেই দ্বারে পেঁীছে দিয়েছেন।"

বিদায় নেবার সময় প্রণাম করে আশির্বাদ চাইলে এই প্রাচীন মহাপুরুষ পাহাড়ি বাবা দু'হাত জোড় করে নিজ মস্তকে রেখে বললেন, "ঠাকুর বামদেব আপনার মঙ্গল করুন। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করতে পারে না। আশির্বাদ করতে পারেন তারামা, বামদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতিগণ। আমরা প্রার্থনা করতে পারি মাত্র। আমরা অঘোরী।"

আশ্রমের সীমা পর্যন্ত পরম করুণাঘন মূর্তি নিয়ে পাহাড়িবাবা লেখকের সাথে সাথে এলেন। পাহাড়িবাবার শিষ্য সাগর বাবু ও ভক্ত নারায়ণ বাবু বললেন, "বাবা আপনাকে অশেষ কৃপা করেছেন। নইলে আপনি আসামাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে আপনার সাথে অবিরাম কথা বলতেন না এবং তারপর আবার এত সব দিতেনও না।

এমনটি কখনো আমরা দেখিনি। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান। যখন খুশি চলে আসবেন।" ইত্যাদি।

পাহাড়ীবাবার সাথে উপরোক্ত সাক্ষাতের দু'বছর পরে পাহাড়িবাবা সহসা দিন তারিখ জানিয়ে স্বেচ্ছায় অলৌকিকভাবে এই আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন (১৯৮৪ সালে)।

সেখানেই সমাধি দেয়া হয় তাঁর দিব্য ও পবিত্র মরদেহের। যথা সময়ে বিশাল ভাণ্ডারা দেয়া হয় তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ি বাবার সাথে উপরোক্ত সাক্ষাতকার ও সংযোগের জন্য লেখক, শ্রীচন্দ্রশেখর মিত্র, সমর বসু ও তাঁর অনুজ অমর বসুর কাছে কৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম চরণে যোগীরাজ রামনাথ অঘোরীবাবা

আনুমানিক বাংলা ১২৮৩ সনে একটি বত্রিশ বছরের তেজদৃপ্ত দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ যুবক একদিন তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে এসে প্রণাম করতেই শ্রীবাম যুবককে আশির্বাদ করে মৃদু হেসে বললেন, 'এ ছেলে একদিন রাজসিক সাধক হবে।'

উপস্থিত সবাই একথা শুনে বিস্মিত হলেন। শ্রীবামের আশির্বাদ লাভ করে যুবক তারাপীঠে শ্রীবামের সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটালেন। ক্রমে শ্রীবামের কৃপায় যোগ ও তন্ত্রের বহু নিগূঢ় ক্রিয়া

যুবক ধীরে ধীরে করায়ত্ব করতে লাগলেন। যুবক মাঝে মাঝে শ্রীবামের নিবিড় সান্নিধ্যে কাটিয়ে যান তারাপীঠ এসে।

যথা সময়ে যুবক শ্রীবামের কাছ থেকে স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করেন।

এই মহাসৌভাগ্যবান যুবকই হলেন উত্তরকালে ভারত বিখ্যাত ডাক্তার যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা। যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবার সুদীর্ঘ জীবন ইতিহাসও বিশাল বৈচিত্র্যে ভরপুর।

আনুমানিক বাংলা ১২৫১ সনে (ইং ১৮৪৫) তাঁর জন্ম হয় বিহারের পাকুরের রাজপরিবারে। তিনি ছিলেন পাকুরের ছোট রাজকুমার। কিন্তু এই রাজপরিচয় তিনি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কখনো।

ছোটবেলা থেকেই তিনি তাঁর মামাবাড়ী বোলপুরের অদূরে বেলেগ্রামে ছিলেন। কৈশোর থেকেই তাঁর প্রকৃতি ছিল দুর্দান্ত। তিনি অসম্ভব দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন। ভয় ডর বলে কিছু তাঁর ছিল না। অন্যায়কারীকে প্রয়োজন হলে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতেন।

বামদেবের কাছ থেকে স্বপ্নে দীক্ষিত হ'বার পর তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন হ'ন এবং অবশেষে আপ্তকাম হ'ন।

তাঁর কঠোর সাধনা উত্তরকালে কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়। নেপালের বরফাবৃত এক গুহায় এক নাগাড়ে বার বছর একপায়ে দাঁড়িয়ে কঠোরতম সাধনা করেন। তাছাড়া কোশী নদীগর্ভে দীর্ঘকাল জলের তলে কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শীতকালে নদী বরফে রূপান্তরিত হলেও তিনি তাঁর তলদেশে হাজার মন বরফের চাপের মধ্যে নির্বিকার ভাবে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে সুদীর্ঘকাল সাধনা করে সিদ্ধ হ'ন।

দেহবোধহীন এই সিদ্ধ সাধক পরবর্তীকালে ভারতের বিখ্যাত নাথ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাধন প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ন।

অবশেষে কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতবিখ্যাত মহান নাথযোগী 'বড়্‌ঢে বাবা'র কাছ থেকে তিনি নাথ ধর্মে দীক্ষিত হ'ন। নাথ-ধর্মমতে তাঁর কর্ণভেদ করান বিখ্যাত নাথযোগী সুন্দরলাল। অবশেষে যোগ পথেও সিদ্ধ হ'ন।

তন্ত্র ও যোগ এই উভয় পথেই তিনি সিদ্ধ হয়ে নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান হ'ন।

নেপালের 'ভাতমেস্মরে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের প্রায় সকল বিশিষ্ট তীর্থস্থান দর্শন করেন। মানস সরোবর ও কৈলাস তিনি, বহুবার পরিক্রমা করেন।

তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতির খ্যাতি সারা ভারতে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিশিষ্ট সিদ্ধযোগী মহাত্মাগণ তাঁকে 'যোগীরাজ' বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। আবার 'অঘোরী' রূপেও তাঁর খ্যাতি অঘোরী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হয়।

ভারতবর্ষ ও নেপালের বহু বিশিষ্ট সাধক, যোগী ও মহাত্মাগণ ক্রমে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দশমহাবিদ্যার পূজারী ভূপেশ ভট্টাচার্য্য (সত্যানন্দগিরি, কালীঘাট), বিজয় অঘোরী (টালিগঞ্জ) হীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ি (তারাপীঠ) প্রভৃতিগণ।

তাছাড়া বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ কঙ্কালী বাবা (জগদীশ মজুমদার, দুমকা) তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন (এদের সবার সাথে লেখকের পরিচয় ঘটেছে)। 'কঙ্কালী বাবা'র গুরু মহাসাধিকা শ্রীশ্রীরাঙ্গামাও যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন।

নেপালের রাজা মহেন্দ্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পুত্র যুবরাজ বীরেন্দ্র (বর্তমানে রাজা) অলৌকিকভাবে রামনাথ বাবার দ্বারা জীবন ফিরে পান। রাজা বীরেন্দ্রও গুরু প্রতীম যোগীরাজ অঘোরী বাবাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। তাঁর অভিষেকের সময় রামনাথ অঘোরী বাবার শ্রীহস্ত থেকে রাজমুকুট পরবার ইচ্ছে ছিল। সেই সময় রামনাথ বাবা কোলকাতায় ছিলেন। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যায় তাঁর কাছে। কিন্তু আত্মপ্রচার বিমুখ রামনাথ বাবা সারা বিশ্বের রাজা, মহারাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্নেহের বীরেন্দ্রকে রাজমুকুট পরাতে রাজী হলেন না। অন্য লোকের ওপর ভার দিয়ে এক গরীব ভক্তের অসুখের সংবাদ পেয়ে পাটনায় চলে গেলেন। গ্রন্থলেখক তখন তাঁর পাশেই বসে ছিলেন। সারাবিশ্বের সামনে তাঁর নাম যশের এই দুর্লভ সম্মান ও সুযোগকে নিতান্ত হেলায় তিনি ত্যাগ করলেন। যথার্থ সাধু তিনি। যথার্থ সাধক যিনি, তিনি কখনো নাম যশের কাঙ্গাল হ'ন না। ১৯৭৪ সাল

থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর লেখক ডাক্তার যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবার নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন এবং অশেষ স্নেহধন্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ একশো চৌত্রিশ বছরের জীবনের বহু অকথিত ও অপ্রকাশিত কাহিনী তিনি লেখককে সর্বপ্রথম বলেছেন। লেখককে আরো বলেছেন, "শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী তারানাথের (শ্রীশ্রীতারাক্ষ্যাপা) চেয়ে বয়সে আমি বড়।"

তাছাড়া শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্বপ্নে দীক্ষা পাবার প্রসঙ্গে তিনি লেখককে এক অতি আশ্চর্য অভিনব, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। রামনাথ বাবা বলেন, "আমার গুরুদেব বামাক্ষ্যাপা আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দেন। দুই তারাক্ষ্যাপা (ব্রহ্মচারী তারাক্ষ্যাপা (জুড়নপুর) ও বসিরহাটের তারাক্ষ্যাপা (মণিগোঁসাই) এবং পরে মনোহর ক্ষ্যাপা (পুরুলিয়া) প্রভৃতি সবাই গুরুদেব বামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে স্বপ্নে দীক্ষা পান। বামাক্ষ্যাপা বাবার সকল শিষ্যই স্বপ্নে দীক্ষিত।" যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা যখন নেপালে 'ভাতমেস্বর' আশ্রমে রয়েছেন, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও জেনারেল সেক্রেটারী কুশেচভ ভারত হয়ে নেপালে আসেন (১৯৫৩)।

পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের অধিপতি রাজা মহেন্দ্রর অনুরোধে যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা বুলগানিন ও কুশেচভের মাথায় হাত রেখে হিন্দুপ্রথায় আশির্বাদ করেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্যতম স্নেহ, কৃপা এবং দিব্যসঙ্গধন্য 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত শিল্পী ও পরিব্রাজক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবার মহারাষ্ট্রের 'পুনা'তে সাক্ষাত ও গভীর আলাপ হয়। প্রামোদবাবু সম্পর্কে রামনাথ বাবার শ্রদ্ধা ও প্রীতি এই লেখককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। লেখক এই উভয় মহাত্মার বিশেষ স্নেহধন্য।

ইংরেজী ১৯৭৫ সালে তিনি গ্রন্থকারকে তাঁর জীবনের বহু আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমার জীবনের কথা এভাবে তোমার কাছেই প্রথম বললাম। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থে তা চিরতরে লিপিবদ্ধ থাকলে লোকের কল্যাণ হবে।" কিন্তু রামনাথ বাবার বর্ণিত সকল নিগূঢ় কথা ও ঘটনা প্রকাশ করতে গেলে তা একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই অতি সংক্ষেপে এই একটি মাত্র অধ্যায়ে ; সার সংক্ষেপেটুকু বর্নিত হ'ল।

১৯৭৯ সালের ২রা ডিসেম্বর রবিবার যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা কোলকাতার আশ্রমের জন্য ইন্টার্ণ বাইপাসের কাছাকাছি একটি জমি দেখতে আসেন। লেখক তাঁর সাথে ছিলেন। ফেরবার পথে তিনি সেদিন লেখকের গৃহে কিছু সময়ের জন্য আসেন। তাঁর স্বল্প কালীন অবস্থান লেখকের অন্তরে চির মধুর স্মৃতি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রামনাথ বাবার কলকাতার শ্যামবাজারের আশ্রমঘরটি বহু দেব দেবীতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মময়ী তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রাণবন্ত রূপ ও ভাব তাঁর সেই ঘরে প্রবেশ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

যোগীরাজ রামনাথ বাবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মহান বিপ্লবী ছিলেন। বহু বিপ্লবী তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। তবে তিনি তাঁর গুরুভাই তারাক্ষ্যাপার (জুড়নপুর) ন্যায় অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তবু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে যেমন তারাক্ষ্যাপা তেমনি রামনাথ অঘোরী বাবার সাথেও গভীর যোগাযোগ ছিল (মহাত্মা তারাক্ষ্যাপার কথা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।) ১৯৭৫—১৯৭৯ সালের মধ্যে রামনাথ অঘোরীবাবা বহুবার এই গ্রন্থলেখককে নেতাজী বিষয়ক বহুতথ্য প্রদান করেন এবং তিনি আরো জানান যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখককে বলেন, "সুভাষ জীবিত রয়েছেন। আমার সাথে ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যে কয়েকবার নেপালে ও কোলকাতায় দেখা করে গেছেন।" নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লেখককে বলেন, "সুভাষ জীবনে নারী স্পর্শ করেনি। বিবাহ তো দূরের কথা। সুভাষ, সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুভাষ বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে অধ্যাত্ম সাধনার পথে রয়েছেন। বার্ধক্য তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সেও স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ যোগ সিদ্ধ দেহ। ভারতবর্ষের বহু সিদ্ধ মহাপুরুষের অধ্যাত্ম শক্তি সুভাষের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়েছে। যথাসময়ে সুভাষ দেশ ও জগৎ কল্যাণে আত্মপ্রকাশ করবে।"

যোগীরাজ রামনাথ অঘোরীবাবা তাঁর অসাধারণ যোগশক্তির দ্বারা তাঁর আশ্রিত শিষ্য ভক্ত সন্তানদের বহু কঠিন রোগ সকল নিজদেহে

টেনে নিয়ে তাঁদের রোগ থেকে মুক্তি দিতেন। পরে একটি বিশেষ যোগক্রিয়ার দ্বারা তা দেহ থেকে বের করে দিতেন।

১৯৭৯ সালে কালী পূজোতে এই লেখককে স্বজনসহ আমন্ত্রণ করেন রামনাথ বাবা তাঁর শ্যামবাজারের গৃহাশ্রমে। লেখক যান কালীপূজোর রাতে এবং মধ্যরাতে রামনাথ বাবা পূজা শেষ করলেন। পাঠাবলির পরিবর্তে কুমড়ো প্রভৃতি বলি দিলেন স্বহস্তে। তখনও তিনি সুস্থ দেহে বিরাজ করছেন। লেখক ও তাঁর স্বজনদের তিনি প্রসাদ গ্রহণ করালেন আন্তরিকতার সাথে।

কালীপূজোর কিছুদিন পর একটি আশ্রিত ভক্তের একটি ভয়ঙ্কর রোগ তিনি অনিচ্ছাসত্বেও নিজ দেহে টেনে নেন ভক্তের প্রবল আর্তির জন্য। কিছুদিন পর তা বের করবার জন্য যে যোগ ক্রিয়া করেন তা ব্যস্ততার দরুন ও অন্যমনস্কতার জন্য সফল হয় না। ফলে সেই রোগটিই তাঁর দেহত্যাগের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৮০ সালের ৬ই জানুয়ারী রবিবার বেলা দেড়টার সময় ডাক্তার যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবা স্বেচ্ছায় মরলীলা সমাপ্ত করে তারামণ্ডল তথা বামমণ্ডলে চলে গেলেন ইষ্ট তথা গুরুর কোলে।

পরদিন ৭ই জানুয়ারী সোমবার সকালে তাঁর মরদেহ বালুরঘাটে নিয়ে যান তাঁর কিছু সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ। লেখক সেদিন শেষ প্রণাম জানিয়ে আসেন মহাযোগী রামমাথ বাবার মহাসমাধিতে মগ্ন মরদেহের উদ্দেশ্যে। বরফাবৃত সেই ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তমূর্তি দেখলে মনে হবে তিনি যেন ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন। বালুরঘাটে নিয়ে গিয়ে তাঁর মরদেহের মহাসমাধি দেয়া হয়।

সমাধিকালে তাঁর দেহ থেকে আশ্চর্যভাবে প্রচুর রক্তবমন হয় এবং দেহ উষ্ণ হয় সাময়িকভাবে। এই ব্যাপারে অনেকে হতচকিত হয়ে পড়েন। যাহোক, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহান উন্নত শিষ্য ডাক্তার যোগীরাজ রামনাথ অঘোরী বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল, তাঁর এই মরদেহের সমাধি তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির মহাক্ষেত্র নেপালে ভাতমেশ্বর আশ্রমে দেবার জন্য। এজন্য তিনি স্থান নির্বাচন করেও রেখেছিলেন এবং সমাধি স্থানটি স্বহস্তে খুঁড়েও রেখেছিলেন। তাঁর ভক্ত নেপালের রাজা বীরেন্দ্রও চেয়েছিলেন নেপালে তাঁর

মরদেহকে এনে সমাধি দেয়া। কিন্তু কিছু সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন বালুরঘাট নিয়ে গিয়ে সমাধি দেবার। এজন্য রামনাথ বাবার বিশাল শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী ভাণ্ডারার দিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বালুরঘাটে স্মৃতি মন্দির এখনও যথার্থ নির্মিত হয় নি। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীরামনাথ অঘোরী বাবার কাছে চির কৃতজ্ঞ। তাঁর শিষ্য বিজয় অঘোরী, হীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, শিষ্যা উমাদেবীর কাছেও কৃতজ্ঞ।

শ্রীশ্রীরামনাথ অঘোরী বাবার সাথে সংযোগের ব্যাপারে শ্রীমান সরোজ সিন্‌হার কাছেও লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—০—

বিচিত্র আলাপ ও মহাজ্ঞান দান

একদিন মোক্ষদানন্দ ও শ্রীবাম তারামায়ের আঙ্গিনায় বসে কথা বলছেন। তারামায়ের পূজা প্রসঙ্গে মোক্ষদানন্দ শ্রীবামকে বললেন, "তাই তো রে বামা, পাঁঠার দাম বেড়ে গেল, তারামা'র পূজা কেমন করে হবে ভাবছি।" শ্রীবাম তাই শুনে বললেন, "তাই তো মোক্ষদানন্দ বাবা আমি ভাবতাম তারামা'র লেগে ভাববার কেউ নাই। এখন দেখি মোক্ষদানন্দ বাবা রইছেন। পাঁঠার লেগে ভাবনা কি বাবা, আপনি রইছেন, আমিই রইছি।"

শ্রীবাম এই কথার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, জগতের ব্যাপার তারামা অনন্ত চিন্তা করেন। এই সমগ্র জীব জগত তারামা'র মধ্যেই রয়েছে। তাই তারামা'র চিন্তার অংশীদার হবার প্রয়োজন নেই। তারামাকে দেখা ও পাবার চিন্তা করাই প্রতিটি

জীবের প্রধান কাজ। শরণাগতির মধ্য দিয়েই এ কাজ করতে হবে। তাই শরণাগত হওয়াই এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ কাজ।

সুতরাং ঈশ্বরের কাজের জন্য না ভেবে, ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত ভক্ত ও সাধক সন্তান মাত্রেই।

এই মহাজ্ঞানই শ্রীবাম পরোক্ষভাবে তাঁর উপরোক্ত বিচিত্র সংকেত মূলক ভাষায় আচার্য্য স্বরূপ বৃদ্ধ মোক্ষদানন্দকে বুঝিয়ে দিলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটি ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত এই লেখককে বলেছেন (১৯৭৬)। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তারাপীঠে মাধবানন্দ গিরিমহারাজ

ভারতবিখ্যাত মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ তারাপীঠে এলেন আনুমানিক বাংলা ১২৮৪ সালে। তারামন্দিরে তারামাকে প্রণাম করে এই প্রাচীন সিদ্ধ মহাপুরুষ এলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে। ভারতবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ভগবান গাঙ্গুলীর অন্যতম মহানশিষ্য ও বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরুভাই দেড়শতাধিক বছর বয়স্ক মাধবানন্দ গিরি মহারাজ মহাশ্মশানে প্রবেশ করলেন।

মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বসে আছেন। উভয়ে উভয়কে সানন্দে আলিঙ্গন করলেন। দু'জনের সাধনার পথ ও মত ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সিদ্ধি লাভের পর কোন ভেদাভেদ থাকেনা। এক ব্রহ্মানন্দ সাগরে সবাই ভাসেন। তাই দেড় শতাধিক বছর বয়স্ক মহাযোগী ও ও মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রেমিক শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের সাথে মাত্র চল্লিশ বছর বয়স্ক মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক ও পরম প্রেমভক্তির মহান বিগ্রহ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কোন ব্যবধান নেই। এক ও অভিন্ন দিব্যানন্দে উভয়ে বিভোর হয়ে রইলেন।

তারপর নিগূঢ় অধ্যাত্ম ভাব বিনিময়ে উভয়ে মগ্ন হলেন।

তারাপীঠে কয়েকদিন মহানন্দে অতিবাহিত করে মাধবানন্দগিরি সশিষ্য বিদায় নিলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে। শ্রীবামও তাঁকে যথাযথ মর্য্যাদা দিয়ে বিদায় জানালেন।

উত্তরকালে তারাপীঠের এই মধুর স্মৃতির কথা এই গ্রন্থ লেখককে তিনি আনন্দের সাথে জানান।

বাংলা ১৩৭৯ সালে (ইংরেজী—১৯৭৩) প্রায় শত বছর পূর্বে দেখা তারাপীঠের সেই মধুর স্মৃতিকথা তিনি লেখককে তাঁর কোন্নগর আশ্রমে বসে জানান। তখন তাঁর বয়স দু'শো পয়তাল্লিশ বছর। প্রায় আড়াইশো বছরের এই ভারত বিখ্যাত প্রাচীন মহা-পুরুষ সেই তারাপীঠ ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অমৃত কথা বলতে বলতে দিব্য আনন্দে বিভোর হয়ে লেখককে বললেন, "বাবা, আমি সারা ভারতবর্ষ ও প্রায় সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করেছি। কিন্তু বামাক্ষ্যাপার মত আনন্দময় পুরুষ বেশী দেখিনি। বামাক্ষ্যাপার সাথে কথা বলে বড় আনন্দ পেয়েছি। আহা, কি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন তিনি। ওঁর এক শিষ্য কাশীর ব্রীজের নীচে আছে।" সদাসত্যে অধিষ্ঠিত ও জ্ঞানকর্ম ও যোগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ভারতবিখ্যাত প্রাচীন মহাপুরুষ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান মুক্তপুরুষ মাধবানন্দ গিরির এই মহান মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহান সত্তার আনন্দময় দিকটি সত্যদ্রষ্টা মহাযোগী মাধবানন্দ গিরির দিব্য দৃষ্টিতে যথার্থ উন্মোচিত হয়েছে।

এই ভারতবিখ্যাত প্রাচীন মহাপুরুষের দিব্য জীবন কাহিনী বিশাল বৈচিত্র্যময়। বাংলা ১১৩৫ সালে (ইং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার কচুয়া গ্রামে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ ও তাঁর আবাল্য সুহৃদ লোকনাথ ঘোষাল (উত্তর কালে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে বিখ্যাত) ঐ গ্রামেই আবির্ভূত হ'ন তাঁর দু'বছর পর অর্থাৎ বাংলা ১১৩৭ সালে। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর চেয়ে তিনি যে দুবছর বড় ছিলেন তা তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে এই লেখককে বাংলা ১৩৭৯ সালে (ইং ১৯৭৩) বলেন

(তখন তাঁর বয়স দুশো পয়তাল্লিশ বছর)। একই দিনে তাঁর ও তাঁর বাল্য বন্ধু লোকনাথের উপনয়ন হয় কচুয়া গ্রামের বাড়ীতে। বাংলা ১১৪৮ সালে এই উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল তের এবং লোকনাথের এগার। উভয়ের আচার্য্য গুরু ছিলেন দেশ বিখ্যাত মহাপণ্ডিত, মহান জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী ভগবান গাঙ্গুলী। ভগবান গাঙ্গুলীর বয়স তখন প্রায় ষাট বছর। আনুমানিক বাংনা ১০৮৮ সালে (ইং ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে) ঐ কচুয়া গ্রামেই (প্রাচীন নাম কাঁকড়া) এই মহাজ্ঞানী মহাসাধকের আবির্ভাব ঘটে। ভগবান গাঙ্গুলীর পিতার নাম রামকুমার গাঙ্গুলী। ছোট ভাইয়ের নাম গঙ্গাধর গাঙ্গুলী। ভগবান গাঙ্গুলী ছিলেন কান্যকুব্জ থেকে আগত গাঙ্গুলী বংশের আদি পুরুষ মহাত্মা বেদগর্ভের তেইশতম পুরুষ এবং সর্বানন্দ মেলের রাখব গাঙ্গুলীর সপ্তম পুরুষ। ভগবান গাঙ্গুলী জ্ঞানযোগী ও ক্রিয়াবান ছিলেন।

যাহোক, উপনয়নের পর প্রাচীনকালের বেদোক্তমতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আদর্শ অনুসারে এই দুই ব্রহ্মচারী বালকের ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী চিরতরে সংসার ত্যাগ করে উভয় শিষ্যকে নিয়ে বের হলেন।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রথা ছিল। দেবলোকে সনক, সনন্দ, সনাতন প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং মহাতপা তেজস্বী বালখিল্য মুনিগণ এই দুর্লভ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।

যে সকল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়নের পর গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক গুরুর কাছ থেকে বেদ অধ্যায়ন ও করায়ত্ব করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে আর পিতৃগৃহে ফিরে সংসার জীবনে প্রবেশ করতেন না এবং কঠোর নিষ্ঠার সাথে ব্রহ্মচারীরূপে সারাজীবন অতিবাহিত করতেন, সেই নিষ্ঠাবান ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়। বেণীমাধব ও লোকনাথকে চিরতরে এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আদর্শে তৈরী করেন আদর্শ গুরু ভগবান গাঙ্গুলী।

ভগবান গাঙ্গুলীর ন্যায় গুরু ভারতের সাধনার সমগ্র ইতিহাসে খুবই বিরল। তখনকার দিনে ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিত ও মহাসাধক

হয়ে, সংসারী হয়ে, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে এবং বিশাল নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তির মধ্যে থেকেও সব পরিত্যাগ করে চিরতরে এই বালক ব্রহ্মচারীদ্বয়কে নিয়ে সংস্সার ত্যাগ করলেন। সর্বোপরি তাঁর বয়সের কথা ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ ষাট বছর বয়সে সকল প্রিয়জন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে দুটি বালকের সাধনা ও সিদ্ধির দুরুহ দায়িত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের বিরাট দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন, দেশব্যাপী ঘোর অরাজকতার সময়ে।

দেশে তখন মোগল সাম্রাজ্যের শাসন প্রায় আস্তমিত এবং ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়নি (ইং ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ)।

ইংরেজ বনিকের মানদণ্ড 'তখনও' 'রাজদণ্ড' রূপে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে দেখা দেয় নি। দেশব্যাপী অরাজকতা চলছে। পলাশীর যুদ্ধের ষোল বছর পূর্বের এই অরাজকতার ঘোর দুর্যোগের মধ্যে বৃদ্ধ ভগবান গাঙ্গুলী দুই ব্রহ্মচারী বালক বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকনাথ ঘোষালকে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন চিরতরে। নিজের বার্ধক্য, সংসার ও প্রিয়জন এবং অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবলেন না।

ঈশ্বরের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর রেখে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে দু'টি বালকের সাধনা ও সিদ্ধির কঠিন দায়িত্ব নিয়ে বৃদ্ধ ভগবান গাঙ্গুলী সাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হলেন।

তখনকার পথঘাট গভীর জঙ্গল পর্ণ। তার ওপর ঠগ ডাকাতের ভয় তো ছিলই। বারাসতের কচুয়া গ্রাম থেকে পদব্রজে হাটতে হাটতে ভগবান গাঙ্গুলী বালক বেণীমাধব ও লোকনাথকে নিয়ে কালীঘাটে এলেন। তখন কলকাতা নগরীর সৃষ্টি হয়নি। পথঘাট গভীর জঙ্গলে পূর্ণ। সুতানটি গোবিন্দপুর ও কলকাতা, তিনটি গ্রাম মাত্র। কালীঘাট তখন ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গঙ্গাতীরে জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট্ট কাঠের মন্দিরে তখন মা কালী অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। এই সময় বহু তান্ত্রিক সাধক এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট কুটীর নির্মান করে সাধন ভজন করতেন। এখানে কিছুদিন অবস্হানের পর ভগবান গাঙ্গলী শিষ্যদ্বয়ের সাধনার জন্য কালীঘাট ত্যাগ করে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন এবং মাঝে

মাঝে জঙ্গল মধ্যে অবস্থান করে বেশ কিছুকাল ধরে শিষ্যদ্বয়কে কঠোর সাধনার পথে অগ্রসর করাতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

প্রথমে 'নক্তব্রত' অর্থাৎ দিনে অনাহার থেকে 'নক্ত' মানে রাতে একবার হবিষ্য গ্রহণ করা। তারপর 'একান্তরা' অর্থাৎ একদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থেকে পরদিন একবার হবিষ্য গ্রহণ করা। অতঃপর 'ত্রিরাত্রি' অর্থাৎ তিনদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থেকে চতুর্থ দিন একবার অন্ন গ্রহণ করা। পরে 'পঞ্চাহ' অর্থাৎ পাঁচদিন উপবাস করে ছয়-দিনের দিন আহার করা।

এভাবে 'নবরাত্রি', 'দ্বাদশাহ', 'পঞ্চাহ' এবং সবশেষে 'মাসব্রত' অর্থাৎ একমাস সম্পূর্ণ উপবাসী থেকে তারপর দিন অন্নগ্রহণ করা প্রভৃতি কঠোর দুরুহ সাধন সকল শিষ্যদ্বয়কে করালেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শিষ্যদ্বয় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হলেন। এই দুরুহ 'নক্তব্রত' অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক স্তরগুলো সাফল্যের সাথে দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই কঠিন সাধনা করান গুরু ভগবান গাঙ্গুলী শিষ্যদ্বয়কে। শিষ্য বেণীমাধব ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাফল্যের সাথে এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হ'ন। এই সুদীর্ঘকাল সাধনার সময় শিষ্যদ্বয়ের জন্য ভীক্ষা করা, রান্নার ব্যবস্থা করা, রান্না করা এবং সাধনায় উপবিষ্ট শিষ্যদ্বয়কে আহার করিয়ে দেয়, তাঁদের ব্যবহৃত ভোজনপাত্র মার্জনা করা, এমনকি তাঁদের শৌচাদি করিয়ে দিয়ে মলমূত্র পর্যন্ত পরিস্কার করা প্রভৃতি সকল কার্য্য এই দীর্ঘকাল ধরে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী একাই করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় একশো বছর। তাঁর ষাট বছর বয়স থেকে এই একশো বছর পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি এইভাবে শিষ্যদ্বয়ের সেবা করেন এবঃ সাথে সাথে এই উভয় শিষ্যকে জ্ঞান মার্গে ও কর্মমার্গে শিক্ষিত করে তোলেন।

পরবর্তী আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই প্রৌঢ় শিষ্যদ্বয়কে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ পথে সিদ্ধ করান এবং সেবা যত্নও করেন এবং হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিয়ে অবশেষে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে শিষ্যদ্বয়সহ আফগানিস্থানের কাবুলে যান এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে কাশীতে ফিরে আসেন। মহাযোগী হিতলাল মিশ্রের তথা তৈলঙ্গস্বামীর হাতে একদিন তাঁর শিষ্যদ্বয়কে

সমর্পণ করে বললেন, বাবা আমার এই বালক দু'টিকে আজ তোমার হাতে তুলিয়া দিলাম। তুমি আজ হইতে ইহাদিগের ভার নাও। ত্রৈলঙ্গস্বামী" তথাস্তু বলে সম্মতি দিলেন।

প্রায় দেড়শত বছর বয়স্ক ভগবান গাঙ্গুলীর তথাকথিত এই 'বালক' দু'টি বেণীমাধব (মাধবানন্দগিরি) ও লোকনাথ এর (লোকনাথ ব্রহ্মচারী) বয়স তখন প্রায় একশো বছর। তারপর কিছুদিন চারজনে একত্রে অবস্থান করবার পর একদিন কাশীর মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান ঘাটে তিনি স্নানান্তে যোগাসনে দেহত্যাগ করে নিত্যলোকে চলে গেলেন (বাংলা ১২৩৫ সালে, ইং ১৮২৮ খৃঃ)। গুরুর দেহত্যাগে শতবছর বয়স্ক সিদ্ধ পুরুষ বেণীমাধবজী অর্থাৎ মাধবানন্দগিরি ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী খুবই বিষণ্ণ হলেন। বাল্যকাল থেকে এই সুদীর্ঘ প্রায় একশো বছর ধরে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীই ছিলেন তাঁদের প্রাণ সর্বস্ব। একাধারে পিতামাতা গুরু সবই ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, গুরুর এমন শতাব্দী ধরে শিষ্যদের সীমাহীন সেবাযত্ন করবার কথা ভারতের সাধনার ইতিহাসে নেই।

উত্তরকালে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কথা স্মরণ করতে গিয়ে সিদ্ধ পুরুষ বেণীমাধবজী ও লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নয়নদ্বয় সজল হয়ে উঠতো। শিষ্যদের জন্য এমন ত্যাগ তিতিক্ষা অতি বিরল।

ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে শিষ্যের গুরুভক্তি ও গুরু সেবার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু সুদীর্ঘ নব্বুই বছরের ওপর গুরুর সীমাহীন নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক শিষ্য সেবার এমন জ্বলন্ত নিদর্শন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে নেই।

যাহোক, গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর শেষকৃত্য মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে সম্পন্ন করেন শিষ্যদ্বয় বেণীমাধবজী ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

এর কিছুকাল পর জ্ঞান কর্ম ও যোগসিদ্ধ বেণীমাধব তথা মাধবানন্দগিরি ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন পদব্রজে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করে অবশেষে আরব প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করে ইউরোপের ফরাসী প্রভৃতি দেশ অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা মক্কা ও মদিনাতে যান।

এই ভারতীয় সিদ্ধযোগী মহাত্মাদের মক্কা মদিনার ধর্মপ্রাণ

মুসলমানরা আতিথ্য দেন এবং সযত্নে রসুই করে ভোজন করান। মদিনা থেকে পশ্চিমে মরুভূমির মধ্য দিয়ে মক্কেশ্বর যাবার পথে 'আবদুল গফুর' নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের সাথে পরিচয় হয় তাঁদের।

এই প্রাচীন সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর চার জন্মের কথা বলতে পারতেন। তিনি এই ভারতীয় মহাপুরুষদের সাথে আলাপ করে ও তাঁদের যোগশক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, "পাকা লোকের (গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর) হাতে পড়াতে এত উন্নতি করতে পেরেছ। আমাদের ভাগ্যে এই রকম গুরু জোটেনি।" (ত্রৈলঙ্গ স্বামীও এমনিভাবেগ ভবান গাঙ্গুলী বাবাকে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন)।

মহাত্মা আবদুল গফুর ভারতের দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সাধন-পন্থার আনুগামী হয়ে আরবে এসে 'আবদুল গফুর' নামে মুসলমান সমাজে পরিচিত হ'ন।

যাহোক, দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমে পরিব্রাজনার শেষে তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন পদব্রজে।

অতঃপর তাঁরা সুমেরু অভিমুখে যাত্রা করলেন। এবার তাঁদের সঙ্গী হ'ন হিতলাল মিশ্র তথা ত্রৈলঙ্গস্বামী।

এই তিনজন নগ্ন সিদ্ধ মহাযোগী প্রায় পাঁচ বছর দূর্গম বদ্রীনারায়ণ মহাতীর্থে সারা বছর বরফের মধ্যে অবস্হান করে দেহকে সম্পূর্ণ বরফের উপযুক্ত করেন। তারপর অতি দূর্গম সুমেরু অভিমুখে অজস্র সুউচ্চ বরফের শৃঙ্গ অতিক্রম করে চলতে লাগলেন সুদীর্ঘকাল ধরে।

পথে 'উত্তর মানস' নামে এক বিশাল দিব্য সরোবর দর্শন করেন। প্রাচীন সিদ্ধ মহাযোগীগণ একেই যথার্থ 'মানস সরোবর' বলেন।

এই তিন প্রাচীন উলঙ্গ মহাযোগী সুদীর্ঘকাল ধরে অতি দূর্গম বরফের পথে চলতে থাকায় তাঁদের নগ্ন শরীরের ওপর একপ্রকার শ্বেতশুভ্র পুরু চর্মের আচ্ছাদন সৃষ্টি হয়।

ক্রমে তাঁরা রাশিয়ার উত্তর দিকের সাইবেরিয়া অতিক্রম করে উত্তর সাগরেরও উত্তরে চলতে চলতে অবশেষে এমন স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার। এই মেরু প্রদেশে

অন্ধকারের মধ্যে তাঁরা দীর্ঘ দশ বছর অতিক্রম করেন এবং এই সময় এই অন্ধকার বরফের মধ্যে তাঁরা প্রায় দেড় হাত বিশিষ্ট নগ্ন মানুষ দেখতে পান। বেণীমাধবজী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর দীর্ঘ দেহ দেখে এই ক্ষুদ্র নরনারীগণ প্রথমে ভীত হলেও পরে সেই ভাব কেটে যায়।

ক্রমে তাঁরা আরো অগ্রসর হয়ে সুমেরু পর্বতের দিকে ইলাবৃত বর্তের গভীর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করেন।

এখান থেকে ঘোর অন্ধকার বরফের সুউচ্চ স্তম্ভে আরোহণ করে তরঙ্গহীন বায়ু অনুভব করেন।

তারপর সুমেরু থেকে সুদীর্ঘকাল পর প্রত্যাবর্তন করে ত্রৈলঙ্গস্বামী উদয়াচল দর্শণের জন্য গমন করেন এবং সেখান থেকে কাশীতে ফিরে যান। ত্রৈলঙ্গস্বামীর নির্দেশে নিম্নভূমে কর্ম থাকার জন্য বেণীমাধবজী (মাধবানন্দগিরি) কামাখ্যাতে ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদীতে অবতরণ করেন ঐশী নির্দিষ্ট লীলা সুসম্পন্ন করবার জন্য।

উত্তরকালে এই সুমেরু ভ্রমণ ও অন্যান্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালে কোন্নগর আশ্রমে অবস্থান কালে প্রায় আড়াই শত বছর বয়স্ক বেণীমাধবজী তথা মাধবানন্দগিরি মহারাজ এই লেখককে শেষে বলেন, "বত্রিশ বছর ধরে চুরাশী হাজার মাইল আমরা ভ্রমণ করেছিলুম পদব্রজে।"

কামাখ্যা ও চট্টগ্রামের পাহাড় থেকে মাধবানন্দজী উত্তরা খণ্ডের বিভিন্ন স্হানে একা দীর্ঘকাল অবস্হান করেন।

ক্রমে এই প্রাচীন সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগ বিভূতি ও করুণাধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল মৌনী ছিলেন বলে মৌনীবাবা নামেও তিনি বিখ্যাত হ'ন। ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাসাধক মহাসাধিকাগণ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানান। সদানন্দময় এই প্রবীন মহাপুরুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁর নিত্য ভাণ্ডারা দেবার অপরিসীম উৎসাহ ও ক্ষমতা।

ভারতের উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ও পূর্বভারতে তাঁর বিশাল ভাণ্ডারা দেবার কথা সর্বজনবিদিত।

মাধবানন্দগিরি ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী পশুপাখী ও হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতির ভাষা বুঝতে পারতেন এবং কথাবার্তাও বলতেন। বাংলা ১৩৭৯° সালে (ইংরেজী—১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে) মাধবানন্দগিরি মহারাজ তাঁর কোন্নগরের গঙ্গাতীরের আশ্রমে ও হুগলীর আশ্রমে এই লেখককে অনেকবার নানান বিষয়ের বহু সারগর্ভ কথা বলেন।

তারমধ্যে তাঁর গুরু ভগবান গাঙ্গুলী, বাল্যবন্ধু লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তারাপীঠ, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, সুমেরু অভিযান ও বেদান্ত বিষয়ক এবং প্রেমভক্তি ও 'আনন্দ' বিষয়ে বহু কথা বলেন।

এই সময় (১৯৭৩) গ্রন্থ লেখক কেদারনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ, বদ্রীনারায়ণ ও উত্তরাপথের আরো কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রে যাবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাই মাধবানন্দ গিরি লেখককে বললেন, যে ঐসব তীর্থ ভ্রমণ করে ফেরবার পথে কাশীতে যেতে। কারণ কাশীর ব্রিজের নীচে বামাক্ষাপার এক উন্নত শিষ্য আছেন।" সেই অনুসারে কেদারবদ্রী ত্রিযুগী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে ফেরবার পথে কাশীতে নামেন এবং মাধবানন্দ গিরির নির্দেশ মত অনুসন্ধান করে বহু চেষ্টার পর মানস সরোবর ও কৈলাস ফেরৎ স্বামী সত্যানন্দের দর্শন লাভ করেন লেখক (যথাস্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে)।

এই লেখকের কাছেই সর্বপ্রথম তিনি এক বিশেষ কারণে তাঁর গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন এবং লোকনাথ ব্রহ্মচারী যে তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চেয়ে তিনি যে দু'বছরের বড় ছিলেন সেই কথাও তিনি লেখককে সর্বপ্রথম জানান। ইতিপূর্বে কোন নিগূঢ় কারণবশতঃ তা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর দেহত্যাগের সময়ে (২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭৪-লক্ষ্মৌতে) তিনি তা কেবলমাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গকে জানান।

যাহোক, এই গ্রন্থলেখক তাঁর কাছে অনেকবার যাতায়াত করে তাঁর শ্রীমুখ থেকে বহু দার্শনিকতত্ত্ব ও বহু দুর্লভ প্রাচীন তথ্য লাভ করেন। গ্রন্থলেখককে তিনি বহু নিগূঢ়তত্ত্বেরও সন্ধান দেন এবং অধ্যাত্ম সাধনার গভীর ইঙ্গিতও দেন।

স্বল্পকালের জন্য হলেও লেখক তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন এবং অসীম স্নেহ ও কৃপা লাভ করে ধন্য হ'ন।

এই আনন্দমথিত বিগ্রহের পাশে বসে সব সময় আনন্দে মন প্রাণ ভরে যেত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জগতজননী তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অসীম করুণা প্রেরণা ও মহাশক্তিতে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' রচিত হয়। এই রচনাকালীন লেখকেরও ভারতের শতাধিক সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাসাধিকার নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়। সেই সৌভাগ্যের গভীর আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকে লেখকও নিঃসন্দেহে বলতে পারেন যে, আড়াইশত বছরের এই প্রাচীন মহাযোগী ও ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ মাধবানন্দগিরি মহারাজের ন্যায় সার্বিক সদানন্দময় মধুর প্রকৃতি লেখকও পূর্বে কখনো দেখেন নি। একাধারে জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও প্রেমের এমন দুর্ল্লভ ও মধুর সমন্বয় খুবই বিরল।

এই আনন্দময় মহাপুরুষের অন্যতম বাণী হল, "আনন্দে থাক, আনন্দই তোমার স্বরূপ।"

তাই নানান অধ্যাত্ম প্রসঙ্গের মাঝে বলে উঠতেন, "আনন্দ, আনন্দ কর।"

লেখক ১৯৭৩ সালে ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, কাশী প্রভৃতি পর্য্যটন করে ফিরে এসে কোলকাতায় মাধবানন্দগিরিকে উপরোক্ত বামাক্ষ্যাপার শিষ্য প্রসঙ্গে জানান। তখন তিনি ভবানীপুরে এক ভক্তগৃহে সাময়িকভাবে অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমাধবানন্দগিরির অলৌকিক শক্তির অজস্র কাহিনী তাঁর শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে।

বাংলা ১৩৭৯ সালে তাঁর কোন্নগরের আশ্রমে তাঁর এক শিষ্য তাঁর একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এই লেখককে জানান।

চুঁচুড়া নিবাসী এই ভক্ত প্রবর অহিভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স তখন (১৩৭৯ সালে) প্রায় আটান্ন বছর।

মাত্র সাত বছর বয়সের কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে তিনি আক্রান্ত হ'ন। সেই সময় (১৩২৯ সালে) এই দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা বিশেষ ছিল না। তিনি মৃতপ্রায় হ'ন। তাঁর পিতা চিকিৎসার সাধ্যমত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সাত বছরের বালক পুত্রের বাঁচবার কোন আশা দেখতে না পেয়ে পিতা হতাশায় অধীর হয়ে ওঠেন। সহসা

বালকের পিতা শুনতে পেলেন যে ত্রিকূট পাহাড়ের ওপর বিরাট মহাযোগী মাধবানন্দগিরি অবস্থান করছেন। তিনি অপার করুণাময়। তাঁর কৃপা পেলে এই মৃত প্রায় পুত্র বেঁচে যেতে পারে।

তিনি তখন রক্তআমাশায় জর্জরিত মৃত প্রায় বালক অহিভূষণকে কোলে নিয়ে ত্রিকূট পাহাড়ে উঠলেন। তখন ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিলেন মাধবানন্দগিরি মহারাজ। তাঁর পাশে বসেছিলেন আরেক বিখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি। মাধবানন্দগিরি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ভোলানন্দগিরি বালকের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন যে বালকের জীবনদীপ নিভে এসেছে।

একটুপরে মাধবানন্দগিরি মহারাজের ধ্যান সমাপ্ত হ'ল। তিনি নয়ন মেলে দেখলেন অদূরে প্রায় মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে সজল নয়নে বালকের পিতা বসে আছেন তাঁর দিকে অতি কাতর ভাবে তাকিয়ে। ভোলানন্দগিরি মাধবানন্দগিরি মহারাজকে বললেন, মাধবজী, আপনার ধুনি থেকে একটু ভস্ম ওই ছেলেটিকে দিন। আপনার কৃপায় তাহলে বাচ্চা বেঁচে যাবে।"

মাধবানন্দগিরি বালকের পিতাকে কাছে ডাকলেন। তারপর একটু ভস্ম তাঁর ধুনি থেকে তুলে মৃতকল্প বালকের পিতাকে বললে, "এখনি বাচ্চাকে খাইয়ে দাও। সেরে যাবে।"

পরম আগ্রহে সেই পবিত্র ধুনির ভস্মটুকু তিনি তাঁর বালক পুত্র অহিভূষণকে খাইয়ে দিলেন। একটু পরেই বালক চোখ তুলে তাকালো এবং অনেক সুস্থ বোধ করলো।

মাধবানন্দগিরি বালকের পিতাকে বললেন, 'এবার ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।"

মহানন্দে বালকের পিতা মাধবানন্দগিরি ও ভোলাগিরি মহারাজকে প্রণাম করে বালককে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। বালক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এই অলৌকিক কৃপালাভে বালকের পিতা ও তার আত্মীয়স্বজন মহানন্দগিরির প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হলেন। কয়েকদিন পর ত্রিকূট পাহাড় থেকে মাধবানন্দগিরি ও ভোলাগিরি অন্যত্র চলে গেলেন।

এই ঘটনার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর কাশীতে হিন্দুধর্মের মহাসম্মেলন

হচ্ছে। সারা ভারতের বহু বিশিষ্ট সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষগণ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। ভারতবিখ্যাত মহাসাধিকা শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা-ও সেখানে উপস্থিত। বক্তৃতামঞ্চে বসে আছেন সবাই। মহাযোগী ও প্রাচীন ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজও মঞ্চে বসে আছেন। মঞ্চের সম্মুখে বিশাল দর্শকমণ্ডলী। কমপক্ষে দশহাজার ধর্মপ্রাণ নরনারী সেখানে উপস্থিত হ'য়ে এই দুর্লভ দৃশ্য দেখছেন ও অমৃতময় ধর্মকথা শুনছেন। সহসা উপরোক্ত অহিভূষণ বাবু মহাশয়কে মাধবানন্দ গিরি মহারাজ সমবেত দশহাজার দর্শকের মাঝখান থেকে আশ্চর্যভাবে ডাকলেন। চুঁচুড়া নিবাসী অহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো হ'তবাক। তাঁকে কেন ডাকছেন এই বিরাট মহাপুরুষ? তিনি মাধবানন্দ গিরির কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই, মাধবানন্দ গিরি মৃদু হেসে তাঁর 'ডাক' নাম ধরে ডেকে বললেন, "কিরে ভাল আছিস?—ত্রিকূট পাহাড়ের কথা তোর মনে আছে?

অহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ত্রিকূট পাহাড়ের কথা তো পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। তার তখন বয়স ৭ বছর ছিল। স্মরণে থাকবার কথা নয়। কিন্তু পিতামাতাম কাছে শুনেছিলেন সেই আশ্চর্য কাহিনী, জেনেছিলেন তাঁর জীবনদাতা মাধবানন্দ গিরি মহারাজ। কিন্তু সেই কাহিনীও তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। সেই প্রাণদাতা মাধবানন্দ গিরি মহারাজ পঞ্চাশবছর বাদে আজ তাঁকে দশহাজার লোকের মাঝখান থেকে চিনে বার করে কুশল জিজ্ঞেস করে ত্রিকূট পাহাড়ের কথা বলছেন, এই মহা বিস্ময়কর ও অভাবিত সৌভাগ্যে অহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দে কেঁদে ফেললেন এবং মাধবানন্দ গিরি মহারাজের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। পরম করুণাময় ও সদানন্দময় মহাপুরুষ মাধবানন্দ গিরি তাঁকে সস্নেহে আশির্বাদ করলেন এবং পরে তাঁর সাথে দেখা করতে বললেন।

পরবর্তীকালে তিনি মাধবানন্দ গিরি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে ধন্য হ'ন।

১৯৭৩ সালে উপরোক্ত কাহিনীটি অহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দে সজল নয়নে মাধবানন্দ গিরির কোন্নগর আশ্রমে বসে লেখককে বলেন। লেখক তখন সদলবলে মাধবানন্দ গিরি মহারাজের নির্দেশে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের

এই অন্নপ্রসাদ দানের ব্যাপারও ভারতবিখ্যাত। নিত্য অন্নসেবা তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্য ছিল। উত্তরাখণ্ডে ও ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাধবানন্দ গিরি যখন যেখানে থাকতেন সেই আশ্রমেই তখন তাঁর অন্ন যজ্ঞের এই নিত্য ভাণ্ডারা অবিরাম অব্যাহত থাকতো।

এই প্রাচীন দুর্লভ মহাত্মার চরণদ্বয় স্পর্শ করে একদিন এই দীন লেখক তাঁকে বলেন, "আপনার প্রায় তিন শতাব্দীর অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডিত এই দিব্য আনন্দময় দেবদেহ স্পর্শ করে অনুভব করলুম, ভারতের বিগত তিনশতাব্দীব সকল মহাপুরুষের দিব্য স্পর্শ।" উত্তরে এই প্রাচীন আনন্দময় মহাপুরুষ মৃদু হেসে বললেন। "এক ব্রহ্মকে স্পর্শ করলেই সব স্পর্শ হয়ে যায়।"

উত্তরটি অতি নিগূঢ় ও গভীর তৎপর্যমণ্ডিত।

মাধবানন্দগিরি মহারাজ তাঁর আবাল্য সুহৃদ ও শতাধিক বছরের নিত্যসঙ্গী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাথে সূক্ষে যোগাযোগ রাখতেন দীর্ঘকাল ধরে।

তিনি যখন কামাখ্যায় ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারী নারায়ণগঞ্জের (অধুনা বাংলাদেশের) অদূরে বারদী গ্রামে আশ্রম স্থাপন করে লোককল্যাণে তাঁর নিত্যলীলা ও ঐশী শক্তি বিতরণ করছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগমশায় প্রভৃতি মহা পুরুষগণ এবং আরো বহু সাধু সন্ন্যাসী যেমন তার সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করেন তেমনি সহস্র সহস্র গৃহী ভক্ত মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু জমিদার, রাজা, মহারাজা ও আর্ত নরনারী তাঁর কৃপা ধন্য হ'ন। বারদী তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গে এক অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ রূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁর নামও মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে বাংলা ১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ একশো ষাট বছর বয়সে এই ব্রহ্মজ্ঞানী ও মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর ঐশীলীলা সমাপ্ত করে যোগবলে দেহত্যাগ করে সূর্য ভেদ করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে বেণী মাধবজী তথা মাধবানন্দ গিরি মহারাজের কথা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ব্রহ্মানন্দভারতী জিজ্ঞেস করেন তাঁর গুরুকে। উত্তরে লোকনাথ ব্রহ্মচারী ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। পরে বললেন, "বেণী কামাখ্যায় আছে।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাথেও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সূক্ষ্ম যোগাযোগ ছিল এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্যতম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্য ক্লেশব-সাধুর সাথে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রসঙ্গ নিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আলোচনাও করেন। যথাস্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে।

অবশেষে ইংরেজী ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ লক্ষ্ণৌতে সহসা স্বেচ্ছায় মহাসমাধিতে চিরতরে মগ্ন হ'ন।

দেহত্যাগের পূর্বে একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে বলেন তাঁর পূর্বাশ্রমের কথা। তাছাড়া ভারত বিখ্যাত এক রাজসিক সিদ্ধ সাধক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত মন্তব্য ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি তাঁর কোন্নগর আশ্রম সম্পর্কে বলেন যে কালে এই আশ্রম মহাতীর্থে পরিণত হবে।

কোন্নগরের গঙ্গাতীরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের অদূরবর্তী দক্ষিণে শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি যথার্থ মনোরম। এই পবিত্র মনোরম আশ্রমে শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্বেতশুভ্র বাণলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এই শিবমন্দিরের উত্তরে রয়েছে একটি পবিত্র বিল্ববৃক্ষ। শোনা যায় যে, একদা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন্নগরে আসবার সময় এই বিল্ববৃক্ষ মূলে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। তখন বৃক্ষটি প্রায় শুষ্ক ছিল। ঠাকুরের স্পর্শে আবার নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়।

এই বিল্ববৃক্ষ মূলের বাঁধানো চাতালে বসে শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ ভক্তসঙ্গে বহু অধ্যাত্ম কথা বলতেন। এই পবিত্র শিবমন্দির ও পবিত্র বিল্ববৃক্ষের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের মহান মরদেহের সমাধি দেয়া হয় লক্ষ্ণৌ থেকে মহাসমারোহে এনে। তারপর ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) রবিবার শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষ্যে বিরাট ষোড়শ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার তাঁর সমাধি ক্ষেত্রের ওপর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়।

ইংরেজী ১৯৭৪ সালে এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। লেখক সেই পূর্ণ কুম্ভে যোগদান করেন। সেখানে শ্রীমৎ মাধবানন্দ গিরি মহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও

সেবক 'অজুভাই'-এর (অজয় মুখোপাধ্যায়) সাথে লেখকের সাক্ষাত হয়।

অজুভাই গুরু অন্তপ্রাণ। লেখককে জানালেন যে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভের পর কেদার বদ্রীর পথে যাবেন। তারপর আশ্রমে গুরুর ধ্যানে ও সেবায় মগ্ন থাকবেন। পরবর্তীকালে তাই হয়। বিগত দশ বছর ধরে মৌন এই সাধক গুরুর ধ্যান ও সেবায় নিমগ্ন থাকেন।

১৯৭৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের সমাধী ক্ষেত্রের ছবি নেবার জন্য লেখক কোন্নগরের এই পবিত্র আশ্রমে যান।

আশ্রমের প্রাণপুরুষ শ্রীমৎ মাধবানন্দ গিরি মহারাজের দিব্য আনন্দময় প্রাণবন্ত বিগ্রহের অভাবে সমগ্র আশ্রম স্মৃতিভারে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। লেখকেরও এই আশ্রমের অতীতের অজস্র আনন্দময় স্মৃতি (সদা প্রাণচঞ্চল ও অবিরাম ভক্ত সমাগমে মুখর) মানস নয়নে বারবার ভেসে উঠছিল।

সেই সুখ স্মৃতি হৃদয়ে নিয়েই শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের সমাধী ক্ষেত্রে বসে ছবি নেয়া হ'ল। এই সমাধী মন্দিরে বসে তাঁর আড়াই শত বছরের দেবদেহের উষ্ণ স্পর্শ ও আশির্বাদ অন্তরে অনুভব করলুম।

আশ্রম থেকে লেখককে সহযোগিতা করলেন মাধবানন্দ গিরি মহারাজে সেই প্রিয় শিষ্য শ্রীঅহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী দুর্গাদেবী।

লেখকের সাথে ছিলেন ভক্তপ্রবর শ্রীরতু মুখোপাধ্যায় ও ভগবতী প্রসাদ বাজোরিয়া।

শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য ও সেবক এবং মৌনী 'অজুভাই', লেখক ও তাঁর সঙ্গীদের শ্রীগুরুর আদর্শ অনুসারে প্রসাদ দান করে বাধিত করলেন। এজন্য লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমের নাম তাঁরই নাম অনুসারে।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই পবিত্র আশ্রমটি 'একদিন মহাতীর্থে পরিণত হবে' সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি

মহারাজের এই ভবিষ্যত বাণী একদিন নিশ্চয়ই সার্থক হবে জগৎ কারণে জগৎ কল্যাণে।

—০—

তারাপীঠে মহাত্মা বাবামনি

আনুমানিক বাংলা ১২৮৫ সনে মহাপীঠ তারাপীঠে এলেন এক প্রাচীন মহাত্মা। নাম 'বাবামনি'। এই রহস্যময় মহাপুরুষের পূর্বাশ্রমের কথা কেউ জানেন না। সর্বদা প্রশান্ত গম্ভীর এই মহাত্মা নিজেকে এক গভীর রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখেন।

তাঁর বয়স, সাধনা, সিদ্ধি সবই রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। বীরভূম জেলার বোলপুরের সিস্টার নিবেদিতা রোডের অদূরে একটি ছোট্ট আশ্রমে তিনি বাস করেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে তাঁর শিষ্য-ভক্তদের কাছে শোনা যায় যে—১৮৮৬ সালের ১৭ই আগস্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেবের মহাপ্রয়াণের যে ছবি তোলা হয়েছিল ততে তাঁর ছবি রয়েছে। তখনই তিনি মধ্য বয়স্ক ছিলেন।

সেই হিসাবে তাঁর বয়স প্রায় দেড়শত বছর। স্বল্প বাক, সদা অন্তর্মুখীন এই ব্রহ্মবীদ মহাপুরুষ বহুবার তারাপীঠে এসেছেন। আপন মনে নিজ সাধনা সম্পন্ন করে তিনি আবার ফিরে গেছেন নিজ ক্ষেত্রে।

তারাপীঠের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে তাঁর সাক্ষাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি নিজে কোথাও আলোকপাত করেন নি।

তিনি অত্যন্ত গুপ্ত ও প্রচার বিমুখ ছিলেন। তাঁর বহু অলৌকিক কাহিনী তাঁর শিষভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

শোনা যায় তাঁর দীক্ষিত শিষ্য সংখ্যা গুটি কয়েক মাত্র। ভক্ত ও গুণমুগ্ধ প্রচুর রয়েছে। ইং ১৯৮৫ সালে তিনি দেহত্যাগ করলে তাঁর স্বহস্ত লিখিত একটি ডায়েরী পাওয়া যায়। তাতে তাঁর গভীর রহস্যে ঘেরা জীবনের বহু ঘটনাবলী পাওয়া যায়।

এই ডায়েরীতে তিনি তাঁর বয়স সম্পর্কে স্বহস্তে লিখেছেন যে তাঁর বয়স প্রায় আড়াইশত বছর। তাঁর শিষ্য ও সংগীত শিল্পী সৈকত রায় তাঁকে এই লেখকের কথা জানালে তিনি ১৯৭৯ ও '৮১ সালে বলেন যে তিনি নিজেই লেখককে সবকিছু বলবেন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে সহসা তিনি দেহ ছেড়ে দেন।

তবে তাঁর অন্যতম ভক্ত তপন মুখার্জী (নিবেদিতা রোড, বোলপুর) 'বাবামনি'র তথাকথিত ডায়েরীটি লেখককে সাময়িক-ভাবে প্রদান করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তা পেলে এই প্রাচীন মহাপুরুষ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আবার বহু কিছু বিষয়ে নবরূপে আলোকপাত করা যাবে।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য সচ্চিদানন্দ সরস্বতী

বাংলা ১২৮৬ সালের এক প্রসন্ন প্রভাত। একটি সৌম্য যুবক এসে উপস্থিত হ'ল তারাপীঠে। যুবকের বয়স মাত্র আঠারো বছর ছয় মাস। যুবকের চোখে মুখে রয়েছে শক্তিধর সাধকের সস্পষ্ট প্রতি শ্রুতি।

যুবক শ্রীবামের চরণে শরণাগত হ'ল। চাইলো ঈশ্বরীয় পথের পাথেয়। করুণাময় শ্রীবাম অচিরে কৃপা করলেন এই সাধককে।

যুবকের উন্নত আধারে ঢেলে দিলেন তাঁর অফুরন্ত কৃপা বারি। দীক্ষার পর যুবকের নাম দিলেন সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্রীবামের নির্দেশে যুবক কঠোর সাধনায় রত হ'ল।

যাঁর গুরু শিবাবতার স্বয়ং শ্রীবাম এবং যাঁর সাধনা স্বয়ং শ্রীবামের সান্নিধ্যে। তাঁর ইষ্ট প্রাপ্তি ও আপ্তকাম হতে বিলম্ব হয় না। কিছুকাল পরে সাধক সচ্চিদানন্দ লাভ করলো তাঁর আরাধ্য ইষ্টকে। মন্ত্র চৈতন্যের আনন্দে সচ্চিদানন্দ সরস্বতী সব সময় বিভোর হয়ে গেল।

এই পরম সৌভাগ্যবান সিদ্ধ সাধকের জন্ম বাংলা ১২৬৭ সালের পৌষ সংক্রান্তীর দিন। নাটোরের রানী ভবানীর পবিত্র বংশে তাঁর জন্ম।

সিদ্ধিলাভের পর শ্রীবামের নির্দেশে তিনি আরো গভীরতর সাধনায় মগ্ন হ'ন। তারপর সুদীর্ঘকাল পরিব্রাজনায় অতিবাহিত করেন।

উত্তরকালে শ্রীবামের নির্দেশে তিনি শ্রীবামের অন্যতম শিষ্য নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তথা স্বামী নিগমানন্দের সাধনায় সহযোগিতা করেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা এই ব্রহ্মবীদের জীবনকে এক সুষম ছন্দে গেঁথে রেখেছে।

বাংলা ১৩৮০ সালে (ইং ১৯৭৩ খৃঃ) উপরোক্ত কাহিনী তিনি এই লেখককে জানান। তখন তাঁর স্থূল দেহের বয়স একশো চৌদ্দ-বছর ছিল।

সমগ্র ভারতে তাঁর শিষ্য শিষ্যার সংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ বলে তিনি জানান।

—০—

শ্রীবামের জননীর অসুস্থতা ও আরোগ্য লাভ

শ্রীবামের জননী একষট্টি বছর বয়সে অর্থাৎ বাংলা ১২৮৭ সালে সহসা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১২৬২ সালে তিনি তাঁর স্বামী সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে কঠিন বৈধব্য জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

তার ওপর কঠিন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে চার কন্যা দুই পুত্রের প্রতিপালনের সুকঠিন দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয় সুদীর্ঘ কাল ধরে।

বড় কন্যা তথা প্রথম সন্তান জয়কালী বিধবা হয়ে যৌবনেই পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। আবাল্য সাধিকা জয়কালী তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যৌবনেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তবু বিধবা রাজকুমারী দেবী এই সাধিকা কন্যাকে তার সংসারেই রাখেন তাঁর চোখের সামনে।

এই যুবতী সন্ন্যাসিনী মেয়ের জন্য তাঁর চিন্তা ভাবনা দায়িত্ব ও কষ্ট কম ছিলনা।

অবশ্য পিতৃবিয়োগের কয়েক বছর পর যৌবনেই সিদ্ধ সাধিকা জয়কালী দেবী তারাপীঠে এসে পূর্বেই দিন তারিখ স্থির করে এবং ঘোষণা করে সেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণেই তারাপীঠে স্বেচ্ছায় তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে দেহত্যাগ করে তারামায়ের সাথে লীন হ'ন। স্বামী হারাবার কিছুকাল পর রাজকুমারী দেবী প্রথম সন্তান জয়কালীকে অকালে হারিয়ে দুঃখে শোকে আরো জর্জরিত হলেন।

দ্বিতীয় সন্তান তথা প্রথম পুত্র বামাচরণ তথা বামাক্ষ্যাপার জন্যও কম চিন্তা ভাবনা কষ্ট পাননি।

শিশুর মত সরল এই অবোধ ছেলে তাঁর সংসারের কোন কাজে তো এলই না। উপরন্তু এই ক্ষ্যাপা ছেলের জন্য কত লোকের কাছে কতরকম কথা, গালমন্দ, অপমান ও অপবাদ শুনতে হয়েছে।

অবশেষে রাজকুমারীরর সংসার থেকে প্রথম পুত্র এই বামাক্ষ্যাপাও

বাংলা ১২৬৬ সালে চিরবিদায় নিলেন। চিরতরে তারাপীঠে রয়ে গেলেন বামাক্ষ্যাপা। শ্রীবাম নিজে যেমন জননী রাজকুমারীর সংসারের কোন কাজেই এলেন না, তেমনি সংসারের বোঝা হয়েও রইলেন না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী জয়কালীর দেহত্যাগের কিছুকাল পর শ্রীবামও চিরতরে সংসার ত্যাগ করে তারাপীঠে চলে আসেন। দুর্ভাগ্য যেন রাজকুমারী দেবীকে ক্রমেই তাড়িয়ে নিয়ে চললো।

মাত্র ছত্রিশ বছরে স্বামী হারালেন তিনি। তারপর জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়কালীকেও হারালেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রও তারপর সংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন। তারাপীঠে চিরতরে রয়ে গেলেন।

এত শোক এত দুঃখ কষ্ট ব্যথা বুকে নিয়েও কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে যেতে লাগলেন। ধান সিদ্ধ করে, মুড়ি ভেজে, পৈতে তুলে কোন রকমে অতিকষ্টে সংসার চালাতে লাগলেন। কখনো অর্দ্ধাহারে কখনো অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন।

তার ওপর সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম রান্নাবান্না সব নিজেই করতেন। তাছাড়া তাঁর অপর তিন কন্যা দুর্গা, দ্রবময়ী ও সুন্দরীর শ্বশুর বাড়ীর সাথে সামাজিকতা করা এবং মেয়েদের ও নাতিনাতিনীদের তাঁর কাছে আসা যাওয়ার দায় দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হ'ত।

এসব ছাড়াও কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরীর দ্বিতীয়বার বিয়ে দেয়া নিয়ে গ্রামের সমাজ সর্বানন্দকে একঘরে করে রেখেছিল। তার জের ও অশান্তি সারাজীবন ধরে রাজকুমারী দেবীকে সহ্য করতে হয়েছে।

তবু এই দুঃসহ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা দারিদ্র্য অপমান ও বৈধব্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গভীর নিষ্ঠার সাথে তিনি তাঁর স্বামীর সংসারটিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অথচ রাজকুমারী দেবী ধনীর দুলালী ছিলেন। কৈশোরে বিয়ে হয়ে স্বামী সর্বানন্দের গৃহে আসবার পর থেকে সারাজীবন কঠিন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে গেলেন। তারপর স্বামীর দেহত্যাগের পর একের পর এক শোক তাপেও জর্জরিত হলেন আমৃত্যু। তবু এই দুঃখ শোক দারিদ্র্যের অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র আশার আলো ছিল তাঁর ষষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই তাঁর দুঃখ দারিদ্র্যের ভাগ নিয়ে তা মোচন করতে চেষ্টা করতেন এবং অনেকাংশে

মোচন করতেন। বড় হয়ে জননীর দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য সাধ্যমত কাজকর্ম করতেন রামচন্দ্র।

কিন্তু তখন রাজকুমারীদেবীর বয়স প্রায় ষাট বছর। রাজকুমারী দেবীর জন্ম বাংলা ১২২৬ সালে।

তাঁর আঠারো বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান তথা প্রথম পুত্র শ্রীশ্রী বামাক্ষাপার জন্ম হয় (বাংলা ১২৪৪ সালে) আর ষষ্ঠ সন্তান তথা কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয় তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে (১২৫৭ সালে)।

সুতরাং রামচন্দ্র যখন কঠোর পরিশ্রম করে সংসারে সচ্ছলতা আনলেন তখন রাজকুমারী দেবীর বয়স প্রায় ষাট বছর।

তখন তাঁর স্বাস্থ্য নিদারুণ দুঃখ কষ্ট শোকতাপে ও কঠিন দারিদ্র্যে ভেঙ্গে পড়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অর্থাৎ ছত্রিশ বছর থেকে একষট্টি বছর পর্যন্ত অর্থাৎ গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর নিদারুণ দুঃখ কষ্ট দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়ে যান সীমাহীন ধৈর্য্য সহ্য ও অমানুষিক পরিশ্রমের সাথে। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলে ৬১ বছর বয়সে বাংলা ১২৮৭ সালে তিনি গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিরিশ বছর বয়স্ক রামচন্দ্র তখন সংসারের হাল ধরেছেন। রাজকুমারী দেবী ইতিপূর্বেই রামচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে সংসারী করিয়ে ছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নী ইন্দুমতী দেবী শাশুড়ীকে যথাসাধ্য সাংসারিক কাজে সাহায্য করতেন। রাজকুমারী দেবী যখন তাঁর সংসারের সব দায়িত্ব সুসম্পন্ন করলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়লো। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে সমগ্র সংসারের দায়িত্ব তাঁকে একা পালন করতে হয়েছে। এই কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন অমানুষিক পরিশ্রম করে অর্ধাহারে অনাহারে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক তাপ ও দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে।

এত দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য দায় দায়িত্ব রোগ শোক অপমান অবহেলা আঘাত যন্ত্রণা ও বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে ভারতবর্ষের আর কোন মহাপুরুষের জননী রাজকুমারী দেবীর মত সারাজীবন কাটান নি।

সেই হিসাবে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জননী রাজকমারী-দেবী অতুলনীয়া।

তাঁর কঠিন সংযম, ত্যাগ, আদর্শ-নিষ্ঠা, অপরিসীম ধৈর্য্য, সহ্য সর্বতোভাবে আদর্শনীয়।

আটলার দুই ক্রোশ পূর্বে মহাপীঠ তারাপীঠ আলো করে বসে আছেন তাঁরই প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান বামাক্ষ্যাপা। কত সাধু মহাপুরুষ ভক্ত জ্ঞানী যোগী তাঁর পুত্রের পবিত্র সান্নিধ্যে আসছেন। কত ধনী-ভক্ত গৃহস্থরা তাঁর এই সন্ন্যাসী পুত্রের চরণে কত টাকা পয়সা ফলমূল অর্পণ করছেন, তবু অদূরে বসে রাজকুমারী দেবী ভুলেও পুত্রকে এই কঠিন দারিদ্র্যের কথা জানান নি। যতদিন দেহে শক্তি ছিল ততদিন পুত্রকে মাঝে মাঝে দেখে গেছেন তারাপীঠে এসে চার ক্রোশ পথ যাতায়াত করে। সাধ্যমত খাবার তৈরী করে খাইয়ে গেছেন পুত্রকে নিজের হাতে। আর দু'নয়ন ভরে দেখেছেন প্রাণাধিক পুত্রকে।

কিন্তু শ্রীবাম তো অন্তর্যামী। তিনি সবই জানেন। নাটোরের সামান্য মাসহারা মাঝে মাঝে তিনি তাঁর এই দুখিনী মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু অভাবের সাগরে তা যেন কয়েক বিন্দু জল। তাই জননীর এই ত্যাগ তিতিক্ষা শ্রীবাম অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন।

তাই যুগে যুগে দেখা যায় ঈশ্বর ও ঈশ্বর কল্প অবতার পুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে রাজকুমারী দেবীর ন্যায় অতি উচ্চ ও পরম পবিত্র দিব্য আধার সমূহে। এসব মহিয়সী নারীগণ তাই চিরস্মরণীয়া চির বরণীয়া। দারিদ্র্য মানুষের মহান শিক্ষাদাতা। দারিদ্র মানুষের যথার্থ জ্ঞানকে বিকাশিত করে এবং মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে।

তাই জগতের অবতার ও অবতার কল্প দেবমানবগণ সকলেই দীন দরিদ্র ঘরে শুদ্ধসত্ব আধারে আবির্ভূত হয়েছেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর জৈন, হজরত মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, তুলসীদাস, কবীর, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সবাই এই দরিদ্র ঘরেই আবির্ভূত হয়ে জগতের সার্বিক কল্যাণ সাধন করেছেন।

আর তাঁদের জনক জননীগণ ছিলেন তেমনি নির্লোভী শুদ্ধসত্ব আধার বিশিষ্টা।

যাহোক, বাংলা ১২৮৭ সালে ৬১ বছর বয়সে রাজকুমারী দেবী

যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামপুরহাটে ব্রজনাথ সাহার মনিহারি দোকানের প্রধান কর্মচারী রূপে কর্মে রত। এই দোকানে কাজ চালাবার মত ইংরেজী ভাষাও তিনি করায়ত্ব করেছেন দৃঢ় অধ্যাবসায়ের দ্বারা।

ব্রজনাথ সাহার কাছে তাঁর এই চাকরী ও ইংরেজী ভাষা শেখবার মূলে ছিলেন রামপুরহাটের ই. আই. রেলের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসের বড়বাবু দীনবন্ধু বাবু। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃহীন ও সহায় সম্বলহীন এবং জাগতিক শিক্ষাবিহীন সরল যুবক রামচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়ে ও কাজ চালাবার মত ইংরেজী শিখিয়ে তাঁর বন্ধু ব্রজনাথ সাহার কাছে নিয়ে চাকরী দিলেন। অভাবের তাড়নায় যদিও রামচন্দ্র বাল্যকালে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি তবু সততা, আন্তরিকতা ও কঠোর শ্রমের দ্বারা তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রজনাথ সাহার দোকানের প্রধান কর্মচারী হলেন।

তিনি খাওয়া থাকা ছাড়া যে ৭।৮ টাকা মাইনে পেতেন তা সবই জননী রাজকুমারীর হাতে তুলে দিতেন।

এই সময় রামচন্দ্র তাঁর মামার সম্পত্তি মামলা করে উদ্ধার করেন এবং মামীমার সাথে আপোষ করে কিছু বিষয় সম্পত্তিও পান। তাছাড়া তিনি ক্রমে ক্রমে কয়েক বিঘে জমিও কেনেন এবং বাড়ী ঘরও সংস্কার করেন এবং বড় করেন। ফলে এতকাল পর রাজকুমারী দেবীর সংসারে মোটামুটি সচ্ছলতা এল।

ঠিক এই সময় সহসা বৃদ্ধা রাজকুমারী দেবী গুরুতর ভাবে অসুস্থা হয়ে পড়লেন। রামচন্দ্র অসুস্থা জননীকে সাথে সাথে রামপুরহাট ব্রজনাথ সাহার বাড়ীতে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য।

ব্রজনাথবাবু শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে রাজকুমারী দেবীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ব্রজনাথ বাবুর ছেলে বটকৃষ্ণ সাহাও এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। তিনি রামচন্দ্রকে অগ্রজের মতই শ্রদ্ধা করতেন।

ব্রজনাথ সাহা ও বটকৃষ্ণ বাবু এই সময় বৃদ্ধা রাজকুমারী দেবীর শ্রীমুখ থেকে শ্রীবামের বাল্যলীলা শুনে মুগ্ধ হ'ন। শ্রীবামের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধাশীল হ'ন। কিছুদিন পর

রাজকুমারী দেবী সুস্থ হয়ে আবার আটলায় ফিরে গেলেন নিজ গৃহে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর তারামায়ের কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে, তারামায়ের কৃপায় অবশিষ্ট জীবন তাঁর সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়। জীবনের অবশিষ্ট আট বছর সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে। এই সময় থেকে সংসারের দুঃসহ বোঝা তাঁর ওপর থেকে নেমে যায়। রামচন্দ্র সংসারের সব দায় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তাঁকে বিশ্রাম দেন।

সংসারের অভাব অনটনও রামচন্দ্র ঘুচিয়ে দেন। এতকাল পরে সংসারে সচ্ছলতার মুখ দেখে বৃদ্ধা রাজকুমারী দেবী পরম শান্তি পেলেন।

এই শান্তির সাথে এই সময় করুণাময়ী তারামা তাঁকে অসীম আনন্দও দিলেন।

রাজকুমারী দেখতে পেলেন তাঁর প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাপাগল 'বামা'র নাম ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সিদ্ধপুরুষ বলে অনেকে মানছে এবং তার প্রাণের 'বামা'র কাছে অনেকে যাচ্ছে কৃপালাভের জন্য। তাই আগের মত আর তাঁকে কেউ অবহেলা করেনা। বরং 'বামা'র জননী বলে অনেকে তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শুরু করেছেন। এই শান্তি ও আনন্দ পেয়ে রাজকুমারী দেবীর শেষ জীবন টুকু পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠলো।

— o —

মহানন্দ গিরির তারাপীঠে আগমন ও কৃপালাভ

আনুমানিক বাংলা ১২৮৮ সালে তরুণ সাধক মহানন্দ গিরি বৈদ্যনাথ থেকে পদব্রজে তাঁর গুরু সূর্যানন্দ গিরি ও এক গুরুভাই সহ তারাপীঠে এলেন। তারাপীঠের বিশাল মহাশ্মশান ও তাঁর ভয়াবহ রূপ দেখে স্তম্ভিত হলে‌ন মহানন্দ গিরি।

সূর্যানন্দ গিরি তাঁর শিষ্যদের তারাপীঠের মহান ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যের কথা বিশদ ভাবে জানালেন।

আরো জানালেন যে এই মহাপবিত্র পীঠে বর্তমানে জীবন্ত ভৈরব রূপে বিরাজ করছেন তারামায়ের আদরের দুলাল শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। তিনি একাধারে মহাতান্ত্রিক মহাযোগী ও মহান ব্রহ্মবীদ পুরুষ।

মহানন্দের ইচ্ছে হ'ল শ্রীবামের চরণ দর্শন করেন কিন্তু সেই সময় শ্রীবাম দু'এক দিনের জন্য তারাপীঠের অদূরে কোন ভক্ত গৃহে পদার্পণ করতে গিয়েছেন। তাই মহানন্দের মনের বাসনা পূরণ হ'লনা।

সন্ধ্যা হয়ে এল। তারাপীঠ মহাশ্মশান ক্রমে ভীষণ আকার ধারন করতে লাগলো।

শব শিবা সর্প শকুনী সারমেয় সঙ্কুল মহাশ্মশান ঘোর অন্ধকারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

সেই ঘোর অন্ধকারে শিমুল তলায় ত্রৈলঙ্গস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য সূর্যানন্দ গিরি তাঁর শিষ্য মহানন্দ গিরি ও অপর এক শিষ্যকে আসনে বসিয়ে দিয়ে যথারীতি উপদেশ দিয়ে তারামন্দিরে চলে গেলেন।

শিষ্যদ্বয়কে একমনে দৃঢ় চিত্তে আসনে বসে জপ করে যেতে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। কোন কারণেই যেন আসন ছেড়ে না ওঠে কেউ।

মহানন্দ গিরি ও তাঁর গুরুভাই একমনে গুরু সূর্যানন্দ গিরি প্রদত্ত

মন্ত্র জপ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু এই মহাশ্মশানে তারামায়ের বিচিত্র লীলা ও কঠিন পরীক্ষা ক্রমেই পরিস্ফুট হতে লাগলো।

বড় বড় কাল কেউটে, গোখরো প্রভৃতি ভীষণ বিষধর সর্পদের ফোঁস ফোঁস গর্জন তাদের আশে পাশে হতে লাগলো। কখনো সড় সড় করে পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগলো। অন্য দিকে শবমাংস ও শবাস্থি নিয়ে শিবা ও সারমেয়র সম্মিলিত চিৎকার চলছে। তার সাথে শকুনির পাখা ঝাপটানো, শকুনি শাবকদের করুণ কান্না। অসংখ্য মড়ার খুলির মধ্য দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার সময় চার দিকে ভয়াবহ দীর্ঘ শ্বাসের ধ্বনি, মানুষখেকো বড় বড় মশার তীক্ষ্ণ গর্জন প্রভৃতি সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল মহাশ্মশানে।

তার সাথে আশে পাশে অজস্র অশরীরীর চলাফেরা চলছে। ভীষণ ছায়ামূর্তিগুলো পলকে আসছে যাচ্ছে। সহসা এমন ভীষণ দুর্গন্ধ ভেসে এল যে মানুষের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। তবু মহানন্দগিরি ও তাব গুরু ভাই আসনে অটল রইলেন। এরপর ক্রমে ক্রমে মহাশ্মানে শ্মশানবিভূতি শুরু হল। সহসা ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় মহাশ্মশান একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মহাশ্মশান থেকে শিবা ও সারমেয়গণ শ্মশান ছেড়ে চলে গেল। এই অসহ্য সীমাহীন স্তব্ধ নিথরতা এত ভীষণ রূপ ধারণ করলো যে তা সহ্য করতে না পেরে মহানন্দ গিরির গুরুভাই আসন থেকে উঠে তারা মন্দিরে গুরুর কাছে চলে গেলেন। কিন্তু মহানন্দ গিরি নিশ্চল হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন।

ক্রমে তাঁর সামনে নানান অশরীরী আসতে শুরু করলো। তার সাথে অজস্র বিভৎস রূপ ও ভয়ঙ্কর শব্দ চারপাশে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু একনিষ্ঠ সাধক মহানন্দ গিরি সম্পূর্ণ সমাহিত হয়ে রইলেন। অন্তর্মুখীন এই সাধক সব বাধা বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে জগত জননী তারামায়ের কৃপা লাভে সমর্থ হলেন। তারামায়ের দিব্য নীল জ্যোতির্ময়ী রূপ দর্শন করে মহানন্দ গিরি হলেন আপ্তকাম।

ক্রমে ভোর হয়ে এল। মহাশ্মশান আবার শান্তরূপ ধারণ করলো।

তারামন্দির থেকে সূর্যানন্দ গিরি শিমুলতলায় এসে প্রিয়শিষ্য

মহানন্দকে অফুরন্ত আশির্বাদ করলেন। তারা কৃপাধন্য মহানন্দ পরম শ্রদ্ধার সাথে গুরুকে প্রণাম করলেন।

এই সময় সহসা এক বিভৎস মূর্তি তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। সূর্যানন্দ গিরির সামনে সেইমূর্তি দুই হাতে দুই মড়ার হাড় বাজিয়ে নৃত্য করতে লাগলো। আর বলতে লাগলো 'মাকুর মাকুর'। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও গুপ্ত সাধক সূর্যানন্দ গিরি এক দৃষ্টিতে সেই ভয়ঙ্কর নরমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর সহসা সেই মূর্তিকে সবলে আকর্ষণ করে বললেন, 'মা-কুরু', মা-কুরু'।

শোনামাত্র সেই মূর্তি বিস্ময় প্রকাশ করে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

যোগসিদ্ধ পুরুষ সূর্যানন্দ গিরি তাঁর প্রিয় শিষ্য মহানন্দকে বললেন যে এই সাধকটি কিছুকাল পূর্বে এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসেছিল শবসাধনা করতে। শবসাধনার সময় মহাশ্মশানের ভয়ঙ্কর রূপ ও শ্মশান বিভূতি দেখে ভয়ে ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। শ্মশান ভৈরব শূন্য থেকে তিনবার মন্ত্র শুদ্ধ করে দেয় কিন্তু তারপরও লোকটি ভয়ে ভুল মন্ত্র বলতে থাকে। 'মা কুরু'-র স্থানে মাকুর মাকুর' বলতে থাকে।

তখন বিরক্ত হয়ে শ্মশান ভৈরব এই দুর্বল ও ভীরু সাধককে এই মহাশক্তিধর মহাশ্মশানে সাধনা করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করে শবাসন থেকে শূন্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। সেই থেকে লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। কেবল মড়ার হাড় বাজিয়ে দিনরাত শুধু 'মাকুড় মাকুড়' করতে থাকে।

সূর্যানন্দর কথা শেষ হতেই লোকটি জ্ঞান ফিরে পেল। মহাযোগী সূর্যানন্দের স্পর্শে ও কৃপায় লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সচেতন হ'ল। সূর্যানন্দ তাকে সাধনার জন্য সঠিক পথনির্দেশ দিলেন। লোকাটি শান্তভাবে সূর্যানন্দকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে চলে গেল।

সূর্যানন্দ গিরিও তাঁর শিষ্যদ্বয়সহ তারামাকে প্রণাম করে এবং তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তারাপীঠ থেকে বিদায় নিলেন।

সূর্যানন্দ গিরি হলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কিন্তু তিনি গুপ্তসাধক, আত্মপ্রচারে বিমুখ। তাই অনেকে তাঁর নাম জানেন না।

কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্য মহানন্দগিরিকে জগতের কল্যাণার্থে প্রস্তুত করে প্রকাশ করলেন। উত্তরকালে তাঁর এই শক্তিমান শিষ্য মহান যোগী ও সিদ্ধ পুরুষ মহানন্দগিরির খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

জগত জননী তারামায়ের মূর্তি মহানন্দ গিরি কন্‌খলে ও কাশীতে স্থাপন করে নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন।

তারামায়ের এই সিদ্ধ সাধক সন্তান সমগ্র ভারতের সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদালাভ করেন। মহানন্দ গিরির পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ১২৪৭ সালে (ইং ১৮৪১ খৃঃ) কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র। গ্রাজুয়েট হ'বার পর কলকাতার অফিস পাড়া ডালহৌসির এক অফিসে চাকরী নেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয়, এক কন্যা সন্তান হয়। সংসারী হলেও তিনি বরাবর অধ্যাত্মমুখী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করতে যেতেন। এই সময় সহসা এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি মহাযোগী সূর্যানন্দ গিরির সাথে পরিচিত হ'ন।

তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে সবেমাত্র রেল লাইন বসছে। রেল লাইন বসাবার ব্যাপারে সার্ভেয়ার হিসাবে এই সময় নৃপেন্দ্রনাথ কাজ করছিলেন।

একদিন নৃপেন্দ্রনাথ দেখলেন এক জায়গা দিয়ে রেল লাইন যাবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়ে আছে একটি সাধুর ক্ষুদ্র কুটীর। নৃপেন্দ্রনাথ সাধুকে গিয়ে জানালেন যে সাধুকে এই কুটীর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ এই কুটীরের ওপর দিয়েই রেল-লাইন যাবে।

সাধু সূর্যানন্দ গিরি এই কথা শুনে হেসে নৃপেন্দ্রনাথকে বললেন, "কুটীর ছাড়া যাবে না। তোমাদের রেল লাইন ঘুরিয়ে দাও।"

নৃপেন্দ্রনাথ উত্তরে দৃঢ়ভাবে বল্ললে, "অসম্ভব, সামান্য একটি

ক্ষুদ্র কুটীরের জন্য রেল লাইন ঘুরিয়ে নিতে গেলে প্রচুর টাকা খরচ হবে। রেল কোম্পানী কিছুতেই তা করবে না। তাছাড়া আমার সাহেবও রাজী হবে না।"

তাই শুনে সূর্যানন্দ গিরি স্মিত মুখে একটি পাতার ওপর একটি মন্ত্র লিখে তা নৃপেন্দ্রনাথের টুপির মধ্যে দিয়ে বললেন, "তুমি সাহেবের কাছে গিয়ে একথা বল, দেখবে সাহেব রাজী হয়ে যাবে।" নৃপেন্দ্রনাথেরও কৌতুহল হ'ল যাচাই করবার। একদিকে সাধুর মন্ত্রপূত পাতার শক্তি, অন্যদিকে রেল কোম্পানীর স্বাভাবিক অসম্মতি। এই দুইয়ের মধ্যে কার শক্তি বেশী দেখা যাক।

নৃপেন্দ্রনাথের ওপরওয়ালা একজন ইংরেজ। নৃপেন্দ্রনাথ তাঁর সাহেবকে বললেন সাধুর ব্যাপারটি। সব শুনে বৃটিশ সাহেবটি যা বললেন তা শুনে নৃপেন্দ্রনাথ চমকে গেলেন। সাহেব শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "ঠিক আছে, রেল লাইন-ই ঘুরে যাবে। সাধুর কুটির যা আছে তাই থাকবে। সাধুর কুটীরে সাধু শান্তিতে থাক।"

নৃপেন্দ্রনাথ তবু বললেন, "কিন্তু স্যার, তাতে যে রেল কম্পানীর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাবে।"

সাহেব নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন, "তা যাক কিন্তু সাধুকে বিরক্ত করবার দরকার নেই।"

একটি মন্ত্রপূত পাতাতেই যদি এত শক্তি থাকে তবে সেই সাধুর মধ্যে না জানি কি বিরাট শক্তি আছে। ভাবতে ভাবতে নৃপেন্দ্রনাথ তখনি সেই সাধুর কুটীরের দিকে এলেন। কিন্তু কুটীর ফাঁকা। সাধু নেই। নৃপেন্দ্রনাথ বহু খুঁজেও তাঁকে পেলেন না।

অবশেষে নৃপেন্দ্রনাথ কাজ সেরে কোলকাতায় চলে এলেন। কিন্তু সাধুকে দেখবার জন্য প্রাণমন ব্যাকুল হয়ে রইলো।

ইতিমধ্যে আকস্মিক ভাবে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। একমাত্র বন্ধন রইলো তাঁর কন্যা সন্তানটি। কিছুকাল পর নৃপেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন।

কিন্তু বিধাতার বিচিত্র ইচ্ছা। বিয়ের পূর্বদিন সহসা কলেরায় মেয়েটি মারা গেল। বিয়ের সকল অলঙ্কার দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে

নৃপেন্দ্রনাথ মেয়েকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলেন। নৃপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ উদাসী হয়ে গেলেন। সংসারের সববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর দাদা বৌদি তাঁকে আবার সংসারী করবার চেষ্টা করতে চাইলে নৃপেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে নিষেধ করলেন।

ইতিমধ্যে সহসা সেই সাধু অর্থাৎ সূর্যানন্দ গিরির দর্শন পেলেন। তাঁর নির্দেশে তিনি আরো কিছুকাল সংসারে রইলেন। এই সময় তাঁর নির্দেশে নৃপেন্দ্রনাথ সার্ভেয়ারের বড় চাকরী ছেড়ে দিয়ে হাওড়ায় এক সাধারণ শ্রমিকের কাজ করতে লাগলেন শ্রমিকদের সাথে মিশে।

এই শ্রমিকের কাজের মধ্য দিয়ে সূর্যানন্দ গিরি নৃপেন্দ্রনাথের বংশমর্য্যাদা, পাণ্ডিত্য, অর্থ, ডিগ্রি প্রভৃতির অহঙ্কার নির্মূল করলেন। তাঁর চিত্তশুদ্ধি করালেন ধীরে ধীরে।

অবশেষে সেই পরম শুভ লগ্ন উপস্থিত হ'ল। সূর্যানন্দ গিরি নৃপেন্দ্রনাথকে সংসার জগত থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্ম সাধনার পথে নিয়ে গেলেন। যথাকালে নৃপেন্দ্রনাথকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিয়ে গুরু সূর্যানন্দ গিরি তাঁর নাম দিলেন 'মহানন্দ গিরি'। তারপর শিষ্য মহানন্দ গিরিকে নিয়ে বর্মার গভীর জঙ্গলে নিবিড় সাধনায় মগ্ন রাখলেন। অতঃপর বহুতীর্থ বহুস্থান ঘুরতে ঘুরতে বৈদ্যনাথ হয়ে মহাপীঠ তারাপীঠে এলেন। কারণ তারামাতা-ই হলেন সূর্যানন্দ গিরি ও মহানন্দ গিরির ইষ্টদেবী।

সাধারণত গিরি সম্প্রদায় ভুক্ত সাধকগণ শৈবপন্থী হ'ন। কখনো শিবশক্তির সমন্বিত সাধনপন্থী হ'ন। কিন্তু ত্রিলোক জননী তারামায়ের বিচিত্র লীলায় মহাযোগী ও শিবস্বরূপ ত্রৈলঙ্গস্বামীর শিষ্য সিদ্ধযোগী সূর্যানন্দ গিরি এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহানন্দ গিরির ইষ্টদেবী হলেন হলেন স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তারামা।

উত্তরকালে ভারতের দিকে দিকে কনখল, কাশী প্রভৃতি স্থানে জগত জননী তারামায়ের মূর্তি স্থাপন, নিত্য সেবাপূজা, ও তারামায়ের নাম মাহাত্ম্য প্রচারই ছিল মহানন্দ গিরির সারাজীবনের সাধনা।

কালক্রমে কনখল, কাশী ছাড়াও কোলকাতাতেও (১৩৫ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিটে) 'মহানন্দমিশন' স্থাপিত হয় এবং তারামায়ের মূর্তি স্থাপন ও নিত্য সেবাপূজা যথারীতি চলতে থাকে। তাঁর শিষ্য ভবানন্দ গিরি ও প্রশিষ্যগণ সেই ধারা অব্যহত রাখেন।

বাংলা ১৩৩৫ সালে (ইং ১৯২৮) এই ভারতবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ও তারামায়ের বরপুত্র মহানন্দ গিরির মহাসমাধি লাভ হয়।

তারামণ্ডল থেকে একদা যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিল—জগতে তারানাম, তারাসাধনা, তারাপূজা ও তারা মাহাত্ম্য প্রচার করতে, তারামায়ের কৃপায় সেই কাজ সুসম্পন্ন করে সেই জ্যোতির্ময় নক্ষত্র আবার তারামণ্ডলে ফিরে গেলেন তারামায়ের চির অমৃতময় কোলে।

—০—

শ্রীবাম দর্শনে নরেন্দ্রনাথের তারাপীঠে আগমন

বাংলা ১২৮৯ সালে (ইং—১৮৮২ খৃঃ) শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করবার জন্য শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (উত্তর কালে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর কলেজের সহপাঠী শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে তারাপীঠে এলেন। যুবক নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন উনিশ বছর। তিনি তখন বি, এ ক্লাসের ছাত্র। নরেন্দ্রনাথের তারাপীঠে আসবার পেছনে একটা বিশেষ কারণ রয়েছে।

শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের দর্শনের জন্য তখন যুবক নরেন্দ্রনাথ খুবই ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। বন্ধু ও সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে তিনি প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সন্ধানে কখনো তারকেশ্বর কখনো বৈদ্যবাটী আবার কখনো শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করতে থাকেন। কিন্তু মনের মত কাউকে তিনি দেখতে

পেলেন না। এই সময় (১৮৮২ খৃঃ) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাক্ষাত পান এবং কয়েকবার যাতায়াতও করেন কিন্তু তখনও মনের অস্থিরতা কমেনি। ধর্ম সম্বন্ধেও এই সময় নরেন্দ্রনাথের মন দ্বিধাপূর্ণ ছিল। তাই তিনি কখনো ব্রাহ্মসমাজে, কখনো মুসলমান মৌলবীদের কাছে আবার কখনো খৃষ্টান পাত্রীদের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন।

এই মানসিক অস্থিরতা, ধর্মসম্পর্কে গভীর সংশয়, ও শাস্ত্রসম্মত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ দর্শনের তীব্র ব্যাকুলতার---ত্রিবেণী সংগমে যখন যুবক নরেন্দ্রনাথ মগ্ন, ঠিক সেই সময় তারারীঠের মহাতান্ত্রিক, মহাযোগী এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষাপার নাম নরেন্দ্রনাথ জানতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ আরো জানতে পারলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যে চারটি অবস্থা অর্থাৎ বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ ও পিশাচবৎ সেই চারটি অবস্থাই একই সাথে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মধ্যে বিরাজমান।

নরেন্দ্রনাথ তাই শুনে আনন্দিত হলেন। ঠিক এই চারটি অবস্থা একই সাথে দেখবার তীব্র বাসনা তাঁর অন্তরে রয়েছে।

ইতিপূর্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করেছেন এবং দু'চার বার যাতায়াত করেছেন কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে তিনি একই সাথে তিনটি অবস্থা দেখেছেন, অর্থাৎ বালক জড় উন্মাদ-ভাব দেখেছেন কিন্তু পিশাচভাব দেখতে পান নি। ঠাকুরের এই সময় (১৮৮২ খৃঃ) পিশাচভাব তো ছিলই না বরং অতি শুদ্ধ-সত্বভাবে ঠাকুর বিরাজ করছিলেন। এমন কি যাঁর তাঁর হাতে ছোঁয়াও তিনি খেতে পারতেন না। ঠাকুরের পিশাচভাব তাঁর সাধনকালীন অবস্থায় ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁর বহুকাল পর ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন।

যাহোক, লোকমুখে তারাপীঠের শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ তারাপীঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যদিও তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নাম তখন কলকাতার জনজীবনের মাঝে বিশেষ প্রচার হয়নি, তবু অধ্যাত্ম-জগতের সাধক মহাপুরুষদের মাঝে তাঁর নাম যথেষ্ট ছড়িয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভের পরও দীর্ঘ আঠারো বছর কেটে

গেছে। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্থূল দেহের বয়স এই সময় প্রায় (১৮৮২ খৃঃ) পয়তাল্লিশ বছর।

নরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে চলে এলেন শ্রীবামকে দর্শন করবার জন্য তারাপীঠে। সাথে রয়েছেন তাঁর বন্ধু ও সহপাঠি শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

তখন প্রসন্ন প্রভাত। ভোরের সোনালী আলোয় চারদিক স্নিগ্ধ মধুর। শিমুলতলায় শ্রীবাম বসে আছেন। সাথে রয়েছেন একজন অনুগত ভক্ত।

যুবক নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী পদব্রজে রামপুরহাট থেকে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তারাপীঠে এলেন বহু কষ্ট স্বীকার করে।

নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রথমে তারামন্দির এসে তারামাকে প্রণাম করলেন। তারপর চলে এলেন শিমুলতলায় মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করবার জন্য।

নরেন্দ্রনাথ শ্রীবামকে দেখে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করলেন। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীও প্রণাম কললেন। শ্রীবাম নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়কে আশির্বাদ করলেন।

নরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তারামায়ের আদরের দুলাল পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষাপাকে দেখতে লাগলেন। শ্রীবামও প্রাণভরে ও স্নেহভরে নরেন্দ্রনাথকে দেখতে লাগলেন। উভয়ের নয়নরাজি যেন কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেল।

প্রায় পাঁচ মিনিট এভাবে দিব্য মৌনমুখরতায় কেটে গেল। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্তম্ভিত হয়ে এই অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তিনি আরো বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার ও নরেনের নয়নদ্বয় ছলছল করছে সজল হয়ে।

একটু পরে পুনরায় গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে নরেন্দ্রনাথ বামাক্ষাপাকে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন "বাবা আশির্বাদ করুন।

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে বামাক্ষ্যাপা দু'হাত নরেন্দ্রনাথের মস্তকে স্থাপন করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নরেন্দ্রনাথকে প্রাণভরে

আশীর্বাদ করলেন। তারপর নরেনের সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীও শ্রীবামকে প্রণাম করলেন। শ্রীবাম তাঁকেও আশীর্বাদ করলেন।

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী শিমুলতলা থেকে বের হয়ে তারামন্দিরের দক্ষিণ দিকে কিছুদূরে একটি মাটির ঘরে বিশ্রাম ও স্নানাহার করলেন।

বিশ্রামান্তে বন্ধু শরৎ চক্রবর্তী নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা নরেন তুমি বামাচরণকে কি দেখলে?—তোমার চোখ তো তখন ছল ছল করছিল।"

উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ মুক্ত পুরুষের লক্ষণ দেয়া আছে, সে রূপ লক্ষণ বিশিষ্ট মহাপুরুষের দর্শন লাভ করা আমার অনেকদিন হইতেই একান্ত ইচ্ছা। তজ্জন্য অনেক স্থান ঘুরিয়াছি, শেষে তারাপুরে বামাক্ষ্যাপাকে দেখিতে আসিয়াছি, যাহা দেখিলাম, তাহা অতুলনীয়। সাধকাগ্রণ্য ঠাকুরকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) দেখিয়া সব সাধ মিটিয়াছে। তবুও বামাক্ষ্যাপাকে দেখিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। যাহা দেখিলাম তাহা অপূর্ব। তাঁর মধ্যে বালকভাব, জড়ভাব, উন্মাদভাব ও পিশাচভাব সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। এমন মহাপুরুষ খুব বিরল। যাহোক, আমার আসা সার্থক হইয়াছে। তাই একদৃষ্টে দেখিতেছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথের একথা শুনে তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী খুবই আনন্দিত হলেন। কিছুক্ষণ পর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী একাকী শিমুলতলায় বামক্ষ্যাপার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আপনি ঐ যুবককে কি কারণে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন ও আপনার চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল।"

উত্তরে বামাক্ষ্যাপা বললেন, "বাবা, ধর্মের এক্ষণে বড়ই গ্লানি। এই সনাতন হিন্দু ধর্মে লোকের বিশ্বাস ও আস্থা ম্লেচ্ছ সংসর্গে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যুবককে দেখিয়া হৃদয়ে মহা আশার সঞ্চার হইতেছে। এই মহাতেজস্বী ব্রহ্মচর্য পরায়ণ যুবক কালে হিন্দু ধর্মের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তাই তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে ছিলাম।"

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বামাক্ষ্যাপার এই ভবিষ্যত বাণী শুনে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী পরম আনন্দলাভ করলেন।

বামাক্ষ্যাপাকে প্রণাম করে পুনরায় মাটির ঘরে বন্ধু নরেন্দ্রনাথের কাছে ফিরে এলেন। পরদিন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্রামান্তে তারামা ও বামদেবকে পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম করে তারাপীঠ থেকে কোলকাতায় রওনা হলেন।

উত্তরকালে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'ল। সেদিনের সেই বি, এ, ক্লাসের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অর্থাৎ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ভবিষ্যত বাণীর দশবছর পর আমেরিকায় চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রকাশিত হলেন বিশ্বের প্রাচীনতম হিন্দুধর্মের নবীনতম প্রতিনিধি রূপে এবং হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য দর্শন ও মহান উদারতাকে তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর সম্মুখে আশ্চর্য সফলতার সাথে।

মাত্র তিরিশ বছরের মহাতেজ দৃপ্ত মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর অন্তর জয় করে বিশ্ববিজয়ী হলেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিশ্বেব সকল ধর্মের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল 'কলম্বাস' হলঘরের সুসজ্জিত মঞ্চের ওপর পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ পাশাপাশি উপবেশন করেছিলেন। প্রতিনিধিগণ এসেছিলেন পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টান, ইহুদি, কনফুসিয়, থিয়জফিষ্ট, জেটাইল, শিন্টো প্রভৃতি সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা সেদিন এসেছিলেন।

সতেরদিন ব্যাপী এই ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন পাঁচহাজার বিশিষ্ট নরনারী এই অভূতপূর্ব ধর্মমহাসভায় প্রত্যক্ষ করেন এবং সমবেত ধর্মপ্রতিনিধিদের সারগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে মুগ্ধ হ'ন।

এই ধর্মমহাসভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ উইলিয়াম বারোজ এবং মহাসভার সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট মনীষী সি সি বণি।

এই ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ একাধিক দিন সারগর্ভ ভাষণ দেন। তিনি হিন্দুধর্মের মহান সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও হিন্দু ষড় দর্শন তথা উপনিষদ এবং বেদান্তদর্শনের গভীরতা ও উদারতা বিশ্ববাসীর সামনে

অনবদ্যভাবে তুলে ধরেন এবং প্রমাণ করে দিলেন যে বিশ্বের প্রাচীনতম হিন্দুধর্মের বেদান্ত দর্শনের মধ্যেই বিশ্বের সকল ধর্মের সকল দর্শনের 'প্রাণ' সার্থকভাবে বিরাজমান।

শুধু তাই নয় স্বামীজী আরেকটি অভূতপূর্ব কথা বললেন, যা শুনে সমবেত বিশ্ববাসী স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হলেন। তিনি 'Universal Religion-এর কথা বললেন। তিনি বললেন যে এমন একদিন পৃথিবীতে আসবে যেদিন এক বিশ্ব একজাতি এক ধর্ম পৃথিবীতে বিরাজ করবে। এই Universal Religion-এর প্রাণ রয়েছে বেদান্তদর্শনের সার্বিক উদারতার মধ্যে। ধর্ম নিয়ে হানাহানি ভেদাভেদ সেদিন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মের উদারতম বেদান্ত দর্শনের কাছে শ্রদ্ধায় নত হলেন বিশ্ববাসী। স্বামী বিবেকানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম জ্ঞান, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মেধা এবং অসীম ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ তেজদৃপ্ত কলেবর ও মেঘমন্দ্রিত কন্ঠস্বর সমগ্র ধর্ম মহাসভাকে মুগ্ধ করে রাখলো দীর্ঘ সতের দিন ব্যাপী।

সমগ্র ধর্মমহাসভার প্রাণপুরুষ রূপে সুচিহ্নিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসার কল্পে তাঁর মহান মনীষা ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সমবেত ধর্ম প্রতিনিধিদের যেমন মুগ্ধ করলো তেমনি সমবেত দর্শকমণ্ডলীকেও চমৎকৃত ও মুগ্ধ করলো। সকলের হৃদয়ের সিংহাসনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত হলেন।

সমগ্র আমেরিকারও প্রাশ্চাত্যের অজস্র পত্রপত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তার ঢেউ প্রাচ্যেও এসে লাগলো। সর্বধর্মের মহাসমন্বয়ের প্রবর্তক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বশ্রেষ্ট শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কাছে হিন্দু ধর্মের জয়পতাকা তুলে ধরে জগতজয় করলেন। একাধারে ধর্মগুরু, লোকগুরু, মানবপ্রেমিক দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক ও মহান সংগঠক রূপে সুচিহ্নিত হলেন বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনি পরিগণিত হলেন এক বিস্ময়কর আলোক বর্তিকারূপে।

পৃথিবীর সকল প্রান্তের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী মনীষীগণ তাঁকে জানালেন শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বিশ্বইতিহাসের মহান স্রষ্টা, ভারতের নবজাগরণের প্রাণবন্ত বিগ্রহ

সদা উন্নতশির বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, ম্যাক্সমুলার, রোমারল্যাঁ, হ্যারিয়েট মনরো, ডক্টর ব্রাইট, সি. সি. বনি, শ্রীঅরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, মহাত্মাগান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লুইবার্ক, অ্যানিবেশান্ত, রাধাকৃষ্ণন, কৃষ্ণবর্ণা শ্যামজী, আনাগরিক ধর্মপাল, ডক্টর বারোজ, ফান্সেস গুডইয়ার, জে. ই সুইটলারলিন, ব্রজেন্দ্র শীল, এডিথ সোয়ানডার হেলেন হাণ্টিংটন, মেরী ফিলিপস, জর্জ বার্ণাড শ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, আয়ার জি সুব্রমন্য, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, আমীর আলী, আচার্য্য বি. বি. নাগরকর কনষ্টানটনি প্রভৃতিগণ।

ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের নবজাগরণের মহান স্রষ্টা ও স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেছেন—

"স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। "স্বামী বিবেকান্দকে জানলে ভারতবর্ষকে জানা হবে।"

ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমেরিকার তৎকালীন বহু সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল সেসব থেকে কয়েটি মাত্র এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে—

১।..."যথার্থ বিরাট পুরুষ, সরল, ঐকান্তিক, মহান এবং আমাদের দেশের পণ্ডিতদের তুলনায় অতুলনীয় ভাবে বিদ্বান; হারভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক লিখেছেন যে আমাদের সকলের পাণ্ডিত্য জড়ো করলে যা হবে তার থেকেও স্বামী বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্য অনেক বেশী।" (লীন সিটি আইটেম ১৩।৪।১৮৯৪)

২।..."স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড মনস্বিতা ধর্মমহাসভায় তাঁকে প্রধান প্রিয়চরিত্র করেছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলো যুগ সৃষ্টকারী।"

(ভেস মাইনস নিউজ, ২৮. ১১. ১৮৯৩)

৩। ...অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মহান সন্ন্যাসী। প্রভত গভীর দর্শন ও উৎকৃষ্ট ধর্ম তাঁর। পাগনি হলেও খৃষ্টানরা তাঁর অনেক

শিক্ষা অনুসরণ করতে পারেন। তাঁর মত আমাদের মতই উদার।" (স্টেট জার্নাল ২১।১১।১৮৯৩)

৪।..."স্বামীজীর সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, যাদুকরী ব্যক্তিত্ব, ও অগাধ পাণ্ডিত্য এই দেশে হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে।

অত্যন্ত আকর্ষনীয় মহান মানুষ তিনি।......তাঁর গভীর সংগীতময় কন্ঠস্বর অবিলম্বে অপরকে আপন করে নেয়।"

(অ্যাপীল এ্যাভারেজ ১৪।১।১৮৯৪

৫।"...স্বামী বিবেকানন্দ এই দেশের মঞ্চে অবতীর্ণ শ্রেষ্ট বাগ্মীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অতুলনীয় বাচনভঙ্গি, অধ্যাত্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ সামর্থ। তর্ককালে বুদ্ধি. কৌশল, এবং তাঁর পরম আন্তরিকতা ধর্ম মহাসভায় উপস্থিত পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের নিবিড়তম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর অনুপম ভাষণ ও তাঁর ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলো ইংরেজী ভাষায় রত্নতুল্য।

ধর্ম মহাসভায় তাঁর অত্যাশ্চর্য্য প্রারম্ভিক ভাষণটি তাঁকে তৎক্ষণাৎ সেই ধর্ম জ্ঞানীদের সভায় নেতৃত্ব দান করলো।

শিল্পী তিনি চিন্তায়, আদর্শবাদী তিনি বিশ্বাসে, এবং নাট্যকার তিনি মঞ্চে।" (অ্যাপীল এ্যাভারেজ ১৫।১।১৮৯৪)

৬।..."ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র ভাষণটি উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তবে তা ছিল প্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক অতি উচ্চাঙ্গের। বিশেষতঃ সুন্দর ছিল তাঁর ভাষণের সমাপ্তি অংশ। যেখানে তিনি বললেন, "আমি খৃষ্টকে গ্রহণে সর্বদাই প্রস্তুত। তোমাদেরও উচিত কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে গ্রহণ করা।"

(মেসফিল কমার্শিয়াল ১৭।১।১৮৯৪)

৭।..."স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষিত মহলে দারুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় পরিধি এমনই ব্যাপক এবং তাঁর জ্ঞান এমনি সর্বাত্মক যে, এমন কি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরাও তাঁর উক্তি থেকে শিক্ষা নেন এবং তাঁর দিব্য পবিত্র সান্নিধ্য থেকে ভাব গ্রহণ করেন।"

(মেসফিল কমার্শিয়াল ২১।১।১৮৯৪)

৮।..."এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তির মাত্র পনের মিনিট বক্তৃতার জন্য হাজার হাজার মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেন।"

(নর্দাম্পটন ডেউলি হেল্যাণ্ড ১১।৪।১৮৯৪)

স্বামী বিবেকানন্দ সাতটি সাতটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তাহ'ল—বাংলা, ইংরেজী, জার্মান, গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন ও সংস্কৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে সন্ন্যাসী ও সৈনিক। কোন অন্যায়ের সাথে তিনি কখনো আপোষ করেন নি। পরাধীন ভারতের মানুষ হয়েও তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রীষ্টান পাত্রীদের নানান ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র রুখে দাঁড়িয়েছেন। 'ভারতবর্ষ অসভ্য ও কুসংস্কার ভরা' বৃটিশ পাদ্রীদের এই সদম্ভ উক্তির প্রতিবাদে গর্জে উঠে ছিলেন বীর কেশরী বিবেকানন্দ—তিনি প্রকাশ্য সভায় পাদ্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড বজ্র নির্ঘোষ স্বরে বললেন, "একহাতে বাইবেল, অন্যহাতে বিজেতার তরবারি—এই নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছে আমাদেন ধর্ম শেখাতে। তোমাদের ধর্ম গতকালের ধর্ম। যে ধর্ম কালকের ধর্ম আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ধর্মের তুলনায়।"

স্বামীজি সম্পর্কে তাই বিশ্ব বিখ্যাত লেখিকা লুসি মনরো বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যাধিকার প্রাপ্ত বাগ্মী। খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিকৃত প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের সম্পর্কে আমেরিকার জনগণের ধারণা খুবই নীচ ছিল। তাঁরা হিন্দুদের অধঃপতিত অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'হিদেন' মনে করতো। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বিভ্রান্তি ও বিকৃত ধারণা কাটিয়ে দিয়ে সত্যের আলোতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জগত সভায় তুলে ধরেন। তাঁর বক্তৃতার পর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীলোক বলতে থাকেন যে, হায়, এই মহান দেশে আমরা এতদিন মিশনারী পাঠাচ্ছিলাম, এঁদেরই উচিত মিশনারী পাঠানো আমাদের দেশে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বমানবতার প্রতি সীমাহীন প্রেম ও মানব মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রাম ও স্বাধীন চিন্তাধারা বিশ্ববাসীকে শ্রদ্ধাশীল করেছিল।

সকলরকম বৈষম্যের প্রতি ছিল তাঁর নিরলস সংগ্রাম। সাম্যের

চরম কথা তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন যে মানুষই ভগবান। নরনারায়ণ। তাই শিব জ্ঞানে জীব সেবার ব্রত নিয়ে আমরণ সংগ্রাম করে গেলেন দেশে বিদেশে। এতবড় সাম্যের বাণী পৃথিবীকে কেউ ইতিপূর্বে শোনান নি।

সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যতদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের দুটি তাৎপর্যময় মন্তব্য তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির অন্যতম প্রকাশ রূপে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ এক অভাবিত ভাবে স্বাধীন হবে।"

আর রাশিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, একদিন এখান থেকেই শ্রমিক বিপ্লব সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই দু'টি ভবিষ্যদ্‌বাণীই পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ রূপে ফলে গিয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে জ্ঞানে শঙ্কর, প্রেমে বুদ্ধ ও ক্ষমায় যিশু ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর কৃপাধন্যা মেরী সি ফাঙ্কির উক্তিটি বিশেষ প্রনিধাণযোগ্য—

"যিশু যদি এখন পৃথিবীতে থাকতেন তাহলে যেভাবে তাঁর কাছে শিক্ষানিতে যেতাম, ঠিক সেই ভাবে আপনার কাছে এসেছি।"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সবশেষে ক্রিষ্টিন গ্রীনস্‌টাইডেলের চির স্মরণীয় উক্তিটি দেয়া হ'ল—

"স্বামী বিবেকানন্দের সাথে কারো তুলনা চলেনা।......অপরে যেখানে চমকপ্রদ তিনি সেখানে জ্যোতির্ময়। যেহেতু সকল জ্ঞানের উৎসের সাথে সাক্ষাত সংযোগ স্থাপনের অধিকার তাঁর ছিল।......তিনি এ জগতের নন। তিনি আলোকিত পুরুষ। অন্য এক জগত থেকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখানে অবতীর্ণ।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে ঐশী নির্দিষ্ট দেবমানব তা বহু পূর্বেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং প্রায় একযুগ পূর্বে তৎকালীন বি. এ ক্লাসের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত তারাপীঠে তাঁকে দর্শন করতে এসে প্রণাম ও দর্শন করে, এবং আশীর্বাদ চাইতেই তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন ভাবীকালের স্বামী বিবেকানন্দকে এবং তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণীও করলেন তাঁর বন্ধু

ও সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে। যুগগুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাই সর্বপ্রথম নরেন্দনাথ দত্ত তথা ভাবীকালের স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই ভবিষ্যতবাণী করেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, যা তখন ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার।

সেদিন হয়তো জগত জননী তারামায়ের দিব্য ঐশী শক্তি ঝরে পড়েছিল পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথের মস্তকে অবিরল ধারায়। নাহলে দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতে থাকা সত্বেও যুবক নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপাকে দেখবার জন্য তীব্র ব্যাকুল হয়ে তারাপীঠে ছুটে এলেন কেন? আর পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা-ই বা কেন তাঁর সম্পর্কে অভূতপূর্ব ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন?—এসবের পেছনে রয়েছে জগত জননী তারামায়ের এক ঐশী ও নিগূঢ় সংযোগ।

তারাপীঠে যে তারিণী দেবী রয়েছেন তিনিই তো আরেক বেশে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী। তাই দেখা যায় নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ যখন সাকার মানলেন, মা ভবতারিণীকে মানলেন এবং অর্থ না চেয়ে মা কালীর কাছে পরমার্থ জ্ঞানভক্তি বিবেকবৈরাগ্য চাইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে নরেন্দ্রনাথ বললেন "আমাকে মায়ের গান শিখিয়ে দিন", তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও সানন্দে তাঁকে যে গানটি শেখালেন তা হল—"মা ত্বং হি তারা"। সারা রাত্রি ধরে নরেন্দ্রনাথ তারামায়ের এই অপূর্ব গানটি অবিরাম গেয়ে গেলেন ঠাকুরর ঘরে বসে অবিশ্রান্তভাবে।

তাই তারিণী আর ভবতারিণীর অভেদ সেতুর দুই প্রান্তে দাড়িয়ে, নরেন্দ্রনাথ তথা ভাবী স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ঐশীকৃপাশক্তি বর্ষণ করলেন তারিণী ও ভবতারিণীর অভেদ স্বরূপ যুগগুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রাণগঙ্গার দুই তীরে সগুণ ব্রহ্মের এই দুই বিগ্রহ সপ্তঋষির অন্যতম ঋষি নরেন্দ্রনাথকে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে মেলে ধরলেন বিশ্ববাসীর দিব্য চেতনার আলোক বর্তিকা রূপে।

নরেন্দ্রনাথ তো বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হলেন। নরেন্দ্রনাথের সেই বন্ধু ও সহপাঠী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীও সন্ন্যাসী হলেন। বামাক্ষ্যাপার আশিস ও কৃপাধন্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী উত্তরকালে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও সাধকরূপে পরিগণিত হ'ন।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর দীক্ষা ও গুরুকরণও অতি বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সেই কলেজের সহপাঠী ও বন্ধু নরেন্দ্রনাথ তথা পরবর্তী কালের বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই দীক্ষাগ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম দেন স্বামী সদানন্দ।

স্বামী সদানন্দ তথা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর পূর্ব নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের যশোর জেলায়। তবে কোলকাতায় ছেলেবেলা থেকেই তিনি থাকতেন। স্বামী সদানন্দ তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পর পশ্চিমে অনেক বছর গিয়ে সাধনা করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পয়ত্রিশ বছর পর এবং প্রথমবার তারাপীঠে আসবার চল্লিশ বছর পর বাংলা ১৩২৯ সালে (ইং- ১৯২২ খৃঃ) দ্বিতীয়বার স্বামী সদানন্দ একা তারাপীঠে আসেন এবং এবং দশদিন তারাপীঠে থাকেন।

নরেন্দ্রনাথের সাথে সেই প্রথমবার সহপাঠী রূপে তারাপীঠে আসবার চল্লিশ বছর পর তিনি দ্বিতীয়বার তারাপীঠে এসে সেই পূর্বের মধুর স্মৃতিমন্থনে বিভোর হ'ন। কিন্তু সেই প্রথমবার মাত্র একদিন তারাপীঠে থেকে যে স্বর্গীয় আনন্দ পেয়েছিলেন এবার দীর্ঘ দশদিন থেকেও তাঁর একভাগও পেলেন না। তার প্রথম কারণ তারামায়ের অমৃত মথিত রূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর স্থূলদেহের মহান মর্ত্যলীলা শেষ করে অপ্রকট হয়েছেন এগার বছর পূর্বেই (২রা শ্রাবণ ১৩১৮ সালে)। দ্বিতীয় কারণ স্বামী সদানন্দের পূর্ব সহপাঠী ও সুহৃদ নরেন্দ্রনাথ তথা গুরু স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর পৃথিবী জুড়ে ঐশী নির্দিষ্ট লীলা সমাপ্ত করে ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে জগত থেকে বিদায় নিয়ে সেই চির অমৃতময়ধাম ঋষি লোকেই ফিরে গেছেন (৪ঠা জুলাই, ১৯০২)।

তাই দ্বিতীয় বার তারাপীঠে এসে নিঃসঙ্গ সদানন্দস্বামী এই দু'জনের বিরহে ও স্মৃতি ভারে নিরানন্দ হয়ে পড়েন। তারই মাঝে তারামন্দিরে ও তারাপীঠ মহাশ্মশানের শিমূলতলায় জপধ্যান করে দীর্ঘ দশদিন অতিবাহিত করেন।

তারপর তারাপীঠে থেকে চিরবিদায় নিয়ে ট্রেনে মুরারই স্টেশনে এলেন। সেখান থেকে নিকটবর্তী কনকপুর গ্রামে গেলেন। কনকপুরে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্যসঙ্গ ধন্য ও কনকপুর স্কুলের বিশিষ্ট

শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা হ'ল। উপরোক্ত কাহিনীটি তিনি যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন (১৩২৯ সালে)। তাঁরই নির্দেশে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য কৃপাধন্য সঙ্গধন্য যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "বামাক্ষ্যাপার জীবনী ও জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী" নামে একটি ছোট্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২ খৃঃ) গ্রন্থটি রচনা করেন তিনি।

উপরোক্ত দুর্ল্লভ কাহিনীটির প্রথম অংশটি অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু সহ তারাপীঠে শ্রীবামদর্শনে আগমনের অংশটি এবং কাহিনীর শেষ অংশটি অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু তথা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তথা শিষ্য স্বামী সদানন্দের দ্বিতীয়বার তারাপীঠে আসবার ও বিদায় নেবার অংশটি সেই সুদুর্ল্লভ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অশেষ কৃপাধন্য খরুণ নিবাসী পণ্ডিত প্রবর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনী যথাস্থানে (তৃতীয় খণ্ডে) বর্ণিত হবে।

এখন (১৯৮৬) থেকে দীর্ঘ চৌষট্টিবছর পূর্বে রচিত এই অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ গ্রন্থটি লেখককে সন্ধান ও সাময়িকভাবে সংগ্রহ করে দেবার জন্য খরুন নিবাসী ও সহৃদয় ভক্তপ্রবর অম্বুজাক্ষ রায়ের নিকট লেখক চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

তারাপীঠে মগনানন্দ ভৈরবী

বাংলা ১২৯০ সাল থেকে তারাপীঠের কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত আমেদপুর থেকে ডাবুকের কৈলাসপতির সুযোগ্যা শিষ্যা মগনানন্দ ভৈরবী তারাপীঠে আসা যাওয়া করতে থাকেন।

এই অসাধারণ সিদ্ধসাধিকা ডাবুকে গুরু কৈলাসপতির আশ্রমে যাবার পথে তারামাকে দর্শন করে তারাপীঠের প্রাণপুরুষ বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন ও সেবা যত্ন করেন বহুবার।

শ্রীবামের বহু অলৌকিক লীলাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং শ্রীবামের দিব্য কৃপাও লাভ করেন। তিনি বহুবার তারাপীঠে আসেন এবং বেশ কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে বসবাস করে শ্রীবামের সেবাযত্ন করে কৃতার্থ হ'ন।

শ্রীবামও এই বয়োজ্যেষ্ঠা ভগ্নী তুল্যা সিদ্ধ সাধিকাকে যথারীতি সম্মান করেন। শ্রীবামকে তিনি বিচিত্র সেবা করেন।

শ্রীবামকে মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে শ্রীবামের প্রিয় কয়েকটি কুকুর ভীষণ আঁচড়ে দিত, কামড়ে দিত। কখনো হয়তো একপাতায় কুকুরদের নিয়ে খাচ্ছেন শ্রীবাম। প্রায় সব খাবারটাই কুকুরগুলো খেয়ে নিচ্ছে। শ্রীবাম বালকের মত রেগে গিয়ে কুকুরগুলোকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "তোরা শালা, সবই খাবি?"—এই বলে খেতে লাগলেন। এর ফলে শ্মশানের মড়াখেকো হৃষ্টপুষ্ট কুকুরগুলোর মেজাজ সহসা গরম হয়ে গেল। ফলে শ্রীবামকে কামড়ে আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত করলো। দেহবোধহীন শ্রীবামের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি যথারীতি নির্বিকার।

কিন্তু মগনানন্দ ভৈরবী এই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারেন না। তিনি জানেন পরমা প্রকৃতি তারামায়ের পুরুষ রূপ এই শ্রীবাম তথা বামাক্ষ্যাপা। তাই তিনি শ্রীবামের পবিত্র অঙ্গ থেকে কুকুরের কামড় ও আঁচড় গুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তারপর পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দেন সযত্নে।

তখন কিন্তু বামাক্ষ্যাপা তাঁকে গালাগালি দিয়ে চলেছেন। তিনিও

পাল্টা শ্রীবামকে গালাগালি দিয়ে চলেছেন। শ্মশানের এই কুকুরগুলোকে এত বেশী আস্কারা দেবার জন্যই এই গালাগালি। সেবাযত্ন কিন্তু সমানে চলছে। শ্রীবাম সেবা নিচ্ছেন ও যথারীতি গালাগাল দিচ্ছেন এবং মগনানন্দ ভৈরবী সেবা করছেন ও যথারীতি গালাগালি দিচ্ছেন। সেব্য সেবিকার এই বিচিত্র ব্যাপাব উপস্থিত সবাই আনন্দ করে দেখছেন।

শ্রীবামেব এই বাইরের ক্রোধ কিন্তু অন্তরেব আশীর্বাদেরই প্রাণবন্ত রূপ। মগনানন্দ ভৈববীর গালাগালি কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তিরই বহিঃ প্রকাশ মাত্র। উভয়েই তা জানেন। তবু এই বিচিত্র সেবা লীলা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীবামেব প্রকৃতি যেমন শিশুসুলভ তেমনি শিশুর মতই শ্রীবামের মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। ভক্তিমতী মগনানন্দ ভৈরবী কখনো সেই লালা শ্রীবামেব মুখ থেকে মুছে নিয়ে নিজের গায়ে মুছে ফেলেন, কখনো সামনে কোন ভক্ত দাড়িয়ে থাকলে তার গায়ে মুছে দিয়ে বলেন, 'যা, মহাপ্রসাদ পেলি।'

কখনো ভক্তিময়ী মগনানন্দদেবী নিজের হাতে ভাল মুড়ি নাড়ু নিয়ে এসে শ্রীবামকে খাওয়ান। শিশুসুলভ আনন্দ করে শ্রীবাম তা গ্রহণ করেন। কখনো অপূর্ব সুন্দর রুটি তৈরী করে শ্রীবামকে খাওয়ান। সাধারণত মেয়েছেলে দেখলে শ্রীবাম বিরক্ত হয়ে বলেন, "তুই আমাকে কি ছোবি ?"

কিন্তু নিঃস্বার্থ সেবিকা ও অগ্রজা স্বরূপা মগনানন্দ ভৈরবীর ক্ষেত্রে তা শ্রীবাম বলেন না।

শ্রীবামের অফুরন্ত কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন মগনানন্দ ভৈরবী। উত্তর কালে তিনি সিদ্ধসাধিকা ও শক্তিময়ী ভৈরবী রূপে সুপরিচিতা হ'ন।

এই শ্যামবর্ণা, মাঝারি গড়ন ও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারিণী মগনানন্দ ভৈরবীব জন্ম বীরভূমের আমেদপুরে, আনুমানিক বাংলা ১২২৪ সালে (ইং-১৮১৭ খৃঃ)। শ্রীবামের চেয়ে তিনি স্থূলদেহে একুশ বছরের বড় ছিলেন বলে শোনা যায়।

বাল্যকাল থেকেই অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হ'ন। সংসারের কোন বাধা বিঘ্নই তাঁকে আটকাতে পারেনি। পরবর্তীকালে ডাবুকে সিদ্ধপুরুষ কৈলাসপতির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হ'ন।

এই অসাধারণ সিদ্ধ সাধিকা গুরু কৈলাসপতির আশ্রম ডাবুকে যাতায়াতের পথে বহুবার তারাপীঠে আসেন এবং শিবাবতার বামাক্ষ্যাপাকে দেখে, ক্রমশঃ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হয়। ক্রমে তারামায়ের কৃপায় তিনি শ্রীবামের নিঃস্বার্থ ভাবে সেবাযত্নও করতে থাকেন এবং উপলব্ধি করেন বামাক্ষ্যাপা তারামায়ের অভেদ স্বরূপ।

উত্তরকালে তিনি আমেদপুর ষ্টেশনের বিপরীত দিকে তিনি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নাম মগ্নেশ্বরী কালীমন্দির।

এক কষ্টি পাথরে তৈরী অপূর্ব সুন্দর এই কালী মূর্তিটি। খুবই জাগ্রত এই কালী মা।

মগনানন্দ ভৈরবীমায়ের বহু শিষ্য শিষ্যা ও ভক্ত সারাদেশে ছড়িয়ে আছেন। কাশীতেও তাঁর অনেক শিষ্য শিষ্যা রয়েছেন।

মাঝে মাঝে তিনি বহু শিষ্য শিষ্যা সহ কাশীতে গিয়ে অবস্থান করেন। আবার কিছুকাল পর আমেদপুরে চলে আসেন।

১৯৫২ সালের ১৩৫ বছর বয়সেও তিনি অপূর্ব রুটি ও ডালের বড়ি তৈরী করে শিষ্য ভক্তদের খাওয়ান।

তাঁর হাতের তৈরী এই ডালের বড়ি ও রুটি যাঁরা খেয়েছেন, তার মধুর স্বাদ কখনো ভুলতে পারবেন না। ১৯৭২ সালে তাঁর সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে তিনি কাশীতে বিরাজ করছেন। তখন তাঁর স্থূলদেহের বয়স একশো পঞ্চান্ন বছর।

জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শ্রীবাম সম্পর্কে বলেন, "বামাক্ষ্যাপার ন্যায় সবসময় শিশুভাব মণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এযুগে বিরল। বামাক্ষ্যাপা স্থূল দেহে বর্তমান থাকতে তাঁকে অনেকেই চিনতে পারেননি। বামাক্ষ্যাপা ছিলেন স্বয়ং শিবস্বরূপ।" উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক মগনানন্দ দেবীর কৃপাধন্য জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের গ্রন্থাগারিক 'সুশীল'বাবু তথা হীরেন্দ্ররায়ের কাছে লেখক চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবামের মাতৃবিয়োগ ও শেষকৃত্য প্রসঙ্গ

বাংলা ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে সামান্য কয়েকদিন রোগভোগের পর চৌষট্টি বছর বয়সে শ্রীবামের জননী রাজকুমারী দেবী আটলা গ্রামে দেহত্যাগ করে তারামায়ের শাশ্বত কোল লাভ করলেন। শ্রীবামের স্থূলদেহের বয়স তখন পয়তাল্লিশ বছর পাঁচ মাস। শ্রীবামের অনুজ রামচন্দ্রের বয়স তখন তেত্রিশ বছর। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সাধ্যমত চিকিৎসা করেন কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজকুমারী দেবীর দেহত্যাগের দিন বর্ষার শ্রাবনধারা অঝোরে ঝরে পড়ছিল। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যেন শ্রীবাম জননীর পরলোকগমনে সেদিন অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করছিলেন।

সতী সাধ্বী রাজকুমারী দেবীর বাসনা ছিল যে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর মরদেহ যেন তারাপীঠের পবিত্র মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। তারামায়ের কোলেই তিনি থাকতে চান। এই বাসনা শুধু রাজকুমারী দেবীরই নয়, তারাপীঠের আশেপাশের ও দূরের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নরনারীর অন্তরেই এই বাসনা রয়েছে। রাজকুমারী দেবীর বাসনার পেছনে আরো কারণ আছে। এই মহাপীঠ তারাপীঠের মহাশ্মশানে রাজকুমারী দেবীর প্রিয়তম স্বামী সর্বানন্দের মরদেহ দাহ করা হয়েছে। প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠ কন্যা জয়কালী দেবীর দেহও এই শিমুলতলায় দাহ করা হয়। তাছাড়া প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র বামাক্ষ্যাপা, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির লীলাভূমি এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে শিমূল তলায় বিরাজ করছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের চোখের সামনেই তিনি তারামায়ের কোলে সানন্দে থাকতে চান। তাই দেহত্যাগের পূর্বেই তাঁর এই অন্তিম বাসনা তিনি জানিয়েছেন।

সেই অনুসারে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ও তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেসীগণ শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টি ধারার মধ্যেই আটলা গ্রাম থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু কবিচন্দ্রপুরে পৌঁছে দেখলেন দ্বারকানদীতে প্রবল বান ডেকেছে। একে ঘোর বর্ষা, তাতে বাণ ডেকেছে, তাই দ্বারকানদী প্রচণ্ড উত্তাল হয়ে উঠেছে। খুব বেশী বৃষ্টি হলে পাহাড়ে

বান ডাকে। বর্ষার জল দ্বারকা পাহাড় থেকে প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসে দ্বারকানদীতে। ফলে তখন নদীর দু'কূল প্লাবিত করে বিশাল জলরাশি ঘোর আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে উদ্দাম বেগে উত্তরমুখে ছুটে চলে। তারাপীঠের দ্বারকা তীরবর্তী মহাশ্মশানের পশ্চিম ভাগ জল প্লাবিত হয়ে যায়। যাহোক, রাজকুমারী দেবীর মরদেহ নিয়ে কনিষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র ও আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেসীগণ কবিচন্দ্রপুরে পৌঁছে ও দ্বারকার বান পেরিয়ে কি ভাবে পূর্ব দিকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে যাবেন তা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

ওপারে তারাপীঠ মহাশ্মশানে যাবার জন্য কবিচন্দ্রপুর ঘাটে জোড়া ডোঙ্গা আছে কিন্তু নিয়ে যাবার পাটনী নেই। তখন রামচন্দ্রের আত্মীয়বর্গ পাটনীর খোঁজ করতে লাগলেন। এদিকে তারামায়ের মন্দিরের দোতালায় বিরামখানায় বসে বামাক্ষ্যাপা এসব দেখতে পেয়ে দ্রুতগতিতে বিরামখানা থেকে বের হয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্য দিয়ে দ্বারকার পূর্বতীরে এসে দাড়ালেন।

অন্তর্যামী শ্রীবাম সব বুঝতে পেরেছেন। মাতৃশোকে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কবিচন্দ্রপুর ঘাটে পাটনী এল।

জোড়া ডোঙ্গা করে রামচন্দ্র এবং তাঁর আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের প্রতিবেশীগণ রাজকুমারী দেবীর মরদেহ নিয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানে উপস্থিত হলেন। রামচন্দ্র তাঁর অগ্রজ শ্রীবামকে সজল নয়নে জানালেন জননীর দেহত্যাগের কথা। উভয় ভ্রাতাই সাময়িকভাবে মাতৃশোকে নিমগ্ন হলেন। তারপর জননীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। শ্রীবাম তাঁর অনুজ রামচন্দ্র এবং আত্মীয়বর্গ ও শ্মশানবন্ধুদের সঙ্গে চিতার জন্য কাঠ সংগ্রহ করলেন।

যথা সময়ে চিতা প্রজ্বলিত হ'ল। রামচন্দ্র অগ্রজ শ্রীবামকে জননীর মুখাগ্নি করতে বললেন। উত্তরে শ্রীবাম রামচন্দ্রকেই মুখাগ্নি করতে বললেন। কারণ তিনি সন্ন্যাসী। তাই রামচন্দ্রই মুখাগ্নি করলেন।

চিতা যখন রাজকুমারী দেবীর শবদেহকে ঘিরে পূর্ণমাত্রায় প্রজ্বলিত হ'ল তখন মাতৃভক্ত শ্রীবাম জননীর মঙ্গল কামনা করে 'জয় জয় তারা' ধ্বনি তুলে মহাশ্মশান মুখরিত করলেন।

তারপর সজল নয়নে জোড়হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারামা, আমার গর্ভধারিণীকে কোল দে!"

মহা সৌভাগ্যবতী রাজকুমারী দেবী তাঁর পরলোকগত স্বামী ও জ্যেষ্ঠা কন্যার পাশেই পরম শান্তিতে তারামায়ের কোল লাভ করলেন। তারামায়ের নিত্য কোলে পরম শান্তিতে বসে জ্যোতির্ময়ী রাজকুমারী দেবী দেখতে পেলেন তাঁর প্রজ্বলিত জড় দেহকে ঘিরে সজল নয়নে দাড়িয়ে আছেন তাঁর এক সন্ন্যাসী পুত্র এবং আরেক গৃহী পুত্র এবং তাঁদের সাথে রয়েছেন তাঁর জড় দেহ সম্পর্কিত স্নেহের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেসীগণ। এক সময় রাজকুমারী দেবীর জড়দেহ চিতায় বিলীন হয়ে গেল। শ্মশানকৃত্য সম্পন্ন করে রামচন্দ্র সজল নয়নে অগ্রজ শ্রীবামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্মশানবন্ধু আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেসীদের সাথে আটলাতে ফিরে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জননীর দেহত্যাগ ও শেষকৃত্য প্রসঙ্গে তাঁর অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থে একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাহ'ল, দ্বারকার ভীষণ বানের জন্য এবং জোড়া ডোঙ্গা ও পাটনী না থাকার জন্য কবিচন্দ্রপুর থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে আসতে না পেরে 'বালক রামচন্দ্র' ও তাঁর অভিভাবক আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী শ্মশানবন্ধুগণ কবিচন্দ্রপুরেই রাজকুমারী দেবীর দেহকে দাহ করবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে বামাক্ষ্যাপা তা দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র ও অন্যান্য সকলকে কবিচন্দ্রপুরে জননীর শবদাহ করতে নিষেধ করে দ্বারকা নদীর ভয়ঙ্কর বান উপেক্ষা ক'রে 'জয়তারা' বলে ঝাঁপ দিয়ে দ্বারকানদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে ওপারে কবিচন্দ্রপুরে পৌছলেন।

তারপর রামচন্দ্র ও শ্মশানবন্ধুদের সামনে থেকে জননীর দেহ নিজের পীঠে বেঁধে আবার দ্বারকা নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং সাঁতরে পার হয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসে উঠলেন। বালক রামচন্দ্র এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে ও অন্যসবাই কবিচন্দ্রপুর থেকেই আটলা গ্রামে ফিরে গেলেন। তারাপীঠ মহাশ্মশানে বামাক্ষ্যাপাই তাঁর জননীর মুখাগ্নি ও শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু এই ঘটনাটি বহুল প্রচারিত হলেও এর পেছনে কোন প্রামান্য তথ্য নেই।

দ্বিতীয়ত এই অলৌকিক ঘটনা অনুসারে বামাক্ষ্যাপা তাঁর পরলোকগতা জননীর দেহ পীঠে বেঁধে কবিচন্দ্রপুর থেকে দ্বারকা নদী ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এনে নিজে জননীর

মুখাগ্নি করে সৎকার করেন একাকী—এটিও বাস্তবভিত্তিক নয়। কারণ তিনি সন্ন্যাসী, তাই তিনি জননীর মুখাগ্নি করতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্রে সন্ন্যাসী কখনো তাঁর পূর্বাশ্রমের পিতা বা মাতার মুখাগ্নি করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজের পিণ্ড নিজে দিয়ে বিরজা হোম করে পূর্বাশ্রমের সকল সংস্কার ছিন্ন করে চিরমুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সুতরাং বামাক্ষ্যাপা তাঁর জননীর মুখাগ্নি করেননি। আর, গৃহী ও উত্তরাধিকারী 'বালক রামচন্দ্র' কবিচন্দ্রপুর থেকেই আটলাতে ফিরে গেছেন হতভম্ব হয়ে শ্মশান বন্ধুদের সাথে এটিও অবাস্তব ব্যাপার। তর্কের খাতিরে যদি বাস্তব ঘটনা ধরা যায়, তাহলে বলতে হবে, তবে কি দুই পুত্র বর্তমান থাকতেও রাজকুমারী দেবীর মত মহিয়সী নারীর মুখাগ্নি হয়নি? বিনা মুখাগ্নিতেই বামাক্ষ্যাপা তাঁর জননীর শব পুড়িয়ে দিয়েছেন? তৃতীয়তঃ বালক রামচন্দ্র ও তার অভিভাবক আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী শ্মশানবন্ধুগণ সবাই শবদাহ না দেখেই আটলাতে হতভম্ব হয়ে ফিরে গেছেন—এই ঘটনাও বাস্তব সম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ কবিচন্দ্রপুর থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশান ও শবদাহ পরিস্কার দেখা যায়। কবিচন্দ্রপুর ও তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্যে মাত্র কয়েকশো ফুট ব্যবধান সৃষ্টি করে দ্বারকা নদী প্রবাহিত।

সুতরাং শবদাহ না দেখে শ্মশানবন্ধুগণ বালক রামচন্দ্রকে নিয়ে আটলায় ফিরে গেছেন—তা শুধু সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার নয় হিন্দুমতে অশাস্ত্রীয় বটে। হিন্দু শাস্ত্রমতে শববাহীগণ ও শবস্পর্শ যুক্ত শবানুগমনকারী শ্মশানবন্ধুগণ শ্মশানে শবের অগ্নিসংস্কার ও শেষকৃত্য সকল সম্পন্ন করে স্নাত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক অগ্নি শুদ্ধ হবেন।

চতুর্থতঃ আটলা গ্রামের প্রাচীন সংস্কার সম্পন্ন সদাচারী প্রবীণ শ্মশানবন্ধুগণ তাঁদেরই গ্রামের চিরপরিচিত সন্তান বামাক্ষ্যাপাকে ভালভাবেই জানেন। শ্রীবাম তাঁদের শুধু পরিচিত নন, প্রিয়জনও বটে। শ্মশান যাত্রীদের অনেকেই বামের প্রিয় প্রতিবেশী এবং আবাল্য সুহৃদ। তাই শ্রীবামের বিচিত্র প্রকৃতিতে তাঁরা অভ্যস্ত।

সুতরাং গ্রামের শবদাহ সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করে শ্মশানযাত্রীগণ বামাক্ষ্যাপার ভয়ে শবদাহ না করেই না দেখেই শুধু শুধু 'হতভম্ব' হয়ে 'বালক রামচন্দ্র'কে তাঁর পরলোকগতা জননীর

মুখাগ্নি না করিয়ে নিয়েই ফিরে গেছেন সবাই আটলা গ্রামে—তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। তাহলে শাস্ত্রমতে ও প্রাচীন সংস্কার অনুসারে তাঁরা 'শশ্মানবন্ধু" হতে পারেন না এবং আদ্য শ্রাদ্ধে শ্মশান-বন্ধুদের জন্য নির্দিষ্ট নিমন্ত্রণ পাবার অধিকারীও তাঁরা হতে পারেন না।

সুতরাং আটলা গ্রামের তৎকালীন সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ এবং গ্রামের প্রাচীন সংস্কার সম্পন্ন অন্যান্য গ্রামবাসীগণ শবদাহ না করেই বামাক্ষ্যাপার ভয়ে দূর থেকে ফিরে গেছেন তা হ'তে পারেনা। তাঁরা স্বাভাবিক সংস্কার বশেই তাঁদের নির্দিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করে আটলায় ফিরেছেন রামচন্দ্রকে নিয়ে। এটাই স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ করুণাময় বামাক্ষ্যাপাও তাঁর জন্মভূমি আটলাগ্রামের সুপরিচিত আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় প্রতিবেশীদের অযথা হয়রানি ও তাঁদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তাঁদের অসম্মান করেছেন—এটা অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার কারণ তাঁরই জননীর দেহ তাঁরা বহন করে এনেছেন এবং তাঁরই ছোট ভাই রামচন্দ্রের সাথে তাঁরা এনেছেন, এটা শ্রীবামের খেয়াল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। সর্বোপরি তাঁর ছোটভাই রামচন্দ্র সপরিবারে এই আটলা গ্রামেই তাঁর পিতৃগৃহেই গ্রামের সমাজের মধ্যেই বাস করছেন। সুতরাং জননীর শবদেহের মুখাগ্নি ও সৎকার শাস্ত্র মতে না হলে এবং শ্মশান বন্ধুদের কৃতকৃত্য সম্পন্ন না হলে রামচন্দ্র মাতৃশাদ্ধ করতে পারবেন না এবং গ্রামের সমাজ চ্যুত হয়ে অশেষ লাঞ্ছনার ভাগী হবেন এবং মাতৃ শ্রাদ্ধও পণ্ড হবে, এটা সর্বজ্ঞ শ্রীবাম ভাল ভাবেই জানেন। সুতরাং শাস্ত্র নির্দিষ্ট মতে ছোটভাইকে দিয়ে তিনি জননীর মুখাগ্নি ও শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন তাঁর গ্রামের প্রতিবেশীদের সাথে এঠা স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, 'বালক রামচন্দ্র' তখন বালক ছিলেন না। জননী রাজকুমারী দেবীর দেহ ত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। তখন তিনি বিবাহিত এবং একাধিক সন্তানের জনক। সুতরাং রামচন্দ্রের আত্মীয়গণ ও প্রতিবেশীগণ রাজকুমারী দেবীর শব দাহ না করিয়েই বামাক্ষ্যাপার কাজে হতভম্ব হয়ে রামচন্দ্রকে কোন কাজে না করিয়েই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন আটলা গ্রাম—এ তথ্য সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন।

সপ্তমত, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সঙ্গধন্য বহু বিশিষ্ট শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ উপরোক্ত বহুল প্রচারিত অলৌকিক ঘটনাটি বিশ্বাস করেননি। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যামার অন্যতম কৃপাধন্য সন্তান এবং 'বামামিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 'বামলীলা' গ্রন্থের লেখক শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

শাস্ত্রী মশায় 'বামলীলা' গ্রন্থরচনা কালীন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জন্মভূমি আটলাতে যান এবং শ্রীবামের জননীর শেষকৃত্যে যোগদানকারী শ্মশান-বন্ধুদের অনেকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং জানতে পারেন যে জোড়া ডোঙ্গা করে কবিচন্দ্রপুর থেকে রামচন্দ্র জননী রাজকুমারীদেবীর শব নিয়ে এবং শ্মশানবন্ধুগণ সহ তারাপীঠ মহাশ্মশানে আসেন এবং শ্রীবামের নির্দেশে রামচন্দ্র সকলের উপস্থিতিতে মুখাগ্নি করেন এবং শব দাহ করে সবাই আটলায় ফিরে আসেন। সুতরাং উপরোক্ত প্রথম কাহিনীটি সম্পূর্ণ সত্য, শাস্ত্রসম্মত এবং বাস্তবভিত্তিক। আর দ্বিতীয় অলৌকিক কাহিনীটি অবাস্তব ও অশাস্ত্রীয় রূপে চিহ্নিত।

তাই এই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাহিনীটি অবাস্তব ও অশাস্ত্রীয় ও তথ্যহীন রূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় তা গ্রহণ যোগ্য নয়।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জননী রাজকুমারী দেবীর শেষকৃত্য প্রসঙ্গে আরেকটি গ্রন্থে আছে যে, ঐ সময় দ্বারকার প্রচণ্ড বান দেখে রামচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী শ্মশানবন্ধুগণ রাজকুমারী দেবীর শব দ্বারকার বানের জলে ভসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন কিন্তু শোকাতুর রামচন্দ্র আপত্তি করতে থাকেন কাঁদতে কাঁদতে।

এই দৃশ্য দেখে বামাক্ষ্যাপা দ্বারকার বানে ঝাঁপ দিয়ে কবিচন্দ্রপুরে পৌঁছে, জননীর দেহ নিয়ে আবার ঝাঁপ দিয়ে প্রবল তুফান সাঁতরে তারাপীঠ মহাশ্মশানে পৌঁছলেন। সেখানেই তিনি জননীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন একাকী।

কিন্তু উপরোক্ত সাতটি কারণে এই অলৌকিক কাহিনীটিও (যা উপরোক্ত তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীরই প্রায় অনুরূপ) তথ্য-ভিত্তিক ও বাস্তব ভিত্তিক নয়।

—০—

মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীবামের অলৌকিক লীলা

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পরলোকগতা জননী রাজকুমারী দেবীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পর আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্বে একটি পুরানো ঘটনা নিয়ে এক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বহুদিন পূর্বে আনুমানিক বাংলা ১২৬০ সালে রাজকুমারী দেবীর স্বামী সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে। এই ঘটনা নিয়ে সেই সময়ে আটলা গ্রামের অনেকে তাঁকে প্রায় একঘরে করেছিলেন। কিন্তু নির্ভীক ও তেজস্বী এবং তারামায়ের বীর সন্তান সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় তা গ্রাহ্য করেননি। রাজকুমারী দেবীর শ্রাদ্ধের পূর্বে সেই পুরাতন প্রসঙ্গ আবার নূতন করে অশান্তির সৃষ্টি করলো।

আটলা গ্রামের একদল লোক রাজকুমারী দেবী তথা বামাক্ষ্যাপা ও তাঁর ছোট ভাই রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করলেন। অন্যদল তথা রক্ষনশীল সমাজপতির দল তাঁদের বিরুদ্ধে গেলেন। রামচন্দ্রের পক্ষে বিশেষ ভাবে রয়েছেন আটলা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি দুর্গাদাস সরকার। তিনি সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র পরিবারের চিরহিতৈষী (দ্রষ্টব্য-প্রথমখণ্ড)। অন্যদিকে বিপক্ষে রয়েছেন রামপুরহাটের মোক্তার ও বড়শাল গ্রামের সমাজপতি বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

বিষ্ণুবাবুর সাথে রামচন্দ্রের বিশেষ শুভার্থী দীনবন্ধুবাবু ও রামচন্দের কর্মস্থলের মনিব ব্রজনাথ সাহার বন্ধুত্ব থাকায় রামচন্দ্র তাঁদের মাধ্যমে বিষ্ণুবাবুর সাথে আপোষ করতে সমর্থ হলেন। দুই পক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে আপোষ হ'ল। সব অশান্তি মিটে গেল। আপোষের সূত্র অনুসারে রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মণ সমাজকে নিমন্ত্রণ করতে হ'ল। তারামায়ের কি বিচিত্র লীলা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে পাঁচশো'র ওপর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে হ'ল শান্তিপূর্ণ ভাবে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবার জন্য এবং মাতৃদায় থেকে রক্ষা পাবার জন্য। পুরানো অশান্তি চিরতরে মেটাবার জন্যই এই গুরু দায়িত্ব রামচন্দ্রের ওপর এসে পড়লো।

রামচন্দ্রও সাধক প্রকৃতির লোক। বংশের মহান অধ্যাত্ম ঐতিহ্য

তাঁর ধমনীতেও বইছে। তিনিও মাতৃসাধক এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। তাছাড়া যাঁর পিতা মাতৃসাধক সর্বানন্দ, মাতা মহিয়সী সাধ্বী নারী রাজকুমারী দেবী, দিদি সন্ন্যাসিনী ও সিদ্ধসাধিকা জয়কালী দেবী এবং দাদা বীর সন্ন্যাসী ও শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা, তাঁর কিসের ভয়। তাই তিনি বীর সাধকের ন্যায় এই বিরাট দায়িত্ব অনায়াসে কাঁধে তুলে নিলেন।

পিতা মাতার সম্মান, বংশের সম্মানই বড় এখন তাঁর কাছে। তাছাড়া তারামা আছেন, তারামা'র বরপুত্র তাঁর দাদা বামাক্ষ্যাপা আছেন, ব্যবস্থা একটা হবেই। তাই রামচন্দ্র এই পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের গুরুদায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন, গ্রামের অব্রাহ্মণ প্রতিবেশীগণ এবং শ্মশানবন্ধুগণ তো আছেনই। সব মিলিয়ে প্রায় সাতশোর ওপর নিমন্ত্রিত। যাহোক, রামচন্দ্র পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে প্রত্যেককে শিষ্টাচার পূর্বক নিমন্ত্রণ করে এলেন। দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধের দিন এসে পড়লো।

শ্রাদ্ধের পূর্বদিন বিকেলে শ্রীবাম তারাপীঠ থেকে আটলা গ্রামে চলে এলেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাই বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলেন না। বাড়ীর বাইরে রইলেন।

শৈশব ও কৈশোরের এবং তারুণ্যের মধুর স্মৃতি এবং জননী রাজকুমারী দেবীর অপার স্নেহ ভালবাসার কথা স্মরণ করে শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয় সজল হয়ে উঠলো। সাময়িক ভাবে দেহ বোধহীন শ্রীবামকেও মাতৃশোক স্পর্শ করলো। একটু পরে 'ভাবমুখে' নিমগ্ন হলেন। মাঝে মাঝে ভাবে বিভোর হয়ে 'জয়তারা' 'জয়তারা' বলতে লাগলেন।

সেদিন সকাল বেলা শ্রীবামের এক আত্মীয় 'ব্রহ্মানন্দ' এলেন কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানার নারেঙ্গা গ্রাম থেকে। ব্রহ্মানন্দ সাধন জগতের চিহ্নিত সাধক। শ্রীবাম তাঁকে সাদরে কাছে টেনে নানান অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন।

পরদিন অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিন শ্রীবামের নির্দেশে রামচন্দ্রই জননীর পারলৌকিক কাজ সুসম্পন্ন করলেন। দুপুরবেলা ব্রাহ্মণ ভোজনের পালা। পাঁচশতাধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। এদিকে পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা রামচন্দ্র আপ্রাণ

চেষ্টা করেও করতে পারেননি। রামচন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখলেন। তারামায়ের লীলা বোঝা ভার। যে তাঁর ওপর নির্ভরতা রাখতে চাইবে তাঁকেই তিনি অগ্নি পরীক্ষায় ফেলবেন। তবু যে অগ্নি পরীক্ষার প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও তাঁকে ধরে থাকতে পারে, সেই বীর সাধককেই তারামা জয়ী করেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা এখন চরম বিপর্য্যস্ত। এই মুহর্তে পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছেন ভোজনের জন্য।

তাঁরা ভোজন না করে ফিরে গেলে অপমানিত হবেন। রামচন্দ্রকে ধিক্কার দেবেন। তাতে স্বর্গগত পিতামাতার চরম অমর্য্যাদা হবে। বংশের কলঙ্কও হবে। তাছাড়া বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন এবং সারা গ্রামের প্রতিবেশীগণ উপস্থিত। সবাই অপমান ও বিদ্রূপ করবেন। বিরোধী পক্ষ উপহাস করবেন পরম সুখে, রামচন্দ্রের ও বামাক্ষ্যাপার অক্ষমতা দেখে। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রকে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে তোমার দাদা তারামায়ের এত ভক্ত, তাঁর কি কোন ক্ষমতা নেই এই বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচাবার? রামচন্দ্র আর কোন উপায় না দেখে উন্মাদের ন্যায় ছুটে গিয়ে অগ্রজ শ্রীবামের চরণে পতিত হলেন। কাতর ভাবে বললেন, "দাদা, তুমি তো সব জান। যা হয় ব্যবস্থা কর। এখন সব মানমর্য্যাদা তোমার ওপরই নির্ভর করছে।"

করুণাময় শ্রীবাম শান্তভাবে রাচমন্দ্রকে বললেন 'ভাত, ডাল, তরকারী পায়েস প্রভৃতি অল্প অল্প সাধ্যমত রান্না কর। তারপর কলাপাতা দিয়ে ঢেকে একদিক থেকে তুলে পরিবেশন করে যা। তারামায়ের কৃপায় সবাই তৃপ্তি করে খেয়ে যাবে।' মহাপুরুষ দাদার কথায় রামচন্দ্র আশ্চর্য হলেন। পরমুহূর্তে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মনের আনন্দে তাই ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন।

এদিকে আরেক বিপদ উপস্হিত হ'ল। বর্ষার আকাশ ঘন কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল। ভীষণ বৃষ্টি শুরু হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণকে ঘরে বসিয়ে ভোজন করাবার মত ঘর বা স্হান রামচন্দ্রের নেই। বাড়ীর সামনে তাই একফালি জমিতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্হা করেছেন রামচন্দ্র এবং তা উন্মুক্ত আকাশের তলে। দফায় দফায় ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। কিন্তু এখন বাধা হয়ে দাড়িয়েছে আসন্ন এই ভীষণ দুর্যোগ। আকাশ ঘন কালো মেঘে অন্ধকার। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বিদুৎ

চমকাচ্ছে। বাতাস স্তব্ধ। এ যেন আসন্ন ভীষণ দুর্যোগের পূর্বাভাস। যে কোন মুহূর্তে মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হতে পারে। বৃষ্টি হলে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পূর্ণ পণ্ড হবে।

শুধু রামচন্দ্র নয়, সবাই চিন্তায় অস্থির হলেন। বৃষ্টি হলে শুধু খাওয়াই পণ্ড হবে না। পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অতিথি বর্গকে বসবার স্থান দেয়াও অসম্ভব হবে। এদিকে আকাশ অন্ধকার করে প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে। রামচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিই যে পরম শত্রু হয়ে দাড়ালো। ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড হলে মায়ের পরলৌকিক কাজের অঙ্গহানি হবে, তাতে জননীর আত্মা অতৃপ্ত হবেন। অন্যদিকে অগ্রজ বামাক্ষ্যাপা ও রামচন্দ্রের অসম্মান হবে।

সদ্য মিত্র হয়েছেন যাঁরা, সেই বিপক্ষ দলও বিদ্রূপ করবেন। এতকালের ঝগড়া অশান্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এসব চিন্তা করে রামচন্দ্র আরো অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেকে ইতিমধ্যে রামচন্দ্রকে তাঁর অগ্রজ বামাক্ষ্যাপার কথা স্মরণ করিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বললেন যে তাঁর দাদা তো এতকাল তারামা কে ডাকছেন, তিনি তারামাকে বলে এখন বৃষ্টি বন্ধ করুন না? কেউ কেউ বামাক্ষ্যাপার শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে উপহাসও করতে লাগলেন।

আর কোন উপায় নেই দেখে রামচন্দ্র আবার ছুটে এলেন তাঁর অগ্রজের কাছে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর দাদা সন্ন্যাসী হলেও সমগ্র পরিবারের মান মর্য্যাদা একমাত্র তাঁর দাদা বামাক্ষ্যাপাই বাঁচাতে পারেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তখন বাড়ীর বাইরে বসে ব্রহ্মানন্দের সাথে কথা বলছিলেন, এমনি সময় রামচন্দ্র ছুটে এসে আর্তস্বরে অগ্রজ বামক্ষ্যাপা কে বললেন, "দাদা বৃষ্টি বন্ধ কর, না হলে সব পণ্ড হবে। মায়ের কাজ নষ্ট হবে।"

ছোট ভাইয়ের শ্রান্ত ক্লান্ত ভয়কাতর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে এবং পরলোকগত পিতা ও সদ্য স্বর্গগতা স্নেহময়ী জননী ও বংশের মান মর্য্যদার কথা ভেবে এবং এতগুলো (প্রায় সাত শতাধিক) লোক অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাবে ভেবে শ্রীবামের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হ'ল। আর্ত ও শরণাগত ছোটভাই রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করে তিনি আসন্ন ভয়ঙ্কর দুর্যোগে ভরা ঘন কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে 'জয়তারা' বলে ডেকে উঠলেন।

মেঘগর্জনের ন্যায় সেই ডাক শুনে উপস্থিত সাত শতাধিক অতিথি ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজনের স্হানটির ঈশান কোণে বসে সবিক্রমে নিজের হাতের ত্রিশূলটি গেঁথে দিলেন শ্রীবাম।

সাথে সাথে এক অলৌকিক ঘটনা উপস্হিত সবাই সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন। সামান্য ঘূর্ণিবায়ু উঠে ব্রাহ্মণ ভোজনের স্হানটি পরিস্কার করে দিল। সাথে সাথে সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে কর্মস্হলে যেন জলসিঞ্চন করেই বন্ধ হয়ে গেল এবং রামচন্দ্রের বাড়ী, ব্রাহ্মন ভোজনের স্হান এবং অতিথিবর্গের স্হানটুকু বাদ দিয়ে চারদিকে আকাশ ভেঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। তার সাথে মেঘের ঘোর গর্জন, বিদ্যুৎতের প্রচণ্ড চমক ও বারংবার বজ্রপাত হতে লাগলো।

সমাগত পাঁচশোর ওপর ব্রাহ্মণ, শ্রীবাম ও রামচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন এবং আটলা গ্রামের অধিবাসীগণ এবং অন্যান্য অতিথিগণ অপরিসীম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলেন এই অলৌকিক ব্যাপার। মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি ও ঘনঘন বজ্রপাত হচ্ছে অথচ এই শ্রাদ্ধবাড়ী ও ব্রাহ্মণ ভোজনের স্হানে এক বিন্দু বৃষ্টিও হচ্ছে না। বৃষ্টি ধারা আকাশ থেকে নেমে এসে দূরে গিয়ে পড়ছে। এক অদৃশ্য গণ্ডি যেন এই বাড়ী ও কর্মস্হানের চারদিক জুড়ে রয়েছে। দলে দলে লোক এই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে দেখতে খেতে লাগলেন। চারপাশে প্রচণ্ড ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি ও ঘনঘন বাজ পড়ছে অথচ তাঁদের গায়ে একবিন্দু বৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়া স্পর্শ করছে না।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এই মহান অপূর্ব অভূতপূর্ব দিব্য অলৌকিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এক সময় পাঁচশতাধিক ব্রাহ্মণ পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাপ্ত করলেন এবং তারপর বাকি আমন্ত্রিত সকলেও পরম আনন্দে ভোজন সমাধা করলেন। পরম করুণাময়ী তারামায়ের অপার কৃপায় সকলের ভোজন সুসম্পন্ন হয়ে গেল। রামচন্দ্র আনন্দে অধীর হলেন তাঁর অগ্রজ মহাশক্তিধর বামাক্ষ্যাপার পরপর দুটি অলৌকিক শক্তি দেখে।

প্রথমত, শ্রীবামের কৃপায় সামান্য কয়েক সের চাল ডাল তরকারী দুধ প্রভৃতি রান্না করে তাই দিয়ে সাতশতাধিক নরনারীকে পেটভরে খাইয়ে দেয়া হ'ল এবং সকলের খাবার পর কলাপাতা তুলে দেখা গেল যা রান্না প্রথমে করা হয়েছিল ঠিক তাই রয়েছে। শ্রীবামের

এই অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে রামচন্দ্র ও আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীগণ আনন্দে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

বাইরের আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ কিন্তু শ্রীবামের এই অন্তরঙ্গ অলৌকিক লীলার কথা জানেন না। তাঁরা শ্রীবামের বহিরঙ্গ অলৌকিক লীলা অর্থাৎ বৃষ্টি স্তম্ভন দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁরা ভোজ্য দ্রব্য সকল ভোজন করে পরম তৃপ্তি লাভকরে বলেছেন যে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মধুর উপাদেয় খাদ্য বস্তু তাঁরা ইতিপূর্বে কখনো কোথাও খাননি।

তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি যে এই ভোজ্য দ্রব্য সকলও অর্থাৎ ভাত ডাল তরকারী পায়েস প্রভৃতিও অলৌকিক ভাবে সৃষ্ট। যে রান্না দিয়ে মাত্র সাতজন লোক পেট ভরে খেতে পারেন, তাই দিয়ে সাতশো লোক পরম আনন্দে পেট ভরে খেলেন এবং খাওয়া শেষে দেখলেন প্রথমে যা রান্না হয়েছিল তাই রয়েছে।

যাহোক তারামায়ের কৃপায় অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে পরপর দু'টি অলৌকিক লীলা ঘটিয়ে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর স্নেহময়ী জননী রাজকুমারী দেবীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে সুসম্পন্ন করলেন।

এবার ছোটভাই রামচন্দ্রকে ডেকে বললেন, "রাম কাজ তো শেষ হয়েছে। এখন ত্রিশূল তুলে নি।" এই বলে কর্মস্থল থেকে ত্রিশূল তুললেন। সাথে সাথে প্রবল বৃষ্টিতে সমগ্র কর্মস্থলটি ভেসে গেল। বৃষ্টিতে এতলোকের স্তূপীকৃত এঁটোপাতা সব ভেসে গিয়ে স্থানটি পরিস্কার হয়ে গেল। তারামায়ের বীরপুত্র বামাক্ষ্যাপা তাঁর গর্ভধারিণী জননী রাজকুমারী দেবীর পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে এবং পরম তৃপ্তিভরে ভোজন করে আমন্ত্রিত পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অতিথি বর্গ নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

চারিদিকে শ্রীবামের এই অলৌকিক বৃষ্টি স্তম্ভনের কথা রটে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীগণ শ্রীবামের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করলেন। সিদ্ধপুরুষ রূপে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা চিহ্নিত হলেন তাঁদের হৃদয়ে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কোন কোন জীবনী গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে দরিদ্র রামচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীবাম মাতৃশ্রাদ্ধে বহুলোককে

নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেন এবং শ্রাদ্ধের দিন অলৌকিকভাবে বহু লোক কোথা থেকে এসে থরে থরে খাবার নিয়ে আটলা গ্রামে গিয়ে রামচন্দ্রের কাছে দিয়ে আসেন। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হ'বার পূর্ব মুহূর্তে শ্রীবাম চারদিকে গণ্ডি কেটে দেন ভোজন ক্ষেত্রে। ফলে গণ্ডির বাইরে বৃষ্টি হতে থাকে কিন্তু গণ্ডির মধ্যে বৃষ্টি একফোঁটাও হ'ল না। সবাই শান্তিতে খেয়ে গেলেন। শ্রীবামের এই বৃষ্টি স্তম্ভন প্রত্যক্ষ করে সবাই স্তম্ভিত হ'লেন। কিন্তু এই কাহিনী বাস্তব সম্মত নয়। কারণ, প্রথমত রামচন্দ্রকে তিরিশ বছর পূর্বের সেই অশান্তির জের মেটাবার জন্য মাতৃ শ্রাদ্ধে পাঁচশতাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের অঙ্গীকার করতে হয়েছিল। নাহলে মাতৃ শ্রাদ্ধে অশান্তির সৃষ্টি হত। রামচন্দ্র গৃহীলোক এবং আটলা গ্রামের সমাজের মধ্যে বাস করেন। তাই সমাজের অনুশাসন তাঁকে মানতে হয়। তাঁর অগ্রজ বামাক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানে থাকেন। তাই তাঁর কোন সামাজিক বন্ধন বা ভয় নেই। তাই পাঁচশতাধিক ব্রাহ্মণভোজনের দায়িত্ব রামচন্দ্র নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করবার জন্যই রামচন্দ্র এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা পূর্ণ মুক্ত পুরুষ। এই শ্মশানচারী মহাপুরুষ পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করবেন সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য, তা সম্ভব নয়। শ্রীবামের প্রকৃতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি শান্তিপ্রিয় এবং নির্জনপ্রিয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে নিভৃতে থাকতে ভালবাসেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবু যদি উপরোক্ত জীবনীগ্রন্থের মতকে ধরা যায় যে তিনিই নিমন্ত্রণ করেছেন এত লোককে বাড়ী বাড়ী গিয়ে, তবে বলতে হবে যে, তবে কি তিনি তাঁর যোগবিভূতি প্রদর্শনের জন্যই সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ? কারণ তিনি তো সর্বজ্ঞ। তিনি তো জানেন এর শেষ পরিণতি কি ? অর্থাৎ এত লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা অলৌকিক ভাবে তাঁকেই করতে হবে এবং অলৌকিক ভাবে বৃষ্টি স্তম্ভন করে খাদ্য পরিবেশন করে সবাইকে তৃপ্ত করতেও হবে।

কিন্তু মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা এসবের বহু ঊর্দ্ধে। অষ্টসিদ্ধি তাঁর করায়ত্ব থাকলেও তুচ্ছ মান যশের জন্য

অলৌকিক যোগবিভূতি প্রদর্শন করা তাঁর স্বভাব ধর্ম নয়। এসব তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এসব চিন্তা করলেও তাঁকে অপমান করা হয়। তাই শ্রীবামের পক্ষে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করা কোন মতেই সম্ভব হয়নি। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্বভাবধর্ম, মহান প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেই এটা উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয়ত, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার যোগবিভূতির ফলে বহুলোক কোথা থেকে এসে থরে থরে খাবার রামচন্দ্রের গৃহে পৌঁছে দিয়ে গেল। উপরোক্ত জীবনীগ্রন্থ অনুসারে এই আধিভৌতিক ব্যাপারও বাস্তব ভিত্তিক নয়। শ্রীবাম নিজে যেমন সহজলভ্য নন, তেমনি তাঁর যোগবিভূতিও অতি দুর্লভ ব্যাপার। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর নিজ গ্রামে নিজ গৃহে বহু আত্মীয় স্বজনের এবং অতিথি বর্গের সামনে এই ধরণের সহজ সিদ্ধাই তিনি কখনোই দেখাবেন না। এটা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁর প্রকৃতি গভীর এবং অন্তর্মুখীন।

চতুর্থত, ঝড়বৃষ্টির সময়ে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ভোজনক্ষেত্রের চার-পাশে গণ্ডি কেটে দিয়ে বৃষ্টি স্তম্ভন করেছিলেন বলে উপরোক্ত জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারাময়, পরম পুরুষ ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বামাক্ষ্যাপার পক্ষে তাঁর পিতৃগৃহ, ব্রাহ্মণ ভোজনের স্থান, অতিথিবর্গের বসবার স্থান প্রভৃতি বিরাট জায়গা জুড়ে গণ্ডি কাটবার কোন প্রয়োজন হয়নি। তাঁর মহাশক্তিধর ত্রিশূলই বৃষ্টি-স্তম্ভনের পক্ষে যথেষ্ট। তারাময় শ্রীবামের দিব্য হস্তস্পর্শ যুক্ত সেই মহাশক্তিশালী পবিত্র ত্রিশূলই পরোক্ষভাবে গণ্ডির কাজ করেছে। তাই শ্রীবামের পক্ষে গণ্ডি দেবার কোন প্রয়োজন হয়নি।

যাহোক, মাতৃশ্রাদ্ধের পরে বৃষ্টি স্তম্ভনের অলৌকিক ঘটনা চার-দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। শ্রীবামের দর্শন ও স্পর্শনের জন্য সবাই উৎসুখ হলেন। শ্রীবাম যথারীতি নির্বিকার রইলেন। তিনি শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যাবেলা পিতৃগৃহের বাইরে নিভৃতে তারামায়ের ধ্যানে বিভোর রইলেন। তিনি তারাবিদ্যার পর্ণ অধিকারী। একাধারে মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক ও মহাকৌল। অষ্টসিদ্ধি তাঁর করায়ত্ব। তাই তিনি স্বভাবতই সিদ্ধ।

এই অলৌকিক বিভূতি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ জিনিষ। বিপন্ন ছোট ভাইকে মাতৃদায় থেকে রক্ষা করবার জন্য এবং পরলোকগতা

জননীর পারলৌকিক কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্য এবং সমাগত অভুক্ত অতিথিদের অন্নদানের জন্য তিনি রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে এই দুই অলৌকিকলীলা কেবল ঘটালেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অধিকাংশ জীবনী-গ্রন্থে লেখা রয়েছে যে বামাক্ষ্যাপা তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার পরই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি যে সিদ্ধ তা লোকে বুঝতে পারেন। অনেকেই এই প্রচলিত ধারণাকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভ ঘটে সাতাশ বছর বয়সে।

তাঁর সিদ্ধিলাভের দীর্ঘ উনিশ বছর পর অর্থাৎ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জননী রাজকুমারী দেবী পরলোক গমন করেন ১২৯০ সালে। তখন রাজকুমারী দেবীর বয়স ছিল চৌষট্টি বছর। সুতরাং শ্রীবাম তখন ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। তাঁর সিদ্ধি-লাভ থেকে অর্থাৎ সাতাশ বছর থেকে দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ উনিশ বছর ধরে তাঁর বহু লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু সিদ্ধ পুরুষ, মনীষী, সাধক সাধিকা ও মুমুক্ষু ব্যক্তি এই সময় তাঁর কাছে এসেছেন তারাপীঠে।

সুতরাং শ্রীবামের মহাজীবনের বিশাল মধ্য লীলা (আঠাশ থেকে পঞ্চান্ন) এই দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থ লেখকও দীর্ঘকাল ধরে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সঙ্গ ধন্য বহু মহাপুরুষ ও সিদ্ধ সাধক সাধিকার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁদের মাধ্যমে এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

সুতরাং ১২৯০ সালে মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার এই অলৌকিক ঘটনার দ্বারাই তিনি সিদ্ধ বলে প্রচারিত হন এবং লোকে তাঁকে জানতে পারেন—এই তথ্য ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। বাস্তব সত্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীবামের উপরোক্ত অলৌকিক লীলা দু'টির পেছনে কিন্তু ত্রিলোকতারিণী তারামায়ের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এটা উপলব্ধি করা যায়।

তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে দিয়ে অসম সাহসে পাঁচশতাধিক

ব্রাহ্মণ ভোজনের অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন এব সেই অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে রামচন্দ্র শেষ মুহূর্তে চরম বিপদগ্রস্থ হলে তিনি তাঁর বরপুত্র বামাক্ষ্যাপাকে দিয়ে সেই বিপদ থেকে অলৌকিক ভাবে উদ্ধার করালেন বামানুজ রামচন্দ্রকে। আবার বামাক্ষ্যাপাকে বৃষ্টি স্তম্ভন করিয়ে রামচন্দ্রের যেমন মান মর্য্যাদা রাখলেন তেমনি তাঁর প্রাণাধিক বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্যও প্রকাশ করালেন।

তারামা অনন্ত লীলাময়ী। তাঁর লীলা বোঝা ভার। তবে উপরোক্ত অলৌকিক লীলা দু'টির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বরপুত্র বামাক্ষ্যাপাকে জনজীবনের সামনে সগৌরবে তুলে ধরলেন—অধ্যাত্ম জগতের মহান আলোকবর্তিকা রূপে, তা উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তী সুদীর্ঘ কাল ধরে এই ঐশী লীলা মহাসমুদ্রের মতই ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে। বাম সমুদ্রের অসংখ্য অলৌকিক লীলা লহরির অন্যতম হিসাবে উপরোক্ত অলৌকিক লীলা লহরি দ্বয় সমুজ্জ্বল হয়ে রইলো চিরতরে।

মাতৃশ্রাদ্ধের পরদিন নিয়মভঙ্গের পর শ্রীবাম আটলার বাড়ী থেকে তারাপীঠ রওনা হলেন। যাবার পূর্বলগ্নে রামচন্দ্র ও পরিবারের অন্য সবাই এবং উপস্থিত প্রতিবেশীগণ শ্রীবামের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন। অনুজ রামচন্দ্র তাঁর সার্বিক ত্রানকর্তা অগ্রজের চরণকমলে পতিত হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে লাগলেন। ভাব যখন মুখর হয় তখন ভাষা মূক হয়ে যায়। রামচন্দ্রও তাঁর অন্তরের গভীরতম ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে অসমর্থ হলেন। অন্তর্যামী বাম সবই বুঝতে পারলেন। সস্নেহে সদ্য মাতৃহারা ছোটভাই রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে চিরন্তনী তারামায়ের নিত্য লীলা নিকেতন মহাপীঠ তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাথে স্নেহধন্য ব্রহ্মানন্দও গমন করলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সান্নিধ্য ধন্য কেতুগ্রাম নিবাসী সিদ্ধপুরুষ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (কামার পাড়া, পঃ দিনাজপুর)-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সিদ্ধসাধক শ্রীদূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য। তিনি অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মাতৃশ্রাদ্ধের উপরোক্ত কাহিণী শ্রবণ করেছিলেন এবং ...লেখককে সেই কাহিনী ব্যক্ত করেন (১৯৭৫ সালে)।

—০—

একটি আশ্চর্য দিব্য দর্শন

মৃত্যু যেন জীবন থেকে মহাজীবনের পথে এক স্নিগ্ধ মধুর বিরাম। দেহ থেকে দেহান্তরের এক শাশ্বত সাথী। মৃত্যুই আত্মার চিরসাথী। নব নব জীবনের স্বাদ মৃত্যুই আত্মার চিরসাথী। নব নব জীবনের স্বাদ মৃত্যুই আত্মাকে দেয়। এক দেহ জীর্ণ হলে মৃত্যু এসে আত্মাকে আবার নতুন দেহে পৌছে দেয়। তাই আত্মার প্রতিটি নব নব জীবনের স্বাদ মৃত্যুই এনে দেয়। মৃত্যু তাই আত্মার চির বৈচিত্র্যময় সাথী।

আটলা থেকে শ্রীবাম ফিরে এলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে। সাথে তাঁর কৃপাধন্য ব্রহ্মানন্দ। মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর নয়, মৃত্যু যে আত্মার আত্মীয়, সে যে আত্মার স্থান পরিবর্তনের চির সহায়ক ও চিরন্তন সুহৃদ, তা শ্রীবাম আশ্চর্য কৃপা করে ব্রহ্মানন্দকে দেখাতে সচেষ্ট হলেন। মৃত্যুই জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যু হ'ল জীবনের জীবন। জীবন অনন্ত, মৃত্যুও অনন্ত। মৃত্যু তাই জীবনের নামান্তর মাত্র।

জীবের প্রতিটি জীবনের সামগ্রিক ছবি তাঁর দেহের যোগদণ্ডের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। তাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুরাতন দেহের অবসান ঘটলেও সকল সংস্কার জীবের সূক্ষ্মদেহে বিরাজ করে। প্রতিটি মানব দেহের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটি দেহ আছে। স্থূল দেহের লয় হলেও সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ যথারীতি আত্মাকে ঘিরে থাকে।

স্থূল দেহের অন্নময় কোষের ও প্রাণময় কোষের বিনাশ হলেও সূক্ষ্মদেহের মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ এবং কারণ দেহের আনন্দময় কোষ যথারীতি চিরন্তন নিত্য অজ অমর 'আত্মা'কে ঘিরে থাকে। এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীবনের সকল কর্ম ও অনুভূতি, চিন্তা এবং কথা প্রতিটি মুহূর্তে এক অদৃশ্য মহাশক্তির নির্দেশে টেপরেকর্ড হয়ে যাচ্ছে এবং যা কিছু প্রতিটি জীবনে ঘটছে প্রতি মুহূর্তে, তাও এক আশ্চর্য অদৃশ্য শক্তিতে কামেরার ন্যায় উঠে যাচ্ছে মহাকালের অমোঘ নির্দেশে। তাই এই মহাবিশ্বের অনন্ত জীবনের অংশীভূত প্রতিটি জীবনের প্রতিটি স্মরণীয় মুহূর্ত সেই শাশ্বত ছবিতে উঠে যাচ্ছে।

যে সকল মহাপ্রাণ, আত্মবান ও নিজ আত্মায় আত্মস্থ, তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞানয়ন দ্বারা সেই চলমান প্রাণবন্ত রূপ দেখতে পান। শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁদের মধ্যে মহত্তম। তিনি শুধু নিজের জ্ঞাননয়ন দ্বারাই দেখেন না। তাঁর দিব্য স্পর্শে অপরের জ্ঞান নয়নও উন্মোচিত হয়। তাই তিনি আটলা থেকে শ্রাদ্ধের পর দিনই তারাপীঠ মহা-শ্মশানে ফিরে সন্ধ্যাবেলা কৃপা করে ব্রহ্মানন্দকে বললেন, "কর্তামার শ্রাদ্ধ দেখলে। কর্তামার আকৃতি দেখবে?" ব্রহ্মানন্দ এই অলৌকিক দর্শনের কথা শুনে আনন্দে শিউরে উঠলেন। দ্বাদশ দিন পূর্বে যিনি দেহত্যাগ করেছেন এবং এই মহাশ্মশানে চিতার প্রজ্বলিত অগ্নিতে যাঁর স্থূলদেহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে দ্বাদশ দিন পূর্বেই, সেই রাজকুমারীদেবীর সেই পূর্ব দেহ দর্শন করা তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ব্রহ্মানন্দ পরম আগ্রহে সানন্দে রাজী হলেন। মহাশ্মশানের যে ঝিলে দ্বাদশ দিন পূর্বে রাজকুমারীদেবীর স্থূল দেহ দাহ হয়েছিল, তার পাশে শ্রীবাম বসলেন এবং নিজের পাশে ব্রহ্মানন্দকে বসালেন। শ্রীবাম কৃপাকরে ব্রহ্মানন্দের প্রজ্ঞানয়ন উন্মোচন করে দিলেন। সবিস্ময়ে ব্রহ্মানন্দ দেখলেন ঝিলে সহসা চিতা জ্বলে উঠলো এবং তার মধ্যে শ্রীবামজননী রাজকুমারী দেবী শায়িতা রয়েছেন। এই অভূত-পূর্ব অলৌকিক দিব্য দৃশ্য দেখে ব্রহ্মানন্দ মহবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু পরে মহাশ্মশানের সেই ঝিলের কাছে লোক জন আসতে থাকায় এই অপূর্ব আশ্চর্য দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

ব্রহ্মানন্দ গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন যে অধ্যাত্ম জগতে এই পার্থিব পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট ও স্মরণীয় দৃশ্য এক অদৃশ্য দিব্য শক্তির দ্বারা এভাবে চিরতরে রয়ে যায়। এই মহান অদৃশ্য দিব্য শক্তির কাছে পার্থিব জগতের 'মুভি ক্যামেরা'ও নিতান্ত শিশু মাত্র। একমাত্র যোগ বলেই এই দিব্য শক্তির সূক্ষ্ম দর্শন পাওয়া যায়। সাধক প্রবর ব্রহ্মানন্দ শ্রীবামের কৃপায় আরো উপলব্ধি করলেন যে পরলোকগতা শ্রীবামজননীর মরদেহের বিনাশ হলেও তাঁর মরদেহ যুক্ত কর্মের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়নি। তাই রাজকুমারী দেবীর স্থূলদেহের জ্যোতির্ময় রূপ তখনও অবশিষ্ট থাকায় শ্রীবামের আহ্বানে তিনি প্রজ্বলিত চিতায় অনায়াসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীবামের দেহাতীত ও লোকাতীত এবং কালাতীত অসীম শক্তির প্রতি পরম শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ব্রহ্মানন্দ প্রণত হলেন শ্রীবামের চরণ কমলে।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য জয়তারা বাবা

দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সেই অধ্যাত্মভাব মণ্ডিত দিব্য পবিত্র ঘরের ছোট্ট খাটটিতে বসে যথারীতি অমৃতময় ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী স্তব্ধ মুগ্ধ নেত্রে সেই অমৃত মথিত প্রেমময় দেবমানবকে দর্শন করছেন। আর তাঁর অনুপম সুধামাখা কথার অমৃতরস আস্বাদ করছেন। তাঁর মধ্যে হাওড়ার সাঁত্রাগাছি নিবাসী একটি তরুণও রয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য মধুর কথা শুন.ত শুনতে তরুণটিও ভাববিহ্বল হয়ে পড়ছে। যথা সময়ে ঠাকুর সেদিনের মত ঈশ্বরীয় কথা শেষ করলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার সময় হ'ল। মা ভবতারিণীর অন্ন প্রসাদ ঠাকুরের জন্য আনা হ'ল। ভক্তগণও প্রসাদ পাবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন। ঠাকুর কিছু মুখে দিলেন। তারপর সেবা অন্তে নিজের ছোট্ট খাটটিতে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তখন ঠাকুরের স্নেহধন্য সেই তরুণটি অর্থাৎ 'খোকা' তথা সুবোধ মুখোপাধ্যায় (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে 'খোকা' নামে উল্লিখিত) ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পদসেবা করতে লাগলো।

পদসেবা করতে করতে সহসা 'খোকা' সশ্রদ্ধচিত্তে ঠাকুরের পাদ-পদ্মের ধূলি নিজের জিভ দিয়ে গ্রহণ করলো। 'খোকা'র এই ভক্তি

দেখে ঠাকুর খুশি হলেন। ঠাকুরের কৃপালাভ করে খোকা অর্থাৎ সুবোধ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের কাছে অত্যন্ত কাতর ভাবে দীক্ষা চাইলো।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন সস্নেহে স্নিগ্ধ, স্বরে সুবোধকে বললেন, "ওরে, তোর গুরু আমি নই। তুই পুনুর কাছে যা। সেই তোর ব্যবস্থা করে দেবে।"

সুবোধ অবাক হ'ল একথা শুনে। কে এই পুনু। কোথায় থাকেন, তার কিছুই সে জানে না। ঠাকুর বুঝতে পারলেন সুবোধের মনের অবস্থা। তিনি স্নেহভরে সুবোধকে বলে দিলেন যে হাওড়ার কাছে জগন্নাথ ঘাটে যেতে। সেখানে গিয়ে স্বামী পূর্ণানন্দের খোঁজ করতে।

যথাসময়ে জগন্নাথ ঘাটে উপস্থিত হল তরুণ সুবোধ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেখানে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কাউকে দেখতে পেল না। এমনকি স্বামী পূর্ণানন্দের কোন খোঁজও পেলেন না কারো কাছ থেকে।

সুবোধের মন অবসাদে ভেঙ্গে পড়লো। কোথায় ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত, তা নয়, এখন পূর্ণানন্দের খোঁজ করতে হবে।

সুবোধের মনে হ'ল দীক্ষার জন্য যতই তার মন ব্যাকুল হচ্ছে ততই যেন তার ওপর ঈশ্বরের পরীক্ষা বেড়ে চলেছে। সুবোধের মনে পড়লো রামরাজতলার শঙ্কর মঠের কথা। সুবোধের রামরাজতলার বাড়ী থেকে শঙ্কর মঠ কাছে। ছোট বেলা থেকেই শঙ্কর মঠকে সে দেখছে। এই রামরাজতলার বাড়ীতেই তার জন্ম হয়েছে। এখানেই শৈশব ও বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে। ছোটবেলা থেকেই সে শঙ্কর মঠে যাতায়াত করছে।

কিছুদিন পূর্বে শঙ্কর মঠের আচার্য্যের কাছে গিয়ে সুবোধ দীক্ষা চাইলো কিন্তু আচার্যদেব তাকে দীক্ষা না দিয়ে বললেন, "তুমি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে যাও। তিনিই পথ দেখাবেন।" সেই থেকে সুবোধ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত শুরু করলো। কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র পরীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার তাঁকে পাঠালেন স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে, এই জগন্নাথ ঘাটে। কিন্তু কেবল জগন্নাথ ঘাটটিই আছে। স্বামী পূর্ণানন্দ নেই। এমনকি তাঁর কোন সন্ধান বা সংবাদও নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্য তো 'ব্রহ্মবাক্য' তা তো মিথ্যে হতে পারেনা।

সুবোধ ঠিক করলো যে, সে ধৈর্য্য ধরে প্রতিদিন জগন্নাথ ঘাটে

অপেক্ষা করবে। যতদিন না স্বামী পূর্ণানন্দের দেখা পায়। তবু সে হার মানবেনা। তাই প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অজস্র স্নানার্থী নরনারীকে সে জিজ্ঞেস করে স্বামী পূর্ণানন্দের কথা কিন্তু কেউ বলতে পারেন না।

এই ভাবে দিন কাটতে লাগলো। ক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগলো। ক্রমে মাসও কেটে গেল। সুবোধ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলো। স্বামী পূর্ণানন্দের সংবাদ পাবার আশা সে প্রায় ছেড়েই দিল। তবুও অভ্যাস বশে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা জগন্নাথ ঘাটে বসে প্রতিটি নরনারীকে জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলো স্বামী পূর্ণানন্দের কথা।

একদিন একটি সুন্দরী যুবতী মহিলা জগন্নাথ ঘাট থেকে স্নান সেরে উঠছেন সিড়ি দিয়ে। নিতান্ত অভ্যাস বশেই সুবোধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো স্বামী পূর্ণানন্দর কথা। মহিলাটি থমকে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন উদভ্রান্ত যুবক সুবোধের দিকে। একগাল দাড়ি, পরনে ময়লা পোশাক, চুল উস্কোখুস্কো, দৃঢ় অথচ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনতনু কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। তিনি শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, চিনি তাঁকে এবং কোথায় থাকেন তাও জানি।"

এই উত্তর শুনে চমকে উঠলো সুবোধ। এতদিন ধরে যথারীতি 'না' শুনতে শুনতেই অভ্যস্থ হয়ে গেছে। তাই আজ 'হ্যাঁ' শুনে অকূলে যেন কূল পেল সে। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় থাকেন তিনি? দয়া করে বলে দিন আমাকে। আমি অনেকদিন ধরে তাঁকে খুজছি।" মহিলা সুবোধকে শান্তভাবে বললেন, "বেশ, তুমি চল আমার সাথে। তিনি কৃপা করে আমার বাড়ীতেই আছেন।" মহানন্দে সবোধ মহিলার সাথে চলতে লাগলো। ক্রমে মহিলা চিৎপুরের এক নিষিদ্ধ গলিতে প্রবেশ করলেন। সুবোধও তার সাথে প্রবেশ করলো। অবশেষে একটি জরাজীর্ণ গৃহে প্রবেশ করলেন মহিলাটি। পেছনে সুবোধও এল।

বাড়ীর চারদিকের পরিবেশ যেমন নোংরা তেমনি গ্লানিকর। সুবোধ বুঝতে পারলো যে স্থানটি সবদিক থেকে অস্বাভাবিক। চারদিকে সব বারবনিতাদের ঘর। এই সুন্দরী যুবতী মহিলাটিও যে বারবনিতা সেই বিষয়ে সুবোধের আর সন্দেহ রইলো না। তার সারা

দেহ শিউরে উঠলো। কিন্তু উপায় নেই। স্বামী পূর্ণানন্দের সাক্ষাত তার পেতেই হবে। স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর কথা বলে দিয়েছেন, তখন তাঁর দর্শন চাই-ই চাই। তা যেখানেই হোক। আর ঠাকুর তো জেনে শুনেই পাঠিয়েছেন। তবে আর ভয় কি? —এই ভেবে সুবোধ মনে মনে দৃঢ় হ'ল। ঘরে প্রবেশ করে দেখলো ৫/৭ জন লোক বসে আছে। অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক। ঘরের একধারে একটি জীর্ণ মলিন বিছানা। তার ওপর বসে আছেন একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি। চোখ বুঁজে বসে রয়েছেন। তাঁর দুই হাত দুই উরুর ধার দিয়ে মাটিতে অবস্থান করছে। মনে হচ্ছে যেন দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে বসে আছেন। মুখ দিয়ে পানের কষ পড়ছে। পরিধানে একটি জরাজীর্ণ মলিন বসন। সামনে একটি মদের বোতল। তাতে কিছু মদ রয়েছে। পাশে পাশে কয়েকটি শূন্য বোতল পড়ে আছে। মদের বোতলের একপাশে একটা পাত্রে কিছু তেলেভাজা রয়েছে। তার পাশে একটি পানের পিক ফেলবার ডাবর রয়েছে।

সুবোধ বুঝলো এই প্রৌঢ় ব্যক্তিই এসব ব্যবহার করেন এবং তিনিই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কথিত স্বামী পূর্ণানন্দ। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটি এমনি অস্বস্তিকর যে সুবোধের অসহ্য মনে হ'ল। কিন্তু উপায় নেই।

ঘরের এক কোণে সুবোধ চুপ করে বসে রইলো। মনে মনে অভিমান করতে লাগলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর। এমন জায়গায় এমন লোকের কাছ তার গুরুকরণ করে রেখেছেন ঠাকুর যে তা বলবার নয়। এই লোকের থেকে দীক্ষা নিলে তাঁর কোন কাজ হবে বলে মনে হল না সুবোধের। যে লোককে দেখে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়না, তাঁর থেকে মন্ত্র নিয়ে কি হবে? তবু উপায় নেই। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে দিয়েছেন যখন, তখন তো নিতেই হবে। এমনি সব ভাবনা ভাবছে সুবোধ সেখানে বসে বসে। সহসা সুবোধের কানে গেল সেই ৫/৭ জন নিম্ন শ্রেণীর লোক গুলোর কথা।

সুবোধ শুনতে পেল লোকগুলো তাঁদের নানান অসুখ বিসুখের কথা জোড়হাতে নিবেদন করছে স্বামী পূর্ণানন্দর কাছে। তিনি চোখ বুঁজেই শুনছেন সব কথা। মাঝে মাঝে পাশের বালিশের নিচ থেকে শেকড় জাতীয় কিছু বের করে তাদের দিচ্ছেন এবং কি কি করতে

হবে তা বলে দিচ্ছেন। একবার চোখ মেলে তাকালেন তিনি। সুবোধ দেখতে পেল তাঁর চোখ দুটো টকটকে লাল। একে একে সব চলে গেল্।

সুবোধ ঘরের এককোণে চুপ করে বসেই আছে। তখন সেই যুবতী মহিলাটি অর্থাৎ বারবণিতাটি স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে গিয়ে সুবোধের কথা বললো। শুনে স্বামী পূর্ণানন্দ সুবোধকে বললেন "ও গদাই তোকে পাঠিয়েছে?" শুনে সুবোধ আশ্চর্য্য হ'ল। সে তো কাউকে বলেনি, গদাধর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাকে পাঠিয়েছে। স্বামী পুর্ণানন্দর ওপর এতক্ষণে তার একটু ভক্তি হ'ল। সে হাতজোড় করে বললো 'হ্যাঁ'। স্বামী পূর্ণানন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন। সুবোধ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন কে এই স্বামী পূর্ণানন্দ? যিনি ঠাকুরকে নাম ধরে 'গদাই' বলে ডাকতে পারেন? একটু পরে তিনি সুবোধকে কয়েকদিন পরে একটি নির্দিষ্ট তারিখে স্নান করে আসতে বললেন।

সুবোধ স্বামী পূর্ণানন্দকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ঐ বিচিত্র পরিবেশ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। এতক্ষণে যেন সুবোধ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। সুবোধ বাড়ীর পথে চলতে লাগলো। দীক্ষা তার হবে বুঝতে পারলো। কিন্তু মন তার দ্বিধা পূর্ণ। এই পরিবেশে এই লোকের থেকে দীক্ষা নিতেও তার মন চাইছেনা। কিন্তু কিছু করবারও নেই। ঠাকুরের নির্দেশ যখন, তখন তো নিতেই হবে।

যথারীতি সেই নির্দিষ্ট তারিখে সুবোধ স্নান করে গেল স্বামী পূর্ণানন্দর কাছে। সেদিনও যথারীতি সেই একই অস্বস্তিকর পরিবেশ। সেই রকম নানান ব্যাধিগ্রস্থদের ভীড়। স্বামী পূর্ণানন্দও যথারীতি বালিশের নিচ থেকে শেকড়বাকড় যা হাতে আসছে তাই দিয়ে লোকদের বিদায় করছেন।

অবশেষে সবাই যখন বিদায় হ'ল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সেই মহিলা তথা বারবণিতাটি সুবোধের করুণ অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় স্বামী পূর্ণানন্দকে ববলেন, "বাবা, সেই ছেলেটি এসেছে, যাকে আপনি আজ আসতে বলেছিলেন।" স্বামী পূর্ণানন্দ শিশুর মত সবই ভুলে বসে আছেন। মহিলাটি তাঁকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সব শুনে তিনি সুবোধকে সামনে ডেকে বললেন, "শোন্, গদাই

(শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব) তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে, কিন্তু আমি তোর গুরু নই। তোর গুরু তারাপীঠে বসে রয়েছে। তুই বামাক্ষ্যাপার কাছে যা। সেই তোর গুরু। সে তোর জন্য বসে আছে।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুবোধ। আবার একি পরীক্ষা ঈশ্বরের। কোথায় তারাপীঠ, কে বামাক্ষ্যাপা, কিছুই সে জানেনা। অথচ স্বামী পূর্ণানন্দের ভৈরব মূর্তি দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সুবোধের সাহস হচ্ছেনা। কিন্তু সুবোধকে জিজ্ঞেস করতে হ'লনা। অন্তর্যামী স্বামী পূর্ণানন্দ নিজ থেকেই সুবোধকে বললেন, 'ওরে, তোর এত ভাবতে হবেনা। সকাল বেলা হাওড়া স্টেশনে ঢুকে সামনে যে ট্রেনটি পাবি, তাতেই উঠে পড়বি। সেটাই তোকে তারাপীঠের কাছে নিয়ে যাবে। রামপুরহাটে নেমে যাকে বামাক্ষ্যাপার কথা জিজ্ঞেস করবি, সেই তোকে পথ বলে দেবে।' ঠিক তাই হ'ল। পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে এসে সামনে যে গাড়ি পেল তাতেই উঠে পড়লো সুবোধ। সেই গাড়িতেই রামপুরহাটে এসে পেঁ ছিলো।

রামপুরহাট স্টেশনে নেমে বামাক্ষ্যাপার কথা জিজ্ঞেস করতেই লোকে পথ বলে দিল। গ্রামের মেঠো পথ ও মাঝে মাঝে মাঠের আলপথ দিয়ে দীর্ঘ চার ক্রোশ পথ পার হয়ে অবশেষে দ্বারকানদী পার হয়ে সুবোধ তারাপীঠে এসে পেঁ ছিলো।

শ্রীবাম বসেছিলেন শিমুলতলায়। দূর থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত সুবোধকে আসতে দেখেই শ্রীবাম বলে উঠলেন, "খোকা, আয়, তোর জন্যই বসে আছি।" চমকে উঠলো সুবোধ। তার ডাকনাম যে 'খোকা' তা কি করে জানলেন এই মহাপুরুষ। এই তবে তার নির্দিষ্ট গুরু। যার জন্য তিন জন অর্থাৎ শঙ্কর মঠের আচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী পূর্ণানন্দ কেউ তাকে দীক্ষা দেননি। এই বামাক্ষ্যাপা-ই তবে তার ঈশ্বর নির্দিষ্ট বহু প্রত্যাশিত অধ্যাত্ম পথের চিহ্নিত গুরু। মনের আনন্দে আবেগে সজল নয়নে সুবোধ লুটিয়ে পড়লেন বামাক্ষ্যাপার চরণ কমলে। এত কষ্টের অবসান হ'ল আজ তার এতকাল পরে।

সুবোধ সজল নয়নে প্রার্থনা জানালো দীক্ষার জন্য। কৃপাময় শ্রীবাম আশ্বাস দিলেন। তারপর শুভক্ষণে যথাসময়ে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করলেন সুবোধকে। দীক্ষালাভ করে নবজীবন লাভ করলো খোকা তথা সুবোধ মুখোপাধ্যায়। আনুমানিক বাংলা ১২৯০ সালে।

সুবোধ তারাপীঠে এসে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে লাভ করলেন এই পরম দীক্ষা। শ্রীবামের নির্দেশে সাধনায় নিমগ্ন হ'ল। দীক্ষার পর 'মাসখানেক কেটে গেছে। ইতিমধ্যে তারাপীঠে গুরু শ্রীবামের সান্নিধ্যে থেকে সাধন ভজন ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় ক্রমশঃ পারদর্শী হয়ে উঠলো তরুণ সাধক। একটির পর একটি সাধনার স্তর অতিক্রম করে চললো। অলৌকিক দর্শন ও শক্তির বিভিন্ন স্বাদও লাভ করতে লাগলো। গুরু শ্রীবামও খুশি হলেন নবীন শিষ্যের এই দ্রুত উন্নতি দেখে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বামদেব বসে আছেন মহাশ্মশানে। সামনে ধুনি জ্বলছে। অদূরে কয়েকজন শিষ্য ভক্ত বসে আছেন। তাদের মধ্যে নবীন শিষ্য সুবোধ মুখোপাধ্যায়ও রয়েছে। কথা প্রসঙ্গে সুবোধ তাঁদের বলছে দীক্ষার জন্য সেই দীর্ঘ কৃচ্ছ্র সাধনার কথা। সুবোধ তাঁদের বললে, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো জানতেন যে আমার গুরু বামাক্ষ্যাপা বাবা। তিনি সোজাসুজি আমাকে তারাপীঠে পাঠালেই পারতেন গুরুদেবের কাছে। তা না করে শুধু শুধু আমাকে ঐ মাতাল পূর্ণানন্দের কাছে পাঠিয়ে আমার মাস দেড়েক সময় নষ্ট করালেন। লোকটা যেমন নোংরা তেমনি থাকেনও নোংরা পরিবেশে।" ইত্যাদি। অদূরে বসেছিলেন শ্রীবাম। তিনি শুনতে পেলেন সুবোধের সব কথা। মুহূর্তে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন তিনি। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাড়ালেন। চিৎকার করে বললেন সুবোধকে, "শালা। তুই পুনুদাদার নিন্দা করছিস? শালা, তুই কিছু শক্তি লাভ করে তালেবর হয়েছিস? আজ তোকে মেরেই ফেলবো। কোন শালা তোকে বাঁচায়।" বলতে বলতে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে ত্রিশূল নিয়ে ছুটে এলেন সুবোধকে মারবার জন্য। শ্রীগুরু বামের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সুবোধ তখন হতজ্ঞান। উপস্থিত শিষ্য ভক্তরা দ্রুত তাঁর পায়ে পড়ে পথ আটকালো এবং সকাতরে অবোধ সুবোধের হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো শ্রীবামের পায়ে পড়ে। সুবোধও ছুটে এসে গুরু ভাইদের কথামত গুরুবামের চরণ ধরে অনুতপ্ত হৃদয়ে সজল নয়নে ক্ষমা চাইতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর অতিকষ্টে সবাই মিলে শ্রীবামকে শান্ত করলেন।

তখন শ্রীবাম সুবোধকে বললেন, "ওরে, তুই জানিস না পুনুদাদা কতবড় মহাপুরুষ। গত জন্মেই সে সিদ্ধিলাভ করেছে। সিদ্ধিলাভের

পর তারামা'র কাছে মুক্তি চায়। মা বললেন পুনুদাদাকে, 'তোর মনের কোণে এখনও সূক্ষ্মভাবে 'কারণ' খাবার একটু বাসনা আছে। তাই এ জন্মে তোর মুক্তি হবেনা। আগামী জন্মে হবে। আগামী জন্মে তুই জাতিস্মর হয়ে জন্মাবি। এই জন্মের তোর সাধনা ও সিদ্ধির সব কথাই তোর আগামী জন্মেও মনে থাকবে। সেই অবস্থায় তুই কারণে ডুবে থাকবি। সেই ভোগ শেষ হলে পর তোর মুক্তি হবে।' গুরু বামাক্ষ্যাপার এই কথা শুনে উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তগণ সবাই স্তম্ভিত হলেন।

নবদীক্ষিত শিষ্য সুবোধের অন্তর জ্বলে গেল তীব্র অনুশোচনায়। কতবড় মহাপুরুষকে না-জেনে না-বুঝে, শুধু বাইরের রূপ ও আচরণ দেখেই তাঁকে যা নয় তাই বলে সে অপমান করেছে। শ্রীবাম আপন মনে বলতে থাকেন, 'যে পুনুদাদা আমাকে 'বামা' বলে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে 'গদাই' বলে ডাকতে পারেন, সে কত বড় মহাপুরুষ তা তোরা ধারণাও করতে পারবি না।"

স্বামী পূর্ণানন্দকে না জেনে অশ্রদ্ধা করবার জন্য আমৃত্যু সুবোধ তথা উত্তর কালের সিদ্ধ পুরুষ 'জয়তারা বাবা'র অনুশোচনা ছিল। যাহোক', কিছুকাল গুরু বামাক্ষ্যাপার চরণতলে বসে তাঁর নির্দেশিত পথে সাধনা করবার পর গুরুর নির্দেশে তিনি গৃহে ফিরে যান। শ্রীবামের নির্দেশিত পথে সাধনা করতে করতে তিনি লাভ করেন তাঁর পরম আরাধ্যা ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী তারামাকে।

সর্বদা 'জয়মা তারা' নামে তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। স্মরণে মননে আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে বলনে চলনে সর্বদা 'জয়মাতারা' এই অমৃত নামে ডুবে থাকেন। সেজন্য তাঁর নাম হয় 'জয়মা তারা' বাবা। উত্তর কালে "জয়তারা বাবা" নামে তিনি বিখ্যাত হ'ন। বাক-সিদ্ধ এই সিদ্ধপুরুষ সবাইকে বলতেন, "তারা" নামের মধ্যেই রয়েছে অমৃত সমুদ্র। এই মহানামকে সর্বদা জপ করতে করতে চৈতন্য লাভ হবে। পাবে চৈতন্যময়ীর দেখা। 'তারা'ই ব্রহ্ম 'তারা-ই ব্রহ্মময়ী।" আর বলতেন, "কখনো সাধু মহাপুরুষের নিন্দা করবেনা। তারামা কাকে কি ভাবে রেখে কি কাজ করাচ্ছেন, তা বোঝা খুবই কঠিন তাই বিচার করতে যেওনা। ভয়ঙ্কর পাপ ও ক্ষতি হবে।"

ইষ্টলাভ তথা সিদ্ধিলাভের পর তিনি উত্তরকালে হুগলী জেলার

জঙ্গীপাড়া শ্মশানে অবস্থান করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এই শ্মশান "জয়তারা শ্মশান" নামে খ্যাত হয়।

মাঝে মাঝে 'জয়তারা বাবা' মহাপীঠ কালীঘাটে এসে কালীমন্দিরে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার এই সুযোগ্য শিষ্য সিদ্ধপুরুষ 'জয়তারা বাবা' একশো আট বছর বয়সে (১৩৭৮ সনে) মরদেহ ত্যাগ করে তারামণ্ডলে চলে যান।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর (লাহিড়ী বাবা) কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সংযোগের জন্য ভক্তপ্রবর বীরেন্দ্রনাথ সান্যালের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ।

—o-

শ্রীবাম সান্নিধ্যে ভক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ

আনুমানিক বাংলা ১২৯১ সাল থেকে ঝিল্লিখাসপুর নিবাসী ভক্ত প্রবর কৈলাসচন্দ্র সিংহ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ঝিল্লিখাসপুর গ্রাম তারাপীঠ থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীবামের নাম ও খ্যাতি শুনে এবং শ্রীবামের সান্নিধ্যে এসে কৈলাসচন্দ্র সিংহ ক্রমশঃ মুগ্ধ হ'ন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় একজন জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী পুরুষরূপে সুচিহ্নিত।

বাংলা ১২৪০ সালে তাঁর জন্ম হয় ঝিল্লিখাসপুরে। তিনি বয়সে শ্রীবামের চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিলরূপে সুপরিচিত হ'ন।

নিজের চেষ্টায় প্রতি সামান্য অবস্থা থেকে বিরাট প্রতিপত্তিশালী

ব্যক্তিরূপে সমাজে সুচিহ্নিত হ'ন। বিবাহ জীবনে প্রবেশ করবার পর তাঁর দুটি পুত্র হয়। সাংসারিক জীবনে পূজো পার্বন, পারিবারিক বিষয় আশয়, অর্থ ঐশ্বর্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতির মধ্যে থেকেও নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে তিনি সক্ষম হতেন। সমাজের বহু সৎকাজের সাথে তিনি যুক্ত হ'ন। তাঁর চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টি মূলতঃ অধ্যাত্মমুখী বলে শ্রীবাম তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন।

তিনি দীর্ঘ পনের বছর ধরে (১২৯০—১৩০৫ সাল) শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য ও দুর্লভ কৃপা লাভ করেন। শ্রীবামের বহু অলৌকিক লীলা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হ'ন।

প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি প্রতি সপ্তাহে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা বেলা তারাপীঠে চলে আসেন শ্রীবামের অমৃত সঙ্গ লাভের জন্য। শনিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত শ্রীবামের কৃপা ও নির্দেশে আধ্যাত্মিকভাবে বিভোর থাকেন। জপ ধ্যান পুজো ও শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্যে কোথা দিয়ে এই সময়টুকু কেটে যায় তা কৈলাস সিংহ বুঝতে পারেন না। শ্রীবামের কৃপা ও নির্দেশ অনুসারে তিনি জাগতিক জীবনে বাস করেও অধ্যাত্ম জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হলেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত পরমগুরু স্বরূপ শ্রীবামের দিব্য ও পবিত্র সান্নিধ্যে কাটিয়ে আবার কর্মজীবনে ফিরে যান। এই মহাসান্নিধ্যের সময়ে তার যথেষ্ট অধ্যাত্ম শক্তি বিকশিত হয়।

শ্রীবামের এই বিশিষ্ট কৃপাধন্য সন্তান অবশেষে ১৩০৫ সালে ৬৫ বছর বয়সে ব্রহ্মময়ী তারামা ও মহান অধ্যাত্ম আলোক বর্তিকা শ্রীবামের শুভ আশির্বাদ নিয়ে মরদেহ ত্যাগ করে তারালোকে গমন করেন।

তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে শ্রীগিরিশ চন্দ্র সিংহ তাঁদের বংশের পুজো পার্বন ও সম্পত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র সিংহের চারপুত্র। যথাক্রমে তাঁরা হলেন সর্বশ্রী সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ, বৈদ্যনাথ সিংহ, জগন্নাথ সিংহ, এবং ডাক্তার কাশীনাথ সিংহ।

সহৃদয় ও পরোপকারী ডাক্তার কাশীনাথ সিংহ উপরোক্ত কাহিনীর ব্যাপারে লেখককে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য লেখক তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

সংগীতে শ্রীবাম

সংগীত হ'ল ঈশ্বরের নিজস্ব ভাষা। এই ভাষার দেবদেউলে বসে সুর সাধক সুরেশ্বরকে শোনান তাঁর প্রাণের আকুতি। ভক্ত ভগবান এক হয়ে যান সুরের গভীরে। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার যত পথ আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ সুন্দর পবিত্র পথ হ'ল সংগীত।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যুগে যুগে সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ ও মহাসাধিকাদের সংগীতের প্রতি অসীম অনুরাগ। ঈশ্বরের এই নিজস্ব ভাষাতেই তারা ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন। তাই সুরের মধ্য দিয়ে তাঁদের নয়ন জল ধুয়ে দিয়ে যায় ইষ্টের শ্রীপাদপদ্ম যুগল।

শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, নানক, রামপ্রসাদ রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, লালন ফকির প্রভৃতিগণ তাঁর প্রাণবন্ত প্রতীক।

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাও সংগীতের মধ্যদিয়ে তাঁর প্রাণসবস্ব সুরেশ্বরী তারামায়ের রাতুলচরণে তাঁর প্রাণের কথা ঢেলে দেন অজস্র ধারায়। সুরের মুর্ছনার সাথে শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয় থেকে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হয় ভক্তি সুধামাখা নয়ন বারি। এই সুর আর সুরধ্বনির সহযোগে শ্রীবামের দিব্য পূজা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মময়ী সুরেশ্বরী তারামায়ের উদ্দেশ্যে। শ্রীবাম মধুর সুকন্ঠের অধিকারী। তাঁর প্রিয়গীত সকল তিনি প্রাণভরে গেয়ে শোনান তারামাকে।

শ্রীবামের প্রিয়গীত রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র, নবাই পণ্ডিত, ও নীলকন্ঠের গান সকল। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রাম প্রসাদী গান সকল।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ শুধু তন্ত্র সাধনাতেই সিদ্ধ নন, তিনি দুর্লভ গীত রচনা ও সুর আরোপ ও মধুর ভাবে তা গান করবার ক্ষেত্রেও সিদ্ধ। একাধারে সাধক, গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী, রূপে তিনি সিদ্ধ। স্বভাব কবি ও সিদ্ধ পুরুষ রাম প্রসাদের গান শুনে তাই শ্রীবামও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে যান। রামপ্রসাদের গানের সুর

স্বর্গীয় এবং দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। এই রাম প্রসাদের গান শুনে ও গান গেয়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও বহুবার ভাব সমাধি হয়েছে। শ্রীবামেরও তাই। শ্রীবাম প্রায়ই আপন মনে প্রসাদীগান গেয়ে তারামায়ের প্রসাদ লাভ করেন।

রামপ্রসাদের পর কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণের গানও শ্রীবাম প্রাণ ভরে করেন। রাজা রামকৃষ্ণ ও কমলাকান্ত রামপ্রসাদের মতই একাধারে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী রূপে সুচিহ্নিত।

শ্রীবাম নিজে তাঁদের গান করেন এবং তাঁর কাছে আগত ভক্তদের অনেককে আবার তিনি এই সিদ্ধসাধক শিল্পীদের গান করতে বলেন। কখনো তাঁদের সাথে নিজেও ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গান করেন। তাঁর দু'নয়নে তখন বয়ে যায় আনন্দধারা।

শ্রীবামের শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধগণের মধ্যে অনেকেই সংগীতে পারদর্শী। শ্রীবামের ইচ্ছায় তাঁরাও শ্রীগুরু বামকে গান শুনিয়ে কৃতার্থ হ'ন। তাঁদের মধ্যে শাওন ফকির, রসিক গোঁসাই, তারাক্ষ্যাপা, জগৎক্ষ্যাপা, ফণীভূষণ চৌধুরী, ফকির সাহেব, সাধু বাবা, হরি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকন্ঠ, ক্ষ্যাপাবাউল নবনী দাস, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

তাছাড়া আরো কত সাধক ভক্ত যে তাঁকে কত ভাবে গান শুনিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। শ্রীবাম নিজে সুকন্ঠের অধিকারী এবং অজস্র ভাবের গান করেছেন সারাজীবন ধরে। তাঁকে গান শুনিয়েছেনও তাঁর বহু শিষ্য ভক্ত গুণমুগ্ধ গণ।

তারামা স্বয়ং সরস্বতী। তাই শ্রীবাম সদা তারাময়। সুতরাং শ্রীবামের পক্ষে গীত রচনা করে গান করাও স্বাভাবিক ব্যাপার। শ্রীবাম একদিন আপন মনে বসে নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে তারামাকে শোনালেন—

"এ তালুকে রাণীর নাম গো তারাসুন্দরী,
উকিল মোক্তার আছে কত কুবের নামে ভাণ্ডারী।
শ্মশান ভূমি আলো করে বুকের ছেলে কোলে নিয়ে
স্নেহময়ী শিলাময়ী প্রাণময়ী শঙ্করী তারা সুন্দরী ॥

পাগল বামা মা তোর নামে ভাসিয়ে দিল নায়।
শুধু তারা তারা বলে রাণীর নামই গায় ॥
আমরা মা তোর খাস তালুকে বসত করি মনের সুখে।
মা তোর চরণ চিহ্ন বুকে এঁকে কিনবো মা তোর জমিদারী ॥"

সংগীত সুধায় সদা ভাসমান শ্রীবামের কাছে সকল রকম ভক্তি-গীতিই অত্যন্ত প্রিয়। শ্যামাসংগীত, বাউল গীত, ভজন, যাত্রাগান, ব্রাহ্মসংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন মধুর সংগীত তিনি শুনেছেন তাঁর শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে এবং অশেষ আনন্দও পেয়েছেন।

তবে সর্বাধিক আনন্দ পেয়েছেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান করে এবং গান শুনে। এদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে তাঁর আশ্চর্য্য সাদৃশ।

এই উভয় মাতৃসাধকই গানে ভাসতেন এবং বিশেষভাবে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান যেমন করতেন তেমনি শুনতেন ভাবে বিভোর হয়ে। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে আরো বহু বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় এবং উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় যোগাযোগ লক্ষণীয়। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে)।

শ্রীবাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম মাতৃসংগীত গেয়েছেন এবং শুনেছেন। যথাস্থানে সে সব একে একে বর্ণিত হবে।

—০—

শ্রীবাম দর্শনে স্বামী পূর্ণানন্দ ও ভৈরবী মা

বাংলা ১২৯২ সালের মাঘ মাস (ইং ১৮৮৬ খ্রী, ফেব্রুয়ারী মাস) ভোর বেলা প্রবল শীতের মধ্যে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করবার জন্য তারাপীঠে এলেন সিদ্ধ সাধক স্বামী পূর্ণানন্দ ও তাঁর সাধিকা পত্নী নলিনী বালা দেবী তথা ভৈরবী মা।

এই সাধক দম্পতি যাচ্ছিলেন ডাবুকে মন্ত্র নিতে কৈলাসপতির কাছে। যাবার পথে তারাপীঠে এলেন। তারামা কে প্রণাম করে তাঁরা মহাশ্মশানে শিমুলতলায় এলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করতে। শ্রীবাম শিমুলতলায় বসে আছেন। তারাভাবে বিভোর। পূর্ণানন্দ শ্রীবামকে প্রণাম করে স্ত্রীকে বললেন, "যাও, প্রণাম কর। ভয়ের কিছু নেই।" স্বামীর কথায় তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন। তারপর তারাপীঠের প্রাণ-পুরুষ শ্রীবাম কে দেখতে লাগলেন।

শ্রীবামের বিশাল দেহ, শক্ত সমর্থ ও লম্বা চওড়া চেহারা। গায়ের রং শ্যামবর্ণ কিন্তু স্নিগ্ধ। মুখ ভর্তি ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু, মাথাভর্তি ঘন কালো চুল এবং বিশাল আরক্তিম নয়ন যুগল। সব মিলিয়ে এই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তিটি যথার্থ ভৈরবের মূর্তি। এই সময় শ্রীবামের বয়স আট চল্লিশ বছর। দর্শন প্রার্থী স্বামী পূর্ণানন্দের বয়স উনত্রিশ ও নলিনী বালার চব্বিশ বছর। শ্রীবাম উভয়কে আশীর্বাদ করলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ দু একটি কথা বললেন কিন্তু শ্রীবামের ভীম ভৈরব মূর্তি ও মেঘমন্দ্রিত গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বর শুনে ভৈরবীমা'র কথা বলতেই সাহস হ'লনা।

শ্রীবামের আশীর্বাদ গ্রহণ করে উভয়ে ডাবুকে রওনা হলেন। ডাবুকে পেঁছে যথাসময়ে চিহ্নিত গুরু ডাবুকের কৈলাসপতির কাছ থেকে উভয়ে মন্ত্র গ্রহণ করলেন। কৈলাসপতি রাজসিক সাধক রূপে সুপরিচিত। এই বীরাচারী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সিদ্ধসাধককে শ্রীবাম "রাজগোঁসাই" বলে ডাকেন। ডাবুকে অনাদিলিঙ্গ শিব আবিষ্কার করে কৈলাসপতি মন্দির নির্মাণ করে নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। তাঁর গুনমুগ্ধ ও পরবর্তীকালে শিষ্য কাশ্মীরের মহারাজা এই মন্দির নির্মাণ কল্পে একলক্ষ টাকা দেন এবং সেবাপূজার জন্য প্রতিমাসে

পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করেন। কৈলাসপতি ডাবুকের মন্দির সংলগ্ন কুটীরে তাঁর আশ্রম স্হাপন করেন।

তিনি শ্রীবামের অধ্যাত্ম শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকলেও বয়োকনিষ্ঠ শ্রীবামকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। শ্রীবামও সেইভাবে তাঁর সাথে মেশেন। কৈলাসপতি শ্রীবামকে দিয়েই ডাবুকের অনাদি লিঙ্গ শিব ডাবুকেশ্বরে সংস্কার সাধন করান। কৈলাসপতির চেহারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফর্সা ও লম্বা চওড়া চেহারা ও রাশভারি মূর্তি দেখে সবাই সমীহ করেন।

ডাবুক তথা আশে পাশে এবং বীরভূমে তার বহু শিষ্য শিষ্যা রয়েছে। তাঁর মহান সাধনা ও জীবনী যথার্থ আদর্শনীয় (দ্রষ্টব্য 'মহাপীঠ তারাপীঠ'—প্রথমখণ্ড)। যাহোক, ডাবুকে কয়েকদিন অতিবাহিত করে ফেরবার পথে পুনরায় তারাপীঠে এলেন শ্রীবামকে দর্শন করবার জন্য।

শ্রীবাম এবার তারামন্দিরে বসে আছেন। শিশুর মতই নগ্ন। শরীরে একটু কাপড় জড়িয়ে একটু পরেই ফেলে দেন শ্রীবাম। কত লোক তাঁকে কাপড় দিয়েছেন পরবার জন্য। কাপড়ের শেষ পরিণতি এই ভাবে হ'ত। স্বামী পূর্ণানন্দ প্রণাম করলেন। তারপর ভৈরবী মা প্রণাম করতেই শ্রীবাম পা দিয়ে এক প্রচণ্ড লাথি মারলেন তাঁকে। অনেক দূরে ছিটকে পড়লেন তিনি। উপস্থিত সবাই ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। স্বামী পূর্ণানন্দ বিস্মিত হলেন কিন্তু চুপ করে রইলেন। তিনি সাধক; উপলব্ধি করলেন যে হয়তো কোন গুরুতর বিপদ বা অসুস্থতা আসন্ন ছিল, তাই কৃপাকরে শ্রীবাম কাটিয়ে দিলেন। তা না হলে অকারণে মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপা এমন ভাবে তাঁর স্ত্রীকে আঘাত করতেন না। ভৈরবী মা কিন্তু এত দূরে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়েও কোন ব্যথা পেলেন না। বিস্ময়ে কেবল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তখন শ্রীবাম তাঁকে বললেন, "ও, তুই এসেছিস। আমি মনে করেছি 'বল'। আয় আয় কাছে আয়।" তারপর আবার তাঁকে শ্রীবাম প্রণাম করতে দিলে ন।

এই সাধক সন্ন্যাসী দম্পতি তারাপীঠে কয়েকদিন শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে কোলকাতায় এলেন (বাংলা ১২৯২ মাঘ, ইং ১৮৮৬ ফেব্রুয়ারী)। তারপর কাশীপুর উদ্যান বাটীতে গিয়ে যুগাবতার

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করলেন। তখন ঠাকুর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ও খুবই অসুস্থ। তবু দর্শন স্পর্শন ও কথাবার্তাও দু'একটি হ'ল। সেই সময় পরমহংসদেবের পত্নী শ্রীমা সারদামণি ও ঠাকুরের সেবারত শিষ্যদের অনেককে দেখতে পেলেন। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ) শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দর্শনের ছয়মাস বাদে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্যলীলা সম্বরণ করে অপ্রকট হ'ন (৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩, ইং ১৬ই আগষ্ট, (১৮৮৬ খ্রীঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করে পুনরায় তাঁরা তারাপীঠে ও ডাবুকে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও গুরু কৈলাস-পতির দিব্য সান্নিধ্য লাভ করেন।

এই সন্ন্যাসী দম্পতি ; পূর্ণানন্দ ও তাঁর পত্নী ভৈরবীমা'র গৃহী নাম হ'ল যথাক্রমে পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নলিনী বালা দেবী।

পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলা ১২৬৩ সালে। নলিনী বালা দেবীর জন্ম বাংলা ১২৬৮ সালের ফাল্গুণ মাসে বৃহস্পতি বার। তাঁর পিতৃগৃহের পদবী 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। নলিনীদেবীর আরেকটি নাম 'ললিতা'। তাঁর ঠাকুরমা বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে তাঁকে দেখেন। তখন তাঁর সবে জন্ম হয়েছে। সুন্দর টুকটুকে ফর্সা হয়েছিলেন বলে ঠাকুরমা আদর করে নাম রাখেন 'ললিতা'।

তাঁর আদি বাড়ী পাবনায়। ছোটবেলা চট্টগ্রামে অতিবাহিত করেন। মাত্র আটবছর বয়সে অর্থাৎ বাংলা ১২৭৬ সালে তাঁর বিয়ে হয় পরমানন্দের সাথে। তখন তাঁর স্বামী পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র তের বছর। প্রায় যৌবনে উভয়ে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হ'ন। যাহোক তারাপীঠে ও ডাবুকে যথাক্রমে বামাক্ষ্যাপা ও কৈলাসপতির দিব্য সঙ্গ লাভ করে এই সাধক দম্পতি সেখান থেকে বৈদ্যনাথ হয়ে কাশীতে এলেন (ফাল্গুন, ১২৯২)।

কাশীতে স্ত্রী নলিনী বালাকে রেখে সহসা স্বামী পূর্ণানন্দ সাতদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হলেন। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলেন নলিনী বালা দেবী তথা ভৈরবী মা। বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। কাশীতে

সাধুসন্ত যেমন আছেন তেমনি অসাধু লোকেরও অভাব নেই। তার ওপর কাশীতে সবেমাত্র তিনি এসেছেন। সবই তাঁর অপরিচিত। সর্বোপরি তিনি একা ও অসহায়া এক সুন্দরী যুবতী। নিরুপায় হয়ে ভৈরবী মা কাশী বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করলেন এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য।

কাশীশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে তখন কাশীর চলন্ত শিব বিরাজ করছেন। তখন তাঁর বয়স দু'শো আটাত্তর বছর। ভৈরবী মা এই সচল বিশ্বনাথের পাশে পাশে থাকতে লাগলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শরীর বিশাল। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। বিরাট ভুড়ি। সেই ভুড়ির ভাঁজে শরীরের মাঝের অংশটা ঢাকা পড়ে থাকে। ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর পাশে পাশে ভৈরবী মাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কাহে হামারা সাথ আতা হ্যায়। তুমারা আদমী কাহা হ্যায়?" ভৈরবী মা জানালেন তাঁর স্বামীর নিরুদ্দেশ হবার কথা ও তাঁর অসহায় অবস্হার কথা। সব শুনে তিনি অভয় দিয়ে ভৈরবী মাকে বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এখানে কোন ভয় নেই।"

ত্রৈলঙ্গস্বামী রাত তিনটের সময় গঙ্গাস্নান করেন। তখন ভৈরবী মাও তাঁর সাথে স্নান করতে যান। ত্রৈলঙ্গস্বামীর বিশাল ভৈরব কান্তি ও প্রশান্ত গম্ভীর রূপ দেখে তাঁর সাথে বেশী কথা বলতে ভয় হ'ত ভৈরবী মা'র।

একদিন তাঁর যেতে দেরী হ'ল স্নান করতে। তাই তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামীর বসবার স্থানটি পরিস্কার করে রাখলেন। হঠাৎ জলের ধারে একটি আশ্চর্য প্রক্রিয়ারত অবস্থায় তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখে ফেলেন। পরে ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, "যা-ই দেখলে, কারাকে কিছু বোল না। আর আমার কাছে এসো না।"

এমনি ভাবে ছয়দিন কেটে গেল। স্বামীর জন্য চিন্তায় অধীর হলেন ভৈরবী মা। স্বামীর কথা জানবার ইচ্ছে হ'ল ত্রৈলঙ্গস্বামীর কাছে। অন্তর্যামী ত্রৈলঙ্গস্বামী বুঝতে পেরে বললেন, "হাম্ তেরা বাপ্‌কা নোকর হ্যায়?" পরে আশ্বাস দিয়ে বললেন দু'এক দিনের মধ্যেই তোর স্বামী ফিরে আসবে।

পরদিনই হঠাৎ তাঁর স্বামী ফিরে এলেন। অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। কাশীর চলন্ত শিব

ত্রৈলঙ্গস্বামীর বিশাল জীবন যেমনি বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মেরুচূড়ামণি তাঁকে বলা হয় (তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

যাহোক, ত্রৈলঙ্গস্বামীর কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে কাশী বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করে স্বামী পূর্ণানন্দ ও ভৈরবী মা কাশী ত্যাগ করলেন।

কিছুদিন পর স্বামী পূর্ণানন্দ ও ভৈরবী মা বক্রেশ্বরে এলেন। এই সুপ্রাচীন তীর্থ ক্ষেত্রে ও সতীপীঠে তাঁরা খাকিবাবা ও অঘোরী বাবা প্রভৃতি মহাপরুষদের সাথে সাক্ষাত করলেন। কিছুকাল পর উভয়ে মরুতীর্থ হিংলাজ রওনা হ'ন। সেই বছর তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে তাঁরা-ই একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। দুঃসহ গরম ও ভীষণ মরু-ভূমির মধ্য দিয়ে তাঁরা দীর্ঘপথ যাত্রা করেন। মাঝ পথে স্বামী পূর্ণানন্দের পেটে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। তীর্থ ফেরৎ এক ব্রাহ্মণ বললেন পূর্ণানন্দকে 'বাবা, ওখানে কিছু নেই।" তাই শুনে মাঝ পথ থেকেই স্বামী পূর্ণানন্দ ও ভৈরবী মা ফিরে এলেন।

স্বামীর দেহত্যাগের পর গয়া থেকে ফেরবার পথে পুনরায় বক্রেশ্বরে এসে কিছুদিন বাস করেন ভৈরবী মা। এই সময় গভীর সাধনায় নিমগ্ন হ'ন। বক্রেশ্বর থেকে তারাপীঠে এসে বামাক্ষ্যাপার একাধিক অলৌকিক লীলা দর্শন করে ভৈরবীমা ডাবুকে গুরু কৈলাসপতির কাছে এলেন। কৈলাসপতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য কুলদানন্দ তাঁকে ডাবুকে থাকতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি দীর্ঘ পরিব্রাজনায় বের হলেন। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি পরিভ্রমণ করেন। ভারতের বহু তীর্থে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল বিশিষ্ট মহাসাধক ও সাধিকাদের দর্শন লাভ করেন। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কত মহাপুরুষ ও মহাসাধিকার সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁর হিসাব তিনিও জানেন না। তিনি যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা (তারাপীঠ) ডাবুকের কৈলাসপতি (ডাবুক), শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (কাশীপুর উদ্যান বাটী), মা সারদামণি (ঐ), স্বামী বিবেকানন্দ (ঐ), ত্রৈলঙ্গস্বামী (কাশী), ভাস্করানন্দ (ঐ), খাকিবাবা (বক্রেশ্বর), অঘোরীবাবা (ঐ), রামদাস কাঠিয়া বাবা (বৃন্দাবন), রামঠাকুর (ফেণী, চট্টগ্রাম)

লোকনাথ ব্রহ্মচারী (বারদী), যোগানন্দ স্বামী (কালনা), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (মুন্সিগঞ্জ), শম্ভুনাথ ঠাকুর, শঙ্করী মা (চন্দ্রনাথ পাহাড়), ভোলানন্দ গিরি (হরিদ্বার), মোক্ষদানন্দ (তারাপীঠ), চক্রবর্তী বাবা (তারাপীঠ), আনন্দময়ী মা (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি।

ভারত বিখ্যাত মহাসাধিকা আমন্দময়ী মা এই বয়োজ্যেষ্ঠা সিদ্ধ সাধিকা ভৈরবী মাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। কালনাতে তিনবছর ভৈরবী মা যোগানন্দ আশ্রমে বসবাস করেন। ফেণীতে এক ভক্তের বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সাথে সাক্ষাত ও আলাপ হয়। দ্বারকাতে ভৈরবী মা প্রায় পাঁচবছর মাটীর মধ্যে নির্জন গুহায় কঠোর তপস্যা করেন। সীতাকুণ্ড শ্মশানে দীর্ঘ বত্রিশ বছর তিনি সাধনা করেন। এই সময় বহু অলৌকিক লীলা তাঁকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানে তিনি বিস্ময়কর ভাবে হরপার্বতীর দর্শন ও নারায়ণের দর্শন পান। তাছাড়া ভারতের আরো বহু তীর্থে তিনি বাস করেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার তিরোভাবের (বাংলা ২রা শ্রাবণ ১৩১৮) পরও তিনি দু'বার তারাপীঠ যান। ১৩২০ সালে সর্বশেষবার তিনি তারাপীঠ গিয়ে তারামাকে প্রণাম করেন ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সমাধি মন্দিরে বসে সেই পূর্বের স্মৃতি চারণ করেন। বামাক্ষ্যাপা বাবার দেহত্যাগের পর আর কোন বিশেষ সাধুকেই তিনি দেখেননি তারাপীঠে। এমনকি পাণ্ডাদেরও বেশী দেখেননি।

তারামায়ের মায়ের মন্দিরের, পূর্ব দিকে একটি ভোগের ঘরে তিনি সাময়িক ভাবে থাকেন (১৩২০ সালে)। সিদ্ধ সাধিকা ও ভারত বিখ্যাত অজস্র সাধু মহাপুরুষ ও মহাসাধিকার সান্নিধ্য ধন্যা ভৈরবী মায়ের দিব্যজীবন অজস্র অলৌকিক ঘটনা ও ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ও করুণা দ্বারা মহাসমৃদ্ধ।

প্রচার বিমুখ এই মহান সাধিকা দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রাম থেকে হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডানকুনিতে শান্ত নির্জন পরিবেশে ইং ১৯৫২ সালে তাঁর ছোট্ট আশ্রম স্থাপন করে সাধনায় মগ্ন থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর অলৌকিক কৃপাধারা বহু আর্ত নরনারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভক্ত নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজী ১৯৭১ সালের ১৫ই নভেম্বর সোমবার এই লেখক তাঁর ডানকনির আশ্রমে গিয়ে তাঁর প্রথম সাক্ষাত লাভ করেন। তখন তাঁর স্থূল

দেহের বয়স একশো দশ বছর। তবু এই শতাধিক বছরের মহান সাধিকা তাঁর সাধন কুটিরে একাসনে এক ভাবে বসে সুদীর্ঘ ক্ষণ এই লেখকের সাথে কথা বলেন এবং উপরোক্ত সকল ঘটনা লেখককে স্বয়ং বিশদভাবে জানান।

এতটুকু ক্লান্তি শ্রান্তি দীর্ঘ সাড়ে চারঘন্টার মধ্যে দেখা যায়নি তাঁর। সদা হাস্যময়ী ও করুণাময়ী এই ভৈরবী মা'র সাথে পরবর্তী কালে লেখকের আরো কয়েকবার সাক্ষাত ঘটে এবং প্রতিবারই লেখক তাঁর দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হ'ন। ভৈরবী মা'র মূলত প্রিয় খাদ্য ছিল আপেল ফল।

ভৈরবীমা'র মরদেহ ত্যাগের ঘটনাটিও অত্যন্ত বিস্ময়কর। বাংলা ১৩৮২ সালের পৌষমাসে ভৈরবী মা কোলকাতায় শিয়ালদহে এক শিষ্যের বাড়ীতে আসেন। ঈশ্বরীয় নামগানের মধ্যে তিনি সহসা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হ'ন। ভৈরবীমায়ের দিব্য দেহের প্রাণস্পন্দন দীর্ঘক্ষণ না থাকায় তাঁর সমবেত শিষ্য ভক্তগণ বুঝতে পারেন যে তিনি দেহত্যাগ করে গেছেন। তখন একজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে এনে পরীক্ষাও করানো হয়। ভৈরবী মায়ের দেহের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ এবং দেহও শীতল। ডাক্তার ভৈরবী মাকে 'মৃতা' বলে ঘোষণা করলেন। ফলে কান্নার রোল পড়ে গেল শিষ্য বাড়ীতে। বহু শিষ্য শিষ্য ও ভক্ত নরনারীগণ এই আকস্মিক দেহত্যাগে বিমূঢ় হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন।

আশেপাশের ও দূরের শিষ্য ভক্তদের খবর দেয়া হয়। এভাবে প্রায় চার ঘন্টা অতিবাহিত হয়। হঠাৎ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একশো চৌদ্দবছরের মহান সাধিকা ভৈরবী মা সহসা মহাসমাধি থেকে জেগে ওঠেন। উপস্থিত সবাই এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে মহা-বিস্ময়ে মহানন্দে স্তব্ধ হয়ে যান।

ভৈরবী মা তাঁর সমবেত শিষ্য শিষ্যা ও ভক্তগণকে বললেন, "তোমরা আমার জন্য কাঁদছো কেন? আমি কোথায় আর যাব? আমি তো এখানেই তোমাদের মাঝেই থাকবো। দেহটা জরাজীর্ণ, তাই ত্যাগ করছি। তাই আনন্দ কর, আনন্দ কর।" —এই বলে পুনরায় মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। সেই মহাসমাধিতেই তিনি চির নিমগ্না হলেন।

—o—

সেবক নন্দ দাইয়ের বিচিত্র সেবা

তারাপীঠ মহাশ্মশানের ওপারে কবিচন্দ্রপুর। তারাপীঠ ও কবিচন্দ্রপুরের মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা সদৃশ উত্তরমুখী দ্বারকা নদী।

কবিচন্দ্রপুর নিবাসী নন্দা হাড়ি বা নন্দ দাই শ্রীবামের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবক। শ্রীবামের সেবা ছাড়াও সে মাঝে মাঝে পাটনীর কাজ করে অর্থাৎ জোড়া ডোঙ্গা দিয়ে দ্বারকা নদীতে যাত্রী পারাপার করে এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানে ডোমের কাজও করে কখনো কখনো। কবিচন্দ্রপুরে একটি মাটীর ঘরে তার সংসার। দুই স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান নিয়ে সেখানে সে বাস করে। তবু এসব সত্বেও তার মন প্রাণ দেহ শ্রীবামের সেবাতেই প্রধানত নিয়োজিত।

মূলত বাংলা ১২৯২ থেকে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর নন্দ দাই শ্রীবামের একাধারে সেবক ও ভক্ত রূপে বামমণ্ডলে সুপরিচিত। নন্দ দাই তথা 'নোদা' শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অজস্র লীলার প্রত্যক্ষ দর্শক।

নন্দদাইয়ের ন্যায় এতকাল ধরে শ্রীবামের নিত্য সেবা ও দিব্য সঙ্গ লাভ আর কারোর ভাগ্যে ঘটেনি। নন্দদাইয়ের ডাকনাম 'নোদা'। শ্রীবাম তাকে 'লোদা' বলে সস্নেহে ডাকেন।

এই 'নোদা'র আকৃতি হ'ল, খর্ব ও শীর্ণকায়। নেদোর গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নোদা কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ লোক। এই মহারোগ হ'বার কারণ যতদূর সম্ভব জানা যায় যে, একদিন তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্য দিয়ে যাবার পথে একটি মড়ার হাড় নোদার পায়ে ফুটে যায়। ক্রমে তা বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হয়। কোন টোট্‌কা ওষুধে সারলে না। এই ঘা ক্রমে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত হয়ে কুষ্ঠরোগে পরিণত হয়। ফলে নোদার দুই হাতের আটটি আঙ্গুলই খসে পড়ে। শুধু দু'হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়েই সে শ্রীবামের নিত্য সেবা যত্ন করে। শ্রীবামের খাবার জলও সে নিয়ে আসে দ্বারকা থেকে।

শ্রীবাম তাঁর প্রিয় সেবক ও ভক্ত 'লোদা'র এই সেবাযত্ন সানন্দে গ্রহণ করেন। 'নোদা'র আনা জলও তিনি আনন্দের সাথে পান করেন।

কিন্তু 'নেদো' কুষ্ঠ রোগ গ্রস্থ হ,বার পর জাগতিক জীবনে সংসারে ও ঘরে বাইরে সবার ঘৃণার পাত্র হ'ল। কিন্তু শ্রীবামের অফুরন্ত কৃপার পাত্র হয়ে সে নিশ্চিন্তে বেঁচে রইলো।

এদিক দিয়ে 'নোদা' সত্যি মহা সৌভাগ্যবান। যে কুষ্ঠরোগগ্রস্থ 'নোদা' সংসারে সবচেয়ে অবহেলিত ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত, সেই হতভাগ্য নোদাই শ্রীবামের কাছে সবচেয়ে স্নেহের করুণার ও আদরের পাত্র। 'যার কেউ নেই তার বামাক্ষ্যাপা আছে' -এই কথার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এই গলিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ নীচ জাতীয় নন্দা হাড়ি তথা নন্দ ডোম তথা নন্দ দাই। যাকে বাদ দিয়ে জগতের সকলের দিন কাটে মহা আনন্দে, সেই ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগী নন্দ দাইকে বাদ দিয়ে তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব বামাক্ষ্যাপার দিন কাটেনা। এই কুষ্ঠরোগী ও ডোম নোদার হাতে জল না খেলে শ্রীবামের তৃপ্তি হয় না। নোদার গলিত কুষ্ঠের হাতে তামাক গাঁজা প্রভৃতি প্রস্তুত না হলে শ্রীবাম খেয়ে সুখ পান না।

অস্পৃশ্য ও দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগী নোদা মদের বোতল দু'হাতের তালু দিয়ে ধরে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলে শ্রীবামের কারণ পাত্রে ঢেলে না দিলে শ্রীবামের 'কারণ' খেয়ে আনন্দ হয় না। এই দাঁত দিয়ে ছিপি খুলবার অধিকার একমাত্র শ্রীবাম নোদাকেই দিয়েছেন। এমনি আরো কত ভাবে যে তিনি নোদার সেবা গ্রহণ করেন তার হিসেব নেই। যে সেবা অনেক রাজা মহারাজাও শ্রীবামকে শত ইচ্ছে থাকা সত্বেও করতে পারেননি সেই সেবা এই কুষ্ঠরোগী নন্দ ডোম অনায়াসে করেছে শ্রীবামকে।

সেদিক থেকে ভারতের অনেক রাজা মহারাজার চেয়েও সৌভাগ্যবান নন্দা হাড়ি তথা নন্দ ডোম। শ্রীবামের এই নিত্য সেবক 'নোদা' কখনো শ্রীবামের কাছ থেকে আদর, কখনো গালাগাল, কখনো প্রহার আবার কখনো সস্নেহ আপ্যায়ন পায়। নোদা এসব কিছুতেই সুখী। প্রাণঢালা ভক্তি ও ভালবাসার দ্বারা সে শ্রীবামের হৃদয় জয় করেছে। তাই সে নিশ্চিন্ত, আনন্দিত ও তৃপ্ত।

মাঝে মাঝে নোদা শ্রীবামের সাথে বাইরেও বেড়াতে যায়। একবার (১২৯৪ সালে) নোদাকে নিয়ে শ্রীবাম হুগলীতে বাবুগঞ্জে শিষ্য রাখাল চন্দ্র সেনের বাড়ী গিয়েছিলেন। দু'দিন থেকে তৃতীয় দিন তারাপীঠে ফিরে এসেছিলেন।

মাঝে ঝাঝে 'নেদো' শ্রীবামের সন্তান তুল্য মহাশ্মশানের একপাল দেশী কুকুর কুকুরীদের সেবা যত্নও করে। উত্তর কালে এসব কুকুর কুকুরী ছানারা বড় হয়ে শ্রীবামের অন্তলীলার নিত্য সঙ্গী হয়। যথাস্থানে (তৃতীয় খণ্ডে) যথাসময়ে তা বর্ণিত হবে।

মাঝে মাঝে নোদা স্বভাব বশে শ্রীবামের কাছ থেকে কৌশলে টাকা নেয়। করুণাময় শ্রীবাম তা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে থাকেন। পরে মদের ঘোরে নোদা-ই আবার তা বলে দেয়।

একদিন নোদার শ্বশুরবাড়ী থেকে চারজন কুটুম এল নোদার কাছে। কুটুম্বিতা করবার কোন পয়সা নেই তখন নোদার।

তাই নোদা এক ফন্দি আঁটলো মনে মনে। নোদা এসে শ্রীবামকে বললো "গোঁসাই, সর্বনাশ হলছে।" তা শুনে সর্বজ্ঞ শ্রীবাম রসিকতা করে বললেন, "সর্বনাশ হলছেন বই কি বাবা।" নেদো তাঁর প্রিয়তম প্রভুকে বুঝিয়ে বললো, "এক ভৈরবী আলছিল. আপনার কপিনটা চুরি করে লিয়ে গেলছে। যেঁয়েই কপিনটা পুড়িয়ে দিবো. তাইলে ক্ষেপার হোলে ঘা হবে"—ভৈরবী তাই বলছে বটে। শ্রীবাম তাঁর প্রিয় সেবক 'লোদার'র এই গল্প শুনে তখন তাঁর কৌপিন পরবার জায়গায় হাত বুলিয়ে (মজার কথা শ্রীবাম কৌপিন প্রায় ব্যবহার করেন না) চিন্তার ভান করে বললেন, "তাইতো বাবা লোঁদা, কি হবেন বাবা?'' নোদা বললো, "পাঁচটা টাকা ধার দেন গোঁসাই, তাইল সে দিবে বলছে"। মহারসিক শ্রীবাম বললেন," "তিন টাকায় হবে না বাবা?"

নোদা ভাবলে তার বাড়ীতে আজ কুটুম এসেছে। তিন টাকা হলে মোটামুটি চলে যাবে। তাই হিসাব করে বললো নোদা, "তাই দেন গোঁসাই, দেখি ভৈরবী কত দূর গেল।"

এইবলে নোদা তিনটাকা নিয়ে সোজা মদের দোকানে গিয়ে মদ কিনে দুই ছেলে ভীম ও অর্জুনের হাতে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল কুটুমদের জন্য। তারপর নিজে এক বোতল নিয়ে এবং কিছু চাট কিনে শ্রীবামের কাছে এসে তাঁকে মদটি খাইয়ে বাড়ী চলে গেল। আর কপিন নিয়ে কোন কথা হ'লনা।

নোদার এই প্রবঞ্চনা শ্রীবাম জানতে পেরেও নোদোকে শ্রীবাম সমর্থন করলেন। কারণ ভক্তরা মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় শ্রীবামকে কিছু প্রণামী দেন। তিনি সেই টাকা আবার যাদের দরকার, সেই অভাবী-

দেরই দিয়ে দেন। সর্বত্যাগী শ্রীবামের কোন অর্থের প্রয়োজন নেই। পরমার্থ স্বরূপিণী স্বয়ং তারামা-ই তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। তাই অভাবীদের টাকা দিয়ে দেন। অথচ এই টাকার জন্য শ্রীবাম বহুবার এই অভাবীদের কাছ থেকেই কঠিন নির্য্যাতন পেয়েছেন। হাসি মুখে সব সহ্য করেছেন তিনি। আবার তাদেরই দিয়েছেন টাকা। পরম করুণাময় শ্রীবামের কৃপাধণ্য সেবক নন্দদাই তথা নোদার আরো বহু বিচিত্র কাহিনী রয়েছে। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক মহাসাধক ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থনাথের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম কৃপাধন্য রাখাল সেন ও সত্যময়ী দেবী

বাংলা ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসের শেষভাগে এক সকালে মহাসাধক রামপ্রসাদের বংশধর রাখাল চন্দ্র সেন ও তাঁর পত্নী সত্যময়ী দেবী তারাপীঠে শ্রীবামের কাছে এলেন স্বপ্নাদীষ্ট হয়ে।

তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ ১২৮৯ সালে স্বামীগৃহ হালি শহরে এক গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সত্যময়ী দেবী এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখলেন। স্বামী গৃহের কুলদেবী সহসা কন্যা রূপে তাঁকে বললেন, "কাশী যেওনা, তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার কাছে যাও।" পরদিন ঘুম থেকে উঠে যুবতী বধু, রাখালচন্দ্র সেনকে বললেন এই দিব্য স্বপ্নের কথা।

কিন্তু তা সত্বেও জ্ঞাতী বিরোধ ও অন্যান্য অশান্তির জন্য তিন-

বছরের মধ্যে তারাপীঠে যাওয়া হ'ল না। অবশেষে মাত্র পাঁচশো টাকায় সব সম্পত্তি বিক্রি করে চিরতরে হালিশহর ছেড়ে তারপীঠের পথে স্বামী স্ত্রী যাত্রা করলেন বাংলা ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি।

পথে জয়দেবের কেঁদুলী দর্শন করে তারপর তারাপীঠে এসে পেঁৗছলেন এক প্রভাতী লগ্নে।

রাখালচন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ আর সত্যময়ীর বয়স তখন একুশ বছর পাঁচ মাস। সত্যময়ীর জন্ম বাংলা ১২৭১ সালের ১৪ই আশ্বিন হুগলী জেলার বাবুগঞ্জ তামাল পাড়ায়। সত্যময়ীর পিতার নাম পুরুষোত্তম মল্লিক ও মায়ের নাম প্রসন্নময়ী দেবী। রাখাল সেনের জন্ম ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে। রাখালচন্দ্র সেনের পিতার নাম তিনকড়ি সেন। তিনি হালি শহরের বিশিষ্ট কবিরাজ ছিলেন। রাখাল সেনের মায়ের নাম দুর্গাময়ী দেবী। বাংলা ১২৭৬ সালে সত্যময়ী দেবীর সাথে রাখাল সেনের বিয়ে হয়। সত্যময়ীর বয়স তখন পাঁচ বছর। যাহোক, এই ধর্মপ্রাণ দম্পতি তারাপীঠ মহাশ্মশানের ভয়াবহ রূপ দেখতে দেখতে শিমুল তলায় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দর্শন পেলেন। অজস্র শবাস্থি ও একদল সারমেয় পরিবৃত হয়ে শ্রীবাম বসে আছেন।

পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও অশ্রুর সাথে ভক্ত দম্পতি তাঁকে প্রনাম করলেন। শ্রীবাম উভয়কে নিরিক্ষণ করে গম্ভীর স্বরে বললেন, সিদ্ধবংশ, পা ছেড়েদে।" রাখালচন্দ্র সেন বাংলার মহাসিদ্ধ পুরুষ ও মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেন-এর বংশধর। মহাপুরুষ রামপ্রসাদের সিদ্ধি ও রামপ্রসাদী গানের কথা আজ সর্বজন বিদিত।

সর্বজ্ঞ শ্রীবাম তাই ইঙ্গিত করে, 'সিদ্ধবংশ' বললেন। এই ভক্ত দম্পতি শ্রীবামের পদপ্রান্তে সজল নয়নে বসে রইলেন। করুণাময় শ্রীবাম মহাশ্মশানের কিছু মাটি নিয়ে তাঁদের নিয়ে বললেন, 'এইনে, তোদের ভাল হবে, চলে যা।"

তখন তাঁরা করজোড়ে শ্রীবামকে জানালেন যে এজন্য তারা আসেননি। কি জন্য তাঁরা এসেছেন তাতো তিনি ভালভাবেই জানেন। শ্রীবাম এদের মনের জোর পরীক্ষা করছিলেন, তাই উত্তর শুনে প্রসন্ন হলেন। তাঁদের থাকতে বললেন তারাপীঠে। যথাসময়ে তাঁদের দুর্লভ

তারাবিদ্যায় দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করলেন। তারপর বললেন, "তিন রাত্রের বেশী কোথাও থাকিস নি। দেশে ফিরে যা।"

পরম আনন্দে তাঁরা শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার আদেশ শিরোধার্য্য করে ফিরে চললেন হুগলীর বাবুগঞ্জের তামাল পাড়ায় সত্যময়ীর পিতৃগৃহে। শ্রীবামের নির্দেশ মত তাঁরা সাধন ভজনের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করলেন।

দীক্ষা লাভের একমাসের মধ্যেই চৈত্রমাসে (বাংলা ১২৯২) শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা হুগলীর ৺গঙ্গা রাম মল্লিকের শ্মশানঘাটে উপস্থিত হ'ন। সংবাদ পেয়ে শিষ্য রাখালচন্দ্র সেন পরম আনন্দের সাথে গুরুদেব শ্রীবামকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। দু'দিন সেখানে থেকে শ্রীবাম এই শিষ্য দম্পতিকে তারাসাধন সম্পর্কে নিগূঢ় নির্দেশ দিয়ে তারাপীঠে ফিরে গেলেন।

১২৯৪ সালে বৈশাখ মাসে দ্বিতীয়বার এই সাধক সম্পতি তারাপীঠে শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করতে যান। শ্রীবাম তাঁদের পূর্ণাভিষিক্ত করালেন এবং পঞ্চমুণ্ডীতে প্রতিদিন তের হাজার জপ করতে আদেশ দিলেন। দু'রাত্রি মহাগুরু শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে পুনরায় হুগলীতে ফিরে এলেন।

তিনমাস বাদে গুরু বামাক্ষ্যাপা শ্রাবন মাসে (১২৯৪) হুগলীতে এলেন সেবক নন্দা হাড়িকে সঙ্গে নিয়ে। এই দ্বিতীয়বার এসে তিনি শিষ্য রাখালচন্দ্র সেনের বাড়ীতে নিজের হাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন। দু'দিন এই নিষ্ঠাবান শিষ্যদম্পতির সেবা যত্ন গ্রহণ করে এবং সাধনার পথ নির্দেশ করে তৃতীয়দিন তারাপীঠে ফিরে গেলেন।

ক্রমশঃ গভীর নিষ্ঠা ভক্তির সাথে গুরুর নির্দেশ মত তাঁরা সাধনার গভীরে নিমজ্জিত হলেন। এই দম্পতি জাগতিক জীবনে অতি অনাড়ম্বর ভাবে সুখে শান্তিতে দিন যাপন করতে লাগলেন। পুত্রকন্যা না থাকলেও এঁদের পুত্রকন্যা স্বরূপ কিছু দেশী কুকুর কুকুরী ও বেড়াল ও পায়রা রয়েছে। এদের সেবাযত্ন নিয়মিত করেন স্বামী স্ত্রী। বিশেষ করে ককুর কুকুরীদের না খাইয়ে এই সাধক দম্পতি অন্ন গ্রহণ করেন না। শিবস্বরূপ শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা তাঁদের এই আদেশই দিয়েছেন।

রাখাল চন্দ্র সেন সামান্য একটা কয়লার দোকান করেছেন গঙ্গার ওপারে নৈহাটি ষ্টেশনের কাছে। সেই সামান্য সৎ উপার্জন থেকেই

সংসারে চলে যায় কোনরকমে। একদিন রাতে রাখাল সেন ঘুমিয়ে আছেন নিজের ঘরে। ঘরের বাইরের আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে আছেন সত্যময়ী দেবী। হঠাৎ সত্যময়ীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন ঘরবাড়ী সব আলোয় আলোকিত। ডাকাত পড়েছে ভেবে তাড়াতাড়ি তিনি ঘরে এসে স্বামীকে ডেকে তুললেন। রাখাল সেন কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি স্ত্রীকে বললেন, "তুমি স্বপন দেখে ভয় পেয়েছ। শুয়ে পড়, ভয় নেই।"

সত্যময়ী আবার আঙ্গিনায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটু পরে আবার আলো দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সহসা বারান্দার দক্ষিণ দিক থেকে একটি ছোট্ট ঘরের দিকে তাঁর নজর গেল। দেখলেন তাঁদের সেই ছোট্ট ঘরটি অতি উজ্জ্বল অথচ অতি স্নিগ্ধ আলোয় পরিপূর্ণ।

অত্যন্ত অবাক হয়ে তিনি তা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ মাটী ভেদ করে ওপরে উঠে এল এক বিরাট ত্রিশূল ও তার সাথে একটি ছোট্ট পাথরের মূর্তি। পরম সৌভাগ্যবতী এই স্বর্গীয় রূপ দর্শন করে পরম আনন্দে সজল নয়নে সেই শিলামূর্তি তারাদেবীকে জড়িয়ে ধরলেন। সহসা তিনি দৈববাণী শুনলেন, "আমি কুল দেবী, তুই আমাকে পূজা করিস না কেন?"

সশ্রদ্ধচিত্তে ভক্তিমতী সত্যময়ী বললেন, "মা, যখন আমাদের পালাছিল, তখন তোমার সেবাযত্ন করতুম। কিন্তু মা তুমি নিজেই তো আমাদের সেবাযত্ন ত্যাগ করলে। তাই আমাদের বঞ্চিত করে শ্বশুড়ের ভিটা ত্যাগ করালে। সত্যি যদি তোমার কৃপা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেবা করবো।" তখন আবার দৈববাণী হ'ল, আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, আমি তোর কাছেই থাকবো। আর আমার এই শিলামূর্তি সূর্য উদয়ের পূর্বেই গঙ্গায় বিসর্জন দিবি।" ক্রমে ভোর হয়ে এল। জ্যোতির জগৎ মহাজ্যোতিতে মিলিয়ে গেল। সত্যময়ী স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে সব বললেন আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে।

ভক্ত ও সাধক রাখাল চন্দ্র সেন সব শুনে ত্রিশূল ও শিলামূর্তি দর্শন করে ভাবে বিহ্বল হয়ে প্রিয়তমা পত্নীও সাধিকা সত্যময়ীকে সানন্দে বললেন, "তুমি ভাগ্যবতী। ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার গুরু ভক্তি।"

তারপর গোপনে নতুন কাপড় দিয়ে তারামূর্তিকে আবৃত করে সকলের অজান্তে তাঁরা নৌকা করে গঙ্গায় গিয়ে বিসর্জ্জন দিলেন।

এই দিব্য অলৌকিক ঘটনার সাথে সাথে আরেক অলৌকিক ঘটনা ঘটালেন তারামা। হুগলীর ধরমপুর গ্রামের মন্মথ মিস্ত্রিকে মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "বাবুগঞ্জ তামালি পাড়া নিবাসিনী সত্যময়ীর কাছে আমার প্রতিমূর্তি গড়ে দিয়ে আসবি। নয়টাকা মূল্য নিবি। সত্যময়ীর ঘরে যে কোণকাটা বড় জানালা আছে, সেই কাঠে শিবের পাটাতন করবি, যেন অন্যথা না হয়।" এই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভক্ত মন্মথ মিস্ত্রি সত্যময়ী দেবীর কাছে এসে করজোড়ে সব কথা জানালো এবং মায়ের দক্ষিণাকালী মূর্তি তৈরী করতে লাগলো।

বাংলা ১২৯৯ সালে কার্তিক মাসে দক্ষিণাকালী মূর্তি সত্যময়ী দেবীর পিতৃগৃহে বাবুগঞ্জে বীরাচারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

সেই অলৌকিক ভাবে আসা ত্রিশূলটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল দক্ষিণা কালীর পবিত্র মূর্তির পাশে। এরপর এই সাধক দম্পতি পরম আনন্দে আরো গভীর ভাবে তারামায়ের সাধনায় নিমজ্জিত হলেন।

এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ বার বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ কাল পরম শান্তি ও আনন্দে জপ ধ্যানের মধ্য দিয়ে এই সাধক দম্পতি অতিবাহিত করলেন।

অবশেষে ১৩১১ সালের কার্তিক মাসের ত্রয়োদশী দিনটি সত্যময়ী দেবীর জাগতিক জীবনে বিরাট দুঃখ ও বেদনার দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। সেদিন রাতে আকস্মিক ভাবে সামান্য অসুস্থতার মধ্য দিয়ে 'তারা তারা' বলতে বলতে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিশিষ্ট গৃহী-শিষ্য রাখাল চন্দ্র সেন তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে বিলীন হলেন।

প্রিয়তম স্বামীর এই আকস্মিক প্রয়ানে দুঃখে শোকে জর্জরিত হলেন। গঙ্গাতীরে গঙ্গারাম মল্লিক শ্মশানে স্বামীর মুখাগ্নি করলেন সত্যময়ী দেবী। নিদারুণ শোকে বেদনায় ও সীমাহীন বিরহে চল্লিশ বছর বয়স্কা সদ্য বিধবা সত্যময়ী দেবী ভেঙ্গে পড়লেন। গঙ্গা জলে ফেলে দিলেন হাতের নোয়া ও সোনার বালা।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা সহসা তারাপীঠ থেকে অলৌকিকভাবে গঙ্গারাম মল্লিক শ্মশানে আবির্ভূত হলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। অদূরে পায়চারী করছিলেন ডাক্তার প্রসাদ দাস। এমন সময় শ্রীবাম তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "একবার সত্যময়ীকে ডেকে দাও তো।" ডাক্তার প্রসাদ দাস মহাবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন এই বিশাল ভীম

ভৈরব কান্তি নগ্ন বামাক্ষ্যাপাকে। এই মহাপুরুষ যে তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপা এবং রাখাল সেন ও সত্যময়ী দেবীর গুরুদেব তা তিনি জানতেন। তাড়াতাড়ি শ্রীবামকে প্রণাম করে দ্রুত তিনি সত্যময়ী দেবীকে নিয়ে এলেন। সদ্য বিধবা ও শোকাতুরা সত্যময়ী দেবী গুরুদেব বামাক্ষ্যাপাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। শ্রীগুরুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীবাম তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "মা, দুঃখ কোরনা, কোন ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে সর্বদা আছি। এইবার মায়ের কাছে আত্ম সমর্পণ কর মা। তাহলেই প্রকৃত শান্তি পাবে।"

তারপর গঙ্গা জলে শ্রীবাম হাত ডোবালেন। তিনদিন পূর্বে সত্যময়ী দেবী স্বামীর মুখাগ্নিকালে গঙ্গা গর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতের নোয়া ও সোনার বালা। শ্রীবাম অলৌকিক ভাবে সেই নোয়া ও সোনার বালা গঙ্গা জলে হাত ডুবিয়েই তুললেন এবং সদ্য বিধবা সত্যময়ীর হাতে দিয়ে বললেন "মা, ধারণ কর, তোমার স্বামী জগৎস্বামী।" সত্যময়ী দেবী ভয় পেয়ে বললেন, "কিন্তু বাবা, আমি যে বিধবা, লোকে নিন্দা করবে।"

"তা হোক"—বলে শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা স্বয়ং তাঁর হাতে নোয়া ও সোনার বালা পরিয়ে দিয়ে সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর মনে শান্তি ও শক্তি লাভ করে সাধিকা সত্যময়ী দেবী তারামায়ের চরণে নিজেকে সঁপে দিলেন। গভীর সাধনা ও নিত্য সেবা পূজার মধ্যে ডুবে গেলেন। রোজ একবার মাত্র তারামায়ের প্রসাদ গ্রহণ করতেন তাঁর পোষা কুকুর, কুকুরি ও বিড়ালের সাথে।

সুদীর্ঘ কাল সাধনায় নিমগ্ন থেকে এই মহান সাধিকা সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমে তাঁর অলৌকিক কৃপা ধারা বহু আর্ত ও ভক্ত নরনারীর ওপর নেমে আসে। তাঁর অধ্যাত্ম শক্তি ও বাক্‌সিদ্ধির কথা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু ভক্ত তাঁর কৃপালাভ করে পরম উপকৃত হ'ন।

সিদ্ধ সাধিকা হিসাবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁকে ঘিরে এক ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠলো। হুগলীতে তিনি 'দাসী-পিসি' নামে বিখ্যাত হলেন। অবশেষে বাংলা ১৩৬৬ সালের ২৬শে পৌষ বেলা ১১টার সময় এই সিদ্ধ সাধিকা ৯৫ বছর ৩ মাস ১২ দিনের দিন মহাসিদ্ধ মহাপবিত্র পরম অমৃত "তারা" নাম করতে করতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ

করে ইন্টদেবী তারামা ও ইন্ট স্বরূপ পরম গুরু বামাক্ষ্যাপার চরণে লীন হলেন। জগত জননী তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষাপার মহা করুনা ও অলৌকিক লীলার এক প্রাণবন্ত নিদর্শন হয়ে রইলেন ভক্ত ও সাধক প্রবর রামপ্রসাদের বংশধর রাখাল চন্দ্র সেন এবং মহান সিদ্ধ সাধিকা সত্যময়ী দেবী।

—o—

পাথর চাপুড়িতে শ্রীবাম

আনুমানিক বাংলা ১২৯৩ সালে একদা বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী রাজনগরের অদূরে পাথর চাপুড়িতে এলেন তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। এক নিগূঢ় কারণে তাঁর এখানে আসা। পাথর চাপুড়িতে অবস্থান করছেন এক মহান সিদ্ধ মহাপুরুষ দাতাসাহেব। বহুজন বন্দিত এই মহামানবের সাথে আলাপ পরিচয় সূক্ষ্মে আগেই ছিল। দাতাসাহেব শ্রীবামকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। দাতা সাহেবের দরগাটি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের আর্ত, রোগ-গ্রস্থ ও মুমুক্ষু নর নারীর জন্য সবসময় উন্মুক্ত।

দাতা সাহেবের চেহারা খুবই আকর্ষণীয়। দীর্ঘ লম্বা চওড়া চেহারা। রং ফর্সা। আজানুলম্বিত বাহু, মখমণ্ডল শ্মশ্রু মণ্ডিত। হলুদ বর্ণের দীর্ঘ অঙ্গবস্ত্রে সর্বাঙ্গ ঢাকা। তাঁর ডান হাতে বিরাট জপের মালা ও বাম হাতে কখনো চিমটে কখনো লাঠি এবং পায়ে সুদৃশ্য খড়ম শোভা বর্ধন করছে। ইতিমধ্যে বক্রেশ্বর থেকে এলেন আরেক মহাপুরুষ খাকি বাবা। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পূর্বে তিনি তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ করবার পর বক্রেশ্বরে এসে স্থায়ী ভাবে আসন পেতেছেন। বক্রেশ্বরে দীর্ঘকাল

ধরে রয়েছেন। তাঁর জীবন কাহিনীও বিশাল বৈচিত্র্যময় (দ্রষ্টব্য 'মহাপীঠ তারাপীঠ'—প্রথম খণ্ড)।

বিশ্রামান্তে অদূরবর্তী ব্রহ্মদৈত্যতলায় দাতাসাহেব, বামাক্ষ্যাপা ও খাকিবাবাকে নিয়ে এলেন। গভীর রাতে নিবিড় আঁধারে অতীব নিগূঢ় ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন তিনজন।

অধ্যাত্ম জগতের এই ঐশী নির্দিষ্ট যোগযুক্ত তন্ত্রক্রিয়া, সাধনার আরো উচ্চ গভীর স্তরের ভাব ও শক্তি বিনিময়ের ব্যাপার। তাই সর্ব সাধারণের সামনে প্রকাশ্য নয়। তবে এর সার্বিক কল্যাণকর সুফল সর্বস্তরের মানব কল্যাণের জন্যই ব্যয় করেন উপরোক্ত তিন মহাপুরুষ। তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন নেই। তাঁরা পর্ণ ও আপন স্বরূপ প্রাপ্ত মহান মুক্তপুরুষ।

মাঝে মাঝে এই ধরনের নিগূঢ় ক্রিয়ানুষ্ঠান তথা চক্রানুষ্ঠান বক্রেশ্বরেও বসে। তাতে বামাক্ষ্যাপা বাবা, দাতা সাহেব, খাকিবাবা এবং বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবাও মিলিত হয়েছেন। তাছাড়া দু'একজন উচ্চকোটির মহাত্মাও কখনো কখনো বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে এঁদের সাথে মিলিত হতেন।

তারাপীঠ মহাশ্মশানেও যে এই মহা সম্মেলন হয়নি তা বলা যায় না। কারণ দাতাসাহেবের ক্ষেত্রে, খাকি বাবার ক্ষেত্রে যেমন এই নিগূঢ় চক্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি বামাক্ষ্যাপার ক্ষেত্র তারাপীঠের মহাশ্মশানেও এই নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই হ'বার কথা। বিশেষ করে তারাপীঠের সর্বসিদ্ধিপ্রদ সুপ্রাচীন মহাশ্মশান ভারতবিখ্যাত। ব্রহ্মদত্যিতলা ও বক্রেশ্বরের শ্মশান থেকে সর্বাংশে বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এবং দ্রুত সিদ্ধিপ্রদ তারারীঠের মহাশ্মশান। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাতন্ত্রপীঠ হ'ল তারারীঠ এবং এই তারাপীঠের মহাজাগ্রত মহাশ্মশানে ভারতের সর্বস্তরের ও সর্বপথের এবং সর্বমতের সাধকগণ যুগ যুগ ধরে এসে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

তন্ত্রমতে সত্যযুগ থেকে এখন পর্যন্ত লক্ষাধিক সাধক ও ভক্ত এই মহাশ্মশানে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং কলিযুগ শেষ হ'বার পূর্বে আরো একলক্ষ সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করবেন। সুতরাং এখানে বামাক্ষ্যাপা বাবার সাথে, খাকিবাবা (যিনি পূর্বে এখানেই সিদ্ধিলাভ করে গেছেন) দাতা সাহেব ও অঘোরী বাবার অধ্যাত্ম সম্মেলন ও নিগূঢ় ক্রিয়ানুষ্ঠান

হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিম্বদন্তী এই যে, তা ঘটেছে এই মহাশ্মশানে এবং একাধিকবার।

যাহোক, পাথর চাপুড়ি থেকে ব্রহ্মদৈত্য তলায় গিয়ে নির্দিষ্ট নিগূঢ় ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা পাথর চাপুড়িতে দাতা সাহেবের সাধন কুটীরে ফিরে এলেন। তারপর তারাপীঠে ফিরে যান। দাতাসাহেবের এই জাতিভেদের ঊর্দ্ধে সর্বদা বিরাজ করবার মহান শক্তির জন্য শ্রীবাম তাঁকে খুবই ভালবাসেন। শ্রীবামও হিন্দু মুসলমানের এই পরস্পর জাতিভেদের ঊর্দ্ধে সর্বদা বিরাজ করেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ তাঁর অফুরন্ত কৃপা সর্বদাই লাভ করেছে। তাঁর অন্যতম শিষ্য শাওন ফকির তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন।

দাতাসাহেবের জীবন কাহিনী খুবই বৈচিত্রময়। দাতা সাহেবের জন্ম হয়েছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলে। তাঁর নাম ছিল দাতারাম মুখোপাধ্যায়। যৌবনকাল পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসাবে আপন সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, এই পথে সাধনা করে আপ্তকাম হ'ন।

উত্তর কালে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় পথেই সাধনা সম্পন্ন করেন। তাঁর অলৌকিক সাধনশক্তি ও কৃপা হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমান ভাবে লাভ করেন। তার কিছু নিদর্শন মাধাইপুর গ্রামের কবি ও লেখক বলরাম রায় তাঁর রচিত "দাতা কাহিনী"তে দিয়েছেন। 'দাতা কাহিনী' তিনি পদ্যে পয়ার ছন্দে রচনা করেছেন। দাতাসাহেবের অজস্র অলৌকিক কাহিনী পাওয়া যায়। একবার এক অম্লশূলের রোগী দেওঘরে গিয়ে বৈদ্যনাথের মন্দিরে ধর্ণা দেন। বৈদ্যনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুই দাতার কাছে যা, সেই তোর রোগ ভাল করে দেবে।"

রোগী, দাতার কাছে এসে সব বলে। দাতা সাহেবের কৃপায় ভাল হয়ে যান। জনশ্রুতি এই যে একবার একটি উগ্র বিষধর সাপ দাতাসাহেবকে দংশন করতে আসে। সাহেবের দৃষ্টিতে সে কাঠ হয়ে যায়। সেই পুরোনো কাঠের সাপটি আজো দাতাসাহেবের মাজার শরীফে দাতাসাহেবের স্মৃতি চিহ্নের সাথে আছে।

দাতাসাহেবের দরগায় বহু নরনারী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিদিন আসেন এবং মানত করে যান। মানত পূরণের পর চৈত্রমাসে

এখানে বিখ্যাত চৈত্র মেলাতে এসে দাতাসাহেবের দরগায় দাতাবাবাকে চাদর দিয়ে যান।

শোনা যায় যে, তিনি নাকি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম বিশিষ্ট সৈনিক ছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য নিজেকে তিনি নিয়োগ করেন। দাতাবাবার দরগা থেকে বহু রকমের ওষুধ দেয়া হয় আগত রোগীদের।

তার মধ্যে দাতাসাহেবকে প্রতি সন্ধ্যায় কল্কেতে যে তামাক দেয়া হয় টিকেতে করে, সেই টিকের আগুনে তামাক পুড়ে ছাই হয়ে যায়, দাতাবাবার প্রসাদ স্বরূপ এই ছাই নানান অসুখের মহা ওষুধ রূপে বিখ্যাত। বাংলা ১২৯৮ সালে দাতাবাবার তিরোধান ঘটে। উপরোক্ত কাহিনী ও ছবির জন্য লেখক শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী (বক্রেশ্বর) ও শ্রী অসি সেন-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

— o —

শ্রীবামের ডাবুকলীলা

লীলাময় শ্রীবাম আনুমানিক ১২৯৩ সালের হেমন্তকালের একদিন লীলাচ্ছলে ডাবুকে গেলেন তারাপীঠ থেকে। তখন ডাবুকেশ্বর মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। একদিকে সাধুসন্ত অন্য দিকে দরিদ্রনারায়ণ বসেছে। ডাবুকের কৈলাসপতি তখন ডাবুকে ছিলেন না। কর্ম উপলক্ষে কোন শিষ্য বাড়ী গেছেন। উপস্থিত অনেকেই প্রসাদের ব্যাপারে ব্যস্ত। তাই তারাপীঠের মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিকে কেউ নজর দিলেন না। অনেকে চিনতেও পারেননি। জনৈক

পরিবেশনকারী শ্রীবামকে একজন সাধারণ প্রসাদ প্রত্যাশী ভেবে দরিদ্র নারায়ণদের পংক্তিতে বসিয়ে দিলেন।

শ্রীবাম বিনা দ্বিধায় সেখানেই বসে গেলেন। শ্রীবাম প্রসাদ গ্রহণ করছেন চুপচাপ। ক্রমশ তাঁর ভোজনের পরিমাণ দেখে উপস্থিত অনেকের নজর তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'ল। ডাবুকের কৈলাসপতি নিয়ম করেছিলেন যে প্রতিদিন ডাবুকেশ্বর শিবের অন্ন প্রসাদ সমাগত সাধুসন্ত ও ভক্ত এবং দরিদ্রনারায়ণদের পেটভরে খাওয়ানো হবে। কেউ অভক্ত বা অর্ধভুক্ত হয়ে ফিরে যেতে পারবেন না। তাই পরিবেশন কারীগণ প্রত্যেককেই প্রসাদের প্রতিটি পদ দেবার সময় জিজ্ঞেস করেন, "আরো দেব ?" তা সাধুই হোন আর ভিখিরিই হোন।

সেই নিয়মানুসারে শ্রীবামকেও যথারীতি জিজ্ঞেস করছেন পরিবেশন কারীগণ। শ্রীবামও যথারীতি বলে যাচ্ছেন "হ্যাঁ, দিন বাবা।" প্রসাদের প্রতিটি পদই বিপুল পরিমানে শ্রীবাম নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলেছেন। সবশেষে মিষ্টি এল, বোঁদে। শ্রীবাম বোঁদে খেয়েই চললেন। পরিবেশনকারী বোঁদে দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। উপরোক্ত সকল পদ বিশাল পরিমানে খাবার পরও শ্রীবাম প্রায় আধমন বোঁদে খেলেন। তারপর "খুব ভাল খেলাম বাবা" বলতে বলতে উঠে পড়লেন। ইতিমধ্যে শ্রীবামের এই অস্বাভাবিক খাওয়া সর্বত্র রটে গেছে। উপস্থিত সাধু সন্তের নজরও পড়েছে তাঁর দিকে।

তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিনতে পারলেন তাঁকে। "ইনি যে তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা", বলে অনেকেই এগিয়ে এলেন শ্রীবামকে প্রণাম করবার জন্য। চারদিকে রটে গেল তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক ভোজনের কথা।

ইতিমধ্যে ডাবুকেশ্বর মন্দিরের সেবায়েত ও কর্তৃপক্ষেরও চৈতন্য হ'ল। তাঁরা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে যথাযথ মর্য্যাদা না দেবার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ছুটে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে ও ক্ষমা চাইতে। গুরু কৈলাসপতি এসে এই ঘটনা জানতে পারলে তাঁদের কঠোর তিরস্কার করবেন, এই ভয়ও তাঁদের অন্তরে রয়েছে। কিন্তু শ্রীবাম করুণাবতার। এদের অজ্ঞতা ক্ষমা করে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রসন্ন মনে।

পরবর্তী কালে ডাবুকে এসে আরেকটি অলৌকিক ঘটনা শ্রীবাম এই ভোজন ক্ষেত্রে ঘটিয়ে ছিলেন। তাঁর মুখে নিরামিষ খাদ্য আমিষ হয়ে

যেতে থাকে এবং পরে সর্বজন সমক্ষে আবার তা আমিষ থেকে নিরামিষ হয়ে যায়। প্রসাদ প্রসাদই—তা আমিষ আর নিরামিষ যাই হোক। নিরামিষ ভাব সর্বস্ব গোড়া বৈষ্ণবদের এই শিক্ষাদেবার জন্যই শ্রীবাম এই লীলা ঘটিয়েছিলেন। বৈষ্ণবগণ শাক্তদের আমিষ প্রসাদ গ্রহণ করেন না। প্রসাদের প্রতি তাঁদের এই তীব্র ভেদ জ্ঞান দূর করবার জন্যই শ্রীবাম উপরোক্ত অলৌকিক লীলা ঘটান। যথাস্থানে সেই সেই আশ্চর্য লীলা কাহিনী বর্ণিত হবে।

—o—

শ্রীবামের বক্রেশ্বরে গমন ও চক্রানুষ্ঠান

মহাপীঠ তারাপীঠের শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা আরেক মহাপীঠ ও মহাতীর্থ পুণ্যভূমি বক্রেশ্বরে এলেন। শ্রীবামের সাথে কয়েকজন সেবক ও ভক্ত এলেন। আনুমানিক ১২৯৪ সালের প্রথম দিকে শ্রীবাম এলেন। শ্রীবাম বক্রেশ্বরের মন্দিরে এসে প্রণাম করলেন। যথারীতি স্তবার্চনা করে পার্শ্বে অবস্থিত দেবীমহিষমর্দিনীকেও প্রণাম করলেন।

সতীদেবীর ভ্রূমধ্য স্থান (মনঃ) এখানে পতিত হয়েছে। দেবী মহিষমর্দিনী দুর্গা। ভৈরব স্বয়ং বক্রনাথ। সুপ্রাচীন এই তীর্থভূমি বক্রেশ্বরের ঐতিহ্য বহুযুগের। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একাদশ অধ্যায়ে বক্রেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই প্রাচীন মহাতীর্থকে মহর্ষি ব্যাসদেব 'গুপ্তকাশী' রূপে মহামর্য্যাদা দিয়েছন। এই বহু প্রাচীন তীর্থ ক্ষেত্রের নাম 'বক্রেশ্বর' কেন হয়েছে, তাঁর কারণ বিভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই সম্পর্কে দুটি কাহিনী পাওয়া যায়।

প্রথম কাহিনীটি হ'ল, সত্যযুগে কাহোড় নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন। তাঁর পুত্র সুব্রত ছিলেন পিতার ন্যায় মহাতাপস। কিন্তু ঋষি সুব্রত অত্যন্ত ক্রোধ পরায়ণ ছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় মহাতাপস সুব্রত ও লোমশ মুনি উপস্থিত হলেন। লোমশ মুনিকে দেবরাজ ইন্দ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সসম্মানে বরণ করেন কিন্তু ঋষি সুব্রতকে দেবরাজ ইন্দ্র এসব কিছুই করলেন না।

তার ফলে সভার মধ্যে অপমানে লজ্জায় ও প্রচণ্ড ক্রোধে ঋষি সুব্রত কাঁপতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তপস্যালব্ধ সাধন শক্তির অপচয়ের সম্ভাবনায় তা থেকে তিনি বিরত হলেন। কিন্তু প্রচণ্ড মহাক্রোধের অগ্নিতেজে তাঁর ঋষি তনুর অষ্টস্থান পুড়ে বক্র হয়ে গেল। সেই থেকে ঋষি সুব্রতর নাম হ'ল ঋষি অষ্টাবক্র। দেহের এই অষ্টবক্র থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিবের উপাসক অষ্টাবক্র, শিবের তপস্যা করতে লাগলেন এই বক্রেশ্বরে এসে।

তাঁর উগ্র থেকে উগ্রতর তপস্যা চলতে লাগলো সুদীর্ঘ কাল ধরে। তাঁর কঠোরতম তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব পাতাল থেকে অনাদি লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হলেন এবং ঋষি অষ্টাবক্রকে নিরোগ করে বর প্রদান করলেন।

ঋষি অষ্টাবক্রের ঈশ্বর রূপে শিব বক্রেশ্বর নামে এই স্থানে প্রসিদ্ধ হলেন। শিবের এই নাম অনুসারে এই স্থানের নামও হল বক্রেশ্বর। ভক্তের ভগবান শিব তাঁর প্রিয় অষ্টাবক্রকে এই বর দিলেন যে আগে অষ্টাবক্রের পূজো হবে তার পর তাঁর পূজো হবে। পরম করুণাময় শিব ভক্তকে বড় করে নিজে ছোট হয়ে এখানে বিরাজমান হলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি হ'ল, কাহোড় মুনির পুত্র সুব্রত তার জননী গার্গীর গর্ভে থাকাকালীন একদা পিতা কাহোড়ের বেদপাঠ শুনে ভুল ধরে দেন। গর্ভস্থ শিশুর এই দুঃসাহস দেখে ক্রোধে পিতা কাহোড় মুনি পুত্রকে এই বলে অভিশাপ দিলেন, "তুমি আমাকে হেয় জ্ঞান করে আমার বেদপাঠে ভুল ধরলে। তাই তোমাকে এই অভিশাপ দিলাম যে ভূমিষ্ঠ হ'বার সময় তোমার শরীর অষ্ট স্থানে বক্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এবং তোমার নাম হবে অষ্টাবক্র।"

তাই হ'ল। বড় হয়ে অষ্টাবক্র এই বক্রেশ্বরে এসে কঠোরতম

তপস্যা করে শিবের বরে পিতৃ অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিরোগ হলেন। পরবর্তী কাহিনী প্রথম কাহিনীর ন্যায়। এই মহাতীর্থ বক্রেশ্বর ধামের মাহাত্ম্য অপার। সতীপীঠ ও মহান সিদ্ধপীঠ রূপে যুগ যুগ ধরে এই শৈবপীঠ সুচিহ্নিত। শত সহস্র সাধক সাধিকার তপস্যাপূত সিদ্ধক্ষেত্র এই পুণ্য ভুমি।

'গুপ্ত কাশী' রূপে চিহ্নিত এই মহাতীর্থ বক্রেশ্বর ভারত বিখ্যাত। কথিত আছে এই শিব ক্ষেত্রে উনকোটি শিব বিরাজমান।

কাশী বিশ্বনাথের ন্যায় বক্রেশ্বরের বক্রনাথও সদাজাগ্রত। তেমনি জাগ্রত দেওঘরের অনাদি লিঙ্গ বৈদ্যনাথ ও তারকেশ্বরের তারকনাথ। ভারতের বিখ্যাত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বক্রেশ্বর না পড়লেও এই পুন্যতীর্থের মাহাত্ম্য অপরিসীম।

ভারতে যে কয়টি ক্ষেত্রে পরম পবিত্র অক্ষয়বট বিরাজ করছে সত্য যুগ থেকে, তার মধ্যে বক্রেশ্বর অন্যতম।

পুরুষোত্তমের (পুরীর) অক্ষয়বট, ও গয়ার অক্ষয়বট, এবং প্রয়াগের অক্ষয় বটের ন্যায় বক্রেশ্বরের অক্ষয় বটও ভারত বিখ্যাত। মহাবৈষ্ণব নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই মহাতীর্থ বক্রেশ্বরে আসেন ১৪০৭ শকাব্দে। এই প্রসঙ্গে চৈতন্য ভাগবতে 'তীর্থ যাত্রা' অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে, "প্রথমে চলিলা নিতাই তীর্থ বক্রেশ্বর...।" বক্রেশ্বরের এই পরম পবিত্র অক্ষয় বট বৃক্ষের মূলে তিনি কিছুদিন মহানন্দে সাধনভজনে মগ্ন হ'ন। সেই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁর চরণ চিহ্ন সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ মূলে আজো বিরাজ করছে।

তাই মহাতীর্থ বক্রেশ্বর একাধারে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মহামিলন ক্ষেত্র। এখানে বহু বিশিষ্ট সাধকের সমাধি রয়েছে। বক্রেশ্বরের মন্দিরের উত্তরে শ্বেতগঙ্গা উষ্ণ কুণ্ড এবং তার উত্তরে অক্ষয় বট ও প্রাচীন শমী ও নিম বৃক্ষ ও বহু সমাধি রয়েছে। দক্ষিণে মহাশ্মশান ও সাতটি কুণ্ড রয়েছে। পূর্বে পবিত্র গঙ্গা সদৃশা পাপহরা নদী, প্রাচীন শ্মশান অবস্থিত। পশ্চিমে বহু শিবমন্দির রয়েছে বক্রেশ্বর মন্দিরের চারধারে দু'শো শিবমন্দির বিরাজমান। তাছাড়া পঞ্চলিঙ্গের মন্দির, পঞ্চমুণ্ডির আসন অবস্থিত রয়েছে। অক্ষয় বট-বৃক্ষ মূলে কালাপাহাড় কর্তৃক ভগ্ন হরগৌরীর প্রস্তর মর্তি আজো অতীতের সাক্ষীরূপে বিরাজমান।

বক্রেশ্বরে আটটি উষ্ণকুণ্ডের প্রস্রবন বিরাজমান। তার মধ্যে ব্রহ্ম-কুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা কুণ্ড, জীবিত কুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

অগ্নিকুণ্ডের অদূরে দক্ষিণে তপ্ত ও পবিত্র অন্তঃসলিলা পণ্যতোয়া বৈতরণী প্রবাহিতা। উপরোক্ত প্রতিটি কুণ্ডের সাথে পৌরাণিক কাহিনী ও বার তিথি অনুসারে স্নান পূজার পুণ্য ফল বর্ণিত রয়েছে। যাহোক শ্রীবাম সায়াহ্নে বক্রেশ্বরের শ্মশানে চক্রানুষ্ঠানে যোগদান করলেন।

শ্রীবামের সাথে রয়েছেন বক্রেশ্বরের অন্যতম বিশিষ্ট মহাপুরুষ খাকিবাবা (তিনি তারাপীঠে সিদ্ধি লাভের পর বক্রেশ্বরে এসে অবস্থান করেন—প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য), মহাসাধক অঘোরী বাবা ও দাতা সাহেব প্রভৃতি। অঘোরী বাবার জন্ম উড়িষ্যায়। উৎকলের এই মহাপ্রাজ্ঞ মহাসাধক একাধারে যোগ ও তন্ত্রে সিদ্ধ। বক্রেশ্বরের মহা শ্মশানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে লীলা করেন। তারাপীঠেও তিনি একাধিকবার গিয়েছেন। (যথাস্থানে সে কাহিনী বর্ণিত হবে)। তাঁর অন্যতম প্রিয় লীলাক্ষেত্র বক্রেশ্বরের অদূরে দূবরাজপুরের আনন্দ কানন। দাতাসাহেবের কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে নিবিড় আঁধারের মধ্য দিয়ে চক্রানুষ্ঠানের নিগূঢ় ক্রিয়াকলাপ এক সময় সুসম্পন্ন হ'ল। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, খাকিবাবা, অঘোরী বাবা, দাতাসাহের প্রভৃতি মহাপুরুষদের মহাসম্মেলনের ফলে সেই সম্মেলনের পবিত্র ক্ষেত্র আরো পবিত্রতর হ'ল এবং সাধারণ জনজীবনেও নেমে এল দিব্য, পবিত্র আধ্যাত্মিকভাব ও কল্যাণ। দু'একদিন বক্রেশ্বরে মহানন্দে অতিবাহিত করে শ্রীবাম সেবক ভক্তসহ তারাপীঠে ফিরে এলেন। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বক্রেশ্বরের বিশিষ্ট পাণ্ডা ও সাধক শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম চরণে রসিক গোঁসাই

বাংলা ১২৯৪ সালের শরৎকালের একগভীর রজনী। তারাপীঠের অদূরে খরুণ গ্রামের তরুণ ডাক্তার রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সারা-দিনের কাজ শেষ করে সবেমাত্র বিশ্রাম করছেন, এই সময় সহসা ক্রোশ খানেক দূরে অবস্থিত তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে ভেসে এল এক অপার্থিব গুরুগম্ভীর স্বর "জয়তারা জয়তারা"।

এই গভীর রাতে ঐ ভয়াবহ তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে যাঁর গভীর গম্ভীর কম্বুনিনাদ কন্ঠে প্রতিদিন উচ্চরিত হয় সেই চিরপবিত্র চির মধুর তারা নাম, তাঁর নাম সকলেই জানেন। তিনি তারাপীঠের প্রাণপুরুষ ও জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। গভীর রাতে যাঁরা প্রতিদিন দূর থেকে শোনেন এই মেঘমন্দ্রিত মহানাদধ্বনি, তাঁরা কেউ ভয়ে চমকে ওঠেন, কেউ বা স্তব্ধ হয়ে যান, কেউ বা গভীর শ্রদ্ধার সাথে বলেন, "ঐ যে বামাক্ষাপা ডাকছেন"।

আবার কেউ এই মহা নাদধ্বনির মহাতরঙ্গ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করে আনন্দে আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

আগামী দিনের চিহ্নিত সাধক ডাক্তার রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এই শেষোক্তদের অন্যতম। ধর্মপ্রাণ রসিকচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই অধ্যাত্ম পথের ওপর আকর্ষণ অনুভব করেন। তবু সংসার জীবনে কর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখেন।

যৌবনে নিজ চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা ডাক্তার হলেন। যদিও ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেননি কিন্তু তাঁর হাতযশের জন্য এবং রোগীকে দেখা মাত্র রোগ নির্ণয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা ও রোগ উপশমের অব্যর্থ ওষুধ প্রদানের জন্য তাঁর নাম ও খ্যাতি চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তাছাড়া ডাক্তারী শাস্ত্রের ওপর প্রচুর পড়াশুনাও তিনি নিয়মিত করতেন গভীর রাত পর্যন্ত। তাঁর ফলে তাঁর হাতে প্রায় সকল রকমের রোগীদের আরোগ্য লাভ সর্বক্ষেত্রে ঘটতে থাকে। এ সবের ফলে তাঁর নাম যশের সাথে অর্থের প্রাচুর্যও বাড়তে থাকে। সমাজে

সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। যথাসময়ে তাঁর বিবাহ হ'ল। কয়েক বছর পর একে একে চার পুত্রের জনক হলেন তিনি। নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র প্রভৃতি তাদের নাম। সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হল ডাক্তার রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার।

তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পরিচয় ইতিপূর্বে ডাক্তার রসিকচন্দ্র পেয়েছেন। একাধিকবার তিনি তারাপীঠে এসে শ্রীবামকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছেন।

অবশেষে স্মরণীয় ১২৯৪ সালের শরৎকালের সেই শুক্লা গভীর রজনীতে তিনি যখন সকল নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে সবেমাত্র বিশ্রাম করছেন, সেই সময় নাদসিদ্ধ শ্রীবামের 'জয়তারা জয়তারা' নাম ধ্বনি তাঁর কানে ভেসে এল তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে।

এই 'তারা' নামের মহানাদধ্বনি সুপ্ত সাধক রসিকচন্দ্রের কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তাঁকে জাগিয়ে দিল। আত্ম-বিস্মৃত রসিকচন্দ্র যেন আত্মসচেতন হলেন। সংসারের সোনার মায়াজাল দ্বারা তিনি যে চারদিক থেকে আবদ্ধ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন।

ব্রহ্মময়ী তথা শূন্যময়ী তথা পূর্ণময়ী তারামায়ের সর্বপাশমুক্ত সর্ব-মোহমুক্ত মহামুক্তি ক্ষেত্র হ'ল তারাপীঠ মহাশ্মশান। তাই মহাভাবময়ী তারামায়ের মহান লীলাক্ষেত্র তারাপীঠ মহাশ্মশানে অবিরাম অনুরণিত হচ্ছে অনাহতের নিত্য ধ্বনি ও নিত্য আহবান—এই শাশ্বত আহবানের নিত্য বংশীধ্বনি যে ভাগ্যবান শুনতে পান তাঁর মোহমুক্তি এ জীবনেই ঘটবে এবং তাঁর সাধনা সিদ্ধি ও মহামুক্তি একমাত্র তারাপীঠ মহা-শ্মশানেই ঘটবে।

ভক্তের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে এই ঐশী নির্দিষ্ট মহাকৃপা ঘটে। জগত জননী তারামায়ের এই মহাকৃপা লাভ করলেন ভক্তপ্রবর রসিকচন্দ্র। পরদিন ভোর না হতেই ছুটে এলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে মহামুক্তির দিশারী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে। পরম করুণাময় শ্রীবাম তাঁকে করলেন কৃপা। দেখালেন মোহ মুক্তির পথ।

তিনি নিয়মিত যেতে লাগলেন তারাপীঠে শ্রীবামের কাছে। তীব্র আত্মজ্ঞানের খড়্গ দিয়ে সংস্কারের মায়াজাল ছিন্ন করতে সচেষ্ট হলেন।

যতই শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করতে লাগলেন ততই তাঁর বৈরাগ্য তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের সকল অনুরোধ মান অভিমান অভিযোগ তাঁকে তাঁর কঠোর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারলো না। ক্রমে তিনি ডাক্তারী করাও ছেড়ে দিলেন। তবে জমিজমা যা ছিল তাতে স্ত্রী পুত্রদের অন্নের অভাব রইলো না।

ক্রমে তিনি খরুনের সংসার ছেড়ে তারাপীঠে এসে শ্রীবামের কাছে থাকতে লাগলেন এবং শ্রীবামের সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীবামও তাঁকে কাছে টেনে নিলেন এবং এই ত্যাগী ও বীরভাবাপন্ন সন্তানকে বীরাচারে দীক্ষা দিলেন। আদর করে শ্রীবাম তাঁর নাম দিলেন 'বীরপুত্র'।

পরে যথাসময়ে এই বীরাচারী শিষ্যকে শ্রীগুরু বাম পূর্ণাভিসিক্ত করলেন। এদিকে রসিকচন্দ্রের আত্মীয়গণ তাঁকে ত্যাগ করলেন। রসিক তা গ্রাহ্য করলেন না। তারাপীঠে শ্রীগুরু বামের সাথে মহানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। সাধন পথেও শ্রীগুরুর কৃপায় এই বীর সাধক দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

তিনি অনেকবার শ্রীগুরুবামের সাথে 'চক্র'তে বসেছেন। বহিরঙ্গে শ্রীবামের দ্বৈত (মা ও ছেলে) ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অন্তরঙ্গে অদ্বৈত ভাবও দর্শন করেছেন এবং 'তারামা-ই আমার আশ্চর্য ভৈরবী' এই গভীরতম অদ্বৈত ও ব্রহ্মভাব মণ্ডিত শ্রীবামের উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্যও তিনি উপলব্ধি করেছেন।

ভক্ত ও সাধক রসিকচন্দ্র তারাবিদ্যার পূর্ণ অধিকারী শিবাবতার শ্রীগুরুবামকে কখনো 'তারা' রূপে কখনো মহারুদ্র ত্রিশূলধারী শিবরূপে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন।

তিনি দীর্ঘকাল গভীর ভাবে শ্রীগুরুবামের দিব্যসঙ্গ করেছেন, যা শ্রীবামের অপর কোন শিষ্যের ভাগ্যে ঘটেনি। একদিন শ্রীবাম তাঁকে নিজের স্বর্গারোহিনী বিদ্যার পরিচয়ও ইঙ্গিতে দেন।

বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীবামের জন্য জীবিত কুণ্ডের পশ্চিমে সর্ব প্রথম যে মাটির ঘর শ্রীবামের বাল্য সাথী ও ভক্ত নিতাই মণ্ডল তৈরী করেন, তাতে রসিকচন্দ্র ওথা 'রসিক গোঁসাই'ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। মজুরদের সাথে রসিক গোঁসাইও দেয়াল তৈরীর কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীগুরুবামের শ্রীমুখ থেকে অনেক গান তিনি শোনেন। নিজেও কখনো কখনো তাঁর সাথে গান করেছেন। শ্রীবামের অনেক প্রিয় গীত তাঁর কন্ঠস্থ।

রামপুরহাটের খ্যাতনামা উকিল অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের চেয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বেশী আকর্ষণ অনুভব করলে 'রসিক গোঁসাই' তাঁকে হিন্দুধর্মের মহান উদারতা ও গভীরতা এবং তার অন্তর্নিহিত দর্শন ব্যাখ্যা করে শোনান। তাছাড়া গুরুদেব শ্রীবামকে অনন্তবাবুর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। শ্রীবাম অনন্তবাবুকে এই বিষয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করালে অনন্তবাবুর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি প্রবণতা কমে যায়। হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ন।

রসিক গোঁসাই, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রামপুরহাটের আরো অনেককে ধর্মপথে নিয়ে আসেন। শ্রীবাম কৃপাধন্য বীরসাধক রসিক গোঁসাইয়ের মনের বাসনা হয় শ্রীগুরু বামের মহান জীবনী লেখবার কিন্তু তা তিনি বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি।

শ্রীবামের অনেক অলৌকিক লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

বাংলা ১৩১৮ সালের ৩রা শ্রাবণ বিকেল বেলা তিনি শ্রীগুরু বামের সমাধি দেবার সময় উপস্থিত থাকেন এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীগুরু বামের দেহত্যাগের পরও কয়েক বছর তিনি জীবিত ছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ষাট বছরের অধিক ছিল। কিন্তু এই বীরাচারী সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব রূপ দর্শন করে সবাই মুগ্ধ হতেন।

তাঁর উন্নত দীর্ঘদেহ, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য ও ভাবগম্ভীর প্রশান্তরূপ এবং তাঁর সাথে গৈরিক বেশ ও রুদ্রাক্ষের মালা তাঁর দেহে অপূর্ব শোভা বিস্তার করতো। সব মিলিয়ে এক দিব্য বীররূপ। রসিক গোঁসাই শ্রীগুরুবামের স্মৃতি সংরক্ষণী সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির নির্মাণে ও তাঁর আন্তরিক অবদান ছিল।

শ্রীবামের দেহত্যাগের পর শ্রীবামের তিরোভাব উৎসবে তিনি আমৃত্যু প্রতিবছর যোগদান করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর অধিকাংশ সময় রামপুরহাটের প্রখ্যাত উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তিনি বাস করেন। আনুমানিক

১৩২২ সালে নিজ জন্মভূমি খরুণে দেহরক্ষা করেন। শ্রগুরু বামের সমাধির পাশে তাঁর সমাধি দেয়া হয়। আজো সেই সমাধি অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে বিরাজমান।

—o—

শ্রীবাম কৃপামণ্ডিত মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা

বাংলা ১২৯৪ সনের কার্তিক মাসের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তিনদিন পূর্বে যুবক প্রমথেশ তথা ব্রহ্মচারী তারানাথ শ্রীবাম দর্শনে মহাপীঠ তারাপীঠে এলেন মহাতীর্থ অমরনাথ থেকে। ব্রহ্মচারী তারানাথের তারাপীঠে আসবার ব্যাপারটি যথার্থ অলৌকিক ব্যাপার।

বাংলা ১২৯৪ সনে আদিষ্ট হয়ে তিনি শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শন করতে যান। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অন্তর্গত এই দুর্গম তুষার তীর্থ অমরনাথ ঈশ্বরের এক অপূর্ব আশ্চর্য সৃষ্টি। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও, চন্দন বাড়ী, শেষনাগ ও পঞ্চতরণী হয়ে অমরনাথ যেতে হয়।

পহেলগাঁও থেকে পাঁচদিন পায়ে হেটে এই দুর্গম তুষার তীর্থে পৌঁছতে হয় তুষারের মধ্য দিয়েই। যদি মাঝপথে তুষারের ঝড় শুরু হয় তবে উন্মুক্ত আকাশতলেই তুষার বক্ষেই শেষ শয্যা পাততে হবে।

চিয়তুষারাবৃত প্রায় সাড়ে চৌদ্দহাজার ফুট ওপরে এক তুষার শুভ্র পর্বতের গুহার ছাদ থেকে তুষার বিন্দু দ্বারা আপনা থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে অতি বিস্ময়কর ভাবে গঠিত হয় তিনটি শিবলিঙ্গের মত তুষার মূর্তি।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে পর্ণিমার মধ্যে এই তিনটি তুষার মূর্তি

গঠিত হয়। সর্বোচ্চ মূর্তিটি অমরনাথ নামে সুপরিচিত। তাঁর বাম দিকের দ্বিতীয় মূর্তিটি গৌরী পট্ট নামে সুচিহ্নিত এবং ডান দিকের তৃতীয়টি গনেশ পট্ট নামে সুপরিচিত।

পূর্ণিমার দিন অমরনাথ গৌরী পট্ট ও গণেশ পট্টটি পূর্ণরূপ ধারণ করেন। এক স্নিগ্ধ নীলাভ দ্যুতি অমরনাথের সুউচ্চ মসৃণ তুষার লিঙ্গ থেকে বিকিরিত হয়।

একটি শুভ্র শিলাবেদীর ওপর এই তিনটি তুষার মূর্তি গঠিত হয় আপনা থেকে যুগ যুগ ধরে। আবার পূর্ণিমার পর দিন থেকে এই তিনটি তুষার মূর্তি ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে এবং অমাবস্যায় পরিপূর্ণ ভাবে মিলিয়ে যায়।

আবার প্রতিপদ থেকে ধীরে ধীরে এই তিনটি তুষার মূর্তি প্রকৃতির খেয়ালে তৈরী হতে থাকে। যুগ যুগান্ত ধরে চলছে এই আশ্চর্য ভাঙ্গা গড়ার খেলা। সারা বছরে মাত্র একদিন অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহে অমরনাথের পূজা ও দর্শন হয়।

পাণ্ডারা শঙ্করাচার্যের ছড়ি ও নিশান নিয়ে কাশ্মীর থেকে এই দুর্গম তীর্থে পাঁচদিন পায়ে হেটে এই শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন পূজো দেন। তখন শত সহস্র সাধু সন্ত ও তীর্থযাত্রী তাঁদের সাথে আসেন বিশ্বের বিস্ময় এই পরম পবিত্র অমরনাথকে দর্শন করতে। ইদানিং অনেকে শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্বে গুরু পূর্ণিমাতেও অমরনাথ দর্শন করতে যান। কল্হনের সুপ্রাচীন 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে অমরনাথ মহাতীর্থের কথা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এই সুপ্রাচীন তীর্থ সহসা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক মুসলমান মেষপালকের মাধ্যমে আবার অমরনাথ আবিস্কৃত হয় এবং প্রতিবছর জনজীবনে পূজিত হয়।

তাই এই প্রাচীন পবিত্র হিন্দুতীর্থের পূজোর ভাগ ঐ মুসলমান মেষপালকের বংশধরগণ আজো পান। হিন্দু মুসলমানের সমবেত পূজা ও শ্রদ্ধার্ঘ এই মহাতীর্থে একসাথে অর্পিত হয়। ভারতবর্ষের সাধন ইতিহাসে এই মিলিত সেবা পূজা এক অভূতপূর্ব নিদর্শন হয়ে রয়েছে। তাছাড়া শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন সারা ভারতবর্ষ থেকে লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী সমবেত হ'ন এই মহাপবিত্র প্রাচীন ক্ষেত্রে।

সারা বছরে মাত্র একদিনের জন্য এমন বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পূজা সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে উঠে অনুষ্ঠিত হতে বিশ্বে অন্য কোথাও দেখা যায় না।

১২৯৪ সনে আশ্চর্যভাবে আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মচারী প্রমথেশ অমরনাথ যাত্রা করেন পদব্রজে। পীরপাঞ্চাল থেকে অনন্তনাগ হয়ে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এবং পথে অসুস্থ হয়ে পড়েও অলৌকিক ভাবে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন মহাতীর্থ অমরনাথে পৌঁছলেন। তারপর পাপহরা ঝরণায় স্নান করে অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি তুষার শুভ্র অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন করলেন। তার সাথে অমরনাথের বামে গৌরী পট্ট ও ডাইনে গনেশ পট্ট দর্শন করে ধন্য হলেন। মনের আনন্দে প্রাণভরে অমরনাথকে পূজো করলেন। তারপর অমরনাথ গুহার ছাদ থেকে যে তুষার বিন্দু ঝরে পড়ছে, তার বত্রিশটি বিন্দু তারানাথ সবার সামনে এক নিঃশ্বাসে পান করলেন। যিনি তা পারেন সমবেত সাধুগণ তাঁকে 'সিদ্ধপুরুষ' বলেন। ব্রহ্মচারী প্রমথেশকেও তাঁরা সিদ্ধসাধক রূপে স্বীকার করলেন।

তারপর অমরনাথ থেকে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে তিনিও ফিরে চললেন শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনই। কারণ প্রথমত তুষার রাজ্য অমরনাথে থাকবার কোন স্থান নেই। তাই সেদিনই ফিরে যাওয়ার নিয়ম।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণিমা শেষ হ'বার সাথে সাথে এক প্রাণান্তকর দুঃসহ বাতাস বইতে থাকে। তার মধ্যে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। তাই সবাইকেই সেদিনই অমরনাথ থেকে নেমে আসতে হয়।

তারানাথ অমরনাথ থেকে অনন্তনাগ দর্শন করে জম্মুতে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিত. সত্যলীলা দেবী দর্শন করতে গেলেন। গুহার মধ্যে এই দেবীর শিলামূর্তি রয়েছে। পূজা শেষ করে তৃপ্ত মনে ব্রহ্মচারী তারানাথ গুহার বাইরে এসে চারদিকের বরফে আবৃত পর্বত শ্রেণীর শোভা দেখতে লাগলেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

সহসা অচিন্তনীয় ভাবে তাঁর দিদিমার ছায়া মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসেই মিলিয়ে গেল। এর কারণ সম্পর্কে প্রমথেশ যখন চিন্তা করছেন, তখন সহসা চারদিকের পর্বতমালা যেন কেঁপে উঠলো। তিনি অবাক হয়ে জনমানবশন্য চারধারে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। সহসা শূন্যে দেখতে পেলেন এক বিশাল ছায়া মূতি।

অলৌকিক ভাবে শূন্যে দাড়িয়ে আছেন। মূর্তিটি দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিত কেশদাম, দীর্ঘবাহু, আরক্তিম নয়ন, মুখ শান্তি ও স্নিগ্ধভাব মণ্ডিত। সেই মহাপুরুষ দক্ষিণ দিকে বামহাতের তর্জনি তুলে ধরে দেখিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে বললেন, "বামা বীরভূম।" তারপর শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

এই অচিন্তনীয় ও স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে প্রমথেশ বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। শ্রীবামের নাম তিনি পূর্বেই শুনেছিলেন কিন্তু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় ইতিপূর্বে তিনি পান্নি। সেদিনই তিনি বীরভূমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে হঠাৎ ঘোড়ার গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটলো। তিনি আহত হলেন কঠিন ভাবে। কাশ্মীরের বিশিষ্ট বাঙ্গালী মহেশ বিশ্বাস তাঁকে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দু'মাস সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তুললেন। এই সময় কাশ্মীর সরকারের ঠিকাদার গগন বিশ্বাস তাঁকে শ্রীবামের অনেক অলৌকিক লীলার কথা বলেন। তাতে শ্রীবাম সম্বন্ধে প্রমথেশের শ্রদ্ধা ভক্তি আরো বৃদ্ধি পেল।

যাহোক সুস্থ হয়েই বীরভূমের পথে রওনা হলেন কাশ্মীর থেকে। পথে দিল্লীতে নামলেন। দিল্লীতে তিনি তাঁর এক ভক্তের আত্মীয় তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেনের বাড়ীতে উঠলেন। এই সময় দিল্লীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিখ্যাত দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

হেমবাবু তাঁকে দিল্লীর দরবার দেখালেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে রাজা মহারাজারা এসেছেন এই দরবারকে অলঙ্কৃত করে নিজেরা ধন্য হ'বার জন্য। • নিজেদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন ও বৃটিশের কাছে অন্ধ আনুগত্য দেখাবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত। একাধারে দেশপ্রেমিক ও স্বাধীন-চেতা প্রমথেশের উৎকট স্তাবকতা তাই ভাল লাগলো না। এই সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁর কানে কানে বলছেন, "একি দরবার দেখবে। বড় দরবারে চল।" তারানাথ বুঝলেন শ্রীবামই তাঁকে আহ্বান করছেন। সাথে সাথে বীরভূম রওনা হলেন। কানপুর ছাড়িয়ে যাবার পর আবার শ্রীবামের বিভূতি দেখলেন।

তিনদিনের দিন তিনি বীরভূমের মল্লারপুরে এসে নামলেন। মল্লারপুর থেকে পায়ে হেটে অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বহু

আকাঙ্খিত তারাপীঠে এসে পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছবার কিছু পূর্বেই অন্তর্যামী শ্রীবাম উপস্থিত পাণ্ডা ও ভক্তদের বললেন, "আজ দাদা আসছেন।" কিন্তু কেউ তা উপলব্ধি করতে পারলেন না।

একটু পরেই ব্রহ্মচারী প্রমথেশ তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। তারামাকে মন্দিরে প্রণাম করে তারপর তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীবামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীবামকে প্রণাম করলে শ্রীবাম সাদরে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। শ্রীবামকে প্রণাম করে সবিস্ময়ে তারানাথ দেখলেন যে তিনি যে দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি ও দৈববাণী শুনেছেন, তার সাথে শ্রীবামের রূপ ও কন্ঠস্বর সম্পূর্ণ অভিন্ন।

সশ্রদ্ধভাবে বিগলিত স্বরে ব্রহ্মচারী প্রমথেশ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ডাকলেন"? প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শ্রীবাম তাকালেন তাঁর এই একচল্লিশ বছর বয়স্ক ভাবী শিষ্য প্রমথেশ তথা তারানাথের দিকে। ব্রহ্মচারী প্রমথেশের চেহারা যথার্থ বীরাচারী সাধকের চেহারা। তার দেহ সুস্থ সবল। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বিশাল প্রশস্থ বক্ষ, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। নয়নদ্বয় দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ। হাতে লাঠি ও কাঁধে ব্যাগ, তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র।

শ্রীবাম অনুভব মুদ্রার সহযোগে তাঁকে বললেন, "আপনার জন্ম ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে, কাল নয়, পরশু নয়, তার পরদিন আপনার সাথে বোঝাপড়া হবে।" প্রথমেশ উপলব্ধি করলেন শ্রীবাম সত্যিই সর্বজ্ঞ। বাংলা ১২৫৩ সালের (ইং ১৮৪৬ খ্রীঃ) ৮ই কার্তিক শুক্রবার শেষরাত্রে শুক্লা দ্বিতীয়ায় দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রাচীন ব্রহ্মপুরায় (গাড়োয়ালের শ্রীনগরে) ব্রাহ্মণ বংশে ব্রহ্মচারী প্রমথেশের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাড়েন্দ্র শ্রেণীর বাঙ্গালী। পূর্ববঙ্গের রংপুরে আদি নিবাস। তারানাথের পিতা গাড়োয়ালের রাজার রাজদপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি বাবা অমরনাথের পূজো করলে অমরনাথ তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন যে তার পুত্র হবে কিন্তু অল্প বয়সেই সেই পুত্র সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবে। তার কিছুকাল পর প্রমথেশের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁর মাতৃ বিয়োগ হয়। কৈশোরে শিবচতুর্দশীতে তিনি বাড়ীর শিবমন্দিরে এক ঘোর অবস্থায় মন্ত্র পান। তার ফলে তার মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য আসে। উপনয়নের কিছুকাল পরে গৃহত্যাগ করেন।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা করে হঠযোগ সিদ্ধ হ'ন। পরে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন।

যাহোক, একটু পরে শ্রীবাম সস্নেহে বললেন, "দাদা, আপনি ক'দিন উপবাসী আছেন। কিছু সিদ্ধ ছোলা ও মুড়ি খান।"

প্রমথেশ শ্রীবামের নির্দেশ পালন করলেন এবং গুরুসেবায় সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন। সেদিন কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে ৫।৬ জন ভৈরব ভৈরবীর চক্রানুষ্ঠান হ'ল। শিমুলতলায় শ্রীবাম চক্রেশ্বর হলেন। তিনি প্রমথেশকেও সাথে নিলেন। প্রমথেশ এই প্রথম চক্রানুষ্ঠান দেখলেন। তারামায়ের দিব্য ভাব তাঁর মধ্যে জাগলো। চক্র শেষে শ্রীবাম তাঁকে তারাপীঠের মহাশ্মশানের গভীরে নিয়ে গেলেন। তারামা'র এই লীলা নিকেতনে অজস্র বিভূতি দেখে চিরনির্ভীক তারানাথও সহসা ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীবাম তাঁকে নিজ আশ্রয়ে রেখে দিলেন।

পরদিন অমাবস্যা। প্রমথেশ হঠযোগী, তিনি ঠিক করলেন যে উপবাস করে যথা নিয়মে জপ করে শক্তি লাভ করবেন। কিন্তু রাজ যোগী শ্রীবাম তা করতে দিলেন না। তিনি প্রমথেশকে দিয়ে মাংস ও পায়েস রান্না করিয়ে তা নিজে প্রসাদ করে তারানাথকে খেতে দিলেন ও বাধ্য হয়ে প্রমথেশ তা গ্রহণ করলেন, শ্রীবামকে বললেন "কর্তা, আপনার সবই বিপরীত।"

শ্রীবাম উত্তরে বললেন, "এ যে শিমুলতলা, তারামা যে বামা"। অর্থাৎ তারামায়ের এই লীলাক্ষেত্র সকল বিধিনিষেধের ঊর্দ্ধে। গুরু পরম্পরায় কৌলাচার সাধনই এই কৌলক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা সত্বেও হঠযোগী প্রমথেশ বললেন, মানুষকে পিশাচে পাইলে সত্য বর্জিত হয়। তখন শ্রীবাম খড়্গ দেখিয়ে বললেন, "ইনিই গুরু, সকলেই ইহার উপাসনা করেন। ইনিই ব্রহ্মদণ্ড, ইহার দ্বারাই পিশাচ মোচন হয়। এই খড়্গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিনী এর উৎপত্তি স্থান, রুদ্রদেব তার গুরু।"

এবার প্রমথেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে শ্রীবাম কুলনাথের নাথ, তিনিই দ্বিতীয় মহেশ স্বরূপ।

অমাবস্যা, তাতে সূর্যগ্রহণ। এই মহাযোগে হঠযোগী তারানাথকে

শ্রীবাম কৌলধর্মে দীক্ষিত করলেন। মহানিশায় প্রমথেশকে নিয়ে শ্রীবাম মহাশ্মশানের গভীরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে দিয়ে শবসাধনা করিয়ে তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন। পরদিন প্রতিপদ। শক্তি সঞ্চারের ফলে প্রমথেশ দিনরাত যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে রইলেন।

দ্বিতীয়া তিথিতে প্রমথেশ ভোরবেলা শুচিশুভ্র হলেন। আজ এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিটি তাঁর জন্মদিন রূপে সুচিহ্নিত।

শ্রীবাম আদর করে তাঁকে বললেন, দাদা, আজ আপনার জন্মদিন, সংস্কার করতে হবে।" অতঃপর হোমের জন্য শ্রীবামের নির্দেশে শ্মশানের দক্ষিণ দিকে পড়ে থাকা শব কাষ্ঠ আনতে গেলেন। ফেরবার পথে সহসা দেখলেন একটি বিরাট বিষধর সর্প বাম দিক থেকে এসে তাঁর ডান দিকে ফণা তুলে স্থিরভাবে দাঁড়ালো। উভয়ে উভয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারানাথের মনে হ'ল স্বয়ং তারামা যেন এই নাগভূষণ পাঠিয়ে তাঁকে সাদর আহ্বান করলেন। একটু পরে সর্প অন্তর্হিত হলেন। শিমুল তলায় এসে শ্রীগুরুকে তিনি বললেন এই ঘটনা। শ্রীবাম বললেন "ঐ নাগের সাথে তোমার যুদ্ধ হবে।"

শিমূল তলায় পবিত্র হোম শিখা প্রজ্বলিত হ'ল। হোমের অগ্নি কোণে শ্রীগুরু বাম এবং বায়ু কোণে শিষ্য প্রমথেশ। প্রমথেশ কৈশোরে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীগুরুবাম তা প্রকাশ করলেন এবং তা থেকে পাঁচ অক্ষর বাদ দিয়ে ত্রয়োদশ অক্ষর রাখলেন। অতঃপর গুরুদক্ষিণা স্বরূপ শিষ্য প্রমথেশের লাঠিটি গ্রহণ করলেন। অতপর শ্রীগুরুর নির্দেশে এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও আদিত্যবারে স্নান করে আদিত্যের উপাসনা করলেন। সিদ্ধসাধক প্রমথেশ গুরুদত্ত মন্ত্র পরীক্ষা করলেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় বিচিত্র আলাপ হ'ল। শ্রীগুরুবাম শিষ্যের পিতৃদেব কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রমথেশ' নাম পাল্টে দিলেন। শ্রীবাম তাঁর সন্ন্যাস নাম রাখলেন, "ব্রহ্মচারী তারানাথ।"

উত্তরকালে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সুযোগ্য শিষ্য রূপে তারানাথ, 'তারাক্ষ্যাপা' নামেও জনজীবনে সূচিহ্নিত হ'লেন।

'তারাক্ষ্যাপা'র গুরু ভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি সর্বতো ভাবে গুরুময় ছিলেন। গুরু শ্রীবাম ছাড়া আর কারো কাছে জীবনে মাথা নোয়ান নি। তিনি বলতেন, "বামদেবের কাছে মাথা বেচেছি। আর

কার কাছে মাথা নোয়াবো ?" একদিন শ্রীবাম রামপুরহাটে জীতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পাঠালেন প্রিয় শিষ্য তারানাথকে। সেখানে কাজ শেষ হ'বার সময় গুরুর আকর্ষণ অনুভব করে সাথে সাথে তারাপীঠে রওনা হলেন। সরলপুরের মাঠে ঘোর অন্ধকারে দিশে-হারা হলেন। এদিকে শ্রীগুরু বাম তা বুঝতে পেরে বললেন পাণ্ডাদের, "দাদা আসছেন। তাঁকে পিশাচে গিলতে চেষ্টা করছে"। একটু পরে তাঁর কৃপায় তারানাথ এসে উপস্থিত হলেন।

এই সিদ্ধপুরুষ নির্ভীক ও তেজস্বী সন্ন্যাসী শিষ্যকে শ্রীবামও কম পরীক্ষা করেননি। তিনি শিষ্য তারানাথকে আদেশ করলেন যে চারদিকে অগ্নি জ্বেলে সেই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বসে উনিশদিন কঠোর তপস্যা করতে। চির নির্ভীক তারাক্ষ্যাপা তা যথাযথ ভাবে পালন করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কারো ক্ষমতা নেই যে স্থূল দেহকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে নেয়। একমাত্র যিনি পারেন, তিনি গুরু ব্রহ্ম। জো জানে অগ্নি ব্রহ্ম কা ভেদ, সোই ঈশ্বর সোই দেব। পিতা বামই সেই পুরুষ যিনি অগ্নিসম পরম ব্রহ্ম, জ্যোতিস্বরূপ আত্মা। তিনি ভিন্ন শুদ্ধ সৎ করে নিতে, পথ দেখাতে আর কে পারেন ?"

শ্রীগুরুবাম এই পূর্ণ ব্রহ্মচারী সিদ্ধসাধক শিষ্যের উন্নত আধারে অফুরন্ত দিব্য শক্তি দান করেন। তিনি শিষ্যকে মৃতসঞ্জিবনী বিদ্যা দান করেন। তাছাড়া মহাবিদ্যা তারা বিদ্যার অধিকারী করেন এই অমিত যোগ বিভূতি সম্পন্ন তেজস্বী শিষ্যকে। শ্রীগুরু বাম তাঁর এই প্রিয়তম শিষ্য ক শুধু তারাপীঠেই নয়, জুড়নপুর, কপিলেশ্বর, কামাক্ষ্যা প্রভৃতি সিদ্ধ ক্ষেত্রেও পাঠান আরো উন্নত সাধনার জন্য।

শ্রীগুরু বামের আদেশ শিরোধার্য করে মহাযোগী ও উগ্রতাপস তারাক্ষ্যাপা নদীয়া জেলার পলাশীর নিকট জুড়নপুর শ্মশানে সাধনা করতে আসেন। এই জুড়নপুর শ্মশানে সতীপীঠ কালীঘাট অবস্থিত। এখানে দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীদেবীর মূণ্ডপতিত হয়েছে। দেবী মহিষমর্দিনী, ভৈরব ক্রোধীশ। পলাশীর দেবগ্রাম ষ্টেশন থেকে প্রায় বার মাইম দূরে কালীগঞ্জ। সেখান থেকে পদব্রজে দু'মাইল জুড়নপুর। গঙ্গাতীরে মহাশ্মশান। জুড়নপুর গ্রামের প্রান্তভাগে এই সতীপীঠ অবস্থিত।

আবার কাটোয়া থেকে গঙ্গাপার হয়ে ঈশান কোণে চার মাইল গেলে জুড়নপুর গ্রাম। স্থানটি নদীয়া জেলার অন্তর্গত হলেও মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যেও অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে এই সতীপীঠে নাটোরের শক্তিসাধক রাজা রামকৃষ্ণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

এই প্রাচীন সিদ্ধ শক্তিপীঠে তারাক্ষ্যাপা কঠোর সাধনায় নিমজ্জিত হ'ন এবং অচিরেই আপ্তকাম হ'ন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারাক্ষ্যাপাজীর অলৌকিক যোগ বিভূতির ক্ষমতা জুড়ন-পুরের অনেকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর ভক্ত ও অনুগত হ'ন। তিনি সর্পদংশনে মৃত ছেলেকে প্রাণ দান করেন। আবার এক বিধবার একমাত্র মৃত পুত্রকে জুড়নপুর শ্মশানে দাহ করতে আনা হয়। তারানাথজী শবসাধনার সময় মৃত পুত্রটিকে জীবিত করেন। এক মাত্র পুত্রের জীবন ফিরে পেয়ে পুত্রের জননী পরম শ্রদ্ধা ভরে দুই বোতল 'কারণ' প্রাণদাতা তারাক্ষ্যাপাজীকে দেন। তারাক্ষ্যাপাজী সেই বোতল দু'টি নিয়ে জুড়নপুর শ্মশান থেকে তারাপীঠে এসে শ্রীগুরু বামকে দিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগুরুবাম সব বুঝতে পারলেন। একটি বোতল খুলে 'কারণ' শুঁকে বললেন "দাদা, মদবদ্, মড়ার গন্ধ কইছে, খায়েন না।"

সেদিন সেদিন থেকে তাঁর সুদীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী জীবনে আর কোন দিন 'কারণ' স্পর্শ করেননি। শ্রীবাম তাঁর এই উন্নত শিষ্যকে বীরাচার থেকে দিব্যাচারে উন্নিত করে বললেন, "খাবেন এক মুষ্টি চালের অন্ন, ঘনাবর্ত্ত দুধ, ফলমুল।" গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে আমৃত্যু তারা-ক্ষ্যাপাজী এই সাত্বিক আহার স্বপাকে তৈরী করে ইষ্টকে নিবেদন করে গ্রহণ করতেন। তারাক্ষ্যাপাজীর জুড়নপুরে যাতায়াত প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য স্নেহধন্য শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা বলেন, "তারানাথ বাবা পায়ে হেটে (নিজেকে যোগবলে অদৃশ্য করে) গঙ্গাপার হয়ে যেতেন। একই রাত্রে তারাপীঠ থেকে জুড়নপুর শ্মশানে যাতায়াত করতেন।

একদিন তারানাথ বাবাকে খড়ে নদী (কৃষ্ণনগরে) পার হবার সময় মনে হ'ল একসঙ্গে নৌকায় উঠলাম কিন্তু ওপারে নৌকা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি তিনি ওপারের তীরে দাড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বললেন না।" উত্তর কালে কথা প্রসঙ্গে তারানাথজী তাঁর ভক্ত ব্রজহরি মিত্রকে বলেছিলেন, "মূলাধারে ভূতত্বর স্থান, আমাদের দেহের

ভারকেন্দ্র। এই পৃথ্বিতত্ত্বের জয়ের তাৎপর্যই হ'ল দেহের গুরুভার প্রতিষেধ দেহে। আর গুরুভার থাকেনা।" ইত্যাদি।

জুড়নপুরের শ্মশানে গুরু নির্দিষ্ট সাধনা সুসম্পন্ন হলে শ্রীগুরু বাম তাঁকে জুড়নপুর শ্মশান থেকে সাতক্রোশ দূরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামের উত্তরসীমায় অবস্থিত মহাশৈবতীর্থ কপিলেশ্বরে তপস্যা করতে প্রেরণ করেন।

এই সুপ্রাচীন মহাতীর্থে স্বয়ং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাও সাধনা করে গেছেন। তিনি এই সিদ্ধক্ষেত্রের তপঃ প্রভাব জানেন। তাই শিষ্য তারাক্ষাপা-কেও এখানে তপস্যার জন্য পাঠালেন। শ্রীগুরু বামের আদেশে অনাদি-লিঙ্গ কপিলেশ্বর মহাদেবের আরাধনায় তিনি মগ্ন হলেন।

এই সুপ্রাচীন শৈব তীর্থের ইতিহাস অপূর্ব (দ্রষ্টব্য 'শ্রীবামের কপিলেশ্বরে গমন') কপিলেশ্বর হলেন অদূরবর্তী সতীপীঠ কিরীটেশ্বরীর ভৈরব। যুগ যুগ ধরে বাংলার স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ এই কপিলেশ্বর শিবের সাধনা করে গেছেন। এই সুপ্রাচীন মহাতীর্থে মহর্ষি কপিল মুনি তপস্যা করেছেন। সাংখ্য প্রণেতা ও বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার কপিলমুনি মূলত শিবের উপাসক ছিলেন। কপিলমুনির উপাস্য এই অনাদিলিঙ্গ শিবের নাম তাই কপিলেশ্বর।

কথিত আছে এখানেই পূর্বে সাগর ছিল এবং এই মহাক্ষেত্রেই সগরের ষাট হাজার সন্তান কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মিভূত হয়। এই পবিত্র ভূমিতে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে এনে পিতৃ পুরুষদের উদ্ধার করেন। এই পবিত্র সিদ্ধক্ষেত্রেই বৃত্রাসুর বধ করেন দেবরাজ ইন্দ্র।

অদূরে মহাশক্তিপীঠ কিরীটিপীঠ অবস্থিত। মহাতীর্থ কপিলেশ্বর প্রসঙ্গে মহাপরুষ তারাক্ষাপা বলেন, "বর্তমান মনুর উর্দ্ধতন পঞ্চম মনুর অধিকার কালের পূর্ব্বে সাগর হিমালয়ের পাদদেশে ছিল। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপেই ছিল। এই কিরীটি পীঠও সেই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। এক এক মনুর অধিকার কাল তের হাজার বছর। প্রায় পয়ষট্টি হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলদেব সাগরদ্বীপেই ছিলেন। বহু সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কালক্রমে সাগরদ্বীপ এখন বঙ্গোপসাগরের মোহনায়।"

ব্রহ্মচারী তারানাথজী যেমনি তেজস্বী তেমনি নির্ভীক। একবার জুড়নপুর থেকে কপিলেশ্বরে যাবার সময় মঙ্গলপাড়ার ঘাটে তারানাথজী দেখতে পেলেন যে একটি অতিকায় পিশাচ ; তার এক পা সোমপাড়ার

একটি বটগাছে আরেক পা অপর পারের মঙ্গলপাড়ার আরেক বটগাছে রেখে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করছে। তেজস্বী তারানাথ সাথে সাথে হাতের কুঠার তুলে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন। তাঁর পরশুরাম মূর্তি ও হুঙ্কার শুনে পিশাচ ভয়ে পালিয়ে গেল।

জুড়নপুরে সাধনাকালীন তারানাথ কখনো কিরীটিপীঠ, কখনো কপিলেশ্বর কখনো নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় এসেও সাধনা করতেন শ্রীগুরু বামের আশীর্বাদে। তারানাথের গুরুভক্তি যথার্থ আদর্শনীয়। একবার শিবস্বরূপ শ্রীগুরু বামের সাথে বসে কারণ পান করছেন ভক্ত সারদা সাহা। তিনি কারণ পাত্রটি ঠিক মত ধরতে পারেননি। সেই সময় ব্রহ্মচারী তারানাথ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি গর্জে উঠে সারদা সাহাকে বললেন, 'তুই বেটা শুড়ি, পাত্র ধরতে জানিস না, চক্রে বসেছিস ?" শ্রীবাম তাঁকে শান্ত করলেন।

এই মহাতেজস্বী শিষ্য তারানাথজীকে শ্রীবাম দেশমাতৃকার শংখল মোচনের জন্য আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি বিপ্লবের সাধনাতেও ক্রমে দীক্ষিত করলেন। মাতৃ সাধকের কাছে দেশজননী ও জগতজননী এক ও অভিন্ন। মাটি-ই মা। দেশ মাতৃকার পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য তিনি তারানাথকে বললেন, "দেশ স্বাধীন না হলে সাধনা করা যায়না।"

চির স্বাধীন তারানাথজীর চিরদিনই বিদেশী বৃটিশরাজের ওপর তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। জন্মভূমির মুক্তির জন্য মহানগুরু বামাক্ষ্যাপার আদেশ পেয়ে তিনি আরো আনন্দিত হলেন। শ্রীগুরু বাম তাঁকে আদেশ দিয়ে বললেন, "বাংলা তথা সারাভারত ভূমি সংস্কার ও ভারতের হৃতরাজ্য উদ্ধার কাজে তোমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সাধন ভূমি শুদ্ধ করতে হবে" ইত্যাদি। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। তিনি ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

১৯০২ সালে কাশীতে তাঁর পরিচয় হ'ল ভারতখ্যাতা মহাবিপ্লবিনী ও মহাসাধিকা গঙ্গাবাঈয়ের সাথে। তিনি ছিলেন ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়িকা ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর প্রধান উপদেষ্টা ও সহচরী। যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ

করতে করতে গুরুতর আহত হলে গঙ্গাবাঈ ও ঝান্সী রাণী লক্ষ্মী-বাঈয়ের অন্যতম পার্শ্বচর বলবন্ত সিং অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারী হাতে শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে শত্রুসৈন্যকে আঘাত করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে সরিয়ে নিয়ে আসেন নিরাপদ স্থানে।

তারপর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হলে উভয়ে গোপনে তাঁর দেহ সংস্কার করে দ্রুত অন্যস্থানে আত্মগোপন করেন। গঙ্গাবাঈ সিপাহী বিদ্রোহের বিশিষ্ট নায়ক নানা সাহেবের সাথে নেপাল ও ব্রহ্মদেশ যান ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে। পরে নেপালে কর্ম ক্ষেত্র তৈরী করে নৈমিষারণ্যে কঠোর সাধনা অন্তে জুড়নপুর শ্মশানে এসে সাধনমগ্না হ'ন। এখানে বলবন্ত সিং এসে মিলিত হ'ন। জুড়নপুরে দিনের বেলা এই দুই জন ভূগর্ভ গৃহে থাকতেন। গভীর রাতে শ্মশানে ও দেবীর বেদীতে এসে বসতেন।

যাহোক, কাশীতে শ্রীগুরু বামের কৃপায় গঙ্গাবাঈকে পেয়ে তারাক্ষ্যাপাজী আনন্দিত হলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের আর্কট প্রদেশে মহারাষ্ট্রের রাজবংশ—রাজযোগীরাজের বংশে গঙ্গাবাঈয়ের জন্ম হয়। ব্রহ্মচারিণী ও মহাতপস্বিনী গঙ্গাবাঈ সারাভারতে বিপ্লবীদের চোখে উত্তরকালে 'মাতাজী' নামে প্রসিদ্ধ হ'ন। বিপ্ববী ও মহাসাধক তারাক্ষ্যাপাকে তিনি 'পঞ্চাগ্নি' বিদ্যা দান করেন এবং সক্রিয়ভাবে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করান। তাছাড়া উভয়ে বিন্ধ্যাচল পর্বতে বিন্ধবাসিনী মন্দিরের অদূরে 'কালিখো' মন্দিরে যোগ ও তন্ত্র সাধনা করেন। পুনরায় উভয়ে জুড়নপুরেও সাধনা করেন। একদিকে বিপ্লব অন্যদিকে আধ্যাত্ম সাধনা একই সাথে চলতে লাগলো।

মহাতপস্বিনী গঙ্গাবাঈ আদর্শ নারী শিক্ষার জন্য বাংলা ১৩০০ সনের ৭ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (১৮৯৩ সালের ১৯শে এপ্রিল) কালী-ঘাটের মা কালীর নাম অনুসারে মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন।

১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত বহু ভারত বিখ্যাত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক মাতাজী গঙ্গাবাঈয়ের সাথে দেশের বিপ্লব ও স্বাধীনতার ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ বাল গঙ্গাধর তিলক, মতিলাল রায়, বাঘাযতীন, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস

প্রভৃতি। ১৯০৭ সালের ২০শে এপ্রিল ৭২ বছর বয়সে এই মহাতপস্বিনী ও বিপ্লবী 'মাতাজী' কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

• ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পরমগুরু বামাক্ষ্যাপার নির্দেশে তারাক্ষ্যাপাজী আরো গভীর ভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন এবং অগ্রনায়কের ভূমিকা নেন। এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিপ্লবী বারীণ ঘোষ, মতিলাল রায়, কিরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাথে একযোগে কাজ করেন। ১৯০৭ সালে তারাক্ষ্যাপাজী সিংভূম অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াতে চলে যান। সেখান থেকে নাগপুর হয়ে দুর্গম সারাণ্ডা ধলভূম রাজ্য ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবের কাজ করেন। এই সময় বৃটিশ সরকার তাঁর ওপর কড়া নজর রাখে। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের কাজ করেন। ১৯১০ সালে তারাপীঠে ফিরে আসেন। ১৯১১ সালে তারাক্ষ্যাপাজী শ্রীগুরু বামদেবকে পত্রদেন সাংকেতিক ভাষায়।

তারপর তারাপীঠে আসেন। সেখান থেকে এক ভক্তকে পত্রে জানান, "...২৬শে পৌষ, গত কল্য সোমবার সাড়ে আটটার সময় মহারাজ (শ্রীগুরু বামদেব) কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক তহবিল খুলিয়া ভাণ্ডারের অধিকার দিলেন। তাঁহার বাক্য Fade, উভয়ে Eade" ইত্যাদি।

১৯১১ সালের ১৩ই মার্চ শ্রীমণি ভাদুড়ীকে তারানাথজী একপত্রে জানান, "বুড়োজী মহারাজের আদেশ (শ্রীগুরু বামদেবের) বালেশ্বরে থাকিবে।...গত কয়েকদিন আদেশ পাচ্ছিরা মেশ্বরে যাও"...ইত্যাদি। এই সময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আদেশে বিপ্লবী বাঘাযতীনের সাহায্যের জন্য বালেশ্বরে তারাক্ষ্যাপাজী যান এবং অর্থাদি দিয়ে আসেন বাঘা যতীনকে।

তারপর শ্রীগুরু বামের আদেশে এবং পরপর তিনবার দৈববাণী শুনে কামরূপে যাওয়া স্থির করেন। ইতিমধ্যে তারাপীঠে আসেন একবার। শ্রীবাম তখনো স্থূলদেহে বর্তমান। এই সময় পাথুরিয়াঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জামাতা বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক বামদেবের কৃপালাভের জন্য তারাপীঠে আসেন। রাজকুমারী শ্রীশ্রী-বামাক্ষ্যাপাকে গুরুরূপে বরণ করেন। তিনি শ্রীগুরু বামাদেবের চরণদ্বয় ধৌত করে নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন, এই সময় মহাত্মা

তারাক্ষ্যাপাজী সেখানে উপস্থিত হ'ন। তিনি এই দৃশ্য দেখে রাজকুমারী দেবীর হাত থেকে বামদেবের চরণকমলদ্বয় নিয়ে নিজের দীর্ঘ কেশ পাশ দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এভাবে গুরুসেবা করতে হয়।"

তারাক্ষ্যাপাজীর এই অতুলনীয় গুরুভক্তি দেখে উপস্থিত সবাই মগ্ধ হ'ন। তারাক্ষ্যাপাজী তাঁর গুরু শ্রীবামের বহু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীগুরুর অসীম যোগ বিভূতিও দেখেছেন। একবার হুগলীর রায় বাজারে তাঁর প্রিয় পাত্র হুগলীর গবর্ণমেন্ট স্কুলের ট্রেনিং শিক্ষক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারাপীঠে প্রেরণ করেন, নন্দবাবুর পিতার আরোগ্যের জন্য। শ্রীবাম তারাক্ষ্যাপাকে বলে দেন, (তারাক্ষ্যাপাও তারাপীঠে তখন উপস্হিত হ'ন মাদ্রাজ থেকে এসে) নন্দবাবুর পিতা আরো পনের বছর সুস্হ দেহে বাঁচবেন। তাই সত্য হল। তারা ক্ষ্যাপাজীর গুরু ভক্তির আরেক নিদর্শন হল রামপুরহাট থেকে তারাপীঠ সর্বদা পদব্রজে আসা। এই দীর্ঘ সাত মাইল তিনি কখনো গোযান বা পাল্কী ব্যবহার করেন নি।

যাহোক, বামদেব তাঁকে বললেন, দাদা, কামরূপ জয় করে কামাখ্যায় যান। গুরুর আদেশে তিনি কামরূপ গিয়ে কামবীজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কামরূপে সাধনার সময় একদিন তারাক্ষ্যাপাজী শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক দর্শন ও নির্দেশ পান, "যাও মাঞ্চুকোতে, ঘর বাঁধ। আমি উত্তর কুরুবর্ষে যাচ্ছি। প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় করে কুরুবর্ষ থেকে গঙ্গা আনতে —এই সগর বংশের উদ্ধার করতে।" এরপর ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ শ্রীগুরু বাম দেহ ত্যাগ করেন। দেহ ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে একদিন কামরূপে তারাক্ষ্যাপা আপন সাধনায় বিভোর রয়েছেন। সহসা কে যেন তাঁকে স্পর্শ করে বললেন মৃদুস্বরে, "তুমি কি করছো, আমি চললাম, তুমি চলে এস।"

চমকে ফিরে দেখলেন স্বয়ং শ্রীগুরু বামদেব দাড়িয়ে আছেন। সাথে সাথে তারাপীঠ রওনা হলেন।

তার তিনদিন পর ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ জীবন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা দেহত্যাগ করেন। শ্রীগুরু বামদেবের দেহত্যাগের পর এক ভক্তকে তারাক্ষ্যাপাজী পত্রে জানান। "...তাঁহার দেহ চলে গেছে কিন্তু তাঁর শক্তি ও প্রভাব আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করিবে। তুমি জান আমাকে

তিনি কি ভার চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন।...বুড়োজীর স্মৃতি মন্দির সেই তারাপুরে গড়ব কি অন্য কোথায় তাহারও একটা মহাসমস্যা সম্মুখে উপস্থিত। চিরকাল বুড়োজী ত্যাগের ধর্ম দেখিয়ে গিয়েছেন। ...বুড়োজীর নির্দেশ মাঞ্চুকোতে ঘর বাঁধতে, অনন্ত মহাসাগর তোলপাড় করে তিনি উত্তর কুরুবর্ষ গঙ্গা থেকে নিয়ে এসে সগর বংশ উদ্ধার করবেন। মঠ স্থাপনা বিষয়ে মহারাজ বলিতেন, "যার চতুরঙ্গ বল নাই। তার কুক্ষিগত হবে না।"... বুড়োজী মহারাজের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।' ইত্যাদি ১৯১৩ সাথে ব্রহ্মচারী তারানাথজী তিব্বত চীন মাঞ্চুরিয়া উত্তর কুরুবর্ষ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি কাশীতে আসেন।

১৯১৪ সালে শ্রীবামের শিষ্য ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে শ্রীগুরুর লীলাক্ষেত্র তারাপীঠে আসেন। এই সময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য সন্তান ও উত্তরকালে 'বামলীলা' গ্রন্থের লেখক শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সাথে নিয়ে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপাজী 'বামামিশন' গঠন করেন এবং দামোদরের বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে ত্রাণ-কার্য করেন।

তিনি বামদেবের শিষ্য হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য গুরু ভাইদের সহযোগে এবং তার নিজের কয়েকজন ভক্তের সহযোগিতায় শ্রীগুরু বামদেবের সমাধিমন্দির নির্মান করেন এবং নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। তিনি 'বামামিশনের সভাপতি' হন। আমৃত্যু এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯১৪ সালে ১৪ই আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভকালে তিনি তারাপীঠ থেকে কোলকাতায় আসেন। এই সময় নবদ্বীপের অপর পারে মহেশগঞ্জে খোড়ে নদীর ধারে একটি আশ্রম করেন এবং পঞ্চমুণ্ড আসন স্থাপন করেন। কখনো এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপের শ্মশানে শব সাধনা করতে যান। ইতিপূর্বে নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় একটি ঘরে তিনি যখন থাকেন তখন সেখানে একটি বহু প্রাচীন বটগাছের কোটরে একটি অতি বৃদ্ধা যোগিনীমাতাজীও থাকতেন। তিনি তারাক্ষ্যাপাজীকে খুবই স্নেহ করতেন। নবদ্বীপের পোড়ামাতলার পোড়ামা হলেন নীল সরস্বতী, মহাজ্ঞান দায়িনী দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারাদেবী।

তারাক্ষ্যাপাজী কোয়েটাতেও কিছুকাল তপস্যা করেন। ১৯১৬ সালে

তারাক্ষ্যাপাজীকে স্বরূপগঞ্জ আশ্রম থেকে ইংরেজ সরকারে সহসা গ্রেপ্তার করে এবং বিনাবিচারে নোয়াখালির হাতীয়া দ্বীপে বন্দী করে রাখে। বিপ্লবী বাঘা যতীনকে সাহায্য করবার জন্যই ইংরেজ তারাক্ষ্যাপাজীকে অন্তরীণ করে। এই হাতিয়া দ্বীপে নজরবন্দী থাকার সময় একটি অলৌকিক ঘটনা তারাক্ষ্যাপাজী ঘটান।

সেখানকার দারোগার বাড়ীতে একটি ঝি কাজ করতো। তার একমাত্র পুত্র গুরুতর কলেরা রোগে মারা যায়। পুত্র শোকে পাগলিনীর ন্যায় সে ছুটে এসে তারাক্ষ্যাপাজীর পা জড়িয়ে ধরে পুত্রের প্রাণ ভীক্ষা কামনা করে।

তারাক্ষ্যাপাজী তখনি লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। শোকাতুরা ঝিটি সাথে সাথে জ্ঞান হারায়। তাকে দারোগা বাবু প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে তার ব্যাণ্ডেজ খুলে ডাক্তার কোন আঘাত বা ক্ষত চিহ্নই দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলেন। যাহোক, এ ব্যাপারে দারোগা চক্রবর্তী বাবু তারাক্ষ্যাপাজীর বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সাচী সদল বলে তদন্ত করতে এলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তারাক্ষ্যাপাজীকে কঠিন কথা বলায় মুহূর্তে তারাক্ষ্যাপাজী ভীষণ সিংহনাদ করে প্রচণ্ড গর্জে উঠলেন। সাথে সাথে তাঁর মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠলো এবং চোখ দিয়ে আগুনের মতহল্কা বের হতে লাগলো। সেই ভয়ঙ্কর আগুনের হল্কায় ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সাচীর কপালের চুল পুড়ে গেল এবং সারা কপালে কালো দাগ পড়ে গেল। উপস্থিত সবাই ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাচী তখন নতজানু হয়ে 'ও ক্রাইষ্ট, ও ক্রাইষ্ট' বলে সজোরে চিৎকার করলেন।

মিষ্টার সাচী ইংরেজ নন। তিনি জাতিতে জার্মান। তিনি বললেন উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে যে আমি ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় সাধকদের বহু অলৌকিক ঘটনা শুনেছি। কালক্রমে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে ভারতে এলাম। আমার বহুদিনের সাধ ছিল সত্যিকারের ভারতীয় সাধু দেখবো। আজ আমার সেই বহুদিনের ইচ্ছে পূর্ণ হ'ল।

১৯২০ সালে তারাক্ষ্যাপাজীকে পুনরায় কৃষ্ণনগরে নজরবন্দী করে রাখো হয় কিছু কালের জন্য। পরে মুক্তি পেয়ে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ইংরেজের পতন ঘটাবার জন্য গুরু বামদেবের আদেশে আমার বাংলায় আসা। বাঙ্গালী জাতির আত্মবিস্মরণ ঘুচাবার জন্যই আমার সাধনা।"

তারাক্ষ্যাপাজী একাধারে অসাধারণ তেজস্বী, স্নেহময়, চিরনির্ভীক এবং স্পষ্টভাষী ছিলেন। জীবনে কখনো কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি।

একবার দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং তাঁর ভ্রাতৃজায়ার সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়লে তিনি সদলবলে তারাপীঠে এসে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হ'ন। বশিষ্টদেবের আসনে জপ করবার জন্য বেদীটি কানাৎ দিয়ে ঘিরে ফেললেন। স্হানীয় লোকজন বা পাণ্ডারা কিছু বললেন না কারণ তিনি বিরাট ধনী ও মহারাজা। যাগ যজ্ঞে অঢেল খরচ করেন। তাতে তাঁদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই কিন্তু এই সময় তারা ক্ষ্যাপাজী তারাপীঠে এসে উপস্হিত।

তিনি বজ্রকন্ঠে তিরস্কার করে মহারাজকে বললেন, "কানাৎ উঠাও। শিমুলতলা তোমার দ্বারভাঙ্গার গদি নয়। এখানে সকল সাধক ভক্তের সাধন জপ করবার সমান অধিকার।" কুঠার হাতে তারাক্ষ্যাপার এই পরশুরাম মূর্তি দেখে মহারাজা তখনি কানাৎ উঠাতে বাধ্য হলেন।

তারাক্ষপাজী বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুকন্ঠের অধিকারী ছিলেন। ১৩১৭ সালে ভাদ্র মাসে একবার শ্রীগুরুবামের ইচ্ছায় তিনি শ্রীগরু বামাদেবকে দু'খানি শ্যামাসংগীর্ত গেয়ে শোনান।

নাটোরের মহারাজা ও সিদ্ধসাধক এবং বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার রাজা রামকৃষ্ণের রচিত "দীন তারিণী দুরিত বারিণী সত্ত্ব-রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী"...ও "কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে" গান দু'টো সতেজ গলায় গেয়ে শোনান। গান দু'টি শুনে শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয় থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে।

উপস্হিত, তন্ত্রাভিলাসী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা প্রভৃতি মুগ্ধ হয়ে যান এই মধুয় গান দু'টি তারাক্ষ্যাপাজীর কন্ঠ থেকে শুনে।

'বামলীলা' গ্রন্থের লেখক এবং বামমিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে তারাক্ষ্যাপাজী নিজ অনুজের ন্যায় স্নেহ করতেন। তিনি শ্রীগুরুবামের বিশেষ কৃপাধন্য শাস্ত্রীমশায়কে শ্রীগুরুবাম সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ তথ্য সকল প্রদান করেন। তাছাড়া বামদেবের আবির্ভাব তারিখ বার ও তিথিও বলে দেন (১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যুক্তা শিব চতুর্দশী তিথি)।

তারাক্ষ্যাপাজী একাধারে কঠোর নিষ্ঠাচারী, স্বাধীনচেতা ও সুবক্তা ছিলেন। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় স্বরূপ এই মহাতাপস ও দেশ-প্রেমিক যখন বক্তৃতা দিতেন তখন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

তিনি দিনান্তে স্বপাকে একবার আহার করতেন। তার আহার ছিল লবণ ও তেজবর্জিত। সাধারণত তিনি দুধ, ফল, কেশুর, আমলকি, ঘৃত, মধু, সুজি, কফি, ডাব প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে খেতেন। মহাপুরুষ তারাক্ষ্যাপাজীর দেহ যোগসিদ্ধ বলে তাঁর চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা যেতনা।

তাঁর বয়স যখন প্রায় একশো বছর তখনও তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম ও কর্মঠ ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঘি, জাফরান ও মৃগনাভি মিশিয়ে পান করতেন। আত্মপ্রচার বিমুখ এই মহান যোগী পুরুষের প্রতিটি বাণীই আদর্শনীয়।

তিনি বলেন, "মা, আমার রক্ত বীজ বিনাশিনী। রক্ত + বীজ + বিনাশিনী—অথাৎ রক্ত-মাতৃরক্ত, আর বীজ হ'ল পিতৃবীর্য—এই দুই মিলে জীবের উৎপত্তি হয়। তাই মা আমার পুনপুঃনঃ সৃষ্টি বা জন্মের বিনাশিনী। তাই তিনি রক্তবীজ বিনাশিনী।"

তারাক্ষ্যাপাজী আরো বলেন, "বাসনা ত্যাগ কর, মাকে ডাক, দার পরিগ্রহ কর, তাঁর সঙ্গে যুক্ত ভাবে কর্ম কর।...সৎ গৃহস্থ হও। সদ গৃহেই ভগবান একদিন না একদিন আসেন। সদ্ গৃহস্থই সাধু। সাধ + উ, যাহার স্ত্রী থাকবে, যাহারা সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করেন তাঁরাই সাধু"।

আবার কখনো বলেছেন, "সদাচার পালন ও নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা অবশ্য কর্তব্য। এতে আয়ু, বল, স্মৃতি, মেধা ও মানসিক তেজ বৃদ্ধি পায়।...জ্ঞান কর্ম ও উপাসনা, এই তিন ভারতের সাধনা।"

তারাক্ষ্যাপাজী আরো বলতেন তাঁর শিষ্য ভক্তদের, "জিহ্বা ও উপস্থ সংযত করবে। লোভ ও কামকে সর্বপ্রথম দমন করা কর্তব্য। এই কামনার জন্যই বার বার আসা যাওয়া।

সাধারণত সংসারীদের তিনি পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে গভীর ভাবে অনুসরণ করতে বলতেন এবং কুলগুরুর থেকে দীক্ষা নিতে বলতেন। তারা ক্ষ্যাপাজীর কাছে দেশই হল একাধারে জননী ও জগত জননী। তিনি ছিলেন 'গুড়া কেশ' অর্থাৎ তিনি নিদ্রাকে জয় করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কথা বহুক্ষেত্রে সাংকেতিক ভাষায় তিনি বলেছেন। অনেক সময় হেয়ালী ও দুর্বোধ্য মনে হত সাধারণের কাছে।

তিনি যে কি রকম তারামা অন্তপ্রাণ ছিলেন তা তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। ১৯৩১ সালে (বাং ১৩৩৮ সনে) এই ঘটনাটি ঘটে। তখন তাঁর বয়স পঁচাশী বছর। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে কোলকাতায় এসে একা একটি বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন।

একদিন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য জ্ঞানী সন্তান এবং 'বামলীলা' গ্রন্থের লেখক শাস্ত্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ প্রতীম গুরুভাই তারাক্ষ্যাপাজীর সাথে সাক্ষাত কররার জন্য বিডন রো'র একটি বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন তারাক্ষ্যাপাজী ঘরের মেঝেতে মাদুরে শুয়ে আছেন এবং ছটফট করছেন। ঘরে আর কেউ নেই। শাস্ত্রী মশায় চিন্তিত হয়ে কারণ জানতে চাইলে, পঁচাশী বছরের প্রবীন সিদ্ধ পুরুষ মহান বিপ্লবী এবং গুরু গম্ভীর প্রকৃতির তারাক্ষ্যাপাজী ছোট্ট শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন এবং হা হুতাশ করতে থাকেন। শাস্ত্রী মশায় এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান।

একটু পরে শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে বললেন, "আরে, আমি কি অন্যায় করেছি। জ্বরে আমি আলু থালু কচ্ছি একাই। 'মা' (তারামা) নিজে এসে আমায় পাখায় বাতাস দিচ্ছেন। আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখি, ব্যাপার বুঝে মা'র হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়েছি রে, মা'র হাতে কত লেগেছে। কি অন্যায় আমি করেছি রে।" —এই বলে কাঁদতে লাগলেন।

শাস্ত্রীমশায় এই দিব্য দৃশ্য দেখে ও অমৃত কথা শুনে আনন্দে আবেগে বিগলিত হলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে তিনি তারামার

এই পঁচাশী বছরের শিশুসন্তান তারাক্ষ্যাপাজীকে শান্ত করলেন। তারাক্ষ্যাপাজী ছিলেন যথার্থ ইষ্টময় ও গুরুময়। তারাক্ষ্যাপাজী একাধারে যোগী, তান্ত্রিক, জ্ঞানী, ভক্ত, জ্যোতিষজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ এবং মহান কর্মযোগী ও ভূত ভবিষ্যত দ্রষ্টা ছিলেন।

১৯৩৫ সালে তিনি বহরমপুরে উমাবনম নামে আশ্রম প্রতিষ্টা-করেন। তখন তাঁর বয়স অষ্টাশীর ওপর।

এখানে আশ্রম করবার কারণ হিসাবে তিনি তাঁর শিষ্য ও বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং 'সিদ্ধ সাধক তারাক্ষ্যাপা' গ্রন্থের লেখক শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন, "এই ভূমির নাম ব্রহ্মপুরম্। এই ব্রহ্মপুরেই বাংলার শেষ শক্তির লীলা পলাশীর মাঠ। নিকটে পঞ্চানন শিবের মন্দির ও বর্ম্মার রাজকুমার প্রিন্স থিবোর সমাধি। ইহা গৌড়ের এলাকা। গঙ্গার অপর পারে কিরীট পীঠ। এখানে দেবীর কিরীট পড়েছে। ইহাই ভারতের মুকুট" ইত্যাদি। শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা প্রসঙ্গে তারাক্ষ্যাপাজী বলেন, "বুড়োজী মহারাজ সর্বদাই জপ করতে বলতেন, জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি। জপিলে তিনলক্ষ হইবেন প্রত্যক্ষ।"

তারাক্ষ্যাপাজী আরো বল্লেন, "জপ করবে, জপ করতে করতে শ্রান্ত হও তো ধ্যান করবে, ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হলে তত্ত্ব চিন্তা করবে। পুনরায় জপ করবে।" উমাবনম্ আশ্রম থেকে একদা শিষ্য অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লেখেন "...তুমি যে সাদা প্রস্তরময় তারামূর্তি দেখেছ তিনি সচল ও বুদ্ধদেব। তারাপীঠের শ্মশানে যে একটি মস্ত বড় "ক্রব্যাদ" বাস করে তাহার খোঁজ কেহ রাখেনা"......।

১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্ব শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বহরমপুরে আসেন। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মহাবিপ্লবী তারাক্ষ্যাপাজী একটি পত্র দেন। পত্র বাহক ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য্য। গালা দিয়ে বদ্ধ করা খামটি যোগেন্দ্রবাবু তারাক্ষ্যাপাজীর গুণমুগ্ধ ও বিপ্লবী শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের হাতে দেন নেতাজীকে দেবার জন্য।

শশাঙ্কবাবু নেতাজীর হাতে খামটি দিয়ে বললেন, "শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপা আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন। চিঠিখানি হাতে নিয়ে নেতাজী সুভাষ

চন্দ্র বসু সহসা যেন আত্মস্থ হয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। বিগত আটত্রিশ বছর ধরে (১৯০২—১৯৩৯ সাল) মহাবিপ্লবী তারাক্ষ্যাপাজীর আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের বিশাল কর্মধারার কথা সকল দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীগণ জানতেন। নেতাজী শুধু জানতেনই না তার সাথে একাত্মও ছিলেন। উভয়ে একই পথের পথিক। তাছাড়া প্রায় ছয় বছর পূর্বে ভিয়েনায় দেশপ্রেমিক বিঠল ভাই প্যাটেলের রোগশয্যার পাশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন এবং চিন্তিত এবং কিছুটা বিপন্ন বোধ করছিলেন, সেই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে অলৌকিকভাবে মহাযোগী ও মহাবিপ্লবী তারাক্ষ্যাপাজী তাঁর পাশে উপস্থিত হ'ন।

যাহোক চিঠিখানা হাতে নেবার একটু পরেই নেতাজীর আত্মস্থভাব কেটে যায়। তিনি চমকে উঠে বললেন, "তারাক্ষ্যাপা বেঁচে আছেন? কোথায় থাকেন, আমি দেখা করবো"। শশাঙ্কবাবু বললেন "উনি শহরের প্রান্তেই নিজ আশ্রমে থাকেন এবং বৈকালে লালবাগে যাওয়ার পূর্বেই যাতে দেখা হয় তার চেষ্টা করবো।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তারাক্ষ্যাপাজীর চিঠিটি খুললেন। লাল পেন্সিলে লেখা চিঠিটি। বিরানব্বুই বছর বয়স্ক মহাবিপ্লবী তারাক্ষ্যাপাজী লিখেছেন—

সুভাষ বসু।

৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভিয়েনার কথা মনে কর। পদ চুম্বন ধর্ম্ম নয়। ইন্দ্রকে "গোত্রভিৎ" বলে। আর বলদেবকে যমুনাভিৎ বলে। তুমি কিছু ভেদ করেছ? অষ্টবজ্র মিলন কাল এসে গেছে। কোথায় কার উদ্দেশ্যে যাইতেছ?

তোমাদের ×

পত্রটি পড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শশাঙ্ক সান্যাল মহাশয়ের হাতে পত্রটি দিয়ে বললেন, "দেখুনত শশাঙ্কবাবু, এ সব বুঝেন, উদ্ধার করতে পারেন"?

শশাঙ্কবাবু পত্রটি পড়লেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেদিনই তারা-ক্ষ্যাপাজীর সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ ভাবে অধীর হলেন। এই সাক্ষাতের ব্যাপারে শশাঙ্কবাবু উমাবনম্ আশ্রমে যান এবং ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় (নেতাজী শশাঙ্ক বাবুর পিতৃগৃহেই মধ্যাহ্ন

ভোজন করেন সেদিন) নেতাজীকে জানান যে তারাক্ষ্যাপাজী কলকাতায় তাঁর সাথে (শশাঙ্ক বাবু র) যোগাযোগ করে তাঁকে নিয়ে নেতাজীর সাথে সাক্ষাত ও আলোচনা করবেন।

নেতাজীর নির্দ্দেশে শশাঙ্কবাবু তারাক্ষ্যাপাজীর কাছে অষ্টবজ্র সম্মেলনের সহজ ব্যাখ্যা চাইলে, ভবিষ্যত দ্রষ্টা মহাপুরুষ তারাক্ষ্যাপাজী সেই চিঠির এক কোণে স্বহস্তে আবার লিখলেন নেতাজীকে, "তোমার কর্মক্ষেত্র ইউরোপের রণাঙ্গনে, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।" নেতাজী তা দেখলেন।

তারাক্ষ্যাপাজীর এই ভবিষ্যৎ বাণী পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে ফলে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা কালে নেতাজী ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ রাজশক্তিকে ফাঁকি দিয়ে জার্মানী গেলেন। সেখানে বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরী করে সেখান থেকে সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে সাবমেরিনে সমুদ্রের নীচ দিয়ে জাপানে গেলেন। সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহযোগে বিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার তৈরী করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনাপতি রূপে বৃটিশ ভারত আক্রমন করলেন এবং ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রবেশও করলেন। এই প্রচণ্ড আক্রমন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাবে ও ভারতের নৌ বিদ্রোহের দরুন শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেন।

ভারতীয় ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীক আজাদ হিন্দ ফৌজের সাবিক আঘাতেই যে শেষ পর্যন্ত মহাপরাক্রমশালী বৃটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ল, পরবর্তী কালে বৃটিশ সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তা স্বীকার করেছেন।

সত্য দ্রষ্টা ঋষি তারাক্ষ্যাপাজী নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য দেখতে পেয়েছিলেন। তাই ১৯৩৯ সালের ৩০শে নবেম্বর সুভাষচন্দ্রকে পত্রের মাধ্যমে তা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন।

১৯৪৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর (বাংলা ১৩৫২ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ) বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে গুরুমদ্রা ধারণ করে সজ্ঞানে প্রায় একশো বছর বয়সে মহাসমাধিতে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপাজী নরদেহ ত্যাগ করে তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার অমৃতময় কোল লাভ করলেন।

মর দেহত্যাগের পূর্বে আশ্রিত শিষ্য ভক্ত ও অজস্র অনুরাগীগণকে অভয় দিয়ে বলেছেন, "আমি সপ্তভূমি গ্রীষ্মময় পুরী, বর্ষাময় পুরী হিমালয় পুরী প্রভৃতি অতিক্রম করে বশিষ্ঠ ঋষির মত স্বদেহে পুনরায় ফিরে আসবো।"

মহাযোগী ও মহাবিপ্লবী তারাক্ষ্যাপাজীর মরদেহ ত্যাগের সংবাদে সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মহান জীবনী ও বাণী আলোচনা করা হয়।

১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারী কলকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে তারাক্ষ্যাপাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে বিরাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেশের বিশিষ্ট বিপ্লবী, দেশনেতা, শিক্ষাবিদ, মনীষী, লেখক প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষ তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। এই মহতি সভায় মহাবিপ্লবী তারাক্ষাপাজীর স্মৃতিরক্ষাকমিটিও গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতার ষ্টুডেন্ট হলে তারাক্ষাপাজীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে বিভিন্ন স্থানে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর।

শিবাংশ সম্ভূত মহাযোগী তারাক্ষ্যাপা দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে ঐশী নিদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করে আবার শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে গেলেন। কিন্তু যাবার পূর্বে শুনিয়ে গেলেন ফিরে আসার পরম আশ্বাস বাণী 'সম্ভবামী যুগে যুগে'।

—o—

শ্রীবাম কর্তৃক দিগম্বরের প্রাণ রক্ষা

পথ দিয়ে চলেছে যুবক দিগম্বর। সহসা এক সন্ন্যাসী দিগম্বরের সামনে এসে দাড়ালেন। তারপর দিগম্বরের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "তোমার পূর্বজন্মের ঘোর পাপের ফলে তোমার মৃত্যু আসন্ন। আজ থেকে সাত দিন পূর্ণ হলে কালসর্প দংশনে তোমার মৃত্যু হবে।" সন্নাসীর কথা শুনে আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কে দিগম্বর বিহবল হয়ে পড়লো। অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে এর থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলো সে সন্ন্যাসীর কাছে।

সন্ন্যাসী প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, "তোমাকে কালসর্প দংশন থেকে রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। তবে একটি উপায় তোমাকে বলতে পারি। তারাপীঠে 'বামাক্ষ্যাপা' নামে একজন মহাশক্তিবান মহাপুরুষ আছেন। কেবল তিনিই তোমাকে এই অবধারিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেন। তুমি তাঁর শরণাগত হও।" এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। সাতদিনের দিন দিগম্বর তার বিধবা জননী সহ অপরাহ্ন কালে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হ'ল। আর কয়েক ঘন্টা পরেই তার কাল সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটবার কথা। মৃত্যুর মহাভয়ে ভীত দিগম্বরের সুস্হ সবল শরীর এই এক সপ্তাহের মধ্যে অসুস্থ ও ক্ষীণ হয়ে গেছে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু চিন্তায়। দিগম্বর ও তাঁর জননী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সন্ধানে মহাশ্মশানে প্রবেশ করলো।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তারাপীঠের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ছড়িয়ে আছে সূর্যের শেষ স্তিমিত আলো। এই সন্ধ্যা যেন অনেকের জীবনের শেষ সন্ধ্যা হয়ে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে তার কালো পাখা মেলে। জীবন মরণের এই নিত্য দ্বন্দ্ব মধুর খেলার দ্রষ্টা হয়ে চিরন্তনী তারামায়ের লীলা চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছেন শিমুলতলায় শ্রীবাম।

এই সময় তাঁর পদতলে সজল নয়নে লুটিয়ে পড়লেন দিগম্বর ও তার জননী। নিবেদন করলো সাতদিন পূর্বের সেই সন্ন্যাসীর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত বাণী। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো "বাবা আজ সেই দিন।"

অন্তর্যামী শ্রীবাম সবই বুঝতে পারলেন। তবু ভক্তের একনিষ্ঠতা পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, "ওরে, আমি কি ওঝা, যে সাপের বিষ থেকে তোকে বাচাবো। তুই মন্দিরে গিয়ে তারামাকে ডাক। তাতে কাজ হবে"।

কিন্তু সন্ন্যাসীর বাক্য স্মরণ করে দিগম্বর আরো দৃঢ়ভাবে শ্রীবামের পদযুগল ধরে আর্ত স্বরে কাঁদতে লাগলো। দিগম্বরের জননীও কাঁদতে লাগলেন পুত্রের প্রাণ ভীক্ষা চেয়ে। ভক্তের কাতরতা ও একনিষ্টতায় শ্রীবাম প্রীত হলেন। এদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। মহাশ্মশান ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপ করতে লাগলো। করুণাময় শ্রীবাম দিগম্বরকে বললেন, "ওরে শাল, শিঘ্র নদীতে স্নান করে আয়। একটু পরেই কালসাপ আসবে তোকে মারতে।" তারপর দিগম্বরের জননীকে বললেন, "মা, তারামন্দিরে গিয়ে প্রাণভরে তারামাকে ডাক্। তাঁর কৃপা হলেই তোর ছেলে বাঁচবে।" সজল নয়নে দিগম্বরের জননী তারামন্দিরে চলে গেলেন। এদিকে দিগম্বরও তাড়াতাড়ি দ্বারকানদীতে স্নান করে ফিরে এল।

শ্রীবাম শিমুলতায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে শরণাগত দিগম্বরকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "প্রাণ ভরে "তারা" নাম জপ কর।"

তারপর দিগম্বরের চারদিকে গণ্ডি কেটে দিয়ে বললেন, "এই গণ্ডি ছেড়ে যাস্নি। তাহলেই শাল ফট্ হবি। ভয় নেই আমি কাছেই আছি।" এই বলে শ্রীবাম অদূরে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকারে চারদিক নিমগ্ন হ'ল।

মহাশ্মশান ক্রমশঃ বিভৎস রূপ ধারণ করতে লাগলো। শবমাংস নিয়ে শিবা সারমেয়র চিৎকার, শকুনি শাবকদের করুণ কান্না, অজস্র অশরীরীর অস্ফুট আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি সব মিলিয়ে মহাশ্মশান ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো।

ক্রমে শ্মশান বিভূতি শুরু হ'ল মহাশ্মশানে। শবমাংস ফেলে শিবা ও সারমেয়র দল শ্মশান ত্যাগ করে চলে গেল। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা নেমে এল মহাশ্মশানে। মহাশ্মশানের এই অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর। অতি ভয়াবহ মৌনতায় মহাশ্মশান মুখর হয়ে উঠলো। অতিবড় দুঃসাহসী শক্ত সমর্থ সাধকও এই অবস্থায় আসন থেকে উঠে পড়ে মহাশ্মশান থেকে বের হয়ে আসেন। সামান্য দুর্বল জীব দিগম্বরের পক্ষে তাই

এই প্রচণ্ড অসহ্য গভীর গম্ভীর মহামৌনতা সহ্য করা আরো অসম্ভব। কিন্তু প্রাণের দায়ে সে উঠতে পারছিল না। শ্রীবামের প্রদত্ত গণ্ডির মধ্যে বসে সে শ্রীবামের নির্দেশে প্রাণপণে 'তারা' নাম জপ করবার চেষ্টা করছে অর্ধচেতন অবস্থায়। সহসা দ্বারকানদী তীরের ঘোর জঙ্গল থেকে ফোঁস ফোঁস গর্জন শুনতে পেল দিগম্বর। শব্দটা ক্রমেই ছুটে আসতে লাগলো দিগম্বরের দিকে তীব্র বেগে।

হতজ্ঞান দিগম্বর মর্মে মর্মে বুঝতে পারলো সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপী কাল সাপ এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভীষণ ভয়ে জোরে জোরে 'তারা'নাম করবার চেষ্টা করলো কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হ'লনা। দিগম্বরের দেহমন বুদ্ধি ক্রমেই অবশ হয়ে যেতে লাগলো।

উঠে পালাতে গেলেও মৃত্যু নিশ্চিত অথচ বসে থাকতেও সাহস হচ্ছেনা। মৃত্যুর করাল মূর্তি নিয়ে কালসাপ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে তাকে মরণ দংশন করতে। এ এক অসহ্য অবস্থা। কিন্তু তারামা ও বামদেবের কৃপা যার ওপর হয়েছে তাকে কালসাপ কি করবে? তারামা ও শ্রীবামের কৃপায় দিগম্বর গণ্ডি ছেড়ে বের হ'ল না। গণ্ডির মধ্যেই বসে রইল প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়।

এদিকে বিরাট কালসর্প ঘোর গর্জন করে এগিয়ে এল দিগম্বরকে দংশন করতে। কিন্তু শ্রীবামের দেয়া গণ্ডির মধ্যে ঢুকতে পারছে না কালসর্প। যতবারই গণ্ডির মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করছে ততবারই গণ্ডি থেকে তীব্র মন্ত্রপূত তেজদৃপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছে। সেই তীব্র তেজ শিখার স্পর্শে বিরাট বিষধর কালসর্পের দেহ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছুতেই কালসর্প গণ্ডি অতিক্রম করে দিগম্বরকে দংশন করতে পারছে না। -

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিরাট কালসাপ বিশাল ফণা বিস্তার করে গণ্ডির চারপাশে ঘুরতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই শ্রীবামের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারলো না।

অবশেষে নিস্ফল আক্রোশে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বারবার বিষাক্ত ছোবল দিতে লাগলো গণ্ডির চারপাশে। তারপর ব্যর্থ হয়ে গর্জন করতে করতে দিগম্বরকে ছেড়ে কালসর্প চলে গেল। ক্রমে ভোর হয়ে এল। তারামন্দির থেকে পাণ্ডা ও ভক্তগণ একে একে আসতে লাগলেন শিমুল তলায়।

তাঁরা দেখলেন গণ্ডির মধ্যে দিগম্বর জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে আছে। গণ্ডির চার পাশে সর্প দংশন জনিত মৃত্যুরূপী অজস্র গরল জমে আছে। তাঁরা তারামায়ের চরণামৃত এনে দিগম্বরকে খাইয়ে সুস্হ করলেন। দিগম্বরের মা দিগম্বরকে সুস্হ দেহে পরম আনন্দে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই শ্রীবামের এই অলৌকিক শক্তি ও অপার করুণা প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হলেন। মহাভাগ্যবান দিগম্বরকে নিয়ে সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সন্ধানে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা মহা বিস্ময়ে দেখলেন শ্রীবাম যেন ধ্যানমগ্ন, স্তব্ধ তাঁর বিশাল দেহ। কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে তীব্র বিষে জর্জরিত হয়ে নীল বরণ ধারণ করেছে। উপস্থিত সবাই উপলব্ধি করলেন যে সেই কাল সর্পের সকল বিষ পরম করুণাময় শ্রীবাম তাঁর দিব্য অঙ্গে টেনে নিয়ে শরণাগত ভক্ত দিগম্বরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

সারা দিনরাত সেদিন একভাবে কেটে গেল নীলকন্ঠের অবতার নীলকলেবর শ্রীবামের। পরদিন জীবিত কুণ্ডে স্নান করে শ্রীবাম সুস্হ ও স্বভাবিক হলেন। প্রাণদাতা শ্রীবামকে প্রাণভরে প্রণাম করে ও শ্রীবামের আশীর্বাদ লাভ করে সানন্দে দিগম্বর ও তাঁর বিধবা মা নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। আনুমানিক বাংলা ১২৯৫ সালে শ্রীবামের এই অলৌকিক কৃপা লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

—o—

শারদীয়া চতুর্দশীর মেলা ও শ্রীবাম

শারদীয়া চতুর্দশীর শুভ আগমনে সমগ্র তারাপীঠ মুখরিত হয়ে উঠলো। স্নিগ্ধ শারদীয়ার এই শুক্লা কোজাগরী তিথিতে তারাপীঠ মহানন্দে মেতে উঠলো।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পূর্ণিমা তিথির পূর্বদিন এই মহাপবিত্র শ্রীশ্রীতারা পূজা তারাপীঠে যুগ যুগ ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সত্যযুগে মহামুনি বশিষ্ঠদেব বহু সাধনার পর এই তারাপীঠে এসে শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে চীনাচারে তারাসাধনা করে এই কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে ত্রিলোক তারিণী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের দর্শন লাভ করেন। পরবর্তীকালে রত্নাগড়ের সওদাগর জয়দত্ত বণিকও এই কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে তারামায়ের দর্শন কৃপালাভ করেন।

তাই বহুযুগ ধরে প্রতিবছর শরৎকালে এই পুণ্য তিথিতে মহাপীঠ তারাপীঠে বিরাট সমারোহে জগত জননী তারামায়ের তারাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মহাপূজা তারাপূজা উপলক্ষ্যে তারাপীঠে সাতদিন ধরে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয় (দ্রষ্টব্য তারাপীঠের পূজা পার্বন—প্র. খ.)।

এই পরম পবিত্র কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীর জোছনাভরা রাতে মহাসমারোহে ত্রিলোক জননী তারামায়ের ভোগমূর্তিকে তারামন্দিরের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিরাম খানায় এনে উচুবেদীতে স্থাপন করে সারারাত ধরে বিরাট সমারোহে পূজা করা হয়। হাজার হাজার সাধুসন্ত ও ভক্ত গৃহীবৃন্দ এই স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে জীবন সার্থক করেন। সমগ্র তারাপীঠ এই কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী রাতে বিনিদ্র থাকে পরম আনন্দে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারাপীঠের প্রধান কৌল সিদ্ধপরুষ আনন্দনাথ এই চতুর্দশীর মেলায় ধর্মসম্মেলন ও ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার প্রবর্তন করেন।

এই মহাপবিত্র চতুর্দশী মেলা উপলক্ষে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নাটোর প্রভৃতি স্থান থেকে বিভিন্ন রাজা মহারাজা জমিদার প্রভৃতি সেবক বৃন্দের পক্ষ থেকে জগত জননী তারামায়ের পূজা দেয়া হয়

চতুর্দশী তিথিতে। তারামাকে নানান বস্ত্র অলংকার দিয়ে সুসজ্জিত করে মহাসমারোহে পূজা দেয়া হয়।

এই কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এড়োলের, বাগডাঙ্গা, নশীপুর, জেমোকান্দি, দিনাজপুর, নাটোর, সাপুর প্রভৃতি থেকে এবং সেবক মল্লিকগণের পক্ষ থেকেও বিশেষ পূজা দেয়া হয়।

এই চতুর্দশী মেলার আরেক বিরাট আকর্ষণ তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। মেলার সাতদিন যেমন একদিকে পূজা, উৎসব, মেলা, যাত্রাপান, কীর্তন, বাউলগান প্রভৃতি চলতে থাকে অন্যদিকে সমাগত সাধু মনীষী ও ভক্ত গৃহস্হগণ দলে দলে শ্রীবামের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের জন্য শ্রীবামের কাছে উপস্হিত হ'ন। শ্রীবাম এই সাতদিন তারামায়ের ভাবে মহানন্দে বিভোর থাকেন। ভক্ত ও মুমুক্ষুদের ধর্ম উপদেশ দেন প্রয়োজন মত। বহু সাধুসন্তকেও নিগূঢ় সাধন পথের নির্দেশ দেন।

অনেক বিশিষ্ট মনীষী এই সময় শ্রীবামকে নানান অধ্যাত্ম প্রশ্ন করে তাঁদের জ্ঞানের ঝুলি পূর্ণ করে নেন। শ্রীবাম এই সময় কল্পতরু হয়ে যান। শুধু ধর্মালোচনা বা উপদেশ বা নির্দেশই নয়। এই সময় শ্রীবাম গানেতেও বিভোর হয়ে থাকেন। শুধু নিজেই তাঁর প্রিয় গীত সকল করেন না, তাঁর শিষ্য ভক্তদের দিয়েও নানান ধরণের গান করান।

সব মিলিয়ে চতুর্দশী মেলার সাতদিন এক নিবিড় আনন্দে সমগ্র তারাপীঠ মগ্ন হয়ে যায়। তারাপীঠেশ্বরী ব্রহ্মময়ী তারামাও যেন এই সময় নিত্য নতুন লীলায় মেতে ওঠেন।

তারামা এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য ও প্রত্যক্ষ প্রাণবন্ত উপস্তিতির আনন্দময় প্রভাব সমবেত শতশত সাধুসন্ত ও ভক্ত গৃহীর অন্তরে সুগভীর ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ১২৯৫ সালের এই শারদীয়া কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী তিথিও সেই মহান ঐতিহ্যের ধারা যথারীতি বহন করলো।

—০—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে কুমারানন্দ

বাংলা ১২৯৫ সালের শারদীয়া দুর্গাপুজার পর তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব শুক্লা চতুর্দশীর মেলা সবে শুরু হয়েছে। এই সময় ঘুরতে ঘুরতে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর থানার চাঁদাইপুর গ্রামের গৃহী ব্রাহ্মণ যুবক কুমারানন্দ তারাপীঠে এলেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করে আনন্দে আপ্লুত হলেন। যে অতৃপ্তি ও অশান্তি নিয়ে তৃষিত চাতকের মত বছরখানেক ধরে তিনি সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্ম পথের সঠিক নিশানা খুঁজছিলেন, তারাপীঠে এসে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করে তাঁর মনে হ'ল এতদিনে তিনি পেয়েছেন পরশ পাথর তথা তাঁর মনের মানুষকে।

তেত্রিশ বছরের যুবক কুলদানন্দ আশ্রয় নিলেন শ্রীবামের বিশাল বক্ষপুটে। সাধক কুমারনন্দের জন্ম বাংলা ১২৬২ সালের ২২শে আষাঢ় মুর্শিদাবাদের চাঁদাইপুর গ্রামে।

ছোটবেলায় তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা শেখেন। যৌবনে পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বহরমপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বাংলা ভাষা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই শিক্ষকতার কাজ করবার পর উত্তরকালে তিনি বর্মার যুদ্ধে সাময়িকভাবে কাজ পান। যুদ্ধ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তাঁর সাথে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে একটি সর্বগুণ সম্পন্না কিশোরীর বিবাহ হয়।

বর্মার যুদ্ধ শেষে বাড়ী ফিরে এসে তিনি অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের জন্য গভীর ভাবে ব্যাকুল হ'ন। অবশেষে বাংলা ১২৯৪ সালে বৃদ্ধা মা ও যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্ম গুরুর সন্ধানে বের হয়ে পড়েন।

প্রায় একবছর পর ঘুরতে ঘুরতে তারাপীঠে আসেন। তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হ'ন। গুরুজ্ঞানে শ্রীবামকে সেবা করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। অনেক পরীক্ষার পর শ্রীবাম কুমারানন্দকে "তারামা'র ভালছেলে" হয়ে থাকতে দিলেন। দীর্ঘ সাতমাস কুমারনন্দ নিবিড়ভাবে শ্রীবামের সান্নিধ্যলাভ করলেন।

শ্রীবামকে গুরুজ্ঞানে যথেষ্ট সেবা করলেন। প্রায় ছায়ার মত তিনি দিনরাত শ্রীবামের সাথে থাকেন।

তখনও (১২৯৬ সাল) শ্রীবামের আশ্রম গৃহ তৈরী হয়নি। রাতে কখনো শ্রীবাম কুমারানন্দকে নিয়ে শ্মশানে কখনো বা জীবিত কুণ্ডের ঘাটে, কখনো বিরামখানায় আবার কখনো তারা মায়ের মন্দিরের উত্তর দিকের আঙ্গিনায় অবস্থান করেন।

তারামন্দিরের উত্তরদিকের আঙ্গিনার পূর্বদিকের মন্দির দেয়ালে সীতাহরণের কাহিনী এবং পশ্চিমদিকের দেয়ালে কৃষ্ণলীলার কাহিনী খোদিত রয়েছে। শ্রীবাম পূর্বদিকে শয়ন করেন এবং তাঁর পদতলে পশ্চিমদিকে কুমারানন্দ শয়ন করেন।

তাই পরম রসিক শ্রীবাম রহস্য করে কুমারনন্দকে বলেন, "আমি রাবণ রাজার পদতলে থাকি আর আপনি কৃষ্ণঠাকুরের পদতলে থাকি।" ভক্ত ও সেবক কুমারানন্দ শ্রীবামের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে শ্রীবামের নিত্যলীলা প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করেন। একদিন শ্রীবাম কুমারানন্দকে নিয়ে দ্বারকার ওপারে কবিচন্দ্রপুরের মাঠের পুকুরে ফুল তুলতে যান। পুকুরটি পঙ্কে ও দামে পূর্ণ। তবু তার মধ্যে পঙ্কজ হয়ে রয়েছে অজস্র। এই পদ্মফুল দেখে শ্রীবাম ভাবে বিহ্বল হয়ে পুকুরের মাঝখানে একটি বড় পদ্মফুল তুলতে গেলেন। ফলে দামে জড়িয়ে ডুবে যেতে লাগলেন। কুমারানন্দ এই অবস্থা দেখে তখনি ডুব দিয়ে দাম ছিঁড়ে দেন।

শ্রীবাম আনন্দের সাথে বললেন "বাবা, আপনি ছিলেন তাই বাঁচলাম। নইলে তো কুবিদে বেটী মেরেছিল।" মূলত এই লীলার মাধ্যমে শ্রীবাম কুমারানন্দের নিষ্ঠা ও ভক্তি পরীক্ষা করলেন। এভাবে দীর্ঘ সাতমাস কেটে যায়। অবশেষে কুমারানন্দ শ্রীবামের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন।

শ্রীবাম তাঁকে 'তারা' নাম দিয়ে বললেন, "বাবা, এই 'তারা'নামই মন্ত্র। আর মন্ত্রতন্ত্র কি জানি। 'তারা তারা' জপ করবেন।" কিন্তু কুলদানন্দ এতে তৃপ্ত হলেন না। তিনি বীজ ও বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান চাইলেন। শ্রীবাম তাঁকে ধরা দিলেন না। তিনি জানেন ডাবুকের রাজসিক সিদ্ধসাধক কৈলাসপতি কুমারনন্দের ভাবীগুরু।

তিনি কুমারানন্দকে কৈলাসপতির কাছে যেতে বললেন। কিন্তু

কুমারানন্দের মনপ্রাণ জুড়ে আছেন শ্রীবাম। তিনি শ্রীবামের কাছেই দীক্ষা চাইলেন তথাকথিত বীজমন্ত্র ও আনুষ্ঠানিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু শ্রীবাম তা দিলেন না। তিনি জোর করে ডাবুকে কুমারানন্দকে কৈলাসপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বীরাচারী কৈলাসপতি কুমারানন্দকে বীরাচারে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দিলেন কুলদানন্দ। কিছুকাল পব কুলদানন্দের সাধ্বী স্ত্রী ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী দক্ষিণ গ্রামে এসে স্বামীর সাধন পথের নিত্য সাথী হলেন।

কৈলাসপতি তাঁকেও দীক্ষা দিয়ে কুলদানন্দের উত্তর সাধিকা করলেন। এই ধর্মপ্রাণ সাধক দম্পতি যথা তন্ত্রোক্ত আদর্শ ভৈরব ভৈরবী।

উত্তরকালে কুলদানন্দ সস্ত্রীক শ্রীবামকে দর্শন করতে আসেন তারাপীঠে। যথাস্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে।

—০—

শ্রীবাম কৃপাধন্য কেশবসাধু

বাংলা ১২৯৫ সালের হেমন্তকাল। সোনালী ফসলের নয়নাভিরাম দৃশ্য বীরভূমের মাঠে মাঠে।

মহাপীঠ তারাপীঠের দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে সেই সোনার ফসলের ঢেউ চারদিকে বিরাজমান। তার সাথে শীতের মধুর আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। পল্লীর ঘরে ঘরে নবান্নের আনন্দময় উৎসবের আসন্ন প্রস্তুতি চলছে। এমনি এক সোনালী সকালে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি। নাম শ্রী কেশব সেন। এক

নিবিড় আত্মিক যোগ যেন তাঁকে অদৃশ্য ভাবে আকর্ষণ করে মহাপীঠ তারাপীঠে নিয়ে এল। তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করলেন মহাশ্মশানে এসে।

শ্রীবামকে দর্শন করে গভীর ভাবে মুগ্ধ হলেন। শ্রীবামও তাঁর চিহ্নিত এই সাধক সন্তানকে দেখে প্রসন্ন হলেন।

কেশব সেন শ্রীবামের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন করলেন। কিছুকাল পর এক শুভক্ষণে শ্রীবাম কৃপা করলেন কেশব সেনকে। মহামন্ত্র তারামন্ত্রে তাঁকে দীক্ষা দিয়ে মহান অধ্যাত্ম পথের অধিকারী করলেন। যথাসময়ে শ্রীবাম শিষ্য কেশব সাধুকে তারা সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়া সকল যথাযথ প্রদান করলেন।

তারপর শ্রীবামের নির্দেশে তীর্থ পরিব্রাজনায় বের হলেন। বহু দুর্গম তীর্থ শিষ্য ভ্রমণ করবে তা অন্তর্যামী শ্রীগুরুবাম জানেন। তাই তারাপীঠ থেকে যাবার লগ্নে বললেন প্রিয় শিষ্য কেশবকে, "আর কিছু না নিস, জপের মালাটা নিয়ে যা।" এই বলে প্রিয় শিষ্য কেশবকে শ্রীবাম তাঁর একটি জপের মালা প্রদান করলেন।

সেই মহা শক্তিধর জপের মালা বুকে নিয়ে শিষ্য কেশব তারামা ও মহান গুরু শ্রীবামকে প্রণাম করে দীর্ঘ পরিব্রাজনার পথে বের হলেন। এক আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই কেশব সাধু। তাঁর বলিষ্ঠ ও পৌরুষদৃপ্ত দীর্ঘদেহ উজ্জল শ্যামবর্ণ এবং স্নিগ্ধ মুখশ্রী ও কুঞ্চিত কেশদাম এবং বিশাল নয়নদ্বয় নিবিড় সৌন্দর্য্যে ভরপুর। সব মিলিয়ে এই ব্রহ্মচারী সাধক প্রবর এক বিরাট পৌরুষের দীপ্ততায় সর্বদা পরিপূর্ণ। পরবর্তী কালে এই সাধক সন্যাসী সাধুর মাথায় বিরাট জটা হয়। মাথা থেকে পদতল পর্যন্ত সেই বিশাল জটা বিস্তার লাভ করে।

শ্রীবামের কৃপায় এই বীর তারা সাধক দীর্ঘকাল ধরে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অরেক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেন। বহু দুর্গম তীর্থে পরিভ্রমণ কালে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখী হ'ন কিন্তু প্রতিবারই শ্রীবামের অদৃশ্য কল্যাণ হস্ত তাঁকে রক্ষা করে। একবার আসামের জঙ্গলে তিনি নরখাদক বাঘের সামনে পড়লেন। পালাবার পথ নেই। তখন শ্রীগুরু বামকে

স্মরণ করলেন এবং ইষ্টদেবী তারামাকে স্মরণ করে বললেন, "তারামা, আমার দেহ থেকে মানুষের গন্ধ বের করে দে।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার সেই মুহূর্তে কেশব সাধুর দেহ থেকে মানুষের গন্ধ বিলীন হয়ে গেল। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার, বাঘ কেশব সাধুকে আক্রমণ করলো না। ধীরে ধীরে বাঘ তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।

আরেকবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় এক বিশিষ্ট মহাপুরুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে পড়লো। সহসা সেই মহাপুরুষ উঠে চলতে শুরু করলেন। কেশব সাধুও তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। হঠাৎ সেই মহাপুরুষ অদৃশ্য হলেন। সহসা অলৌকিক ভাবে তিনি দেখলেন যে হিমালয়ের এক তুষারাবৃত পর্বতের গুহার সামনে বরফের ওপর তিনি দাড়িয়ে আছেন। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সুদূর প্রয়াগের কুম্ভমেলা থেকে তথা সমতল থেকে হিমালয়ের এই বহু উচ্চ (বিশ হাজার ফুটের ওপর) বরফের পর্বতে কিভাবে তিনি এলেন তা বুঝতে পারলেন না। স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইলেন। তাঁর পদতলে বরফ, সামনে পেছনে ডাইনে বামে বরফ। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। চারদিকে এই তুষার শুভ্র বরফ আর আশ্চর্য গভীর নিস্তব্ধতা।

এক গভীর গম্ভীর মহামৌনতায় চারদিক পরিপূর্ণ। এ কোন অধ্যাত্মলোকে তিনি এলেন তা ভাবতে লাগলেন। ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামকে স্মরণ করতে লাগলেন। চারদিকে বরফের অগণিত পর্বত শৃঙ্গগুলো ঝকঝক করছে। যেন অসংখ্য শুভ্র ত্রিশূল অসীম অনন্ত নীলন নভোমণ্ডলকে স্পর্শ করে এক অব্যক্ত আনন্দে শান্ত সমাহিত হয়ে বিরাজ করছে। শিবশক্তির এই স্বর্গীয় মহামিলন প্রকৃতি দেবী যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন।

সহসা কেশব সাধু সবিস্ময়ে দেখলেন প্রয়াগের কুম্ভমেলার সেই মহাপুরুষ তাঁর পাশ দিয়ে সামনের বরফাবৃত গুহার মধ্যে বরফ ঠেলে প্রবেশ করলেন। কেশব সাধুও গুহাতে যেই প্রবেশ করতে যাবেন, তখনি সেই যোগী মহাপুরুষ তাঁকে নির্দেশ দিলেন গুহার বাইরে দাড়িয়ে থাকতে এবং সাধনা করতে। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে এক টানা বরফের ওপর অবস্থান করে কেশব সাধু গভীর ভাবে সাধনা করলেন।

এই সময় তিনি বরফের ওপর জপ সাধনা করতেন, বরফের ওপরই নগ্ন দেহে শয়ন করতেন এবং বরফই শুধু খেতেন। জগত

জননী তারামা ও মহাশক্তিধর গুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপায় তাঁর শীত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা কিছুই ছিলনা। এক অসীম ব্রহ্মানন্দে সর্বদা মগ্ন থাকতেন। তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্যমণ্ডিত বলিষ্ঠ দেহে এই সময় অযুত হস্তির বল সর্বদা অনুভব করতেন। উত্তরকালে হিমালয়ের এই ঋষিলোকের সাধনার কথা শিষ্যদের বলতে গিয়ে তিনি পরম আনন্দে বলেন, "এ সময় মনে হ'ত আমি তারামা ও গুরু বামাক্ষ্যাপার কোলে সর্বদা রয়েছি। তাঁদের দিব্য উপস্থিতি সর্বদা অনুভব করতুম। আমি যেন একটি ছোট্ট শিশু।"

আবার রহস্য করে বলতেন, "তারামা আমাকে এই দীর্ঘ বার বছর আইসক্রিম খাইয়ে রেখেছেন।"

কেশব সাধুর এই পরম বিস্ময়কর 'আইসক্রিম' খাওয়ার রহস্য হ'ল প্রতিদিন এই বরফের রাজ্যে এক দিব্যদর্শন শুভ্র গাভী কোথা থেকে এসে কেশব সাধুর সামনে উপস্থিত হ'ত। তারপর বরফের ওপর সাধনরত কেশব সাধুর সামনে দাড়ানো সেই শুভ্র পবিত্র গাভীর বাট থেকে ক্ষীরের মত মধুর দুগ্ধধারা ঝরে পড়তে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বরফের ওপর পড়া মাত্র সেই দুগ্ধ রাশি বরফের সাথে মিশে সুমিষ্ট আইসক্রিম হয়ে যেত।

সুদীর্ঘ বার বছর ধরে প্রতিদিন এই গাভী এইভাবে দুগ্ধ দিয়ে যায় কেশব সাধুকে। আর সুদীর্ঘ বার বছর এই অলৌকিক আইসক্রিম খেয়ে বেঁচে থাকেন এবং সাধনা করেন তারামায়ের প্রিয় সন্তান এবং শ্রীবামের প্রিয় শিষ্য কেশব সাধু। এই চিরতুষার রাজ্যে শ্রীগুরু বাম প্রদত্ত জপের মালাই কেশব সাধুর নিত্য সাথী। এই মহাসিদ্ধ জপের মালার কল্যাণে জনমানব শূন্য, বৃক্ষ তরুলতা তৃণশূন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণী শূন্য এই চির তুষার চির মহা মৌনরাজ্যে কেশব সাধু মহানন্দে মহান সাধনায় মগ্ন থাকেন। এই দীর্ঘ বার বছর তিনিও মৌন ছিলেন। এই ঋষিলোকের দিব্য মাহাত্ম্য কেশব সাধু পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন সুদীর্ঘ বার বছর ধরে।

অবশেষে সেই মহাপুরুষের নির্দেশে আবার অলৌকিক ভাবে বার বছর পর তিনি হিমালয়ের সেই চিরতুষার অপার্থিব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ঋষিলোক থেকে সমতলে নেমে আসেন।

আবার পরিব্রাজনা শুরু করেন ভারতের দিকে দিকে। এভাবে

আরো অনেক অলৌকিক লীলা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বার বার ঘটে।

ইতিমধ্যে তিনি তারাপীঠে এসে ইষ্টদেবীর ও শ্রীগুরু বামের সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটিয়ে যান। জীবনের সায়াহ্নে শ্রীগুরুবামের অলৌকিক ঐশী নির্দেশে ২৪ পরগণা জেলার বারাসতের দত্তপুকুর শ্মশানে আসন পাতেন। কলকাতাতেও তাঁর একাধিক শিষ্য ভক্তদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে পদার্পণ করেন।

তখন তাঁর বয়স একশো পঁচিশের ওপর। বাংলা ১৩৬১ সালে (ইং ১৯৫৫) শিয়ালদহের নিকট বৈঠকখানা বাজারের কাছে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অলৌকিক কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ও প্রবীন গৃহী সাধক শ্রীকেদার প্রসন্ন সান্যালের গৃহে মহান সিদ্ধপুরুষ কেশব সাধু আসেন। প্রথম পরিচয় অতি আশ্চর্য ভাবে ঘটে।

কেদারবাবু তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটি কাজে যাচ্ছিলেন। এই সময় রাস্তার মোড়ে দেখা হ'ল কেশব সাধুর সাথে। তাঁকে দেখেই কেশব সাধু বললেন, "বাবা, তুমি তো সংঘাতিক ছেলে। চল ঘরে, কেউটে গোখরো পুষেছ, চল দেখি ঘরে।"

তাই শুনে কেদার বাবু সাদরে কেশব সাধুকে নিয়ে তাঁর গৃহে এলেন। সেই থেকে মাঝে মাঝে কেশব সাধু আসেন কেদার প্রসন্ন সান্যালের বাড়ীতে।

শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবাযত্ন দিয়ে কেশব সাধুর হৃদয় জয় করলেন গুপ্ত সাধক কেদারবাবু। মাঝে হঠাৎ একদিন দত্তপুকুর শ্মশান থেকে চলে এলেন কেদারবাবুর অনুরোধে। কয়েকদিন পরেই মত পাল্টে ফিরে যান দত্ত পুকুরে। কেদারবাবু একবিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন এই মহান সাধকের দিব্য সান্নিধ্যে এসে। তিনি যখনই কেশব সাধুর কাছে বসেন, তার কিছুক্ষণ পরেই কেদারবাবুর সর্বশরীর জ্বলতে আরম্ভ করে। সেই জ্বালায় ব্যাথ্যা নেই অথচ আশ্চর্য উত্তাপ আছে।

এই সময় একদিন ভারত বিখ্যাত মহাযোগী পুরুষ বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী অলৌকিক ভাবে কেদারবাবুর বাড়ীতে আবির্ভূত হ'ন (পরম পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১২৯০ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের বারদীতে দেহত্যাগ করেন)।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কেদারবাবুকে স্পর্শ করা মাত্র তিনি জ্ঞান

হারিয়ে ফেলেন। তাঁর সাধ্বী স্ত্রীও জ্ঞান হারান। কেদারবাবুর ছেলে মেয়েরা এই অবস্থা দেখে কাঁদতে থাকেন। তখন শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বললেন, "আমার মৃত্যু নেই" এই বলে অন্তর্হিত হলেন। এরপর দু'তিন দিন শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী আসেন কেদারবাবুর গৃহে অলৌকিক ভাবে। তিনি খড়ম পায়ে শিয়ালদহের জনবহুল রাস্তা দিয়ে আসেন কেদারবাবুর বাড়ীতে। কিন্ত কেদারবাবু ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখতে পেতেন না। সহসা একদিন আবার শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী এলেন কেদারবাবুর গৃহে। এখন কেদার বাবু বা তাঁর স্ত্রী বাবাকে দেখে দেখে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। বাবাকে সহজ স্বাভাবিক ভাবেই পরম আনন্দে ও সমাদরে গুরুজ্ঞানে বরণ করেন এবং সাধ্যমত সেবা যত্ন করেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। হঠাৎ লোকনাথ বাবা এসে কেদারবাবুর ঠাকুর ঘরে বসে বললেন, "দেখ্, বামদেবের চেলা এলে 'ও' ঘরে (পাশের ঘরে) বসতে বলিস।" কি আশ্চর্য্য, একটু পরেই কেশব সাধুও এলেন। কেদারবাবু পাশের ঘরে কেশব সাধুকে সমাদর করে বসালেন।

কিছুক্ষণ পর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অনুমতি পেয়ে কেশব সাধু ঠাকুর ঘরে ঢুকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন পত্রপুষ্প দিয়ে। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী সানন্দে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সুযোগ্য শিষ্য কেশব সাধুকে। পরে কেশব সাধু কেদারবাবুকে বললেন, "যাক, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।"

লোকাতীত এই মহামানবের এভাবে প্রায়ই সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্থূল দেহ আবার স্থূল দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহে আসা যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা রইলো না কেশব সাধুর। কেশব সাধু বিস্মিত হয়েছিলেন যে, শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর ন্যায় এত বড় উচ্চ কোটির মহাপুরুষ যিনি এই সাক্ষাতের প্রায় পচাত্তর বছর পূর্বে মরদেহ ত্যাগ করেছেন এবং বিশেষভাবে সূর্য লোকে প্রস্হান করেছিলেন, সেই তিনি কি ভাবে সূর্যলোক থেকে নেমে এসে একজন সাধারণ ধর্মপ্রাণ গৃহীর গৃহে প্রায়ই আসা যাওয়া করেন? সেই উর্দ্ধলোক থেকে নেমে এসে স্থূল দেহ ধারণ করে?

কেশব সাধু শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর দর্শন ও স্পর্শ পেয়ে উপলব্ধি করলেন শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী যথার্থ ভক্তের ভগবান এবং সর্বত্র বিরাজমান। বারদীর এই ভারতবিখ্যাত মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর

জীবন কাহিনীও অতি বিস্ময়কর। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বাল্যবন্ধু শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ ইতিপূর্বে তারাপীঠে গিয়ে শ্রীশ্রী-বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করে অশেষ আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে মাধবানন্দজীর সাথে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য ত্রিশ অধ্যায়)।

যাহোক এই অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাথে সাক্ষাতের পর থেকে কেশব সাধু সপ্তাহে সপ্তাহে কেদারবাবুর পবিত্র গৃহে অসতে লাগলেন।

কেদারবাবুও যথাসাধ্য সেবাযত্ন করেন তাঁকে। তাছাড়া কম্বল ও অর্থ প্রভৃতি দিয়েও সহযোগিতা করেন। কেশব সাধুর কোলকাতার অন্যান্য শিষ্য ভক্তগণও যথাসাধ্য অর্থাদি দিয়ে সেবা করতেন। কেশব সাধুর দত্তপুকুর শ্মশানের আশ্রম গৃহেও কেউ কেউ যেতেন সেবার দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে।

একদিন দত্তপকুর শ্মশান থেকে কেশব সাধু কোলকাতায় কেদার বাবুর বাড়ীতে এসে বললেন, "আজ নোনতা খাবার ইচ্ছে হয়েছে। তাই তারামা পাঠিয়ে দিলেন।" কেদারবাবু সানন্দে নিমকি কচুড়ি এনে খাওয়ালেন।

কথায় কথায় কেদার বাবু একদিন কেশব সাধুকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করলেন। কেশব সাধু বললেন, "৩৫।৩৬ বছর"। একশো টা আর বললেন না। এই হিসাবে কেশব সাধু তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে আবার তিনি বলেন যে তিনি তাঁর গুরুদেব বামদেবের সমবয়সী।

হয়তো গুরু অন্তপ্রাণ কেশবসাধু তাঁর গুরুদেব বামদেবের প্রতি অসাধরণ ভক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশত "বড়" কথাটি কোনক্রমেই উচ্চারণ করতে চাননি।

কেশব সাধু প্রতিবছর কালীপূজোর দিন দত্তপুকুর শ্মশানে বড় করে কালীপূজা করতেন। কেদারবাবুর ইচ্ছে ছিল কেশব সাধু কোলকাতায় এসে বরাবর থাকেন। সেই রকম ব্যবস্থাও তিনি করতে ইচ্ছুক ছিলেন কেশব সাধুর শিষ্য ভক্তদের সাথে। কিন্তু কেশব সাধু দত্তপুকুর শ্মশানের নির্জন ও শান্ত পরিবেশ ত্যাগ করে কোলকাতার কোলাহলের মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না।

রহস্যকরে কেদারবাবুকে বললেন, "১০।১২ টাকা দেনা আছে, সেটা শোধ না করে আসলে লোকে চোর বাটপাড় মনে করবে।" কেদারবাবু তাঁর এই কথাকে 'শব্দ ব্রহ্ম' রূপে ব্যাখ্যা করে কেশব সাধুকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন সেই টাকা শোধ করে দিয়ে। কিন্তু কয়েকদিন থেকেই কেশব সাধু বললেন, "আর ভাল লাগছেনা।" এই বলে দত্তপুকুর শ্মশানে চলে গেলেন। বাংলা ১৩৬৯ সাল পর্যন্ত কেশব সাধুর সাথে কেদারবাবুর গভীর যোগাযোগ থাকে। একদিন কেশবসাধু তাঁর গুরু বামদেবের পরম পবিত্র সিদ্ধ জপের মালাটি কেদার বাবুকে এসে দিয়ে গেলেন।

বহুকালের এই মহাপ্রাণবন্ত সিদ্ধ জপের মালা কেদারবাবু শ্রদ্ধার সাথে নিত্য পূজা করতে থাকেন।

পরবর্তী তিন চার বছর কেশব সাধু মূলত দত্তপুকুর শ্মশানেই (নাম জকাল ঘাটা শ্মশান) জপ ধ্যান করে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি প্রায় অনশনে অর্ধাশনে অতিবাহিত করেন। তখন তাঁর দেহের বর্ণ কালো, মাথায় জটা, গালে বড় বড় দাড়ি। অসুস্থতার জন্য শেষ দিকে জটা কেটে ফেলা হয়। কেশব সাধুর এই শ্মশান আশ্রম গৃহের নিয়মিত পোষ্য হ'ল একপাল কুকুর বেড়াল। এদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেখেই স্থানীয় লোকেরা বুঝতে পারতেন যে এরা কেশব সাধুর কুকুর বেড়াল। বাংলা ১৩৭৪ সালে প্রায় ১৪৫ বছর বয়সে কেশব সাধু মধ্যাহ্ন কালে দেহত্যাগ করেন। কেশব সাধুর অজস্র অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন দত্তপুকুর ও বারাসতের বহু ভক্ত ও স্থানীয় জনগণ। কিন্তু তা সত্তেও এই উচ্চ কোটির মহান সিদ্ধপুরুষকে অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি।

যাহোক, তাঁর মরদেহকে দত্তপুকুর শ্মশানে তাঁর আশ্রম গৃহ সংলগ্ন স্হানেই উপবিষ্ট অবস্হায় সমাধি দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরস্পর বিরোধী ভাব থাকায় অপর লোকেরা কয়েকদিন পর কেশব সাধুর পবিত্র দেহকে সমাধী থেকে তুলে দাহ করেন।

কেশব সাধুর এক প্রবীন ভক্ত ও সেবক সতীশ সাধু সেই থেকে এই শ্মশান আশ্রমে বসবাস করেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীকেদার

প্রসন্ন সান্যাল এবং সতীশ সাধুর কাছে। তাছাড়া সহযোগিতার জন্য অমল কুমার সমাজদার ও অরুণ কুমার ব্রহ্মর (দত্তপুকুর, বারাসত) কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম স্নেহধন্য রামানন্দ ভারতী

গ্রীষ্মকাল। তারাপীঠের আকাশ বাতাস সূর্যের প্রখর কিরণে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত। সমগ্র বীরভূমের ওপর সূর্যদেবের এই অগ্নিবর্ষণ অকৃপণ ভাবে চলছে।

মাঠ ঘাট এই অগ্নিদাহে ভীষণ উত্তপ্ত। তারাপীঠের মহাশ্মশান এই প্রচণ্ড উত্তাপেও কিন্তু স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। অসংখ্য বিশাল বিশাল বৃক্ষ সমন্বিত এই মহাশ্মশানের নিবিড় শ্যামলিমা সূর্যের প্রখর কিরণকে প্রবেশ করতে দেয়নি। তার ফলে এই নিবিড় বনানীর মধুর ছায়া ক্লান্ত শ্রান্ত পথিককে যেন প্রাণদান করছে।

তারামায়ের কি বিচিত্রলীলা। রাতে যে মহাশ্মশান অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর পথিকের কাছে, দিনে সেই মহাশ্মশান পথিকের কাছে পরম শান্তি ও সুখের আশ্রয়।

তবু দিনের প্রখর দাবদাহের জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছে কখন এই ভয়াবহ অগ্নি স্বরূপ মার্তণ্ডদেব অস্তাচলে যাবেন।

গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয় থেকেই মানুষ সূর্যাস্তের প্রার্থনায় মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু আদিত্যদেব তাঁর কর্ম যথারীতি সম্পন্ন করে তারপর অস্তাচলে চলে গেলেন।

তারাপীঠের আকাশে বাতাসেও নেমে এল বহু প্রার্থিত স্নিগ্ধ মধুর শীতলতা।

আনুমানিক বাংলা ১২৯৭ সালে (ইংরেজী ১৮৯১) এমনি এক

গ্রীষ্মকালের গোধূলী লগ্নে আলো আঁধারের মুখরিত দ্বন্দ্ব মাঝে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন প্রবীন সাধক রামানন্দ ভারতী। ত্রিলোক-তারিণী তারামাকে প্রণাম করে শিমুল তলায় এলেন মহাযোগী মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার দর্শনে।

শ্রীবাম শিমুল তলায় তারামায়ের দিব্যভাবে বিভোর হয়ে আছেন। সাধক প্রবর রামানন্দ ভারতী এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীবামকে দর্শন ও প্রণাম করে রামানন্দ ভারতীর মনে হ'ল দীর্ঘকাল পর এমন একজন মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক মহাপুরুষকে দর্শন করে তাঁর জীবন সার্থক হ'ল।

বিগত কিছুকাল ধরে তিনি তন্ত্রসাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অনেক তান্ত্রিক সাধকের সান্নিধ্যে ইতিমধ্যে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের উপলব্ধি ও ক্রিয়াকর্ম তাঁকে যথার্থ আকৃষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সুপ্রাচীন মহাতন্ত্রপীঠ মহাপীঠ তারাপীঠে এসে তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব তথা মহাতান্ত্রিক মহাযোগী শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করেই সাধকপ্রবর রামানন্দ ভারতীর মনে হ'ল এতদিনে তাঁর মনের বাসনা তারামা পূর্ণ করলেন।

শ্রীবামও এই সরল উদার প্রাজ্ঞ এবং প্রবীন সাধককে দেখে প্রসন্ন হলেন। শ্রীবামের নির্দেশে রামানন্দ ভারতী কিছুকাল তারাপীঠে অবস্থান করেন এবং তন্ত্রের বহু নিগূঢ় ক্রিয়া আয়ত্ত করেন।

শ্রীবাম এই প্রবীন তন্ত্রসাধকের পবিত্র আধারে যোগ ও তন্ত্রের দিব্য শক্তি অকৃপণ ভাবে ঢেলে দেন। অবশেষে একদিন তারামা ও শ্রীবামের কৃপায় তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হ'ন রামানন্দ ভারতী। আপ্তকাম এই মহান প্রবীন সিদ্ধ পুরুষ উত্তর কালে ভারতের অন্যতম উচ্চ কোটির মহাপুরুষ রূপে সুচিহ্নিত হ'ন।

এই প্রবীন মহান সাধক যখন তন্ত্র সাধনার জন্য তারাপীঠ আসেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর অতিক্রম করে গেছে (তিনি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার চেয়ে বয়সে প্রায় দু'বছরের বড়)। তবু এই পরিণত বয়সে নবীন উৎসাহে তন্ত্রসাধনার গভীরতম প্রদেশে তিনি বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা তাঁর বিরাট প্রতিভা ও দুর্বার

ঐশী শক্তির বিস্ময়কর কৃপা হিসাবে সুচিহ্নিত। উত্তরকালে এই বিশিষ্ট তারা সাধক তথা সিদ্ধযোগী ও মহান তান্ত্রিক রামানন্দ ভারতীর কাছে থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন ভারতের বহু বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ নরনারী। হাজারীবাগ, রাঁচী, রামগড়, আলমোড়া, কাশী প্রভৃতি স্থানের বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হ'ন।

স্বামী রামানন্দ ভারতীর মধ্যে ব্রহ্ম, বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব সাধনার বিস্ময়কর সমন্বয় হয়েছে।

এই বিরাট আধার ও বহুমুখী প্রতিভার মহাসমন্বয় স্বরূপ রামানন্দ ভারতীর মহান জীবনও বহু বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

একাধারে মহাপণ্ডিত, কবি, লেখক, তেজস্বী ও সত্যসন্ধানী, সুবক্তা, বিশিষ্ট পরিব্রাজক, মহান যোগী, ও তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ রূপে স্বামী রামানন্দ ভারতীর খ্যাতি ছিল সর্বভারতীয়।

এই বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী স্বামী রামানন্দ ভারতীর পূর্বাশ্রমের নাম রামকুমার ভট্টাচার্য্য।

বাংলা ১২৪২ সালের (ইংরেজী ১৮৩৬ খ্রীঃ) পবিত্র মহাবিষুব সংক্রান্তীতে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রামের সামন্তসার পল্লীতে বিখ্যাত 'গিরার বাড়ী'র সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম রামগতি ভট্টাচার্য্য। রামগতি ভট্টাচার্যের তিন সন্তান—প্রথমটি কন্যা সন্তান উমা সুন্দরী এবং দুই পুত্র রামকুমার ও রামচরণ। রামকুমার বাল্যকাল থেকেই স্বল্পভাষী ও মিষ্টভাষী এবং সাধক প্রকৃতির। বাল্যকাল থেকেই তিনি পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু রামচন্দ্র সমাদ্দার ও পরবর্তীকালে ইদিলপুরের কীর্তিচন্দ্র শাণ্ডিল্য তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু হ'ন। যৌবনে তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'ন এবং 'বিদ্যারত্ন' উপাধী লাভ করেন।

উত্তরকালে তিনি "রামকুমার বিদ্যা রত্ন" রূপে সারাদেশে সুপরিচিত হ'ন।

রামকুমারের পিতৃগৃহ 'গিরার বাড়ী' নামে বিখ্যাত হ'বার কারণ গিরিধর নামে এক গিরিশ্রেণীর সাধক সন্ন্যাসী এই বাড়ীতে দীর্ঘকাল

অবস্থান করে সাধনা করেন এবং প্রসিদ্ধ "বুড়ামা" বিগ্রহটি তিনি স্থাপন করে যান। সেই থেকে এই বাড়ী 'গিরার বাড়ী' নামে বিখ্যাত হয়। রামকুমারের পিতা, যুবক রামকুমারের বিবাহের জন্য উদ্যোগী হ'ন।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া নিবাসী বিখ্যাত সন্ন্যাসী বংশের (এই বংশে অনেকে সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং সিদ্ধি লাভ করেন। তার মধ্যে রাম সন্ন্যাসী ও কৃষ্ণ সন্ন্যাসী অন্যতম) গুরুচরণ চক্রবর্তীর কন্যার সাথে রামকুমারের পিতা রামগতি ভট্টাচার্য্য রামকুমারের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই রামকুমারের পত্নী বিয়োগ হয়।

রামকুমার এই সময় কোলকাতায় এসে 'ওয়েসলিয়ান মিশন' স্কুলে প্রধান পণ্ডিত রূপে কর্মজীবন শুরু করেন।

কিছুকাল পর কোতরঙের বিখ্যাত তান্ত্রিক ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্নেহধন্য, বীরাচারী অচলানন্দের শিশু কন্যা জ্ঞানদাদেবীর সাথে রামকুমার ন্যায়রত্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কথিত আছে যে বিয়ের পর অচলানন্দ তাঁর মেয়ে ও জামাতা রামকুমারকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান এবং তাঁর অনুরোধে তাঁর কন্যা ও জামাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আশীর্বাদ করেন।

এই সময় কোলকাতায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবল জোয়ার চলছে। বিখ্যাত ব্রাহ্ম সমাজ নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়রত্নও ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হ'ন। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। মহর্ষি রামকুমারকে তাঁর নিজগৃহে কিছুকাল রাখেন। কিছুকাল পর রামকুমার ন্যায়রত্ন হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হ'ন।

এর ফলে পিতৃকুল ও শ্বশুর অচলানন্দের সাথে তাঁর প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বিচ্ছেদ ঘটে।

স্বধর্ম নিষ্ঠ, তেজস্বী ও বীরাচারী তান্ত্রিক অচলানন্দ জামাতার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং নিজ বালিকা কন্যা জ্ঞানদাকে স্বামী গৃহে যেতে দিলেন না। কিন্তু কিছুকাল পর রামকমার একদিন সহসা নিভৃতে এসে স্ত্রী জ্ঞানদা দেবীকে পিতৃগৃহ

থেকে চিরতরে নিয়ে যান। এরপর রামকমার ন্যায়রত্ন চন্দননগরে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম 'লেখক পণ্ডিত' রূপে কাজ করেন।

এদিকে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসে রামকুমার ক্রমে কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতাদের নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁদের অন্তরঙ্গ হ'ন।

এই সময় ব্রাহ্ম আন্দোলন উপলক্ষে রামকুমার আসাম গমন করেন। তাঁর রচিত "উদাসী সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ" গ্রন্থে তাঁর সুন্দর বিবরণ আছে। সেখানে চা বাগানের সর্বময় কর্তা হ'ল বিদেশী ইংরেজগণ। এই সাহেবরা চা বাগানের ভারতীয় শ্রমিকদের তথা কুলীদের ওপর যে অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার করে তার জীবন্ত চিত্র তেজস্বী ও সাহসী রামকুমার ন্যায়রত্ন তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুলী কাহিনী'তে তুলে ধরেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রাণবন্ত ও ক্ষুরধার লেখনী তৎকালীন অত্যাচারী ইংরেজদের নকল সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়ে আসল বর্বর রূপ প্রকাশ করে দেয়।

নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি অসম সাহসে তৎকালীন ইংরেজ সাহেবদের চা বাগানের সকল কুকর্ম প্রকাশ করেছেন। এটি প্রথমে বাংলায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ইংরেজী "রাইস অ্যাণ্ড রায়ত"-এ প্রকাশিত হয়। এর ফলে সারাদেশে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ বড়লাটের মসনদ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। দেশে বিদেশে এই নিয়ে বিরাট আন্দোলন শুরু হয় এবং দেশে বিদেশে তদন্তও শুরু হয়।

ফলে বড়লাটের আদেশে কুলী আইন সংশোধিত হয়। তার ফলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কুলী নর নারীদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে যে নারকীয় অত্যাচার চলছিল তা বন্ধ হয়।

সেই সময়ে একজন সামান্য বাঙ্গালী ধর্ম প্রচারক যুবকের পক্ষে অসীম শক্তিধর দুর্ধর্ষ বৃটিশ সাহেবদের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করবার কথা কল্পনারও অতীত ছিল।

কিন্তু জগত জননী তারা মা তাঁর চিহ্নিত সাধক সন্তানকে দিয়ে

সেই অকল্পনীয় ব্যাপারকে বাস্তবে রূপ দিলেন মহা সাফল্যের সাথে জয়যুক্ত করে। অত্যাচারী বৃটিশ সাহেবরা বহুবার রামকুমারের প্রাণ নাশের চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। আমেরিকার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো'র "আঙ্কল টমাস কেবীন" বইটি যেমন সেদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে দাসত্ব প্রথা বন্ধ করে দেয়, তেমনি রামকুমার ন্যায়রত্নের বিখ্যাত এই 'কুলী কাহিনী' গ্রন্থটি এদেশের কুলীদের ঘৃন্য দাসত্ব থেকে ও অপরিসীম নারকীয় অত্যাচার থেকে মুক্ত করে দেয়।

এরপর আসাম থেকে রামকুমার কোলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় ব্রাহ্ম সমাজের কাজে মগ্ন হ'ন।

ইতিমধ্যে উড়িষ্যাতে গিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কাজ, বিদ্যালয় স্থাপন, সমাজে উপাসনা প্রভৃতি কাজ সকল সুসম্পন্ন করেন।

ইংরেজী ১৮৭৮ খ্রীঃ রামকুমার বিদ্যারত্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কমিটির সদস্য হ'ন।

রামকুমার উত্তরবঙ্গ ও আসামে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য্যের ভার নিয়ে ছিলেন। বিরাট কর্মযোগী রামকুমার বিদ্যারত্নের দাম্পত্য জীবন স্বভাবত সংক্ষিপ্ত ছিল।

মূলত ইং ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত এই দশ বছর তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল। তখন তিনি কোলকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে থাকতেন সপরিবারে।

আনুমানিক ইংরেজী ১৮৮৮ সালে তিনটি শিশু কন্যা রেখে রাম-কুমারের পত্নীসহসা অকালে দেহত্যাগ করেন। রামকুমার তখন মেদিনীপুরে ভীষণ বন্যার জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল নিয়ে ত্রাণ কার্য্য করছেন। পত্নীর মৃত্যুর কিছুকাল পর ইং ১৮৯০ সালে তিনি হিন্দু ধর্মের বিধান অনুসারে দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে ব্রাহ্মদের সাথে তাঁর মতদ্বৈত হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করেন।

নর্মদার তীরে এক ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে তিনি হিন্দুমতে সন্ন্যাস নেন।

তাঁর গুরুদত্ত নাম হয় স্বামী রামানন্দ ভারতী। সন্ন্যাসের পর তিনি গৃহের বন্ধনে নিজেকে আর আবদ্ধ রাখলেন না। তাঁর তিনটি

শিশু কন্যা সুষমা, সুরমা, ও রমার জীবন ধারণের সকল ব্যবস্থা করে যান।

বড় মেয়ে সুষমা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ রইলো। মেজ মেয়ের ভার নিলেন তাঁর বিশিষ্ট ব্রাহ্ম বন্ধু ও সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং ছোট মেয়ে রমার দায়িত্ব নিলেন ব্রাহ্ম বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী।

এবার সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে চিরতরে সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক রূপে স্বামী রামানন্দ ভারতী হিমালয়ের পথে যাত্রা করলেন।

ইংরেজী ১৮৯০ খ্রীঃ থেকে ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ দ্বাদশ বছর তিনি মূলত পরিব্রাজনা (হিমালয়ে তিব্বতে এবং সমতলে), তন্ত্রসাধনা (তারাপীঠে), দীক্ষাদান (হাজারীবাগ, রাঁচী, রামগড়, আলমোড়া, কাশী প্রভৃতি স্হানে বহু ভক্ত নর নারীকে) এবং আশ্রম স্হাপন (কাশীতে) প্রভৃতি অধ্যাত্ম মূলক কর্ম সকল সুসম্পন্ন করেন।

বাংলা ১২৯৭ সনে (ইং ১৮৯১ খ্রীঃ) হরিদ্বারে ভারত বিখ্যাত পূর্ণ কুম্ভ মেলায় উপস্হিত হলেন।

তখন তিনি মূলতঃ দেরাদুনের বিখ্যাত টপকেশ্বর গুহায় মহাজাগ্রত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পাদদেশে থাকতেন।

এই সময় প্রায়ই একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প এসে তাঁর বুকের ওপর শুয়ে থাকতো।

যাহোক, হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভে এসে রামামন্দ ভারতী পূর্ণকুম্ভে সমাগত ভারতের সকল বিশিষ্ট মহাপুরুষদের সাথে মিলিত হলেন।

বিশ্বের এই বৃহত্তম শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম এবং প্রাচীনতম ধর্মমেলা হরিদ্বারে দীর্ঘ তিন মাস ধরে অনুষ্ঠিত হয়। ভারত আত্মার মহামিলন স্বরূপ এই পূর্ণকুম্ভ হরিদ্বারে শুরু হয় শ্রীপঞ্চমী থেকে। মূলত পাঁচটি পবিত্র স্নান নিয়ে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম স্নান শুরু হয় শ্রীপঞ্চমীর দিন। মুখ্য স্নান হ'ল চৈত্র সংক্রান্তীর দিন। মাঝে আরো দু'টি স্নান হয়। শেষ স্নান হয় বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। স্বামী রামানন্দ ভারতী হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভে যোগ দিলেন। প্রথম স্নান থেকে শুরু করে

মুখ্য স্নান ও অমৃত যোগের মহাস্নান চৈত্র সংক্রান্তীতে সুসম্পন্ন করলেন। শেষ স্নান বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে।

ইতিমধ্যে হরিদ্বারে সমাগত ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষদের অনেকের সাথেই রামানন্দ ভারতীর আত্মিক যোগ স্হাপিত হয়েছে। শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজ, শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীমাধবানন্দগিরি মহারাজ প্রভৃতি বহু ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষগণ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে উপস্হিত হয়েছেন। নামযজ্ঞ, ভাণ্ডারা, ভাববিনিময়, স্নান ও সুসজ্জিত মিছিলে হরিদ্বার তিনমাস ধরে গমগম করছে।

বিশ লক্ষাধিক সাধুসন্ত ও গৃহীদের সমাবেশ হয়েছে দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রধান দ্বার এই গঙ্গাদ্বার তথা হরিদ্বার তথা মায়াপুরে।

বিশ্বের এই প্রাচীনতম, বৃহত্তম, মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম ধর্মমেলা তথা কুম্ভমেলার ইতিহাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোরম।

সুপ্রাচীন স্কন্দপুরাণে এই কুম্ভযোগ তথা কুম্ভমেলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

এই কম্ভযোগের উৎপত্তির মূলে রয়েছে সত্যযুগে দেবাসুরের মিলিত প্রয়াসে অমৃত লাভের জন্য সেই সমুদ্র মন্থনের কাহিনী।

অমৃতলাভ করতে পারলে চির অমর হওয়া যাবে। জন্ম রোগ জ্বরা ও মৃত্যুর হাত থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে।

তাই দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর বৈরী হওয়া সত্তেও এই অমৃত লাভের জন্য একমত হয়ে একসাথে কাজ করতে এগিয়ে এলেন।

ইতিপূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ অমৃত কুম্ভের সন্ধান দেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে সাগর কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন।

এরপর ব্রহ্মকে বললেন, "দেবতা ও অসুরদের একসাথে সমুদ্র-মন্থন করতে বলুন। মন্থন শেষ হলে পর লক্ষ্মীদেবী এবং অমৃত কুম্ভ নিয়ে দেব বৈদ্য ধন্বন্তরী উঠে আসবেন। সেই অমৃত পান করলে অমর হবে।"

ব্রহ্মার নির্দেশে দেবগণ গোলকে এসে নারায়ণের শ্রীমুখ থেকেও

সেই নির্দেশ পেলেন। তারপর দেবগণ ও অসুরগণ অমৃত কুম্ভের জন্য একযোগে ব্রতী হলেন।

ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থন সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একে একে সবই ব্যবস্হা হ'ল। বিরাট বিপুল এই আয়োজন।

স্বয়ং বিষ্ণু কূর্মরূপে সাগরতলে অবস্হান করলেন। মন্দার পর্বত মন্হন দণ্ড রূপে সেই কূর্মের পৃষ্ঠে স্হাপিত হলেন। মন্হন রজ্জু হলেন স্বয়ং নাগরাজ বাসুকী। আর দুই চিরবৈরী দেবতা ও অসুরগণ যথাক্রমে বাসুকীর সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ ধরে মন্থন করতে লাগলেন।

একে একে ক্ষিরোদ সমুদ্র থেকে চন্দ্র, ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবা, অশ্ব, পুষ্পক রথ, অজস্র রত্নাবলী, সুরভিগাভী, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা প্রভৃতি উঠে এলেন। তারপর এলেন অমৃত কুম্ভ নিয়ে দেববৈদ্য ধন্বন্তরী ও শেষে লক্ষ্মীদেবী।

অসুরগণ ধন্বন্তরীকে চেনে না। তাই অমৃত কুম্ভের অমূল্য সম্পদের দিকে না তাকিয়ে লক্ষ্মীর জন্য ব্যস্ত হলেন।

ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পুত্র জয়ন্তকে গোপনে অমৃতকুম্ভ দিয়ে দেবলোকে পাঠালেন। অসুরগণ তা লক্ষ্য করলো না। কিন্তু অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য্য তা দেখতে পেয়ে অসুরদের জানালেন যে অমৃতকুম্ভ নিয়ে জয়ন্ত পালাচ্ছে অসুরদের বঞ্চিত করে।

অসুরগণ তখন জয়ন্তের পিছনে ধাওয়া করলো। দেবলোকের আটটি স্থানে জয়ন্ত কুম্ভ নিয়ে ভ্রমণ করলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন অমৃত কুম্ভটি রেখে। কিন্তু অসুরগণ আক্রমণ করতে আসায় পুনরায় ছুটতে লাগলেন। অবশেষে স্বর্গলোক ছেড়ে দেবরাজ-তনয় জয়ন্ত মর্ত্যে এলেন এবং মর্ত্যের চারটি স্থানে অমৃত কুম্ভ রেখে বিশ্রাম করলেন কিছুক্ষণ। এই চারটি স্হান হল—দেবভূমি হিমালয়ের গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী।

কিন্তু বিশ্রাম বেশীক্ষণ তাঁর কপালে ছিল না। অসুরগণ তাড়া করতেই আবার অমৃত কুম্ভ মাথায় নিয়ে ছুটতে লাগলেন।

হরিদ্বারে অমৃত কুম্ভ রাখবার কিছু পরেই জয়ন্ত তিনদিন ধরে ছুটে প্রয়াগে এলেন অমৃত কুম্ভ নিয়ে। সেখানে একটু বিশ্রাম করেই তিনদিন ছুটে নাসিকে, তারপর সেইভাবে ছুটে তিনদিন পর

উজ্জয়িনীতে এলেন। এভাবে তিনদিন পর পর দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত চার জায়গায় অমৃত কুম্ভ নামালেন এবং বার দিন পর ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থনের স্হানে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে অমৃত কুম্ভ নামিয়ে রাখবার সময়ে এই দিব্য অমৃতময় পূর্ণ কুম্ভ থেকে কয়েক ফোঁটা অমৃত ঝরে পড়েছে গঙ্গাদ্বার তথা হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে এবং তারপর প্রয়াগের ত্রিবেনীতে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নদীর সংগমে।

অমৃতের প্রথম স্বাদ কিন্তু দেবলোক পেল না। পেল পবিত্র মর্ত্যভূমি। তার মধ্যে সর্বপ্রথম পেল হরিদ্বারের ব্রহ্মার তপস্যা ক্ষেত্র মহাপবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড। নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে অমৃত পড়েনি। তবে পরম পবিত্র অমৃতকুম্ভ সেখানে কিছুক্ষণ অবস্হান করে সেই স্হান দু'টোকে অশেষ পবিত্র করে দিয়েছে।

যাহোক, জয়ন্ত তিনদিন পরপর এই চারটি স্হান ঘুরে বারদিন পর অমৃত কুম্ভ নিয়ে ফিরে গেলেন ক্ষিরোদ সমুদ্রের মন্থন ক্ষেত্রে। দেবতাদের একদিন হ'ল মানুষের ক্ষেত্রে একবছর। তাই তিন বছর অন্তর উপরোক্ত চার স্হানে অর্থাৎ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়।

অমৃত পড়বার জন্য হরিদ্বার ও প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভ হয়। বার বছর পর পর পূর্ণ কুম্ভ হয়। নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অর্ধকুম্ভ হয়।

অতঃপর জয়ন্ত পূর্ণকুম্ভ নিয়ে এলে তা নিয়ে অমৃত পানের জন্য দেবাসুরের যুদ্ধ শুরু হয়। তখন বিষ্ণু মোহিনী নারীর রূপ ধরে অসুরদের বিভ্রান্ত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে চির অমর করে দেন।

দেবতাদের ছদ্মবেশ ধরে রাহু ও কেতু—এই দুই অসুর অমৃত পান করতেই সূর্য ও চন্দ্র এই দুই দেবতা তা ধরে ফেলেন এবং বিষ্ণু সাথে সাথে সুদর্শণ চক্র দ্বারা এদের দুই জনের গলা কেটে ফেলেন। কিন্তু গলা পর্যন্ত অমৃত চলে গিয়েছিল বলে রাহু ও কেতুর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত অমর হয়ে যায়। সেই থেকে রাহু ও কেতু চিরশত্রু হয়ে যায় সূর্য ও চন্দ্রের ওপর।

যে যে যোগে এই অমৃত কুম্ভ হরিদ্বারে, প্রয়াগ ও নাসিকে এবং উজ্জয়িনীতে অবস্থান করেছিল তাকে কুম্ভযোগ বলা হয়।

এই কুম্ভ যোগের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর এবং অধ্যাত্মভাব মণ্ডিত।

মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব অপরিসীম।

দেবগুরু বৃহস্পতি যখন শনির ক্ষেত্র কুম্ভরাশিতে অবস্থান করেন এবং রবি (সূর্য) গ্রহ যখন মীন থেকে মেষ রাশিতে সংক্রামণ, করেন সেই সময়ে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তী তিথিতে হরিদ্বারে (ব্রহ্মকুণ্ডে) মহাস্নান তথা মহামেলা হয়।

বৃহস্পতি এক এক রাশিতে এক বছর অবস্থান করেন। তাই বারটি রাশি পরিক্রমা করে বার বছর পর পর কুম্ভ রাশিতে এলে এই পূর্ণ কুম্ভ হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হয়। তাই যুগ যুগ ধরে এই গ্রহের যোগে ও সঞ্চারে বার বছর পর পর হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বৃহস্পতি যখন মেষ রাশিতে অবস্থান করেন এবং রবি ও চন্দ্র মকর রাশিতে থাকেন এবং তিথি যখন অমাবস্যা হয় তখন প্রয়াগে সংগম ক্ষেত্রে (গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সংগমে) কুম্ভযোগ তথা কুম্ভ স্নান অনুষ্ঠিত হয়। মূলত পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তী তিথিতে এই কুম্ভমেলা হয়।

বৃহস্পতি যখন কর্কট রাশিতে অবস্থান করেন এবং রবি চন্দ্রও কর্কটে থাকেন এবং তিথি অমাবস্যা পড়ে তখন নাসিকে গোদাবরী নদীর তীরে কুম্ভ স্নান হয়। শ্রাবণ মাসে এই কুম্ভমেলা হয়।

বৃহস্পতির তুলা রাশিতে অবস্থান কালে ও রবি চন্দ্রও তুলা রাশিতে থাকাকালীন অমাবস্যা তিথিতে উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীর তীরে কুম্ভ যোগ তথা কুম্ভমেলা হয়। কার্তিক মাসে উপরোক্ত গ্রহ সমাবেশে ও অমাবস্যা তিথিতে উজ্জয়িনীতে কুম্ভ-স্নান হয়।

এই চার স্থানে অর্থাৎ হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে ও উজ্জয়িণীতে কুম্ভ স্নানের ফল অপরিসীম। বিশেষ করে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে এবং প্রয়াগের সংগমে অমৃত কুম্ভযোগের ফল সর্বাধিক। কারণ এই দুই স্হানেই কেবল অমৃত পড়েছিল। তাই মহাকাশে যখন উপরোক্ত গ্রহের অবস্হান ঘটে তখন হরিদ্বারে ও প্রয়াগে

অমৃত কুম্ভযোগ তথা পূর্ণকুম্ভ যোগ স্বরূপ পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মহা কুম্ভ যোগে স্নান করলে এক লক্ষ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ, এক লক্ষ বার পৃথিবীর সকল তীর্থ ভ্রমণ ও এক হাজার বার বাজপেয়ী যজ্ঞের অসীম ফল লাভ হয় বলে জানা যায়।

যে মহাভাগ্যবান এই মহা অমৃত যোগে স্নান করেন তিনি দেহান্তে অমৃত লাভ করে দিব্য ধামে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই জন্ম রোগ, শোক জরা মৃত্যুময় পৃথিবীতে নাও আসতে পারেন। চিরকাল পবিত্র নিত্য দিব্য ধামে থেকে যেতে পারেন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম এই কুম্ভমেলার আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

যুগ যুগান্ত ধরে ভারতবর্ষে এই মহান কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সুপ্রাচীন স্কন্দ পুরাণে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক দিক থেকে এর প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চেয়েঙ্গে ৬৪৪ খৃষ্ঠাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দর্শন করে স্তম্ভিত হয়ে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় সেই সময় পাঁচ লক্ষ সাধুসন্ত ও গৃহী প্রয়াগের সংগমে স্নান করেন সেই কুম্ভ যোগে।

দশম শতাব্দীতে জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য এই কুম্ভমেলাকে একটি সার্বিক অধ্যাত্মরূপ দান করেন।

কুম্ভমেলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তিনি ভারতের চারদিকে চারটি মঠ স্থাপন করেন ও ভারতের সকল সন্ন্যাসীদের দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করে এই চার মঠের অধীনে নিয়ে আসেন এবং এই দশনামীগণই হরিদ্বারে প্রয়াগে নাসিক ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায় মিলিত হয়ে শঙ্করাচার্য্য নির্দেশিত পথে শোভাযাত্রা করে কুম্ভ যোগে স্নান করেন। এই দশনামী সম্প্রদায় হ'ল, পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, সাগর, ও পর্বত।

এই দশনামী সম্প্রদায় চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার মঠের অন্তর্গত হয়।

শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত চার মঠ হ'ল, ভারতের উত্তরে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ (বদ্রীনারায়ণ থেকে উনিশ মাইল নিম্নে অবস্হিত), দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে গোবর্ধন মঠ ও পশ্চিমে সারদা মঠ।

শঙ্করাচার্য্য বেদকে চার ভাগ করে এই চার মঠের অন্তর্গত করেন।

তাই উত্তরে যোশী মঠের প্রধান শাস্ত্র অথর্ব বেদ। এই মঠের আরাধ্য হ'ল বদ্রীনারায়ণ। এই যোশী মঠের অন্তর্গত হ'ল গিরি, সাগর ও পর্বত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ।

দক্ষিণ ভারতের মহিশূর রাজ্যের অন্তর্গত শৃঙ্গেরী মঠের প্রধান শাস্ত্র হ'ল যজুর্বেদ। আরাধ্য দেবতা হলেন রামেশ্বরম্। এই মঠের অন্তর্গত হ'ল পুরী, ভারতী ও সরস্বতী সম্প্রদায়।

পূর্ব ভারতের পুরুষোত্তম তথা পুরীর গোবর্ধন মঠের প্রধান শাস্ত্র হ'ল ঋক বেদ। আরাধ্য দেবতা হলেন জগন্নাথ। এই মঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হ'ল বন ও পর্বত।

পশ্চিম ভারতের দ্বারকায় সারদা মঠের প্রধান শাস্ত্র হ'ল সামবেদ। আরাধ্য দেবতা হলেন দ্বারকাধীশ। এই সারদা মঠের অন্তর্গত হ'ল তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ।

এই দশনামী সম্প্রদায় আবার সাতটি আখড়ায় বিভক্ত তাহল— নির্বানী, নিরঞ্জনী, জুনা, অটল, আনন্দ, আবাহন ও অগ্নি। নির্বানী, নিরঞ্জনী ও জুনা এই তিন নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরঞ্জনী ও জুনা নাগা সন্ন্যাসীগণ হরিদ্বারে কুম্ভ যোগে স্নানের শোভাযাত্রায় সর্বপ্রথম থাকেন।

প্রয়াগে নির্বানী সম্প্রদায়ের নাগাগণ সর্বপ্রথম কুম্ভ স্নানের শোভা-যাত্রায় থাকেন।

হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মূলত তিন মাসব্যাপী। কুম্ভমেলার প্রধান স্নান পাঁচটি।

শ্রীপঞ্চমী থেকে স্নান শুরু হয়। মাঝে শিবরাত্রি ও আরেকটি

যোগে স্নান হয়। তারপর প্রধান স্নান চৈত্র সংক্রান্তীতে হয়। সব শেষে বৈশাখী পুর্ণিমায় শেষ স্নান হয়।

প্রয়াগেও তিন মাস ব্যাপী পূর্ণ কুম্ভে পাঁচটি স্নান হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রধান স্নান মকর সংক্রান্তী তিথিতে।

শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত এই মঠের অধীনে ভারতের দশনামী সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীকে নিজেদের নাম গোত্রে এই চার মঠের দীক্ষা ক্ষেত্রে অঙ্কিত করতে হয়। এজন্য চার মঠের অধীনে বাহান্নটি দীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

তার মধ্যে সাতাশটি যোশী মঠের গিরি সম্প্রদায়ের অধীনে, শৃঙ্গেরী মঠের অধীনে বিশটি (পুরী সম্প্রদায়ের অধীনে ষোলটি, চারটি ভারতী সম্প্রদায়ের অধীনে), গোবর্ধন মঠের অধীনে চারটি (বন সম্প্রদায়ের অধীনে) এবং বাকি একটি লামা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের অধীনে।

শঙ্করাচার্য্যের পাঁচশত বছর পর ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সময় মহাসাধক মধুসূদন সরস্বতী মূলত নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

সেই সময় মুসলমান সৈন্যরা কুম্ভমেলায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের ওপর খুবই অত্যাচার করতো। অহিংস ও নিরস্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীগণ নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করতেন।

একবার সম্রাট আকবরের মরণাপন্ন কন্যাকে মধুসূদন সরস্বতী যোগ বলে সুস্থ করে দেন। ভারতবিখ্যাত এই বৈদান্তিক ও মহাযোগীকে সম্রাট আকবর শ্রদ্ধার সাথে কিছু দিতে চাইলে মধুসূদন সরস্বতী তখন আকবরকে কুম্ভমেলায় হিন্দু সাধুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা বলেন।

সম্রাট তখন তাঁকে বলেন যে আপনাদের আক্রমণ করলে আপনারাও সশস্ত্র হয়ে পাল্টা আক্রমন করবেন। এতে আমার সম্মতি রইলো। সেই রূপ ঘোষণাও সম্রাট আকবর করলেন।

তখন মধুসূদন সরস্বতী চির উদাসী ও নির্ভীক নগ্ন সাধুদের সশস্ত্র করে নাগা সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন।

বিগত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে সেই থেকে সশস্ত্র নাগাগণ কুম্ভমেলার

স্নানের শোভা যাত্রায় সর্বপ্রথম থাকেন। নাগা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা মধুসূদন সরস্বতী বাঙ্গালীর গৌরব। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় এই মহাপুরুষের জন্ম। ১৫১১ খৃঃ প্রয়াগে কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন। তিনি নীলাচল থেকে প্রয়াগে আসেন এবং প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা ও দীক্ষাদান করে প্রয়াগ ঘাট থেকে কাশী যান। ১৫৭৫ খৃঃ প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সম্রাট আকবর ও বীরবল উপস্থিত হয়ে মেলা দর্শন করেন। কুম্ভমেলায় প্রতিটি মণ্ডলীর থেকে একজন মণ্ডলীশ্বর নির্বাচিত হ'ন।

সাধারণতঃ দশনামীর অন্তর্গত পরমহংস সম্প্রদায় থেকে এক-প্রান্তের সন্ন্যাসীগণ মণ্ডলীশ্বর নির্বাচন করেন। বাংলা ১২৯৭ সালে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভে ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষগণ যোগদান করেন।

তাঁদের মধ্যে ভোলাগিরি মহারাজ, রামদাস কাঠিয়া বাবা, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, মাধবানন্দ গিরি মহারাজ, দয়াল দাসজী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেই সময় ও পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে প্রতিটি কুম্ভমেলায় বিশেষভাবে দেখা যেত হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা ও দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে। সেই থেকে কুম্ভমেলায় একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত হয় তা'হল—

"ভোলা কাঠিয়া বালা তিন নিয়ে কুম্ভমেলা।"

কুম্ভমেলা মূলত সাধুদের মেলা। আধ্যাত্মিক ভাব বিনিময়ের মহামিলন মেলা। ভক্ত গৃহীগণও এতে অংশ নেন। ঈশ্বর দ্রষ্টা এই মহাপুরুষদের দিব্য সান্নিধ্যে এসে অনেকের জীবন ঈশ্বর পথে চালিত হয়। অনেকে লাভ করেন মহান দীক্ষা। এই কুম্ভ মেলায় এসে (প্রয়াগে) বিখ্যাত অ্যাডভোকেট তারাকিশোর চৌধুরী, রামদাস কাঠিয়া বাবার দর্শন ও কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন।

উত্তরকালে রামদাস কাঠিয়া বাবার সুযোগ্য শিষ্যরূপে তিনি সুচিহ্নিত হ'ন। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভারত বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ সন্তদাস বাবাজী নামে পরিচিত হ'ন এবং রামদাস কাঠিয়া বাবার আশ্রমের অধ্যক্ষ রূপে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান হ'ন।

এভাবে আরো কত বিশিষ্ট গৃহীভক্তের জীবন অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হয়েছে কুম্ভ মেলায় এসে, তার হিসেব নেই।

শুধু অমৃতত্বের অনুভব নয়, এই অমৃত কুম্ভের পথে এসে জীব তার নিজ আনন্দময় অমৃতমথিত স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজ আত্মায় বিশ্বাত্মা অনুভব করে দিব্য আনন্দে বিভোর হ'ন।

জীবত্ব ছেড়ে, নাম রূপের অতীতে গিয়ে শিবত্ব লাভ করে হ'ন আপ্তকাম।

অমৃত কুম্ভের এই বহিরঙ্গের মধ্য দিয়ে মানুষ অন্তরঙ্গের কুম্ভ যোগেও ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন। এই যৌগিক স্নান নিত্য ও শাশ্বত। মেরুদণ্ডের তলদেশ থেকে সূক্ষ্ম অবস্থানরত ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে (গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেনী স্বরূপ) মূলাধারে অবস্থানরত চৈতন্যময়ীকে সহস্রারে পৌঁছে দিয়ে মহাশক্তি ও সদা শিবের মহামিলন ক্ষেত্রে স্নান করলে জীব লাভ করে এই অমৃততত্ত্ব। জীবের মুক্তি স্নান হয় এই মহাসংগমে।

জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের অতীতে গিয়ে 'কারণ' দেহে লাভ করে এই শিবস্বরূপ। তখন জীব জগত ব্রহ্ম একাকার হয়ে যায়। তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধ্যান, ধ্যাতা, ধ্যেয় এক হয়ে গিয়ে অমৃত-স্বরূপ তথা মহামুক্তি স্বরূপ 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম' দর্শনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী যে অবিরাম অমৃত ধারা বর্ষিত হচ্ছে তা পান করতে করতে নিজ আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে সে মিশে যায়।

পরম পবিত্র অমৃত কুম্ভ তারই আনন্দময়, নিত্য ও শাশ্বত রূপ।

হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হ'ল। পূর্ণ কুম্ভ সেরে রামানন্দ ভারতী এবার বিদায় নিলেন সমাগত বিশিষ্ট সাধু মহাপুরুষদের কাছ থেকে। বিশেষ করে সুপরিচিত ভোলা গিরি মহারাজ, রামদাস কাঠিয়া বাবা, বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও মাধবানন্দ গিরি মহারাজের কাছ থেকে।

উপরোক্ত প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্তরঙ্গ সুহৃদ। বিশেষ করে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা ও ভোলাগিরি মহারাজ। তাঁরা দু'জনেই তারাপীঠে এসেছেন। শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন কিছুকাল (যথাস্থানে বর্ণিত হবে)। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাথেও শ্রীবামের সূক্ষ্ম যোগাযোগ ছিল গভীর। বালানন্দজীর অন্যতম গুরু-ভাই ছিলেন শ্রীবামের অন্যতম শিষ্য পাহাড়ি বাবা।

যাহোক, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান বলে কুম্ভমেলার

এই তিন প্রবাদ পুরুষ 'ভোলা, কাঠিয়া, বালা' স্বামী রামানন্দ ভারতীকে সাদর বিদায় জানালেন।

হরিদ্বার থেকে বের হয়ে পদব্রজে রামানন্দ ভারতী দুর্গম বদ্রীনারায়ণ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সন)। সাথে সাথী হিসাবে জলধর সেন এবং অচ্যুতানন্দ। বদ্রীনারায়ণ দর্শন করে প্রায় দু'মাস পর ফিরে এলেন।

জলধর সেন তাঁর "হিমালয়" গ্রন্থে এ সম্পর্কে মনোরম বিবরণ দিয়েছেন।

তারপর রামানন্দ ভারতী উত্তর ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করে ক্রমে গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, গোমুখ, কেদারনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। তাঁর "হিমালয় ভ্রমণ" গ্রন্থে এর অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রকৃতি প্রেমিক, ভাবুক ও কবি।

হিমালয় পরিভ্রমণের মাঝে মাঝে তিনি সমতলে নেমে আসেন এবং হাজারীবাগ, রাঁচী, রামগড়, কাশী প্রভৃতি স্থানে শিষ্য ও ভক্তদের গৃহে যাতায়াত করেন এবং তাঁদের অধ্যাত্মপথে চালিত করেন।

মাঝে মাঝে কোলকাতায় এসে কন্যাদের এবং বন্ধুদের দেখে যান।

বাংলা ১৩০১ সালে (ইং ১৮৯৫ খ্রীঃ) তারামায়ের কৃপাধন্য এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্যশক্তি ও আশীর্বাদধন্য স্বামী রামানন্দ ভারতীকে কেন্দ্র করে জগত জননী তারামা এক অপূর্ব দিব্যলীলা ঘটালেন হাজারীবাগে। হাজারীবাগ শহরে যেখানে দুর্গা পূজার মেলা হয়, সেখানে এক বাড়ীতে একদিন গভীর রাতে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দম্পতি গভীর নিদ্রামগ্ন।

এই ভক্ত দম্পতির নাম শ্রীলোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মনোরমা দেবী। লোকেন্দ্রনাথের পিতার নাম যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

গভীর রাতে জগত জননী তারামা স্বপ্নে দেখা দিলেন ধর্মপ্রাণা সাধ্বী মনোরমা দেবীকে। মধুর কন্ঠে অপার করুণাময়ী তারামা বললেন, "আমি তারামা, আমার পূজা কর। তোদের ভাল হবে।"

ভক্তিমতী মনোরমা দেবী স্বপ্নের মধ্যেই ব্যাকুলভাবে বললেন, "কিন্তু মা, আমরা যে বড় গরীব। তোমার পূজা করি সাধ্য কি।"

ঘুম ভেঙ্গে গেল মনোরমা দেবীর। স্বামীকে বললেন এই দিব্য স্বপ্নাদেশের কথা। ভক্তপ্রবর লোকেন্দ্রনাথ আনন্দে রোমাঞ্চিত হলেন। কিন্তু তারামায়ের নিত্য সেবা পূজা করবার সামর্থ তাঁর নেই। দারিদ্র্য তাঁর নিত্য সাথী। তবু সাধ্য না থাকলেও সাধ আছে পূজো করবার। বিশেষ করে ত্রিলোকজননী তারামা স্বয়ং এসে দর্শন দিয়ে যখন বলেছেন। কিন্তু কিভাবে কি করবেন, তা ভেবে পান না এই ব্রাহ্মণ দম্পতি। কিন্তু যাঁর কাজ তিনিই ব্যবস্থা করেন। মানুষ শুধু ভেবে মরে।

অনন্ত করুণার মহাসিন্ধু তারামাই সব ব্যবস্থা করলেন। ত্রিলোকতারিণী তারাময়ের কৃপাধন্য এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সঙ্গধন্য তারাবিদ্যার অধিকারী ও তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ রামানন্দ ভারতী তারাপীঠ থেকে সহসা হাজারীবাগে তাঁদের গৃহে এলেন।

কৃপা করে তারামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ভক্ত লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাধ্বী পত্নী মনোরমা দেবীকে। গুরুদেব রামানন্দ ভারতী শুনলেন এই দম্পতির কাছ থেকে তারামায়ের স্বপ্নাদেশের কথা। সব শুনে প্রসন্ন হয়ে তিনি তারামায়ের একটি অপূর্ব সুন্দর ছবি লোকেন্দ্রনাথ ও মনোরমা দেবীকে দিয়ে বললেন যে সাধ্যমত নিত্য সেবাপূজা করবার। তারপর তিনি হাজারীবাগে তাঁর অন্য শিষ্য ভক্তদের গৃহে চলে গেলেন।

এই অপূর্ব যোগাযোগে ও তারামন্ত্রে নবদীক্ষিত হয়ে এবং তারামায়ের ছবি পেয়ে এই ব্রাহ্মণ দম্পতি অশেষ আনন্দিত হলেন। কিন্তু কিভাবে কি উপাচারে সেবা পূজা করবেন তা ভেবে পান না। ভক্ত বৎসলা পরম করুণাময়ী তারামা এই সমস্যার সমাধানও করে দিলেন।

ত্রিলোকপালিনী তারামা দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে মনোরমা দেবীকে বললেন, "যে ভাবে তোর ছেলে মেয়েকে খেতে দিস্, সেই ভাবেই আমাকে খেতে দিবি। ভক্তি করে পূজো করবি। আমি তাতেই খুশি হ'ব।"

তারামায়ের এই দ্বিতীয়বার স্বপ্নাদেশ পেয়ে মনোরমা দেবী

অপরিসীম আনন্দিত হলেন। পরদিন থেকে এই দরিদ্র সংসারে প্রতিদিন যা রান্না করেন মনোরমা দেবী, তাই একথালা প্রথমে তারামায়ের সেই ছবির সামনে নিবেদন করতে থকেন। তারপর বাড়ীর সবাই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

করুণার মহাসমুদ্র তারামায়ের কৃপালহরিতে নিত্য স্নাত হতে থাকেন লোকেন্দ্রনাথ সপরিবারে। ধীরে ধীরে লোকেন্দ্রনাথের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হ'ল। ক্রমে সংসারে আর্থিক ঐশ্বর্য প্রচুর হ'ল। ক্রমে লোকেন্দ্রনাথ হাজারীবাগ তথা রামগড়ের একজন বিশিষ্ট ধনী জমিদার রূপে সুপরিচিত হলেন।

মাঝে মাঝে গুরুদেব রামানন্দ ভারতী আসেন লোকেন্দ্রনাথের গৃহে। দু'একদিন অতিবাহিত করেন প্রিয় শিষ্য গৃহে। তারপর যথারীতি সাধন পথের নির্দ্দেশ দিয়ে আবার হিমালয়ের পথে চলে যান।

একবার রামানন্দ ভারতী এসে লোকেন্দ্রনাথকে তাঁর ত্রিশূলটি দিয়ে যান। সাধক প্রবর লোকেন্দ্রনাথ গুরুপ্রদত্ত এই শক্তিধর ত্রিশূলটিকে নিত্য পূজা করেন। সাত্বিক ব্রাহ্মণ এবং তারাসাধক লোকেন্দ্রনাথ প্রতিদিন তারাপূজা করতেন গুরু রামানন্দ ভারতীর নিগূঢ় নির্দেশ অনুসারে। তিনি কুম্ভক করে মাটি থেকে প্রায়ই ওপরে উঠে যেতেন।

লোকেন্দ্রনাথ বাবুর প্রথম পুত্র ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ও অত্যন্ত সাত্বিক ছিলেন। গুরু রামানন্দ ভারতীর নির্দেশে ভোলানাথ বাবু তাঁর পিতার কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। শোনা যায়, ভোলানাথ বাবুর নামকরণও রামানন্দ ভারতী করেছিলেন।

যৌবনে ভোলানাথ বাবু প্রায়ই হাজারীবাগ থেকে তারাপীঠে যেতেন তারাময়ের দর্শনের জন্য এবং প্রত্যেককে তারাপীঠে যেতে বলতেন।

কর্মজীবনে একবার তিনি হাজারীবাগ থেকে গিরিডিতে বদলী হয়ে যান। কিছুদিন পর স্বপ্ন দেখেন যে ঠিকমত ভোগ দেয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি হাজারীবাগে গিয়ে সব ঠিক করেন।

লোকেন্দ্রনাথ বাবুর আরেক পুত্র হরনাথ মুখোপাধ্যায় গুরুদেব

রামানন্দ ভারতীর নির্দেশে তাঁর জননী মনোরমা দেবীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

•বাংলা ১৩০১ সালে গুরু রামানন্দ ভারতী শিষ্য লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তারামায়ের যে ছবিটি দেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ—

জগত জননী তারামা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ওপর দাড়িয়ে আছেন। তারামায়ের মুখের গড়ন গোলকৃতি এবং তাঁর ভাগবতী তনুর বর্ণ নীল। পদতলে 'ওঁ' লেখা রয়েছে। কালী পূজোর দিন বলি দেয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রামানন্দ ভারতী নর্মদার তীরে ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত এক মহাপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষিত। ভারতী সম্প্রদায় মূলত বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত। কিন্তু রামানন্দ ভারতী প্রধানত শাক্ত। তিনি মহাবিদ্যা তারাদেবীর উপাসক ছিলেন এবং এই তারা মন্ত্র বহু শিষ্য শিষ্যাকে প্রদান করেছেন। তারাপীঠ তাঁর ইষ্ট-ক্ষেত্র। এমন কি তারার উপাসনার মহাক্ষেত্র তিব্বতে যখন গমন করেন (১৮৯৮ খ্রীঃ) তখন প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করে যাত্রা করতেন এবং তিব্বতে প্রতিদিন ভীষণ দুর্গম পথেও চণ্ডীপাঠ করতেন। ইষ্টদেবীর মূর্তিকে তিনি মাথায় করে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে নিয়ে যান এবং তিব্বতেও সেই ভাবে সুদীর্ঘ চারমাস বহন করেন এবং নিত্য পূজা করেন। ফলে তাঁর এই ইষ্ট মূর্তি তথা শক্তি মূর্তি তারা দেবীর এবং মহান গুরু রূপে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সুচিহ্নিত হ'ন।

যাহোক, শারদীয়া কোজাগরী চতুর্দশী তিথিতে লোকেন্দ্রনাথের গৃহে শ্রীশ্রীতারা পূজা উৎসব ও মেলা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘকাল ধরে। ব্রহ্মময়ী ও মহাসরস্বতী তারামা এই ভক্ত পরিবারে মহালক্ষ্মী রূপে বিরাজ করেন।

গুরুদেব রামানন্দ ভারতী প্রদত্ত জগত জননী তারা মায়ের এই দিব্য পবিত্র ও সদাজাগ্রত ছবিকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে লোকেন্দ্রনাথের পরিবারে বংশ পরম্পরায়।

তাছাড়া শারদীয়া দুর্গা পূজার বিজয়দশীমতেও একাধিক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন বছরে।

লোকেন্দ্রনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়ও তারামায়ের সেবা পূজা করেন সাধ্যমত।

তারামায়ের এই ছবি কি রকম সদাজাগ্রত তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হ'ল।

একদিন লোকেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র হঠাৎ কোন কারণে তাঁর জননী মনোরমা দেবীর ওপর রাগ করে তারামায়ের ভোগের থালাকে অকারণে অপমান করেন এবং পদাঘাত করেন। তার ফলে পরবর্তীকালে তার পদদ্বয় সরু হয়ে যায় এবং সেই পা থেকে Blood Cancer হয়ে তিলে তিলে অসহ্য কষ্ট ভোগ করে মারা যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অনুরূপা দেবী জগত জননী তারামায়ের ওপর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা ও নিষ্ঠা রেখে সারাজীবন ধরে তারামায়ের নিত্যসেবা পূজা করে যাচ্ছেন।

বাংলা ১৩৮১ সালের (ইং ১৯৭৫) মাঘ মাসে এই ভক্তিমতী মহিলা অনুরূপা মুখোপাধ্যায় লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন এবং আশী বছর পূর্বে বাংলা ১৩০১ সালে (১৮৯৫ খ্রীঃ) তার শ্বশুর গৃহে গুরুদেব রামানন্দ ভারতী কর্তৃক প্রদত্ত তারামায়ের সেই দিব্য পবিত্র ছবির একটি ফটো কপি লেখককে দেন এই গ্রন্থের জন্য।

লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ এবং সংযোগের ও অন্যান্য বিবরণের জন্য তাঁর দিদি অনুপমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রানু চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

এবার তারা সাধক রামানন্দ স্বামীর অবশিষ্ট জীবনের কথায় ফিরে যাই।

সমগ্র উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণের পর বাংলা ১৩০৫ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৯৮) বাষট্টি বছর বয়সে অসম সাহসভরে একাকী দুর্গমতম মহাতীর্থ সুদূর তিব্বতের কৈলাস ও মানস সারোবরের উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করলেন।

স্বামী রামানন্দ ভারতী যোশীমঠের অদূরে অবস্থিত নিতি পাস দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং ত্রেতাপুরী, কৈলাস, মানস সরোবর, তাকলাকোটের শিবলিঙ্গ মঠ ও খুজরনাথ মন্দির দর্শন করেন অশেষ কষ্ট করে। তিব্বতে তিনি কৈলস পরিক্রমাও করেন উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে।

তিব্বতে তিনি অনেক সাধুসন্তের সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁদের

মধ্যে জ্ঞানিমামণ্ডিতে একজন দু'শো বছরের প্রাচীন ভুটিয়া যোগিনী মায়ের দর্শণ পান।

এই তারা সাধিকা বরফাবৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে দুঃসহ শীতের মধ্যে একটি কম্বলের আসনে সর্বদা অবস্থান করেন।

রামানন্দ ভারতী তিব্বতের বিভিন্ন গুম্ফায় তারাদেবীর বিশাল স্বর্ণময় অজস্র মূর্তি দর্শন করেন। তিব্বতে সর্বত্র তারাদেবীর পূজা হয় এবং তিব্বতের লামাগণ (সন্ন্যাসীগণ) বুদ্ধের জ্ঞানেশ্বরী স্বরূপা তারাদেবীর উপাসক। ফেরবার পথে রামানন্দ ভারতী নীলং পাস দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। সুদীর্ঘ তিন মাস পর তিব্বত ভ্রমণ শেষ করে গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হ'ন এবং গোমখণ্ড দর্শন করেন। তিব্বতে এই দীর্ঘ তিনমাস অসহ্য শীতের মধ্যে পাহাড়ে, গুহায়, বৃক্ষমূলে ও নদীর তীরে তিনি অতিবাহিত করেন অপরিসীম কষ্ট করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনিই প্রথম লেখক তথা বুদ্ধিজীবি প্রাজ্ঞ ও প্রবীন বাঙ্গালী পরিব্রাজক যিনি পদব্রজে তিব্বতে যান এবং অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও ভয়ঙ্কয় শীত সহ্য করে অপরিসীম পরিশ্রম করে কৈলাস ও মানস সরোবর এবং অন্যান্য মহান তীর্থ সকল দর্শন করেন। তাঁর এই অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী তিনি 'হিমারণ্য' নামে সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারা বাহিক-ভাবে প্রকাশ করেন। পরে গ্রন্থাকার প্রকাশিত হয়।

তিব্বত থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তা সত্তেও পরবর্তী তিন বছর উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকেন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে। কাশীতে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে আশ্রম করে দিয়েছিলেন। সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন।

কিন্তু চিরদিনের মুক্ত পুরুষ মুক্তই থাকতে চান। তারামায়ের কৃপায় উপলব্ধি করতে পারেন যে তাঁর ডাক এসে গেছে।

দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই সমস্ত খাদ্য ত্যাগ করেন। শুধু গঙ্গাজল নাম মাত্র গ্রহণ করে ইষ্ট দেবীর আরাধনায় মগ্ন থাকেন।

অবশেষে বাংলা ১৩০৮ সালের (ইং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯০১) পয়ষট্টি বছর বয়সে কাশীতে মরদেহ ত্যাগ করে ইষ্ট দেবী তারামায়ের কোলে চলে গেলেন।

তাঁর পবিত্র মরদেহ একটি প্রস্তর পেটিকায় বন্ধ করে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেন শিষ্য ও ভক্তগণ।

অনন্ত লীলাময়ী তারামায়ের এক বিচিত্র লীলার নিদর্শন এই সুপণ্ডিত, লেখক, পরিব্রাজক ও মহাতাপস স্বামী রামানন্দ ভারতী।

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় তাঁর মহান দিব্যজীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছে অনন্ত করুণাময়ী তারামায়ের অপার কৃপায়।

—o—

শ্রীবামানুজ রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য কাহিনী

শ্রীবামের অনুজ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু গুণের অধিকারী। তিনি একাধারে সাধক সংগীত শিল্পী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি রূপে সুচিহ্নিত। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অগ্রজ শ্রীবামকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং অগ্রজের কাছ থেকে অধ্যাত্ম কৃপা লাভ করে দিব্য জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন উত্তর কালে।

রামচন্দ্র কর্মজীবনের মাঝে অবসর মত প্রায়ই তারাপীঠ মহাশ্মশানে গিয়ে অগ্রজ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সঙ্গ করতেন এবং গভীর রাতে আবার পদব্রজে প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করে আটলা গ্রামে নিজ গৃহে ঘিরে আসতেন।

গভীর রাতে শ্রীবামের কৃপায় তিনি তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে যখন আটলা গ্রামে রওনা হতেন তখন তাঁকে ঘিরে থাকতো বাঘ, শেয়াল এবং কুকুরগণ।

এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অতি আশ্চর্য্য ভাবে তিনি গভীর রাতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে আটলা

গ্রামে পেঁৗছতেন এবং বাড়ী পেঁৗছে তিনি এই সহচরদের (বাঘ, শেয়াল ও কুকুরদের) স্বাভাবিক ভাবে ফিরে যেতে নির্দেশ দিতেন তারাপীঠে। তাঁর কথা শোনা মাত্র এই ব্যাঘ্র, শিবা ও সারমেয়বৃন্দ অনুগতের ন্যায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে ফিরে আসতেন। এই ঘটনা একবার নয়, দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় এবং রামচন্দ্র কর্মজীবন থেকে পুরোপুরি অবসর নেবার পর তা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীবামের অলৌকিক কৃপাশক্তি এবং সাধক প্রবর রামচন্দ্রের জীবের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও সর্বোপরি জগত জননী তারামায়ের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রমাণিত হয়েছে।

বহু গুণের অধিকারী শ্রীবামানুজ রামচন্দ্রের এ হ'ল একদিক। অন্য দিকে একজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হিসাবেও তিনি সপরিচিত ছিলেন।

তাঁর গানের প্রশংসা স্বয়ং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা একাধিক বার করেছেন।

তিনি তারামায়ের মন্দিরে এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানে বসে অপূর্ব সুরেলা কন্ঠে যখন তানপুরা নিয়ে ভক্তিগীতি গাইতেন তখন সমবেত শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতেন সজল নয়নে।

রামচন্দ্রের দুই কন্যার পর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। কিন্তু পুত্রটি অকালে দেহত্যাগ করে। রামচন্দ্র পুত্রকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। রামচন্দ্রের সেই শিশু পুত্রের ভোজে স্বয়ং শ্রীবামও আটলা গ্রামে যান। বর্ষাকাল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'ল। ব্রাহ্মণ শ'তিনেক নিমন্ত্রিত। তাছাড়া গ্রামের সকল ছোট ছেলেরা নিমন্ত্রিত।

সমবেত অতিথিবর্গের ভোজনান্তে তানপুরা হাতে সাধক রামচন্দ্র যখন ভক্তি সংগীত শুরু করলেন তখন সমবেত ভক্তবৃন্দ পুত্রহারা পিতার প্রাণ মথিত সংগীত সুধা বর্ষণে একদিকে যেমন অপরিসীম আনন্দ পেলেন অন্যদিকে সুরের গভীর আর্তিতে তাঁদের নয়ন সজল হয়ে উঠলো। এই আনন্দ অশ্রুতে সবাই একাকার হলেন।

শ্রীবামানুজ রামচন্দ্র যে কত বড় সুকন্ঠের অধিকারী ছিলেন, তার আরেকটি প্রমাণ পরবর্তীকালে কোলকাতায় পাওয়া যায়। মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের একান্ত অনরোধে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ১৩০৫ সালে কোলকাতায় আসেন। সাথে তাঁর অনুজ রামচন্দ্র এবং নগেন্দ্রনাথ, বিপিন, নবীন প্রভৃতি আট দশ জন সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীবামের কৃপায় সব কাজ সুসম্পন্ন হ'বার পর (যথা সময়ে সেই সকল কাহিনী বর্ণিত হবে) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে গানের আসর বসে। কারণ শ্রীবাম গান ভালবাসেন এবং নিজেও সুকন্ঠের অধিকারী।

কিন্তু সেই গানের আসরে শ্রীবাম স্বেচ্ছায় বললেন, "আমার ভাই বড় গাইয়ে" শ্রীবাম দু'বার বললেন।

তাই শুনে মহারাজ ও তাঁর সংগীতানুরাগী পার্ষদগণ এবং উপস্থিত বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগণ রামচন্দ্রকে গানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

তারাসাধক ও সংগীত শিল্পী বামানুজ রামচন্দ্র তানপুরা বেঁধে গান শুরু করলেন সাথে সাথে সবাই যেন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভাবুক সাধক ও শিল্পী রামচন্দ্র তন্ময় হয়ে গান করে গেলেন। তাঁর মধুর সুরেলা কন্ঠ মাধুর্য্যে সবাই অভিভূত হলেন। গান শেষ হলে মহারাজা এবং উপস্থিত সবাই তাঁকে সানন্দে অভিনন্দন জানালেন। পরে মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর তাঁকে শ্রদ্ধাস্বরূপ একটি দামী কাশ্মীরী শাল উপহার দিলেন। সেই সময়ে (১৩০৫ সাল, ইং ১৮৯৯) এই শালটির দাম ছিল আড়াইশত টাকা।

বামানুজ রামচন্দ্র শুধু সাধক ও সংগীত শিল্পীই ছিলেন না, তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন। পিতা মাতার ওপর তাঁর ভক্তি ছিল অসাধারণ। যৌবনে কর্মজীবন সাধ্যমত শুরু করে ধীরে ধীরে সংসারের দারিদ্র্য দূর করেন এবং জননী রাজকুমারী দেবীর কষ্ট দূর করে জননীকে সাধ্যমত স্বাচ্ছন্দে রাখেন এবং সেবাযত্ন করেন। জননী অসুস্থা হয়ে পড়লে যথাসাধ্য চিকিৎসা এবং সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করেন।

পরবর্তীকালে জননীর দেহত্যাগের পর পূর্বের সামাজিক বিরোধের অবসানের জন্য তাঁর সাধ্যের অতীত হওয়া সত্তেও পিতা মাতার

সম্মান এবং বংশের মর্য্যাদার জন্য পাঁচ শতাধিক ব্রাহ্মণ ও অতিথি-বর্গকে মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেন এবং অগ্রজ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অলৌকিক কৃপায় তা সুসম্পন্ন করেন।

রামচন্দ্রের চার কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে কিন্তু শিশু-পুত্রটি অকালে দেহত্যাগ করে। তবু রামচন্দ্র সংসার ধর্ম যথারীতি পালন করে যান অনাসক্ত ভাবে। বাকি সময় জগত জননী তারামায়ের ধ্যান জপে ও সংগীত সাধনায় নিজেকে মগ্ন রাখেন।

রামচন্দ্রের গানের খ্যাতি বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বহু স্থান থেকে গানের জন্য নিমন্ত্রণ আসতো। কিন্তু এই সাধক ও ভাবুক শিল্পী কোথাও যেতেন আবার কোথাও যেতেন না।

যাঁর পিতা তারাসাধক সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জননী অসাধারণ ভক্তিমতী ও সাধ্বী নারী রাজকুমারী দেবী, বড়দিদি সিদ্ধ সাধিকা জয়কালী দেবী, বড়ভাই স্বয়ং শিবাবতার পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, তাঁর অধ্যাত্মভাব সাধনা তো স্বাভাবিক ও সহজাত। এই বিরাট অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলের মধ্য থেকেই রামচন্দ্র ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন। রামচন্দ্রের অন্যান্য দিদিরা-ও অর্থাৎ দুর্গা দেবী, দ্রবময়ীদেবী এবং সুন্দরী দেবীও দিব্য জীবনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন। তাই দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোকের অবিরাম আঘাত সত্ত্বেও সাধক ও সংগীত শিল্পী রামচন্দ্র তাঁর দিব্য জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি।

খুব অভাবে পড়লে বা বিপদে পড়লেও সহসা কারো দ্বারস্থ হতেন না। এমন কি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় অগ্রজ তথা গুরু স্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছেও সহজে চাইতেন না।

অথচ তাঁর দাদা শ্রীবাম তো "রাজার রাজা"। শ্রীবামের এক মুহূর্তের কৃপা কটাক্ষে তাঁর সব দারিদ্র্য লাঘব হয়ে যেতে পারে। অধ্যাত্ম জগতের এই রাজার রাজা-র ((King of Kings) কাছে অর্থ তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। স্বয়ং ত্রিলোক জননী তারামা যাঁর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণের জন্য সদাই সচেষ্ট রয়েছেন। রামচন্দ সব জানেন তবু তিনি সংসারের বিপদ আপদ সত্তেও অগ্রজ শ্রীবামকে অর্থের জন্য সহজে বলতে চান না।

মাতৃসাধক ও শিল্পী রামচন্দ্র কতখানি সংসার জীবনে নির্লোভ ও অনাসক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ নিম্নলিখিত ঘটনাটি।

গৃহী রামচন্দ্রের চার কন্যা ও এক পুত্র। পুত্রটি অকালে দেহত্যাগ করে। তাই চার কন্যা নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার। স্ত্রী ইন্দুমতী এবং চার কন্যা অর্থাৎ সর্বমঙ্গলা, শুভঙ্করী, অন্নপূর্ণা ও শিবসুন্দরীকে নিয়ে তাঁর জাগতিক সংসার।

বসতবাটী ছাড়া কিছু চাষবাসের জমি আছে। তার জন্য ঘরে আছে ৬।৭টি গরু। একবার ঘরের ৫।৬টি গরু হঠাৎ মড়ক লেগে মরে যায়। লক্ষ্মী স্বরূপা গরুগুলোর মৃত্যুতে রামচন্দ্র বিষণ্ণ হলেন। সেদিন অগ্রজ শ্রীবামের নিকট তারাপীঠ মহাশ্মশানে উপস্থিত হলে শ্রীবাম অনুজ রামচন্দ্রের মুখ থেকে সব বুঝতে পারলেন। তবু অন্তর্যামী শ্রীবাম অনুজ রামচন্দ্রকে বললেন, "কিরে এত মন খারাপ কেন ?"

রামচন্দ্র বিষণ্ণ চিত্তে গরুগুলোর মৃত্যু সংবাদ দিলেন দাদাকে।

শ্রীবাম বললেন, "গরু মরেছে তো কি হয়েছে, আবার গরু কিনে চাষ করবি।"

রামচন্দ্র উত্তরে বললেন, "কিন্তু দাদা, এখন চাষের সময়। এত টাকা কোথায় পাই।"

শ্রীবাম বললেন, "কেন ? আমার কাছে যা টাকা আছে, নিয়ে যাবি।" (শ্রীবামকে অনেক ভক্ত প্রণামী স্বরূপ টাকা দিতেন। সেগুলো জমা থাকতো। শ্রীবাম আবার অভাবীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন)।

দাদার কথা শুনে রামচন্দ্র দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "না দাদা, কখনোই তা সম্ভব নয়। আমি তোমার টাকা গ্রহণ করতে পারবো না। কারণ আমি গৃহী, এতে আমার পাপ হবে। ঠাকুরের টাকা নিতে নেই।"

শ্রীবাম বিস্মিত হয়ে বললেন, "সেকি রে ? আমি দিচ্ছি, তুই নিবি। অবশ্য যদি একেবারে না নিস তবে আবার পরে ফেরৎ দিলেই হবে।" এসব কথা যখন হচ্ছে তখন রামচন্দ্রের চাকর নিমাই সেখানে উপস্থিত ছিল। নিমাই তার মনিব রামচন্দ্রের সাথে আটলা থেকে এসেছে। সে সব কথা শুনলো। যাহোক, রামচন্দ্র টাকা না নিয়েই আটলায় ফিরে গেলেন তাঁর চাকর নিমাইকে নিয়ে। দু'একদিন পরে রামচন্দ্রের সেই চাকর নিমাই তার মনিব রামচন্দ্রের

অজ্ঞাতে তারাপীঠে গিয়ে শ্রীবামের কাছে রামচন্দ্রের নাম করে একশো টাকা চাইলেন।

অন্তর্যামী শ্রীবাম সব বুঝতে পারলেন। তবু অবোধকে জ্ঞান দেবার জন্য নিমাইকে একশো টাকা দিলেন। টাকা নিয়ে খুশি মনে নিমাই আটলাতে ফিরে এল নিজের বাড়ীতে। মনিব রামচন্দ্রকে এই একশো টাকার কথা কিছুই জানালো না।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, স্বয়ং শ্রীবাম আটলায় এলেন ছোট ভাই রামচন্দ্রের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য, ঐ একশো টাকায় কেনা ছোট ভাইয়ের গরুদের দেখা।

আসলে চোরের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর আগমন। রামচন্দ্র অগ্রজকে তাঁর গৃহে পদধূলি দিতে দেখে মহা আনন্দিত হলেন। কিন্তু গরুর প্রসঙ্গে তিনি আশ্চর্য হলেন। ঐ একশো টাকার কথা তো তিনি কিছুই জানেন না। নেয়া তো দূরের কথা।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আগমনের সংবাদে রামচন্দ্রের চাকর নিমাই ধরা পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি একশো টাকা নিয়ে শ্রীবামের চরণকমলে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। কিন্তু আটলা গ্রামের সকল লোক অবাক হয়ে গেল এ ব্যাপারে। তাঁরা কিছুই জানতেন না এ ব্যাপারে। সব শুনে তাঁরা নিমাইকে শাস্তি দিতে গেলে, শ্রীবাম তাঁদের নিরস্ত করলেন এবং নিমাইকে ক্ষমা তো করলেনই উল্টো তাকে দশটা টাকা দেবার জন্য ছোট ভাই রামচন্দ্রকে বললেন। রামচন্দ্র যথারীতি নিমাইকে ক্ষমা করে দশটাকা প্রদান করলেন। উপরোক্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে শ্রীবামানুজ রামচন্দ্রের নির্লোভতা ও তেজস্বীতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

এরূপ আরো প্রচুর ঘটনা আছে রামচন্দ্রের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কে। তারাসাধক, সংগীত শিল্পী ও আদর্শ নির্লোভী গৃহী বামানুজ রামচন্দ্রের উপরোক্ত তিনটি কাহিনীর জন্য লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রামচন্দ্রের তৃতীয় কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর পৌত্র দেবকুমার রায় (আটলা গ্রাম) ও শ্রীবাম সান্নিধ্যধন্য কমলাক্ষ রায়ের কাছে (কড়কাড়িয়া গ্রাম)।

বাংলা ১৩৮২ সালের ১লা আষাঢ় ভক্ত প্রবর শ্রীদেবকুমার রায় উপরোক্ত প্রথম ও তৃতীয় কাহিনীটি লেখককে জানান এবং ১৩৮২

সালের ২৫শে পৌষ (শনিবার) শ্রীবাম সঙ্গধন্য ছিয়াশী বছর বয়স্ক কড়কাড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীকমলাক্ষ রায় উপরোক্ত দ্বিতীয় কাহিনীটি লেখককে বলেন। শ্রীদেবকুমার রায় উপরোক্ত প্রথম ও তৃতীয় কাহিনী দু'টি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুরমা অন্নপূর্ণা দেবী এবং অন্নপূর্ণাদেবীর দিদি শুভঙ্করী দেবীর কাছে।

লেখক এজন্য সবার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

প্রাণদাতা শ্রীবাম

তারাপীঠ মহাশ্মশানের শিমুলতলায় শ্রীবাম বসে আছেন। আপন মনে তারাভাবে বিভোর হয়ে গান করছেন। তারামায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর এই প্রিয় গানটি হ'ল—

"মনপবনের নৌকা বটে বেয়েছে মন কালী বলে।
মহামন্ত্র মন্ত্র যার সে সুবাতাসেতে বাদাম তুলে ॥
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নোঙ্গর তোল মন দুর্গা বলে।
পড়িবে তুফানে যবে নাম গাহিবে সবাই মিলে ॥"

এক সময় গান শেষ হ'ল। গানের রেশ তখনো শিমুলতলাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। শ্রীবামের কাছে তারাই কালী তারাই সব। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মময়ী তারা ছাড়া শ্রীবাম আর কিছু জানেন না, আর কিছু ভাবেন না।

একটু পরে একটি খাটিয়া এসে থামলো শ্রীবামের কাছে। শ্রীবাম একবার সেদিকে তাকালেন। খাটিয়াতে একটি মৃতকল্প রোগী শয়ান। চিররসিক শ্রীবাম যারা খাটিয়া বয়ে এনেছে তাদের

উদ্দেশ্যে বললেন, "কিরে, মড়া আনলি? তা বেশ, ও শালর বহু পাপ করেছে। ভাল করে পোড়া।"

আসলে অন্তর্যামী বাম সবই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর কাছেই এই মরণাপন্ন যক্ষারোগীটিকে নিয়ে আসা হয়েছে বাঁচাবার জন্য। তবু না জানার অভিনয় করলেন।

শ্রীবামের কথা শুনে খাটিয়া বহনকারীদের একজন করজোড়ে বিনীতভাবে জানালো যে খাটিয়ায় যাকে নিয়ে এসেছে সে একজন মরণাপন্ন যক্ষ্মারোগী। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মায়ের একমাত্র সন্তান এই রোগীটি।

কৃপা করে লোকটিকে যেন ক্ষ্যাপা বাবা ভাল করে দেন। অনেক আশা নিয়ে বহুদূর থেকে তারা এসেছে। শ্রীবামের অন্তরে করুণার মহাসমুদ্র আর বাইরে রুক্ষতার আগ্নেয়গিরি। তাই রুক্ষস্বরে বললেন, 'আমি কি ডাক্তার না বদ্যি?'

তারপর উপদেশ দিলেন ভাল ডাক্তার অথবা বদ্যি দেখাবার। কিন্তু কে শোনে সে সব কথা।

লোকগুলো কেবলি শ্রীবামের চরণ কমলে মিনতি করতে লাগলো মুমুর্ষ যক্ষা রোগটিকে ভাল করবার জন্য।

সহসা শ্রীবাম উগ্ররূপ ধারণ করে খাটিয়ার কাছে গিয়ে মৃতকল্প যক্ষ্মারোগীটির গলা সজোরে টিপে ধরে বললেন "শালর আর কখনো পাপ করবি?"

শ্রীবামের কঠিন হাতের চাপে রোগীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো। উপস্থিত লোকজন ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। ভাবলো হয়তো তিনি রাগের মাথায় খুনই করে ফেলবেন এই রোগীকে। কান্নার রোল উঠলো তাদের মাঝে। দু' একজন ছাড়াতে এসে ব্যর্থ হ'ল। অবশেষে খাটিয়া থেকে ঐ মৃতপ্রায় রোগীকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীবাম বললেন, "যা বেদো শালর, বেঁচে গেলি।"

এই বলে আবার নিজ আসনে এসে শান্তভাবে বসে রইলেন।

এদিকে তখন ঐ অজ্ঞান ও মৃতকল্প যক্ষ্মা রোগীটিকে ঘিরে লোকজন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একটু পরেই রোগীটির জ্ঞান ফিরে এল।

সবাই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলো লোকটি স্বভাবিক সুস্থ লোকের মত নিজেই উঠে বসে লোকেদের বললো, "আমার রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এখন খুব খিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও।"

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই আনন্দে মগ্ন হল।

বাইরে রুদ্র ও ভেতরে অপার করুণা সিন্ধু শ্রীবামের চরণ কমলে এসে সবাই আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। শ্রীবাম লোকদের শান্তস্বরে বললেন "একে তারামায়ের প্রসাদ খাইয়ে দে। আর কিছুদিন তারাপীঠে রেখে দে। তাহলেই তারা মায়ের দয়ায় ভাল হয়ে যাবে।"

শ্রীবামের নির্দেশ তারা যথারীতি পালন করলো। কিছুদিন পর লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মহানন্দে বাড়ী ফিরে গেল। একমাত্র পুত্রকে ফিরে পেয়ে তার জননীও আনন্দে মগ্ন হলেন। আর প্রাণদাতা শ্রীবামের উদ্দেশ্যে জানালেন অন্তরের অসীম কৃতজ্ঞতা আর সশ্রদ্ধ প্রণাম।

—o

শ্রীবাম সান্নিধ্যে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা

বাংলা ১২৯৭ সালের এক আরক্তিম অপরাহ্ন। বাইশ বছরের তরুণ তান্ত্রিক ও তারামায়ের সেবায়েত শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা তারামন্দিরে আপন কাজে ব্যস্ত।

সেই সময় সাহাপুর গ্রামের দাসজী তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে নগেন্দ্রনাথের কাছে এসে কেঁদে পড়লো। বললো, "খুড়োমশায়, মলাম, আমাকে ম্যারাছে, বামা পাগলা চিমটার বাড়ি ম্যারাছে। যেই

পায়ে হাত দিয়াছি, পন্নাম করিব, অমনি সটান চিমটার বাড়ি পিঠে। অত্যাচার দেখ বাবা।"

নগেন্দ্রনাথ দাসজীকে শান্ত করলেও নিজে অশান্ত হয়ে উঠলেন। এই ধরণের অভিযোগ অনেক দর্শনার্থীই প্রায়ই এসে করেন এবং তার জন্য অনেক সময় পাণ্ডারাও বিব্রত হ'ন।

তারুণ্যের উষ্ণতায় যুবক নগেন্দ্রনাথ "দেখি তবে' বলে দ্রুত মহাশ্মশানের শিমুলতলায় ছুটে গেলেন। পথ থেকে এক মানুষ সমান নীচে শিমুলতলা। গাছের শেকড় ধরে নামলেন। ঝোপঝাড়ের নিবিড়তার মধ্যে শবাধারের বাঁশ তালাই দিয়ে তৈরী ছোট্ট এক খুপড়ি। এই খুপড়ি হ'ল শ্রীবামের সেই যোগেন্দ্র ঝোপড়া।

ঝোপড়া ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। উত্তেজিত নগেন্দ্রনাথ (জোরে দরজা ঠেলতেই ভেতর থেকে বজ্রকন্ঠে ধ্বনিত হ'ল শ্রীবামের উচ্চ স্বর। কোন শালারে?" বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন শ্রীবাম ঝোপড়া থেকে।

শ্রীবামের বিশাল তেজদৃপ্ত মহানমূর্তি দেখে যুবক নগেন্দ্রনাথ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শ্রীবামও আকস্মিক ভাবে তাঁর প্রিয় রামেশ্বর পাণ্ডার পুত্র নগেন্দ্রনাথকে দেখে বিস্মিত হলেন। একটু পরে শান্ত স্বরে যুবক নগেন্দ্রনাথকে বললেন "কে গো, রামেশ্বর পাণ্ডা কাব র বেটা বাবা লগেন কাকা, কি হয়েছে বাবা?"

শ্রীবামের এই মধুর সম্ভাষণ শুনে নগেন্দ্রনাথ মোহিত হলেন। দাসজীর ব্যাপার নিয়ে কোন কথা বলবার মত অবস্থা নগেন্দ্রনাথের তখন রইলোনা। কিছু পরে সস্নেহে মৃদু স্বরে শ্রীবাম অশেষ কৃপা করে যুবক নগেন্দ্রনাথকে বললেন 'আসুন তো বাবা, তামাক খাই।' এই বলে নগেন্দ্রনাথকে ঝুপড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

তিপ্পান্ন বছরের শ্রীবাম অপার কৃপা করে তাঁর নিত্যলীলার সাথী করলেন বাইশ বছরের যুবক নগেন্দ্রনাথকে।

সেই থেকে সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে (বাংলা ১২৯৭—১৩১৮ সাল) মহাভাগ্যবান নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা হলেন শ্রীবামের অন্যতম লীলা-পরিকর। শুধু তাই নয়, শ্রীরামের অন্যতম প্রধান পারিষদরূপে শ্রীবামের সাথে চক্রে এবং মদ গাঁজা চরস প্রভৃতিতেও তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীবামকে নগেন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধার সাথে কখনো বাবুকাকা কখনো বাবা বলে ডাকেন। শ্রীবামের সাথে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বহুস্থানে ঘুরেছেন। শ্রীবামও তাঁর স্নেহের 'লগেন কাকা'র অনুরোধে লগেন কাকার সাথে একধিক ভক্ত ও রোগীর বাড়ী গেছেন। যথাস্হানে সেইসব কাহিনী বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত কাহিনীটি নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডার পৌত্র শ্রীশম্ভুকিঙ্কর চট্টো-পাধ্যায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। লেখক এ জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

—o—

কারণরসিক শ্রীবাম

শরতের স্নিগ্ধ সোনালী আলোয় ভরে গেছে তারাপীঠের আকাশ বাতাস। আসন্ন আগমনির সুরে প্রকৃতি মুখর।

শ্রীবাম শিমুলতলায় বসে আছেন। তারা মায়ের উদ্দেশ্যে একটি রামপ্রসাদী গান গাইতে লাগলেন ভাবে বিভোর হয়ে।

গানটি হ'ল—

মন ভুল না কথার ছলে
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই যে কুতুহলে
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
যত মদ মাতালে মাতাল বলে।
অহর্নিশি থাক বসি হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধর্বে নিশা ঘুচবে দিশা
বিষম বিষয় মদ খাইলে।......

গানটি গাইতে গাইতে শ্রীবামের বিশাল নয়নদ্বয় দিয়ে অবিরল ধারা বইতে লাগলো। উপস্থিত ভক্তগণ স্তব্ধ হয়ে সজল নয়নে এই দিব্য দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

একটুপর শ্রীবাম প্রকৃতিস্থ হলেন। ভক্তগণ প্রণাম করে যে যাঁর কাজে গেলেন।

এমন সময় দু'টি যুবক এল শ্রীবামের কাছে। যুবক দু'টি তারাপীঠভৈরব শ্রীবামের জন্য ৬।৭ বোতল বিলেতি 'কারণ' নিয়ে এসেছে।

ওরা ঠিক করেছে যে বামাক্ষ্যাপা বাবাকে এই বিলেতি মদ খাইয়ে মাতাল করে দেবে। কত 'কারণ' বামাক্ষ্যাপা হজম করতে পারেন তা-ও ওরা পরীক্ষা করে দেখবে।

সর্বজ্ঞ শ্রীবাম যুবক দু'টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। শ্রীবাম নির্বিকার ভাবে একের পর এক লাল টকটকে বিলেতি মদ শেষ করতে লাগলেন। শ্রীবাম এই লাল বিলেতি হুইস্কিকে বলেন, 'সাহেব বাবাদের রক্ত।' শ্রীবামের ভাষা বিচিত্র কিন্তু গভীর সঙ্কেতপূর্ণ। কঠিন পরিশ্রমী সাহেবগণ তাঁদের গায়ের রক্ত জল করে যা আয় করেন সেই রক্ত জল করা টাকা দিয়ে এই সুরা কিনে পান করেন।

তাই শ্রীবামের কাছে এই সুরা সাহেবদের রক্তের সামিল। উত্তরকালে শ্রীবামের আরেকটি উক্তিও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হ'বার কিছুকাল পূর্বে শ্রীবাম জনৈক শিষ্যকে তার আভাষ দিয়ে বলেন, "লাখ লাখ পাঠা খাব। সাদা পাঠা বাবা।"

শ্রীবামের এই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর মহাকাল রূপের ভাব অত্যন্ত নিগূঢ় ও সঙ্কেতপূর্ণ। মহাকালরূপী শিবের সেই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস নৃত্য যেন শ্রীবামের মাঝে প্রজ্জলিত। শ্রীবাম যে শিবাবতার তার অন্যতম পরিচয় তার এই উক্তি। আর সাহেবদের "সাদা পাঠা" বলবার মধ্যেও রয়েছে আর একটি সঙ্কেত। পাশ্চাত্য বাসীরা মলত ভোগ মুখী। আহার নিদ্রা, মৈথুন-ই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই তাঁরা পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রযুক্তিকরণের মধ্যে সর্বদা নিমগ্ন।

কিন্তু ভারতীয় জীবনধারা মূলত ঈশ্বরমুখী। দৈনন্দিন জীবনে ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতবাসী ঈশ্বরকেন্দ্রিক।

যাহোক, শ্রীবাম বিনা জলে বিনা মুখ শুদ্ধিতে একের পর এক বিলেতি বোতল গলায় ঢালতে লাগলেন। ক্রমে সব বিলেতি মদই শেষ হয়ে গেল। তখন শ্রীবাম যুবকদের কাছে আরো 'কারণ' চাইলেন। তখন যুবকদ্বয় ৬।৭ বোতল দেশী ধেনো মদ নিয়ে এল অদূরবর্তী সা-পুরের শুড়ির দোকান থেকে।

তাও শ্রীবাম একে একে শেষ করলেন, তারপর আরো 'কারণ' খেতে চাইলেন।

তখন যুবক দু'টির মুখ শুকিয়ে গেল। বামাক্ষ্যাপা বাবাকে ১৩।১৪ বোতল দেশী বিদেশী মদ এভাবে খেতে পারেন তা ওদের ধারণা ছিল না। বামাক্ষ্যাপাকে জব্দ করতে এসে নিজেরাই জব্দ হ'ল। এদিকে শ্রীবাম ক্রমাগত আরো 'কারণ' চাইছেন। অথচ যুবক দু'টির কাছে আর পয়সা নেই মদ খাওয়াবার। তখন ওরা মাথা নিচু করে বসে রইলো।

শ্রীবাম তখন মুচকি হেসে বললেন, "শালর মা'র আঁচল থেকে টাকা চুরি করে মদ কিনে লিয়ে আইছিস ক্ষ্যাপাকে মাতাল করবি বটে? তু'শালা দেখবি আমি কি খাই বটে।" এই বলে শ্রীবাম একটি 'কারণ' পাত্র মুখের সামনে ধরে "ওয়াক্" করলেন। সাথে সাথে তাঁব মুখ থেকে অজস্র দুগ্ধ বের হয়ে কারণ পাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি সেই দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রটি তাদের সামনে ধরে বললেন, "দেখ শালা আমি তারামা'র দুধ খাই। মদ খাই না।" সত্যিই শ্রীবাম সুরা খান না, সুধা খান—এই অপূর্ব দিব্য দৃশ্য দেখে যুবক দুটি শ্রীবামের চরণে ক্ষমা চাইলো। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীবাম দেখিয়ে দিলেন, তিনি যা কিছু পান করেন তা সবই ত্রিলোক জননী তারামাকে নিবেদন করে। ফলে তা সবই তারামায়ের অমৃতময় স্তন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক বামাক্ষ্যাপা বাবার শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়পুত্র কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

—০—

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের দেহত্যাগ

তারাপীঠের একদা প্রধান কৌল. বিশিষ্ট বৈদান্তিক, শাস্ত্রজ্ঞ. তন্ত্রোজ্ঞ, কর্মযোগী ও গীতিকার এবং তারাপীঠের প্রধান কৌল ও জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আচার্য স্বরূপ সিদ্ধপুরুষ মোক্ষাদানন্দ আনুমানিক বাংলা ১২৯৮ সালে সুদীর্ঘ সাধন জীবন শেষে, অত্যন্ত পরিণত বয়সে তারামায়ের কোলে চিরবিশ্রাম নিলেন। দেহত্যাগের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল বিরাশী বছরের ওপর।

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের মরদেহ ত্যাগের সাথে সাথে মহাপীঠ তারাপীঠের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো।

শ্রীবাম তাঁর গুরুপ্রতীম মোক্ষদানন্দের পবিত্র দেহ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সমবেত পাণ্ডা, ভক্ত ও সন্ন্যাসীবৃন্দের উপস্থিতিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানের শিমুলতলায় নিমগাছের নীচে 'সমাজ' দিলেন। পরে তার ওপর একটি ছোট্ট সমাধি মন্দির শ্রীবামের আগ্রহে নির্মিত হয়।

মোক্ষদানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁর সাধ্বী স্ত্রী দীর্ঘদিন সাধন-ভজন ও জপধ্যানে অতিবাহিত করেন। তারপর যথাসময়ে তিনিও তারামায়ের চরণে চির বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

তারাপীঠের বিভিন্ন উন্নয়ন ও পর্ব পূজার সাথে মোক্ষদানন্দের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

মোক্ষদানন্দ তারাপীঠে জগদ্ধাত্রী পূজো, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রটন্তী প্রভৃতি পর্বপূজার বিশেষ প্রচলন করেন।

শুধু তারাপীঠেই নয়, অদূরবর্তী সতীপীঠ নলহাটির 'নলাটেশ্বরী' দেবীর নিত্য সেবা পূজার ব্যাপারেও মোক্ষদানন্দ সচেষ্ট ছিলেন।

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ ছিলেন শ্রীবামের শিক্ষাগুরু। শ্রীবামের সাধন কালীন অবস্থায় তিনি ব্রজবাসী কৈলাসপতির নির্দেশে শ্রীবামকে বেদপাঠ করে শুনিয়েছেন। তাছাড়া অভিষেক ও অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি শ্রীবামকে সহযোগিতা করেন।

শ্রীবাম তাই বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

মোক্ষদানন্দ সংগীত রচয়িতা হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। একাধারে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী ছিলেন তিনি। মোক্ষদানন্দের অন্যতম বিখ্যাত গান হ'ল :

"মরবো আর অমনি যাব ব্রহ্মে মিশাইয়ে।
কাজ কিরে ভাই পাপ সংসারে আর থাকিয়ে।"
...ইত্যাদি

এই গানটি শ্রীবামের বিশেষ প্রিয়। মাঝে মাঝে তিনি প্রাণের আবেগে এই গানটি করেন। উত্তরকালে দেখা যায়, শ্রীবাম তাঁর মহান অন্তলীলার শেষলগ্নে প্রায়ই এই মনোরম গানটি মহাসমাধির পূবে করতে থাকেন।

তাছাড়া মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্ব থেকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা পার্যদদের বলেন যে তাঁকে যেন বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধির পাশে নিম গাছের নিচে উত্তরমুখী করে বসিয়ে সমাধি দেয়া হয়।

শ্রীবামের এই ইচ্ছা থেকেই উপলধি করা যায় যে শ্রীবাম তাঁর আচার্য স্বরূপ বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দকে কত গভীর ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

—o—

বামদেবপুরে জটামা'র গৃহে পদার্পণ

তারাপীঠ থেকে শ্রীবাম একদিন বামদেবপুরে এলেন মহাসাধিকা জটামা'র গৃহাশ্রমে। সাথে কয়েকজন ভক্ত।

মহাপীঠ তারাপীঠ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে বামদেবপুর অবস্থিত।

শ্রীবামকে সশ্রদ্ধ চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন শক্তিময়ী সিদ্ধসাধিকা তাঁর শিষ্য ভক্তসহ। নানান সৎপ্রসঙ্গ ও অধ্যাত্ম সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব নিয়ে নিভৃতে উপদেশ দিলেন শ্রীবাম এই মহাসাধিকাকে। তারামায়ের অভেদ স্বরূপ ও তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে ব্রাহ্মণী জটামা গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। শ্রীবামের অপরিসীম কৃপা ধন্যা তিনি। তাঁর তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনকালীন অবস্থায় শ্রীবামের কৃপা ও ঐশী শক্তি তাঁকে দ্রুত সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয় সকল বিঘ্ন দূর করে দিয়ে।

তাই শ্রীবামের প্রতি সিদ্ধসাধিকা জটামার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি অপরিসীম।

শক্তিময়ী জঠামার জীবন ও সাধনার ইতিহাস খুবই বিস্ময়কর।

বামদেবপুর নিবাসিনী শক্তিময়ী সাধিকা জটামা এড়োলের রাজ বাড়ীর মেয়ে। কৈশোরে বিয়ে হয় বামদেবপুরে এক নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারে। যৌবনে তিনি তারামায়ের দর্শনের জন্য খুবই ব্যাকুল হ'ন। সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনার সংকল্প গ্রহণ করেন। সেজন্য বামদেবপুর থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসে দীর্ঘদিন অত্যন্ত কঠোর সাধনায় মগ্ন হ'ন। তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, সংযম ও একানিষ্ঠতা দেখে শ্রীবাম প্রসন্ন হ'ন।

অচিরে এই মহিয়সী সাধিকার ওপর শ্রীবামের কৃপা দৃষ্টি পড়ে। শ্রীবাম বুঝতে পারলেন তারামায়ের চিহ্নিতা ও কৃপাধন্যা এই শক্তিময়ী সাধিকা।

শ্রীবাম জটামাকে সাধনপথে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন এবং

অচিরে জটামা ত্রিলোক জননী তারামায়ের দর্শন ও কৃপা লাভ করে মানব জীবন সফল করেন।

জগতজননী তারামায়ের অপার কৃপায় এবং শ্রীবামের পরম আশীর্বাদে সিদ্ধসাধিকা জটামা অসাধারণ যোগবিভূতির অধিকারিনী হ'ন

জটামা'র এই অনন্যসাধারণ সাধনশক্তি ও যোগবিভূতির খ্যাতি ক্রমে ক্রমে তারাপীঠের সাধকমহলে ও স্থানীয় এবং দূরবর্তী জন-জীবনে বিরাটভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এক বিরাট শক্তিময়ী সিদ্ধসাধিকা রূপে জটামা সুচিহ্নিতা হ'ন। সিদ্ধিলাভের পর জটামা বামদেবপুরে এসে স্থায়ীভাবে আসন পাতেন এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর যোগবিভূতির কথা কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়। বহু ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

জটামা একজন বিশিষ্ট রাজবংশের মেয়ে। যে রাজবংশ অর্থাৎ এড়োলের রাজবংশ যুগ যুগ তারামায়ের সেবা করে আসছেন ("ভক্ত পরম্পারায় তারামায়ের সেবার ইতিহাস"--প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) সেই রাজ ঐশ্বর্যে লালিত পালিত হয়ে এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের গৃহের কুলবধূ হয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যৌবনে সকল রকম সামাজিক ও পারিবারিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কঠোরতম সংযম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাধনার দ্বারা তিনি যে মহাসিদ্ধি লাভ করেন তা সত্যিই দুর্লভ ও আদর্শনীয় এবং চিরস্মরণীয় ব্যাপার।

তাই তারাপীঠ থেকে স্বয়ং মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা এসে জটামা'র গৃহে পদার্পণ করে তাঁর এই মহান সাধনা ও মহাসিদ্ধির স্বীকৃতি দিলেন।

দু'একদিন বামদেবপুরে জটামা'র আন্তরিক সেবা যত্ন গ্রহণ করে শ্রীবাম তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রওনা হ'বার পূর্বে একটি বিশেষ ইচ্ছা জটামা শ্রীবামকে নিবেদন করেন। শ্রীবামের কৃপায় যথাসময়ে পরিণত বয়সে জটামা'র এই ইচ্ছে পূরণ হয়।

জটামা'র শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন বশিষ্ঠানন্দ অবধূত।

হাওড়া জেলার আন্দুলের কালীকীর্তন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি। একাধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও সাধক বশিষ্ঠানন্দ অবধূত জটামা'র বিশেষ কৃপাধন্য সন্তান। অফুরন্ত অলৌকিক কৃপাধারা বর্ষণ করে অবশেষে পরিণত বয়সে জটামা দেহত্যাগ করেন।

দেহরক্ষার পূর্বে জটামার ইচ্ছে অনুসারে তাঁর পবিত্র সাধন-মণ্ডিত দেহ সযত্নে নিয়ে আসা হয় তারাপীঠে। যথাসময়ে মহা-শ্মশানের পাশে পথের ওপর সমাধি দেয়া হয়। পরে সেই সমাধির ওপর জটামা'র স্মৃতি স্বরূপ সমাধি মন্দির নির্মিত হয়।

তারাপীঠ মহাশ্মশানের মহান সাধন ক্ষেত্র যে কেবলমাত্র জগত জননী তারামায়ের সাধক ছেলেদের জন্যই নয়, তা যে তারামায়ের সাধিকা সন্তানদের জন্যও, তার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেলেন শ্রীবাম কৃপাধন্যা মহাসাধিকা জটামা।

জটামায়ের উপরোক্ত কাহিনীর ব্যাপারে লেখককে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন (১৩৮০ সনে) সরলপুর নিবাসী শ্রীশশী মোড়ল এবং তারাপুর নিবাসী শ্রীগৌড় প্রামাণিক। লেখক এজন্য উভয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য ভগবান ভট্টাচার্য্য

মহাপীঠ তারাপীঠে শ্রীবামের কৃপাধন্য সিদ্ধ সাধকদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ ভগবান ভট্টাচার্য্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

ভগবান ভট্টাচার্য্যের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত বরিশাল জেলার চাঁদসী গ্রামে।

যৌবনে সাধনার জন্য গৃহত্যাগ করে বহুতীর্থ পর্য্যটন করে অবশেষে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। তারাপীঠ মহাশ্মশানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হ'ন। অবশেষে এক শুভক্ষণে মহাপীঠ তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপালাভ করেন। এই সময় শ্রীবাম সাধক প্রবর ভগবান ভট্টাচার্যকে তারা সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন এবং তাঁকে সাধন পথে দ্রুত সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেন। ভাগ্যবান ভগবান ভট্টাচার্য্য শ্রীবামের দিব্য পবিত্র সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য লাভ করেন দীর্ঘ তিন বছর ধরে।

শ্রীবাম নির্দেশিত পথে সাধনা করে তিনি আপ্তকাম হ'ন। অচিরে তাঁর যোগবিভূতির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন পর তারাপীঠের অদূরে ঝিল্লিখাসপুরের জমিদার এবং শ্রীবামের ভক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহকে তিনি দীক্ষা দেন। তাঁর খুড়তুতো ভাই এবং তাঁর পুত্র, পুত্রবধূগণও সিদ্ধ পুরুষ ভগবান ভট্টাচার্য্যর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সবাই শ্রীবামের ভক্ত ছিলেন।

ভগবান ভট্টাচার্য্য খুবই সুদর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন। এই গৌরবর্ণ তেজদৃপ্ত সুপুরুষ যখন হোম ও ক্রিয়াকর্ম করতেন তখন সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে ও মুগ্ধ নয়নে তা দর্শন করতেন। তাঁর নয়ন ছিল শিবনেত্রের ন্যায়।

একবার এক যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি একাসনে তিনদিন তিনরাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হোম করে যান। তাঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। শ্রীবামের প্রতি তিনি অসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভগবান ভট্টাচার্য্যের নির্দেশে তাঁর শিষ্যবর্গ বছরে একবার করে এসে তারামায়ের পুজো দিতেন এবং বামাদেবকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতেন। ভগবান ভট্টাচার্য্য শেষজীবনে তারাপীঠ তথা বীরভূম

থেকে কোলকাতায় ভবানীপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এই সিদ্ধপুরুষ পরিণত বয়সে মহাসিদ্ধ নাম 'তারা' নাম জপ করতে করতে তারালোকে গমন করেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রিয় শিষ্য মহান দার্শনিক ডক্টর যদুনাথ সিংহের পুত্র অমিয় কুমার সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

শিবচতুর্দ্দশীর গভীর রাত। প্রহরে প্রহরে শিবরাত্রির মহাযোগে যোগেশ্বর শিবের পূজা চলছে। আসমুদ্র হিমাচল বিনিদ্ররজনী যাপন করছে।

পরম আনন্দে শিবের আরাধনায়, শিবের স্তবে ও ধ্যানে মগ্ন ভারতবর্ষের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ নরনারী।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামও এই শিবরাত্রির মহাপূজায় মহামগ্ন। তন্ত্রসিদ্ধ সাধক বংশের সার্থক উত্তরপুরুষ সাধক প্রবর চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য শিবরাত্রির চতুর্থ প্রহরের পূজায় গভীরভাবে মগ্ন। অদূরে তাঁর সাধ্বী ও সাধিকা পত্নী চন্দ্রময়ী দেবী শিবের ধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন।

সহসা ধ্যানের গভীরতম তন্ময়তার মধ্যে মহাসৌভাগ্যবতী চন্দ্রময়ী দেখলেন এক শ্বেতবর্ণ, জটাজুট মণ্ডিত, ত্রিশূল ও ডমরুধারী তেজদৃপ্ত বিরাট পুরুষ তাঁর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং কাছে এসে বললেন, "আমি তোর ঘরে এলাম।"—এই দিব্যবাণী উচ্চারণ করবার সাথে সাথে সেই বিরাট মহান জ্যোতির্ময় পুরুষ চন্দ্রময়ী দেবীর দেহে মিলিয়ে গেলেন। এক

অপার্থিব পরম আনন্দে চন্দ্রময়ীদেবী শিউরে উঠলেন। ধ্যান শেষে স্বামীকে মহানন্দে বললেন এই দিব্য দর্শনের কথা।

মহান তন্ত্রসাধক চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য সানন্দে পত্নীকে জানালেন শিবাংশজাত এক মহাপুরুষ তোমার গর্ভে আসছেন। তুমি মহাভাগ্যবতী।"

অবশেষে বাংলা ১২৬৭ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) প্রসিদ্ধ তন্ত্রসিদ্ধ বংশে চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন এক দেবশিশু। চন্দ্রকুমার সেই শিবরাত্রিতে তাঁর পত্নীর সেই দিব্য দর্শনের কথা স্মরণ করে পুত্রের নাম রাখলেন "শিবচন্দ্র"।

উত্তরকালে এই শিবচন্দ্র ভারতবিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ভারতের অধ্যাত্ম জগতে সুচিহ্নিত হলেন।

তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব রূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত হলেন। শিবচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার কুমারনদের তীরে মহিশালা গ্রামে।

শিশুকালে শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় সাধক ও সাহিত্যিক কাঙ্গাল হরিনাথের মাধ্যমে। কুমারখালি স্কুলে পড়বার সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন সাহিত্যিক ও পরিব্রাজক জলধর সেন।

কৈশোরে শিবচন্দ্র নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হ'ন। এখানে অল্প বয়সেই নানাশাস্ত্রের ওপর তাঁর অধিকার জন্মে এবং এখান থেকেই তিনি "কবিরত্ন" উপাধী লাভ করেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'ন। কিন্তু গুরুস্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর মশায়ের সম্মানে এই উপাধী তিনি বর্জন করেন। তার ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে "বিদ্যার্ণব" উপাধীতে ভূষিত করেন।

এই সময় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অনেক অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডিত কবিতা ও সংগীত রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ইষ্ট স্বরূপা জগত জননী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর নিম্নলিখিত কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"ভাইরে, আর কি কর বিদ্যাসাধন
মহাবিদ্যা মাকে ভুলে ?
যাত্রা কর সেই পরীক্ষায়
তারা নামের নিশান তুলে ॥
তারা বিদ্যা তারা শিক্ষা তারা বিশ্ববিদ্যালয়।
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারাময় ॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওরে) তারার দর্শন কিছুতেই নয়।
ওরে, সব অদর্শন, যদি আমার
তারামায়ের দর্শন না হয় ॥
তাই, এ সময় ভাই, সময় থাকতে বল
জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়
সেই করে সেই তারার জয় ॥
তাই তারা হয়েও তারায় জয় নাই
কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু তারার জয়ে তারা হয় রে মৃত্যুঞ্জয়।"

অতঃপর অধ্যাত্ম জীবন গভীরভাবে গঠন করবার জন্য শিবচন্দ্র কাশীতে গিয়ে প্রসিদ্ধ বেদান্তী শতাধিকবর্ষীয় আচার্য্য রাম রাম স্বামীর নিকট সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন এবং বেদান্ততত্ত্ব সকল করায়ত্ব করেন।

এরপর তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্র সাধনায় সাফল্য লাভের জন্য তিনি তাঁর বংশের অন্যতম তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের কাছে থেকে শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কিছু কাল পর ভেড়ামারা গ্রামের চিন্তামণি দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান রেখে দেহত্যাগ করেন। পরে পিতা চন্দ্রকুমারের নির্দেশে দ্বিতীয়বার কুমারখালি গ্রামের মনমোহিনীদেবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার ধ্যানে তিনি সর্বদা মগ্ন থাকেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনার উপাচার নিয়ে প্রায়ই বিশেষ তিথি ও যোগে শ্মশানে করেন নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। সর্বমঙ্গলময়ী "তারা তারা" রবে চারদিক কাঁপিয়ে তোলেন। প্রাণভরে গান তৈরী করে জগত জননী তারা মায়ের চরণে নিবেদন করেন। যেমন—

"শিবের বামে জীবের কামে আমারই
সেই একই মা।
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা বামা।
শক্তি স্বরুপিনী মা মোর, জীবেরও মা
শিবেরও মা।
কি জীব কি শিব, দুই-ই হ'ন শব
কোলে যদি না করেন মা॥" ইত্যাদি

অতঃপর তিনি হিমালয়ের সকল বিশিষ্ট তীর্থ দর্শন করে তিব্বতে যান এবং অধ্যাত্ম জগতের সহস্রার স্বরূপ কৈলাস ও মানস সরোবরে কিছুকাল কঠোর সাধনা করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তারপর পশ্চিম ভারতের গির্ণারের গিরিগুহায় তন্ত্রসাধনা করেন কিছুকাল। পরে পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হ'ন। পথে জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, প্রভৃতি সিদ্ধ শক্তিপীঠ প্রভৃতিতে মাতৃ সাধনা করেন। অবশেষে মহাশক্তিপীঠ তথা তন্ত্রপীঠ কামাখ্যা হয়ে তাঁর জন্মজন্মান্তরের সাধন ক্ষেত্র মহাতন্ত্রপীঠ মহাশক্তিপীঠ মহাপীঠ তারাপীঠে এলেন।

আনুমানিক বাংলা ১২৯৮ সনে মহান মাতৃসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তারাপীঠে এলেন। তারামন্দিরে ইষ্ট স্বরূপা জগত জননী তারামাকে দর্শন করবার সাথে সাথে তাঁর পূর্ব জীবনের দিব্য স্মৃতি জেগে উঠলো।

প্রায় দু'শো বছর পূর্বে এই মহাপীঠ তারাপীঠে তিনি তারাসাধক কামদেব তার্কিক রূপে এসে সাধনা করে গেছেন। সাথে ছিলেন আরেক তারাসাধক যাদবেন্দ্র ("বামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র" দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)।

তারামায়ের কৃপায় সেই জন্মে সিদ্ধিলাভের পর সকল ঐশী নির্দিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করে অলৌকিক ভাবে দেহত্যাগের সময় বামদেব তার্কিক বলে যান যে উত্তরকালে তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ বংশে আবার আবির্ভূত হবেন। বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের কথা কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রায় দু'শো বছর পর কামদেব তার্কিক আবার জন্ম নিলেন তাঁরই বংশের উত্তরপুরুষ রূপে। সেই উত্তরপুরুষই হলেন শিবাংশজাত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। আর কামদেব তার্কিকের সেই সাধন সাথী

মহাসাধক যাদবেন্দ্রও (যোগবলে জ্বলন্ত চিতা থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।) সেই অনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন শিবচন্দ্রের জন্মের কিছুকাল পর। "তাঁর বংশের ষষ্ঠ পুরুষ রূপে উত্তরকালে ভুলুয়া বাবা" রূপে তিনিও ভারত বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ রূপে সুচিহ্নিত হ'ন এবং তারাপীঠে এসে শ্রীবামের সান্নিধ্য লাভ করে সাধনান্তে আপ্তকাম হ'ন ('ভুলুয়া বাবা'—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

ত্রিলোক জননী ও অনন্ত লীলাময়ী তারামায়ের কি বিচিত্র লীলা। তারাসাধক কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র দুই জন্ম ধরে মহাপীঠ তারাপীঠে এসে সাধনা করে তারামায়ের সুদুর্লভ কৃপালাভ করলেন। অপার কৃপাময়ী তারামায়ের কত কৃপা থাকলে সাধক জন্ম জন্মান্তর ধরে তারাপীঠে এসে সাধনা করতে পারেন এবং সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

সেই দিক থেকে কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র তথা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও ভুলুয়া বাবা তারামায়ের মহা কৃপাধন্য সন্তান তথা তারামায়ের বরপুত্র স্বরূপ।

যাহোক, তারামায়ের কৃপায় কামদেব তার্কিকের বংশধর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন যে দু'শো বছর পূর্বে তারাপীঠে আগত তারাসাধক কামদেব তার্কিক ও তিনি সম্পূর্ণ অভিন্ন। একই শাশ্বত আত্মা দু'শো বছর আগে পরে দুই দেহে তারামায়ের কোলে উপস্থিত হয়েছেন।

উত্তরকালে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর বিখ্যাত "তন্ত্রতত্ত্ব" গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণ"-এ কামদেব তার্কিককে স্মরণ করে লিখেছেন—

"জয় কুলেন্দ্র কুলানন্দ্র কামদেব তার্কিক গুরুর জয়।"...

যাহোক, তারামাকে প্রণাম করে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এলেন শিবচন্দ্র। তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবাক্ষ্যাপাকে দর্শন করবার বাসনা তাঁর বহুদিনের। তারামা এতদিনে তাঁর বাসনা পূরণ করলেন। মহাশ্মশানে শিমুলতলায় শ্রীবাম বসে আছেন। মহাযোগী ও শিবাবতার শ্রীবামকে দর্শন করে মহান মাতৃসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব পুলকিত হলেন। সানন্দে শ্রীবামের চরণে প্রণত হলেন। শ্রীবামও তারামা'র ঐশী নির্দিষ্ট সাধক সন্তানকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। সাদরে শুদ্ধ আধার সম্পন্ন শিবচন্দ্রকে

কাছে টেনে নিলেন। কিছুদিন শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্যে অবস্থান করে তারাসাধনার বহু কঠিন নিগূঢ় ক্রিয়া সকল সুসম্পন্ন করেন।

শ্রীবাম শিবচন্দ্রের উন্নত পবিত্র আধারে অকৃপণ ভাবে ঢেলে দেন তাঁর অফুরন্ত দিব্য সাধন শক্তি।

শ্রীবামের কৃপায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে অনেক উচ্চ ও নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন করেন এই একত্রিশ বছরের শক্তিধর সাধক। অবশেষে কঠোর সাধনান্তে তারামায়ের দিব্য কৃপা-লাভ করে আপ্তকাম হ'ন শিবচন্দ্র। পূর্বজীবনে তারাপীঠে যে মহান তারাসাধনা শুরু করে গিয়েছিলেন, বর্তমান জীবনে সাধনান্তে তার পরিপূর্ণতা লাভ করে সাধন জীবন সর্বতোভাবে সার্থক করলেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তন্ত্রের সর্বোচ্চ সাধনা তারাসাধনায় হলেন সিদ্ধ।

একদিন মহাশ্মশানে সাধনকালে শ্রীবামের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় সহসা তাঁর পূর্ব জীবনের সাধন স্মৃতি সকল জেগে ওঠে। কামদেব তার্কিক রূপে এই মহাশ্মশানে দুই শতাব্দী পূর্বে যে সকল সাধনা করে গিয়েছেন তা তাঁর প্রজ্ঞা নয়নে একে একে ভেসে ওঠে এবং সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র উপলব্ধি করেন মহাপীঠ তারাপীঠ তাঁর জন্ম জন্মান্তরের সাধনক্ষেত্র এবং সর্বমঙ্গলময়ী ত্রিলোক জননী ব্রহ্মময়ী তারামা তাঁর হৃদয়ের চির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সাধনান্তে কয়েকদিন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য ও পবিত্র সঙ্গ লাভ করে এবং গভীর অধ্যাত্ম উপদেশ লাভ করে কৃতার্থ হ'ন শিবচন্দ্র। তারপর যথাসময়ের তারামা ও বামদেবকে প্রণাম জানিয়ে তারাপীঠ থেকে কুমারখালিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

কুমারখালিতে তিনি জগতজননী সর্বমঙ্গলার পবিত্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তন্ত্রসাধনার প্রচার ও প্রসারকল্পে সর্বমঙ্গলা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর শাখা কেন্দ্র কলকাতা, হাওড়া, শিবপুর, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময় তন্ত্রধর্মের প্রচার ও আলোচনা এবং গভীর তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনার মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

একাধারে তন্ত্রাচার্য্য, সুলেখক, সুবক্তা এবং দেশপ্রেমিকরূপে শিবচন্দ্রের নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব' সারা বাংলা তথা ভারতের

পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়। তাছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ও সমাদৃত হয় জ্ঞানী ও সুধী সমাজে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাসলীলা, দুর্গোৎসব, মা, কর্তা ও মন, গীতাঞ্জলী (দুইখণ্ড), গঙ্গেশ (নাটক), ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, শৈব গীতাবলী, স্তোত্রমালা, দশমহাবিদ্যা স্তোত্র, চণ্ডীতত্ত্ব প্রভৃতি।

তাছাড়া 'শৈবী' নামে একটি অধ্যাত্ম পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। কাশীতে সর্বমঙ্গলা সভা প্রতিষ্ঠা করে তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তন্ত্রধর্মের মূল শুদ্ধ রূপটি সাধক ও ভক্তদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে তন্ত্রের সাথে বেদ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির কোন বিরোধ নেই। তিনি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দেন যে, তন্ত্র বেদেরই অংশ। তন্ত্রের মন্ত্রশক্তিই বেদের জীবনী শক্তি বা পরমাত্মা।

তন্ত্র তাই বেদভিত্তিক। তাই তান্ত্রিক পঞ্চ উপাসনা বেদবৃক্ষেরই পঞ্চশাখা।

তন্ত্র দ্বৈত থেকে শেষপর্যন্ত সেই অদ্বৈত লীলাতেই পৌঁছে দেয়। তন্ত্রের সার্বজনীন উদারতার কথা তিনি সুন্দর বর্ণনা করে বলেছেন, "পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গাজলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই,...কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতেও তন্ত্রের কোন আপত্তি নাই। তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য নিস্তারের অদ্বিতীয় ও অমোঘ উপায়।"

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সার্বজনীন উদারতার জন্য সর্বমতের সর্বপথের লোকই তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট ধর্মনেতা রূপেও তিনি সারা ভারতবর্ষে সুখ্যাতি লাভ করেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আরেক কৃপাধন্য সিদ্ধপুরুষ ও ভারত বিখ্যাত ধর্মনেতা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর মহান ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব নিজে এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিশেষ গুণমুগ্ধ পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি এবং আত্মানন্দ পরমহংসজী প্রভৃতি ধর্মনেতাগণ সমবেত ভাবে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর ধর্ম আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

ভারতব্যাপী বহু আর্য্যসভার প্রতিষ্ঠাতা, সুবক্তা ও দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর মহান ধর্ম

আন্দোলনে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তথা কৃষ্ণানন্দর সাথে শিবচন্দ্রের গভীর হৃদ্যতা ছিল। উভয়ে মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য (শ্রীবামকৃপা ধন্য স্বামী কৃষ্ণানন্দ—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। বিখ্যাত মরমিয়া সাধক ও বাউল কবি লালন ফকিরের সাথেও তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্রের হৃদ্যতা ছিল। লালন গভীর ফকিরের সার্বজনীন উদার মতের সাথে শিবচন্দ্র একাত্ম ছিলেন। মাঝে মাঝে শিবচন্দ্র কুমারখালি থেকে অদূরবর্তী কুষ্ঠিয়ার ছেউরিয়া গ্রাম থেকে সাধক কবি লালন ফকিরকে সাদরে নিয়ে আসতেন। তারপর শুনতেন এই সিদ্ধসাধক ও মানবতার পূজারীর মন মাতানো মধুর বাউল গান।

লালন ফকিরের, "সবলোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারে,' 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়' প্রভৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গানগুলো সিদ্ধপুরুষ ও সুকবি ও গীতিকার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে গভীর আনন্দ দান করতো।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা ও তাঁর দিব্যভাব সকল বাংলা তথা ভারতের জ্ঞানীগুণী মহলে সাগ্রহে প্রচার করেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাও মহাপীঠ তারাপীঠে বসেই শিবচন্দ্রের সকল কর্মধারার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন এবং একের পর এক তন্ত্র সাধনেচ্ছু ভক্তদের শিবচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেন।

একবার দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং তারাপীঠে এসে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্মশানে অভিচার অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা জানালে শ্রীবাম তাঁকে বললেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্রের কাছে যাও। তিনি শক্তিমান, তান্ত্রিক নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার প্রাণের আকাঙ্খা।

শ্রীবামের নির্দেশ মত কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজা কামেশ্বর সিং কুমারখালিতে শিবচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হ'ন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা শুনে শিবচন্দ্র রাজী হ'ন। শিঘ্রই একদিন গভীর রাতে নিকটবর্তী শ্মশানে অনুষ্ঠিত হ'ল মহাকালীর আরাধনা।

শিবচন্দ্রের সাধন শক্তি দেখে কামেশ্বর সিং মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর অন্যতম অনুরাগী হ'ন। উত্তরকালে কুমারখালিতে এবং

দেওঘরে শিবচন্দ্রের সাথে একাধিকবার কামেশ্বর সিং সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হ'ন।

হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুরের ভক্তপ্রবর শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা শিবচন্দ্রের কাছে তন্ত্র সাধনা শিখতে পাঠান। শ্রীবামের ইচ্ছানুসারে শিবচন্দ্র শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তন্ত্রসাধনা শেখান। কাশীর মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান ও বৈদ্যনাথের শ্মশান শিবচন্দ্রের তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিশেষ প্রিয় স্থান রূপে চিহ্নিত। শিবচন্দ্রের বিখ্যাত পঞ্চদুর্গা উৎসব একটি বিশেষ উৎসব ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিও দেশপ্রেমিক শিবচন্দ্রের প্রবল সমর্থন ছিল। বাংলার বহুস্থানে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিবচন্দ্র তেজদৃপ্ত ভাষণ দেন। বহু দেশনেতা তাঁর গভীর অনুরাগী ছিলেন।

শিবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের মধ্যে তৎকালীন কলকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জন উডরফ (সস্ত্রীক), দানবারি গাঙ্গুলী, কালীধন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার উডরফ তাঁর গুরুদেব শিবচন্দ্রের লেখা তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ (Principle of Tantra, Part I & II) করে পাশ্চাত্য দেশে এবং সারাবিশ্বে তন্ত্রসাধনার মহিমা প্রচার করেন।

স্যার উডরফের জীবনে ভারতে ও ইংলণ্ডে একাধিকবার তাঁরগুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের অন্যতম অনুরাগী এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ নামে ভারত-বিখ্যাত) স্যার উডরফকে অনুবাদের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

তন্ত্রাচার্য ও ধর্মাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের বিশিষ্ট অনুরাগীদের মধ্যে ই. বি. হ্যাভেল, ডক্টর আনন্দকুমার স্বামী, কৃষ্ণানন্দস্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ছিলেন।

বাংলা ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র অমাবস্যা তিথিতে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করতে করতে "মা—মা, তারা তারা ব্রহ্মময়ী" বলে মরদেহ ত্যাগ করলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন চিরশান্তিতে চির আরাধ্যদেবী সর্বমঙ্গলময়ী তারামায়ের অন্তহীন পরম আনন্দময় কোলে।

—o—

শ্রীবামদর্শনে কাশ্মীরের মহারাজা

কাশ্মীরের মহারাজা সদল বলে ডাবুকে যাবার পথে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দর্শনের জন্য তারাপীঠে এলেন। তারাপীঠের অদূরে ডাবুক। সেই ডাবুকের কৈলাসানন্দ স্বামীর তিনি শিষ্য। তিনি ইতিপূর্বে ডাবুকের অনাদিলিঙ্গ ডাবুকেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য ও নিত্য সেবাপূজার জন্য একলক্ষ টাকা তাঁর গুরু কৈলাসানন্দ স্বামী তথা ডাবুকের কৈলাসপতিকে দিয়েছিলেন (সেই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে এই একলক্ষ টাকার মূল্য বর্তমানে কোটি টাকার চেয়েও বেশী)। অবশ্য এই টাকা দেবার পূর্বে তিনি কৈলাসপতির নিকট সাধন শক্তির পরিচয় পান। সেই কাহিনী যেমন অলৌকিক তেমনি নাটকীয় (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)।

যাহোক, ডাবুকের মন্দির তৈরী হ'বার পর তিনি একাধিকবার সুদূর কাশ্মীর থেকে ডাবুকে যাতায়াত কবেন। ডাবুকেশ্বর দর্শন, পূজা প্রভৃতি দেবার জন্য এবং গুরু কৈলাসপতির দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্যই তাঁর এই আসা যাওয়া। সেই সময় তিনি জানতে পারেন যে ডাবুকেশ্বর অনাদিলিঙ্গের ('ভৈরব উন্মত্তেশ্বর' মূল নাম) সংস্কার সাধন করেন তারাপীঠের নবীন মহাতাপস তথা মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা।

কাশ্মীরের মহারাজা বুঝতে পারলেন যে, তাঁর গুরু একাধারে প্রবীন ও পরম প্রাজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েও যখন নিজে অনাদিলিঙ্গ ডাবুকেশ্বর শিবের সংস্কার সাধন না করে তারাপীঠের এই নবীন মহাসাধককে দিয়ে করিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই মহাকৌল শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা একজন মহাশক্তিধর মহাপুরুষ।

সেই থেকে কাশ্মীরের মহারাজা (যতদূর সম্ভব জানা যায়, তিনি কাশ্মীরের মহারাজা হরিসিং-এর পিতৃদেব) তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করবার আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেন।

পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সম্পর্কে তাঁর গুরু কৈলাসপতি ও আরো অনেকের কাছে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনতে পান। ফলে তাঁকে দর্শনের জন্য মহারাজার আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে

তাঁর ব্যাকুলতা চরমে পেঁাছে যায়। তিনি স্থির করেন যে এবার ডাবুকে যাবার পথে প্রথমে তারাপীঠ যাবেন।

তারাপীঠেব নাম মাহাত্ম্যও তিনি কিছু কিছু শুনেছেন। তাই জগতজননী তারামাকে প্রণাম করে এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করে তারপর তিনি ডাবুকে যাবেন। সেইমত তিনি সব ব্যবস্থা করে সদলবলে তারাপীঠে এলেন।

তারাপীঠে প্রবেশ করেই মহারাজা তারাপীঠের অপার্থিব সৌন্দর্য ও স্থান মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে মুগ্ধ হলেন। মহারাজা একাধারে ধর্মপ্রাণ, উদার, গুণী, সহৃদয় এবং দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি। তার ওপর তিনি বীরাচারী সিদ্ধমহাপুরুষ কৈলাসপতির শিষ্য। সুতরাং তিনি একই সাথে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট।

যাহোক, তারামাকে যথারীতি দর্শন ও পুজো দিয়ে মহারাজা সদলবলে তারাপীঠে মহাশ্মশানে প্রবেশ করলেন। মহাশ্মশানের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য ও মাধুর্য মহারাজকে মুগ্ধ করলো।

শ্রীবাম তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়স্থান শিমুল তলায় বসে আছেন। সাথে কয়েকজন পাণ্ডা ও ভক্ত রয়েছেন। শ্রীবামের বিশাল ভৈরব মূর্তি, তেজদৃপ্ত আরক্তিম নয়ন এবং ভাবগম্ভীর রূপ দর্শন করে মহারাজা মুগ্ধ হলেন। সাধু দশন করলে কিছু দিতে হয়। সাধুদের কাছে হাতে খালি যেতে নেই। মহারাজ এই ধর্মীয় শিষ্টাচার জানেন।

তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম ঐশ্বর্যশালী রাজ্য কাশ্মীরের অধিপতি। তাছাড়া মহাতীর্থ অমরনাথ, শারদাপীঠ, বৈষ্ণদেবী প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত হিন্দুতীর্থগুলো তাঁর রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ভারতের বহু বিশিষ্ট সাধুসন্তের আসা-যাওয়া তার রাজ্যে আছে। অনেকে মহারাজার রাজদরবারেও আসেন। মহারাজা সকলকেই অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রভৃতি অকাতরে দান করেন। এজন্য ভারতের সাধু সমাজে মহারাজার খুবই সুনাম রয়েছে। সাধুদেব বহু মঠমন্দির তৈরী ও সংস্কারেও মহারাজা প্রচুর অর্থ দান করেন।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শনের ব্যবস্থা এবং সারা ভারতবর্ষ থেকে আগত বহু বিশিষ্ট সাধুসন্তের সেবার ব্যবস্থাও মহারাজা প্রতি বছর করেন।

সুতরাং সাধুদের জন্য মহারাজ বিশাল অর্থ ব্যয় করেন। এ ব্যাপারে মহারাজের প্রচুর দানধ্যান সর্বজনবিদিত। তাই মহারাজা তারাপীঠেও তাঁর ঐশ্বর্য প্রদানে সচেষ্ট হলেন। সাধুদর্শনের জন্য আনিত 'ভেট' শ্রীবামের সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

এক বিশাল সোনার থালায় (কম করেও সেই সোনার থালার ওজন বিশ সের) অজস্র সোনার মোহর দিয়ে পরিপূর্ণ করে এবং পূজার নৈবেদ্যর মত চূড়া করে শ্রীবামের সামনে দিলেন এবং মহারাজা স্বভাব সুলভ বিনয়ের সাথে হাতজোড় করে বামদেবকে তা দয়া করে গ্রহণ করতে বললেন।

শ্রীবাম একবার তাকালেন এই বিশাল সোনার থালা ও তার ওপর অবস্থিত শত শত সোনার মোহরের দিকে। তারপর ইঙ্গিত করলেন তার পাশে উপবিষ্ট একটি প্রিয় কুকুরের দিকে। কুকুরটি তখনি উঠে সোনার থালা ও মোহরের দিকে এগিয়ে গেল। একবার শুঁকলো সোনার থালা ও মোহরগুলোকে। তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে যথারীতি নির্বিকার ভাবে বসে রইলো। সাথে সাথে মহাযোগী ও পূর্ণব্রহ্মবিদ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মূর্তি উগ্ররূপ ধারণ করলো। তাঁর বিশাল তেজদৃপ্ত আরক্তিম নয়নদ্বয় জ্বলে উঠলো।

গম্ভীরভাবে মেঘমন্দ্রিত স্বরে বললেন মহারাজাকে, "যে জিনিষ কুকুরেও ছোঁয়না, সেই জিনিষ সাধুকে দিতে নেই।"

শ্রীবামের একথা শুনে মহারাজ অপ্রস্তুত হলেন। নতমস্তকে দাড়িয়ে রইলেন। তাঁর চৈতন্যের উদয় হ'ল। 'সাধু' কথার যথার্থ অর্থ কি তা শ্রীবামের কৃপায় তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। মহারাজা কিভাবে শ্রীবামকে সেবা করবেন তা চিন্তা করতে লাগলেন। উপস্থিত পাণ্ডাগণ ও ভক্তগণ মহারাজের অবস্থা বুঝতে পারলেন।

তাড়াতাড়ি কিছু ফল মিষ্টি ও কয়েক বোতল 'কারণ'—এর ব্যবস্থা মহারাজাকে করতে বললেন। মহারাজার কাছে ফল মিষ্টি ও 'কারণ' ছিল। ডাবুকের পূজার জন্য এসব নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই থেকে কিছু পাণ্ডাদের সহযোগিতায় তাড়াতাড়ি শ্রীবামের সম্মুখে সেসব উপস্থিত করলেন।

শ্রীবাম এবার প্রসন্ন হলেন। ফলমিষ্টি উপস্থিত সবাইকে

বিলিয়ে দিলেন। 'কারণ' তারা মাকে নিবেদন করে, নিজে কিছু খেলেন বাকিটা কুকুরটিকে এবং দু' একজন ভক্তকে দিলেন।

পরে শ্রীবাম মহারাজকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীবামের আশীর্বাদ লাভ করে মহারাজ পরম আনন্দ লাভ করলেন।

শ্রীবামের নির্লোভ মনভাব তাঁকে অপরিসীম মুগ্ধ করলো। মহারাজা উপস্থিত পাণ্ডাবর্গ ও ভক্তদের বললেন, "আমি জীবনে বহু সাধু দর্শন করেছি কিন্তু এমন নির্লোভ সাধু মহাপুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। 'সাধু' শব্দের যথার্থ অর্থ কি তা এতদিনে উপলব্ধি করলুম। আমি ধন্য, আমার জীবন সার্থক হ'ল বামাক্ষ্যাপা বাবাকে দর্শন করে। তারাপীঠে আসা আমার সার্থক হ'ল।"

অতঃপর শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে ভেট স্বরূপ যে বিরাট সোনার থালা ও শত শত সোনার মোহর মহারাজা দিয়েছিলেন, (যা শ্রীবাম প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি,) সেই সোনার থালা ও মোহর মহারাজ সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করেন। শোনা যায়, সেই সময় শ্রীবামের অনুজ রামচন্দ্র উপস্থিত হ'ন। মহারাজা তাঁকেও মোহর দিয়ে আপ্যায়ন করেন।

তারপর তারামাকে ও শ্রীবামকে প্রণাম করে ডাবুকের পথে রওনা হলেন।

উপরোক্ত লীলার মধ্য দিয়ে শ্রীবাম কাশ্মীরের মহারাজাকে এই জ্ঞান দিলেন যে, যিনি যথার্থ সাধু তিনি সর্বদা সৎকে ধরে থাকেন। সৎ মানে সত্য। সত্যকে যিনি ধরে আছেন তিনিই সাধু। এই সত্য তথা নিত্য শাশ্বত ও চিরন্তন হলেন স্বয়ং ঈশ্বর।

সাধু সেই সত্য স্বরূপ নিত্য স্বরূপ তথা অসীম অনন্ত অক্ষয় অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরকে সর্বদা ধরে থাকেন। ফলে ঈশ্বরের অপার্থিব ঐশ্বর্যের ও মাধুর্য্যের আস্বাদে সাধুর হৃদয় সর্বদা পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকেন।

তাই অসার অনিত্য ক্ষয়ীষ্ণু নশ্বর অস্থির এই পার্থিব টাকা কড়ির কোন মূল্য সেই সাধুর কাছে নেই। তিনি ঈশ্বরের চিরন্তন ঐশ্বর্যে সর্বদা ঐশ্বর্যবান। তাই এই পার্থিব কাঞ্চন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। যেমন মূল্যহীন তাঁর কাছে পার্থিব তথা অসার অনিত্য সংসারের কামিনী।

তাই সাধুর কাছে এই কামিনী কাঞ্চন সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও পরিত্যাজ্য।

যে পাখী সত্য তথা নিত্য মুক্তির মহাকাশে তার জ্ঞান ও ভক্তির দু'ডানা মেলে অমৃত আনন্দে উড়ে বেড়ায়, সে কখনো অনিত্য অসার অশান্তিময় কামিনী কাঞ্চনের বদ্ধ খাঁচায় আবদ্ধ হয় না।

ভূমার আনন্দে সাধু সেই হোমা পাখীর ন্যায় পার্থিব কামিনী কাঞ্চনের বহু ঊর্দ্ধে নিত্য চিদাকাশে বিরাজ করেন। কখনো নীচে নামেন না।

এই হ'ল 'সাধু'। এই 'সাধু' সর্বদা স্ব-ভাবে থাকেন অর্থাৎ সত্য ও নিত্যের ভাবে থাকেন। যা তাঁর নিজস্ব স্বরূপ।

এই স্বভাবে সাধুই হ'ল শ্রীবাম বর্ণিত 'সাধু'। এই "সাধু" অভাবে সাধু অর্থাৎ অনিত্যের ভাবে মগ্ন সাধু নন। জগত সংসারে বর্তমানে এই অভাবে সাধুর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু শ্রীবাম বর্ণিত স্বভাবে সাধুর সংখ্যা খুব কম। কাশ্মীরের মহারাজা এ পর্যন্ত অভাবে সাধু অর্থাৎ অনিত্য ভাবে মগ্ন সাধুই দেখেছেন, তাই তাঁরা মহারাজার প্রদত্ত কাঞ্চন তথা টাকা পয়সা গ্রহণ করেছেন এবং মহারাজাও সর্বত্র এই টাকা দিয়ে গেছেন। তার ফলে কাশ্মীরের মহারাজেরও স্থির ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সাধু মাত্রেই কাঞ্চন তথা টাকা পয়সা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সর্ব মোহমুক্তির মহাক্ষেত্র তথা পরম ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠে এসে তারামায়ের অভেদ স্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপায় ও শিক্ষায় মহারাজের এত দিনের ভুল ধারণা ও অভিজ্ঞতা ভেঙ্গে গেল। শ্রীবাম নিজ আচরণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ও বুঝিয়ে দিলেন "সাধু" কাকে বলে এবং আরো জানিয়ে দিলেন যে এই স্ব-ভাবে সাধুই হলেন যথার্থ "সাধু।

—০—

শ্রীবামের নাটোরে গমন ও বিচিত্র লীলা

নাটোরের মহারাজা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মহারাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর একান্ত বাসনা যে তারামায়ের বরপুত্র বামাক্ষ্যাপা বাবা একবার তারাপীঠ থেকে নাটোরে আসেন। মহারাণী জানেন যে বামাক্ষ্যাপা-বাবা অসাধারণ যোগবিভূতির অধিকারী। তিনি ইচ্ছে করলেই মহারাজাকে সুস্থ করে দিতে পারেন।

নাটোরের ছোট তরফ এক শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায় তারমায়ের নিত্য সেবা পূজার মহান ব্রত পালন করে চলেছেন। শ্রীবাম তা ভাল ভাবেই জানেন। তাছাড়া নাটোরের সেবার অন্ন তারামায়ের সাথে শ্রীবামও প্রতিদিন গ্রহণ করেন।

সুতরাং মহারাণী স্বর্ণময়ীর এই বিপদের দিনে করুণাময় শ্রীবাম নাটোর যেতে রাজী হলেন।

মহারাণী স্বর্ণকুমারী দেবী সানন্দে তাঁকে আনবার জন্য তাঁর রাজ এষ্টেটের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী ও পাইক বরকন্দাজ পাঠালেন।

শ্রীবাম কয়েকজন ভক্ত সেবকসহ তাঁদের সাথে নাটোর রওনা হলেন।

সবারই ইচ্ছে মহারাজা সুস্থ হয়ে যান। বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীবামের মুখ থেকে যা বের হবে, তাই সত্য হবে। এটা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। তাই কয়েকজন চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে শ্রীবাম সেই রকম কিছু বলেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হলে মহারাজা সুস্থ হবেন এবং তাঁরাও পর্যাপ্ত আর্থিক পুরস্কার পাবেন। সেই আসায় তাঁরা সারা পথ শ্রীবামকে বলতে লাগলেন, "বাবা, আপনি মহারাজার কাছে গিয়ে শুধু বলবেন, ভাল হয়ে যাবে। আর মহারাণীকে বলবেন—তোমার স্বামী ভাল হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই। ব্যাস আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না"।

শ্রীবাম সবই শুনলেন। সায়ও দিলেন তাঁদের কথামত। সবাই খুব খুশি। যথাসময়ে নাটোরে পৌঁছলেন শ্রীবাম। মহারাণী

সাদরে শ্রীবামকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীবামের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করলেন। তারপর মহারাজার কাছে নিয়ে গেলেন, শ্রীবাম দেখলেন। কিছু বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তারামা বলতে দিলেন না।

শ্রীবামের কন্ঠ থেকে কোন আশ্বাস বাণী বের হ'ল না। মহারাজার ঘর থেকে শ্রীবাম বের হয়ে এলে মহারাণী স্বর্ণকুমারী দেবী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন মহারাজার আরোগ্য সম্পর্কে।

সহসা শ্রীবামের মুখ থেকে বের হ'ল, "ফট্ হয়ে যাবে।" অর্থাৎ মৃত্যু হবে অচিরে। এই মর্মান্তিক কথা শুনে মহারাণী ও সবাই বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

করুণাময় শ্রীবাম দুঃখের সাথে মহারাণীকে বললেন "আমি তো ভাল হয়ে যাবে-ই" বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু তারামা বলতে দিলেন না। জিহ্বাগ্রে এসে "ফট্" বলে দিলেন।" মহারাণী উপলব্ধি করলেন যে নিয়তি একেই বলে। মহারাজের জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত হয়ে এসেছে।

পরদিন শ্রীবাম নাটোর থেকে রওনা হলেন। তার দু'দিন বাদেই মহারাজা দেহত্যাগ করলেন।

শোনা যায় ফেরবার পথে শ্রীবামকে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিনীর মন্দিরে যাবার অনুরোধ করা হয় কিন্তু শ্রীবাম যেতে অস্বীকার করেন।

তারামায়ের ছোট্ট অমৃতময় রূপটিই শ্রীবামের সমগ্র অন্তর জুড়ে রয়েছে তাই তারামায়ের অন্য মূর্তি শ্রীবামের কাছে তত আকর্ষণীয় নয়।

নাটোরের ন্যায় এরকম ঘটনা উত্তরকালে হাসনের জমিদারের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল, তবে সে ক্ষেত্রে শ্রীবামের ঐকান্তিক ইচ্ছায় হাসনের জমিদার দেহান্তে তারাপীঠে তারামায়ের কোল লাভ করে ধন্য হ'ন।

যথাসময়ে সেই কাহিনী (তৃতীয় খণ্ডে) বর্ণিত হবে।

—o—

শ্রীবাম স্নেহধন্য সদাগরের কথা

মহাপীঠ তারাপীঠের শ্রীশ্রীতারামন্দিরের পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে গ্রামের পথ। উত্তর দক্ষিণ লম্বা দীর্ঘ এই পথ।

এই পথের ওপরই তারা মন্দিরের পাশে মহেন্দ্রচন্দ্র প্রামাণিকের দোকান। মহেন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত সৎ ও সহৃদয় ব্যক্তি। তারাপীঠের প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে খুবই ভালবাসেন ও সম্মান করেন। তিনি শ্রীবামকে 'কর্তাবাবা' বলে ডাকেন। শ্রীবাম তাকে আদর করে "সদাগর" বলে ডাকেন।

শ্রীবাম কখনো দোকানে পদার্পণ করলে মহেন্দ্রচন্দ্র শ্রীবামকে তামাক, কলাই ভাঁজা, লঙ্কা প্রভৃতি দিয়ে সাধ্যমত আপ্যায়ন করেন।

একদিন শ্রীবাম সন্ধ্যা বেলা দোকানে এসে তাঁর প্রিয় সদাগরকে বললেন, "সদাগর আমায় কলাই ভাজা দে" ; সদাগর তাই দিলেন।

তারপর আবার বললেন, "লঙ্কা দে"। সদাগর তাও দিলেন। তারপর পুনরায় পায়ে মাখবার জন্য তেল চাইলেন।

সদাগর বাঁশের চোঙ্গায় করে তেল দিলেন। এরপর সদাগরকে বললেন, "সারাদিন খুব চেঁচাইছি, তামাক দে বাবা।"

সরল ভক্ত সদাগর এবার রেগে গিয়ে তামাক দিতে দিতে বললো, "কত দেব আর?" শ্রীবাম মধুর স্বরে বললেন, "দে বাবা দে।"

শ্রীবামের এই মধুর স্বরে ভক্ত সদাগরের মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল।

শ্রীবামকে তিনি খুবই ভালবাসেন।

শ্রীবামের মাহাত্ম্যও তিনি সাধ্যমত উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। শ্রীবামের এই লীলা বিচিত্র রহস্যময়। যাঁর পদতলে প্রতিদিন অজস্র ভক্ত প্রদত্ত ফল মূল 'কারণ' মিষ্টি প্রভৃতি পড়ছে। যাঁর সামান্য ইচ্ছা-পূরণের জন্য তাঁর গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সর্বদা ব্যাকুল। যাঁর পদতলে রাজা মহারাজাগণ সোনার থালায় সোনার মোহর স্তূপীকৃত করে দিয়ে এবং দেশ বিদেশের সেরা 'কারণ' বোতল ও অন্যান্য

বহুবিধ সামগ্রী 'ভেট' দিয়ে কৃতার্থ বোধ করেন, এমন কি ভারত বিখ্যাত বহু সিদ্ধ মহাপুরুষগণ পর্যন্ত যাঁর দর্শনে এসে ও যাঁকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার খাইয়ে অশেষ আনন্দ লাভ করে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন (কারণ শ্রীবামকে খাওয়ালে স্বয়ং তারামাকেই খাওয়ানো হয়, এই তাঁদের উপলব্ধি) সেই চির অনাসক্ত মহাপুরুষ শ্রীবাম একজন সামান্য দোকানদারের কাছে গিয়ে কলাই ভাজা, তেল, লঙ্কা, তামাক চেয়ে চেয়ে নিচ্ছেন এটা খুবই আপাতবিরোধী ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

কিন্তু মূলত তা নয়। ভগবান চিরদিনই প্রিয় ভক্তের কাছে ছোট্ট হয়ে আসেন।

ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য ভক্ত তাই দেখতে পান না। ভগবান তাঁর ঐশ্বর্য গোপন করে মাধুর্য নিয়েই ভক্তের কাছে আসেন। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে অমৃতময় মাধুর্য বিরাজমান।

এই স্বর্গীয় মাধুর্যের আস্বাদে ভক্ত আনন্দে বিভোর হ'ন। আর ভক্তের এই আনন্দময় আস্বাদে ভগবান হ'ন তৃপ্ত।

ভক্ত যে ভগবানের প্রাণাধিক প্রিয়। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন অবতার দেখা যায় ভক্তের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার্ঘও ভগবান সানন্দে গ্রহণ করছেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত গুহকচণ্ডালকে কোল দিয়ে তার প্রদত্ত ফলমূল সানন্দে গ্রহণ করছেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজোচিত অভ্যর্থনা ও আমন্ত্রণ ত্যাগ করে ভক্ত বিদুরের ক্ষুদ্র গৃহে গিয়ে সামান্য অন্ন গ্রহণ করছেন। ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ও সখা সুদামার জীর্ণ মলিন বস্ত্র থেকে সানন্দে এক মুঠি চিঁড়া গ্রহণ করে তৃপ্ত হচ্ছেন।

এমনিভাবে যুগে যুগে ভগবান অজস্র আদর্শ স্থাপন করে চলেছেন। ভাগবত ভক্ত ভগবান যে এক। শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাও তাঁর মর্ত্য লীলায় এই আদর্শ একাধিক বার স্থাপন করেছেন।

শ্রীবামের কৃপায় ভক্ত 'সদাগর' (মহেন্দ্রচন্দ্র প্রামাণিক) সুখে শান্তিতে সারাজীবন সপরিবারে কাটিয়ে যান।

মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিকের পুত্র গৌর প্রামাণিকও শ্রীবামের অশেষ কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন। যথাসময়ে শ্রীবাম কৃপাধন্য গৌর প্রামাণিকের কথা (তৃতীয় খণ্ডে) বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত কাহিনীটি মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিকের পুত্র বৃদ্ধ গৌর প্রামাণিক বাংলা ১৩৭৮ সনে (ইং ১৯৭১) লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি শ্রীবামের আরো অনেক লীলাকথা লেখককে বলেছেন। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

- o --

শ্রীবামের পৈতা মাহাত্ম্য

শ্রীবামের গলায় পৈতা রয়েছে। ব্রাহ্মণের সন্তান, তাই তাঁর এই যজ্ঞোপবীত। কিন্তু এই পৈতার এমনি মাহাত্ম্য যে প্রায়ই তাঁর গলায় থাকে না।

সর্ব সংস্কার মুক্ত ও সর্বপাশ মুক্ত পূর্ণ ব্রহ্মবিদ শ্রীবামের পৈতার কোন প্রয়োজন নেই। তবু কখনো গলায় থাকে কখনো গলায় থাকেনা। এই থাকা না থাকা নিয়ে কৌতুকও কম হয়না।

একবার শ্রীবামের গলার পৈতাটা দীর্ঘদিন ধরে ময়লা হয়ে রয়েছে। দেহবোধহীন শ্রীবামের সেদিকে খেয়াল নেই।

কিন্তু তাঁর নিত্য সেবক নন্দদাই একদিন তা দেখে শ্রীবামকে বললো, "গোঁসাই, তুমার পৈতা কাল্লা হইছে বটে, দেন কেনে ধুয়ে দিই।" সাথে সাথে শ্রীবাম সেবক নন্দদাইকে পৈতাটা গা থেকে খুলে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যা বটে"।

নন্দ দাই তথা নোদা পৈতাটা ধুয়ে গাছের ডালে মেলে দিল। হাওয়ায় পৈতাটা উড়ে গিয়ে দ্বারকায় পড়ে ভেসে গেল। নোদা কিছু বললো না শ্রীবামকে। শ্রীবামও নোদাকে আর পৈতার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। কিছুক্ষণ পর কবিচন্দ্রপুরের কৃষ্ণধন লেট এসে শ্রীবামকে গাঁজা টিপে দিল। শ্রীবাম গাঁজায় দম দিয়ে চুপ করে রইলেন।

তারপর তিন মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীবামের যেন খেয়াল হ'ল পৈতার ব্যাপারে। সাথে সাথে নোদাকে ডেকে বললেন, "নোদা, আমার পৈতা কৈ?" নোদা উত্তরে বললো, "লিয়ে আইছি গোঁসাই"। এই বলে নোদা তার কবিচন্দ্রপুরের ঘরে গেল। নোদা ভাল করেই জানে যে শ্রীবামের সেই পৈতা কবে হারিয়ে গেছে। তাই সে তার বউয়ের কাপড়ের পাড় থেকে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে তা পৈতার মত করে পাকিয়ে নিয়ে এল শ্রীবামের কাছে। তারপর বললো, "এই লাও গোঁসাই তুমার পৈতা"।

শ্রীবাম খুশি মনে তাই গলায় পরলেন। নোদাও খুশি হ'ল তাঁর প্রভু শ্রীবামকে ঠকাতে পেরে।

সর্বজ্ঞ শ্রীবাম সব বুঝেই হাসিমুখে তা অনুমোদন করলেন। তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি তাই সদাই ব্রাহ্মণ। এই লৌকিক পৈতা তাই তাঁর মত সদা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত দেবমানবের কাছে অর্থহীন।

এই নোদা জাতিতে ডোম, সেই ডোমের স্ত্রী'র কাপড়ের পাড় দিয়ে পাকানো এই বিচিত্র পৈতা এবং জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ পৈতা, এই দুই-ই তাঁর কাছে সমান মূল্যহীন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তথা শ্রীবাম এই দৃষ্টান্তই দেখালেন। তাই এই পৈতা প্রায়ই তাঁর গলায় থাকে না। এক ভক্ত তাঁকে একদা প্রশ্ন করে যে তবু কেন তিনি গলায় পৈতা রাখেন। উত্তরে শ্রীবাম তাকে বলেন যে, তাঁর পিতার (সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়) ইচ্ছে ছিল যে তিনি গলায় পৈতা রাখেন। তাই তিনি পৈতা রেখেছেন। কিন্তু এই পৈতা তাঁর কাছে থাকা বা না থাকা দুই-ই সমান।

তাই দেহ বোধহীন নিত্য শুদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্যপবিত্র পরম ব্রহ্মবিদ শ্রীবামের দিব্য দেহে এই পৈতা প্রায়ই বিচিত্র কৌতুকের কারণ হয়ে দাড়ায়। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক, শ্রীবামের অপার কৃপাধন্য ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ (তেলিখানা শ্মশান, হুগলী) তীর্থাবধূতের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

শিক্ষাদাতা শ্রীবাম ও তান্ত্রিকগণ

পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা থেকে চারজন ভৈরব ও ভৈরবী এলেন মহাতীর্থ কালীঘাটে। মা কালীকে দর্শন করবার পর তাঁরা কালীঘাটের সেবায়েতদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে তান্ত্রিকগণ সেবায়েত পাণ্ডাদের কাছে জানতে চাইলেন যে এখানে এমন কোন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন কিনা, যাঁর সাথে তাঁরা চক্রে বসতে পারেন। এই রকম শক্তিধর তান্ত্রিকের সাথে চক্রে বসলে তাঁদেরও সাধনশক্তি বৃদ্ধি হবে। সেবায়েতগণ সবিনয়ে তাঁদের জানালেন যে, আপাতত কালীঘাটে তাঁদের জ্ঞাতসারে তেমন কোন শক্তিমান বীরাচারী তান্ত্রিকের খবর নেই। তবে বীরভূমের মহাপীঠ তারাপীঠে মহাতান্ত্রিক ও মহান সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষ্যাপা রয়েছেন। তিনি মহাকৌল। বীরভূমের তন্ত্রের ধারাকে তিনিই ধরে রেখেছেন। সুপ্রাচীন তন্ত্রপীঠ তারাপীঠকে তিনিই জাগ্রত করে রেখেছেন। তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব তিনি।

সেবায়েতগণ তাঁদের আরো বললেন যে, ভারতের বহুস্থান থেকে বহু উন্নত শক্তি সাধক বামাক্ষ্যাপার কৃপা লাভের জন্য তারাপীঠে যাতায়াত করেন এবং অনেকে বামাক্ষ্যাপার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করেছেন।

সুতরাং তারাপীঠে গিয়ে মহাকৌল বামাক্ষ্যাপার সাথে চক্রে বসতে পারলে মনের বাসনা পূর্ণ হবে এবং তাঁদের শক্তিসঞ্চারও হবে! সেবায়েতদের একথা শুনে ভৈরব ভৈরবীগণ খুশি হলেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তারাপীঠে গিয়ে স্বয়ং বামাক্ষ্যাপাকে নিয়ে তাঁরা চক্রে বসবেন।

পরদিন এই চারজন তান্ত্রিক তারপীঠ রওনা হলেন। যথাসময়ে তারাপীঠে পৌঁছলেন। মহাশ্মশানে শিমুলতলায় শ্রীবামের দশন পেলেন। শিষ্য ও ভক্ত পরিবৃত হয়ে শ্রীবাম বসে আছেন। শ্রীবামকে প্রণাম করে তান্ত্রিকবৃন্দ নিজেদের মনের বাসনা শ্রীবামের চরণে নিবেদন করলেন।

এই তান্ত্রিক ভৈরব ভৈরবীগণ নিজেদের বীরাচারী সাধক সাধিকা মনে করেন। তাই শ্রীবামকে নিয়ে তন্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়া "চক্র"-এ বসতে চাইলেন। শ্রীবাম কৃপা করে সম্মতি দিলেন। ঠিক হ'ল,

গভীর রাতে মহাশ্মশানের প্রাণকেন্দ্র শিমুলতলায় এই তান্ত্রিক চক্র অনুষ্ঠিত হবে। স্বভাবতই শ্রীবামকে তান্ত্রিকগণ চক্রেশ্বর পদে বরণ করলেন। শ্রীবাম সম্মতি জানালেন।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগলো। পাণ্ডাগণ ও অন্যান্য ভক্তগণ যে যার গৃহে ফিরে গেলেন। মহাশ্মশান জনমানবশূন্য হ'ল। দিনের মূক শ্মশান রাতে মুখর হয়ে উঠলো। ঘোর অন্ধকারে আবৃত মহাশ্মশান জেগে উঠলো। শবদেহ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলো শিবা ও সারমেয়গণ। সর সর শব্দে নানান ধরণের বিষাক্ত সর্প চলাফেরা করতে লাগলো। অন্ধকারে শকুনীর ছানার করুণ কান্না আর অজস্র নরকপালের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের বিচিত্রধ্বনি প্রবাহিত হতে লাগলো। তার সাথে অসংখ্য অশরীরীর দীর্ঘশ্বাস ও যাতায়াতে মহাশ্মশান ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে লাগলো। নানান ভৌতিক শব্দে মহাশ্মশান মুখর হ'ল। এই ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে শ্রীবামের সাথে উপরোক্ত ভৈরব ভৈরবীগণ শিমুলতলায় এলেন। যথাসময়ে চক্রে বসলেন সবাই।

চক্রেশ্বর স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা। বৃত্তাকারে বসেছেন ভৈরব ভৈরবীগণ। চক্রের নিয়মানুসারে বহিরঙ্গ পঞ্চমকারের অন্যতম উপাদান হিসাবে মদ মাংস মৎস প্রভৃতি সবার সামনে উপস্থিত রয়েছে। ভৈরব ভৈরবীগণ মাংস ও মৎস রান্না করে নিয়ে এসেছেন।

মহাপ্রকৃতির উন্মুক্ত কোলের উপযোগী হয়েই উপবিষ্ট সবাই। নিরাবরণ হয়েই মহাপ্রকৃতির সাথে একাত্মতায় মগ্ন সবাই। পুরুষ প্রকৃতির চিরন্তন. দ্বন্দ্ব এখানে সমুজ্জ্বল। নিবিড় আঁধারের মধ্যে চক্র শুরু হ'ল। চক্রেশ্বর স্বয়ং তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপা। তাই ভৈরব ভৈরবীদের মনে অফুরন্ত আনন্দ ও গর্ব।

তন্ত্রের সর্বোচ্চ সাধনা তারাসাধনায় সিদ্ধ ও মহাবিদ্যা তারাবিদ্যার অধিকারী এবং তারামায়ের বরপুত্র বামাক্ষ্যাপার সাথে তাঁরা চক্রে বসেছেন, এটা তাঁদের অসাধারণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে চক্রে বসলে তাঁদের শক্তি সঞ্চার তো হবেই, উপরন্তু অনেক অলৌকিক দর্শনও হতে পারে শ্রীবামের কৃপায়। কারণ চক্রেশ্বর হলেন কুলনাথের নাথ তথা দ্বিতীয় মহেশ স্বরূপ

স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা। তিনি শুধু বহিরঙ্গে তথা স্থূল পঞ্চমকারেই সিদ্ধ নন, তিনি অন্তরঙ্গ পঞ্চমকারেও সিদ্ধ।

সুতরাং বহিরঙ্গ পঞ্চমকার অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুনের মধ্য দিয়ে যেমন ধীরে ধীরে নিষ্কাম ভাবে চরম লক্ষ্যে বীরভাবে পৌঁছানো যায়, তেমনি অন্তরঙ্গ পঞ্চমকারেও আরো গভীরে পৌঁছানো যায়।

এই অন্তরঙ্গ পঞ্চমকারে, বহিরঙ্গ পঞ্চমকারের মদ-ই হ'ল অহঙ্কার, মাংস-ই হ'ল (মাং-স) বাকসংযম, মৎস্য হ'ল প্রাণবায়ু, মুদ্রা-ই হ'ল অভেদতত্ত্ব এবং মৈথুন হ'ল সহস্রারে শিবশক্তির চৈতন্যময় মিলন।

তন্ত্রের এই কালীকুল ও শ্রীকুল তথা আদ্র পন্থী শুষ্কপন্থী তথা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পঞ্চমকার সবই শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার করায়ত্ত।

তাছাড়া শ্রীবাম পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার অতিক্রম করে স্থূলদেহের সপ্তচক্র ও সূক্ষ্মদেহের দ্বিসপ্ত চক্র, এই ত্রিসপ্তচক্র ভেদ করে স্বয়ং শিবস্বরূপত্ব লাভ করে জগত জননী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের সাথে অভেদ হয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, ত্রিলোক জননী তারামা'র সাথে নিজেকে পরিপূর্ণ লয় করে শ্রীবাম হয়ে আছেন সম্পূর্ণ তারাময়। তাই সাক্ষাত শিবস্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে চক্রে বসা অসাধারণ সৌভাগ্য ও গর্বের ব্যাপার। জীবন সর্বতোভাবে ধন্য হয়ে যায়। তাই ভৈরব ভৈরবীগণ আজ মহা আনন্দিত।

চক্রেশ্বর শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে যথারীতি চক্রের উপাচার সহ বরণ করলেন ভৈরব ভৈরবীগণ। তারপর চক্রের কাজ শুরু হ'ল।

সহসা চক্রেশ্বর শ্রীবাম ভৈরব ভৈরবীদেব জিজ্ঞেস করলেন, "শুদ্ধি লিয়ে আইছ তো?" তারা বললেন, " হ্যাঁ বাবা"।

তারপর শুদ্ধি অর্থাৎ মদের চাট হিসাবে রান্না করা সস্বাদু মাংস তাঁরা শ্রীবামকে সানন্দে দিলেন।

শ্রীবাম তা দেখে বললেন, "এ শুদ্ধি ভাল লয় বাবা, তারামা ভাল শুদ্ধি দিইছে আমি লিয়ে আইছি বাবা।" —এই বলে মহূর্তের মধ্যে মহাশ্মশানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

একটু পরে দু'হাত ভর্তি করে শ্রীবাম একতাল পচাগলা নাড়িভুড়ি নিয়ে এলেন। মহাশ্মশানের কোনগলিত শবের পেট থেকে শ্রীবাম তুলে এনেছেন।

মহাশ্মশানে গলিত শবের অভাব নেই। যাঁরা বিত্তবান তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনের শবদেহ কাঠ কিনে পোড়ান। কিন্তু অধিকাংশ গরীব লোকই দেহকে 'সমাজ' দেন অর্থাৎ মাটি চাপা দেয়।

পরে সেই শবকে মাটি থেকে তুলে ফেলে শ্মশানের নরমাংসাসী শেয়াল কুকুরেরা মহানন্দে খেতে থাকে। আবার নতুন শব পেলে পুরানো পচাগলা শব ফেলে সেই শব খেতে থাকে। প্রতিদিনই বহু শব মাটি চাপা দেয়া হয়। তার ফলে শেয়াল কুকুরদের খাদ্যের অভাব নেই। ফলে বিশাল মহাশ্মশানে অর্ধভুক্ত গলিত শব চারদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। শ্রীবাম এই রকমই একটি গলিত শব থেকে উপরোক্ত পচাগলা নাড়িভুড়ি নিয়ে এসেছেন তথাকথিত মদের শুদ্ধির জন্য। শ্রীবাম সানন্দে সেই দু'হাত ভর্তি পচাগলা ও পুঁজ রক্ত যুক্ত ভীষণ দুর্গন্ধময় নাড়িভুড়ি তাঁর পাত্রে রাখলেন। সহসা ভীষণ দুর্গন্ধে জপেরত ভৈরব ভৈরবীগণ চমকে উঠলেন এবং শ্রীবামের পাত্রের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

তাঁরা সভয়ে দেখলেন শ্রীবাম সানন্দে অতি দুর্গন্ধময় ক্লেদাক্ত পচাগলা ও পুঁজ রক্ত মাখা একতাল নাড়ি ভুড়ি এনে পাত্রে রাখলেন এবং পরম আনন্দে সেই বিষাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত গলিত শবের নাড়িভুড়ি মুঠো মুঠো তুলে খেতে লাগলেন। শ্রীবাম এই ভীষণ ঘৃণিত ও গলিত পচা নাড়িভুড়ি শুধু যে নির্বিকার ভাবে খাচ্ছেন তা নয়। উপরন্তু মহা আনন্দে খাচ্ছেন। যেন দই সন্দেশ মিষ্টি 'রাবড়ি' খাচ্ছেন।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চারজন ভৈরব ভৈরবীর মুখ শুকিয়ে গেল।

কারণ এরপর, শ্রীবাম তাঁর প্রসাদ এদের চারজনকেই দেবেন এবং তাঁদের প্রত্যেককেই তা খেতেই হবে। তার কারণ শ্রীবাম যে এই চক্রের চক্রেশ্বর। তাঁর প্রসাদ নির্বিকারভাবে চক্রের সকলকে খেতেই হবে। না হলে তাঁদের সাধন শক্তির ভীষণ হানি হবে। বিশেষ করে শ্রীবামের মত মহাশক্তিধর ও মহাতান্ত্রিক এবং সাক্ষাত শিবস্বরূপ মহাপুরুষ যেখানে 'চক্রেশ্বর'।

তন্ত্রমতে 'চক্রেশ্বর' হলেন ঈশ্বরস্বরূপ। তাই তাঁর প্রসাদ অগ্রাহ্য করলে শুধু সাধনশক্তিই নষ্ট হয়ে যায়না, ঘোর পতনও হয়।

তাই চক্রেশ্বর যা প্রসাদ দেবেন, তাই গ্রহণ করতে চক্রের সকলে

বাধ্য। বিশেষ করে চক্রেশ্বর যেখানে তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা।

তাই চক্রেশ্বর শ্রীবামের এই ভয়াবহ দুর্গন্ধ ও পুঁজ রক্ত যুক্ত গলিত শবদেহের নাড়িভুড়ি প্রসাদ অগ্রাহ্য করবার কোন উপায় নেই দেখে ভয়ে আতঙ্কে তান্ত্রিক ভৈরব ভৈরবীগণ অস্থির হয়ে পড়লেন। একটু পরেই শ্রীবাম একমুঠো করে সেই পুঁজরক্তমাখা ও ভীষণ দুর্গন্ধময় পচাগলা নাড়িভুড়ি চারজন ভৈরব ভৈরবীর পাতে দিয়ে বললেন, "তারামা ভাল শুদ্ধি দিইছে, খেয়ে লাও সব।"

চক্রেশ্বর শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আদেশ অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অথচ সাক্ষাত মৃত্যুস্বরূপ এই বিষাক্ত ঘৃণিত গলিত নাড়িভুড়ি কি করে মুখে দেবে তাই ভাবছেন ভৈরব ভৈরবীগণ।

এদিকে বামদেব তাড়া দিচ্ছেন খাবার জন্য। দেহবোধযুক্ত ভৈরব ভৈরবীগণ ভীষণ বিপদে পড়লেন। একদিকে এতদিনের সাধনশক্তি অন্যদিকে এই ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য খাদ্য যা খেলে বিষক্রিয়ায় দেহের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই দোটানায় পড়ে গেলেন ভৈরব ভৈরবীগণ। এমন জানলে তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার কাছে তারা কখনোই আসতেন না।

মদের 'শুদ্ধি' তথা চাটের জন্য সুস্বাদু মাংস রান্না করে এনেছেন তাঁরা।

অথচ শ্রীবাম তা গ্রহণ না করে এই বিভৎস নারকীয় দুর্গন্ধ যুক্ত পচাগলা ও পুঁজ রক্ত মাখা নাড়িভুড়ি যা পোকায় থিকথিক করছে তা এনে নিজে খাচ্ছেন আনন্দ করে এবং তাঁদেরও খেতে বলছেন।

শ্রীবামের এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় পড়লেন ভৈরব ভৈরবীগণ। একদিকে মান আরেকদিকে প্রাণ। এদিকে শ্রীবাম এই অভূতপূর্ব প্রসাদ নেবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। অবশেষে আর কোন উপায় নেই দেখে বাধ্য হয়ে ভৈরব ভৈরবীগণ যেই সেই বিভৎস পচাগলা নাড়িভুড়ি, দু'একটি মুখে দিয়েছেন, সাথে সাথে ভীষণ দুর্গন্ধে ও ভয়ে ও ঘৃণায় তাঁরা গলগল করে বমি করতে লাগলেন তাঁদের পাতের ওপরেই। সাথে সাথে শ্রীবাম নির্বিকার চিত্তে তাঁদের পাত থেকে পচাগলা নাড়িভুড়ি ও তাঁদের বমিগুলো দু'হাত ভরে তুলে তুলে খেতে লাগলেন এবং সানন্দে বলতে লাগলেন "তারামা ভাল শুদ্ধি দিইছে যাবা, তারামা ভাল শুদ্ধি দিইছে।"

এই ভয়ঙ্কর বিভৎস দৃশ্য দেখে ভৈরব ভৈরবীগণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ক্রমে ভোর হয়ে এল। বামদেবের কয়েকজন শিষ্য ভক্ত শিমুল-তলায় এসে অজ্ঞান অবস্থায় ভৈরব ভৈরবীদের দেখে বিস্মিত হলেন। তাড়াতাড়ি তাঁরা সেবা যত্ন করে ভৈরব ভৈরবীদের জ্ঞান ফেরালেন।

তখন ভৈরব ভৈরবীরা তাঁদের বললেন গত রাতের চক্রের কথা এবং সেই ভয়ঙ্কর বিভৎস অভিজ্ঞতার কথা। সব শুনে শ্রীবামের শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁদের তিরস্কার করলেন।

তাঁরা ভৈরব ভৈরবীদের বললেন যে আপনারা মহাবিদ্যা তারাবিদ্যার পূর্ণ অধিকারী বামাক্ষ্যাপার সাথে চক্রে বসেছেন? আপনারা শ্রীগুরু বামের কৃপায় যে প্রাণে বেঁচে গেছেন এই যথেষ্ট!

আপনারা শ্রীবামের সাথে চক্রে বসবার সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত। তিনি তারাময়, তাই দেহ বোধহীন এবং শুচি অশুচির উর্দ্ধে। অথচ আপনারা মহাবিদ্যা তারার তত্ত্ব জানেন না এবং দেহ বোধযুক্ত। সুতরাং শুচি অশুচি ভেদজ্ঞান আপনাদের রয়েছে। তাই ঘর থেকে মাংস রান্না করে এনে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে চক্রে বসেছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীব্যামাক্ষ্যাপা যে কি বস্তু তা আপনারা ধারণাও করতে পারেন নি। তাই না জেনে না বুঝে আপনাদের স্পর্ধা হয়েছিল শ্রীবামের সাথে চক্রে বসবার। তার ফল কি হ'ল তা তো স্বচক্ষেই দেখলেন এবং উপলব্ধি করলেন।

এই কথা শুনে ভৈরব ভৈরবীগণ লজ্জায় মাথা নত করলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে শ্রীবামের কাছে তাঁরা কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ।

অথচ সামান্য শক্তির মদে মত্ত হয়ে তারা মহাশক্তিধর ও মহা-কৌল এবং মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার সাথে একাসনে বসে তান্ত্রিক চক্র করতে গিয়েছিলেন এবং তার ফল যে কি শোচনীয় হয়েছে তা তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। লজ্জায় অনুশোচনায় তাঁরা দগ্ধ হতে লাগলেন।

তাঁরা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে সর্বতোভাবে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিন্তু শ্রীবাম তখন মহাশ্মশানে নেই। শ্রীবামের এক ভক্ত

সংবাদ দিলেন যে শ্রীবাম তারামায়ের মন্দিরে গেছেন। একটু পরে ফিরবেন। ভৈরব ভৈরবীগণ তারাপীঠ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে শ্রীবামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শিক্ষাদাতা রূপে শ্রীবাম তাঁদের গতরাতে যে মহাজ্ঞান দিলেন তা উপলব্ধি করতে তাঁরা সচেষ্ট হলেন।

তন্ত্রের সর্বোচ্চ সাধনা তারাসাধনা। এই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও মধুর অভেদ সাধনায় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সর্বতোভাবে সিদ্ধ। তাই তিনি মহাবিদ্যা তথা ব্রহ্মবিদ্যা তারাবিদ্যার পূর্ণ অধিকারী। তারাবিদ্যা হ'ল ব্রহ্মবিদ্যা তথা অভেদবিদ্যা। এই বিদ্যার যিনি অধিকারী তিনি শুচি অশুচির ঊর্দ্ধে। তাঁর কাছে গঙ্গাজল ও নর্দমার জল এক। তিলমাত্র দেহবোধ ও ভেদজ্ঞান থাকলে এই ব্রহ্মবিদ্যা তারাবিদ্যায় সিদ্ধ হওয়া যায় না। তাই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার তিলমাত্র দেহবোধ নেই, কোন ভেদজ্ঞান নেই। এক অভেদ ব্রহ্মতত্ত্ব তথা তারাতত্ত্বে তিনি সর্বদা বিভোর। সমগ্র জীবজগত ব্রহ্ম তাঁর কাছে এক ব্রহ্মতারায় লীন হয়ে গেছে। তাই শ্রীবাম সম্পূণ তারাময়। তাই তারাবিদ্যা তথা ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণ অধিকারী হলেন শ্রীবাম।

তারাবিদ্যা আবার লয়বিদ্যা। ষড়রিপু অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, অষ্টপাশ অর্থাৎ লজ্জা ঘৃণা ভয় মান কুল শীল ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি, এমনকি তিলমাত্র দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না। শুচি অশুচি বোধ থাকে না। সব ব্রহ্মতারার লয় হয়ে এক অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞানালোকে লীন হয়ে অমৃত আনন্দে বিভোর হয়ে যায়।

সেখানে গঙ্গার জল আর নর্দমার জলে কোন ভেদ থাকে না। সেখানে রান্না করা সুস্বাদু মাংসের আর গলিত শবের পুঁজ রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পচা গলা নাড়িভুড়ির স্বাদ এক হয়ে যায়।

সর্বভূতে এক তারামাকে দর্শন করতে না পারলে, নিজ আত্মার সাথে বিশ্বাত্মার মিলন ঘটাতে না পারলে, এই পরম পবিত্র অভেদজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাই এই পরম অভেদজ্ঞানের অধিকারী। তাই শ্রীবাম দশ মহাবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা তারাবিদ্যার পরম অধিকারী।

তাই তারাবিদ্যা একাধারে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে

কোমল, সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে শুচি, সবচেয়ে অশুচি ও সবচেয়ে পবিত্র বিদ্যা।

তাই শ্রীবাম এই মহাবিদ্যার পরম অধিকারী হয়ে সর্বভূতে শুধু তারামাকেই দেখেন। তাই শুচি অশুচি ভাল মন্দ ভেদ জ্ঞান তাঁর তিলমাত্র নেই। তাই নির্বিকারভাবে তিনি গলিত শবের দুর্গন্ধময় নাড়িভুড়ি যেমন খাচ্ছেন তেমনি ভৈরব ভৈরবীদের সদ্য বমিগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে খাচ্ছেন। কোন বিকার তো নেই-ই ; উপরন্তু আনন্দে তা তারামায়ের নাম করতে করতে খাচ্ছেন। কারণ তিনি যে সর্বদা অমৃতময় তারা মন্ত্রে মন্দ্রিত।

তাই তারানামের অনন্ত হর্ষের অসীম অমৃত প্রবাহে শ্রীবামের দিব্য দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত সর্বদা প্লাবিত। তাই ঘৃণ্য নাড়ি-ভুড়ি ও কদর্য বমি পান করেও শ্রীবামের দিব্য দেহের কোন বিকার বা ক্ষতি হয় না। উপরন্তু তারাময় শ্রীবামের দিব্য স্পর্শে সেই মহা অশুচি বস্তুসকল মুহূর্তে অমৃতময় হয়ে তাঁর দেহে মিলিয়ে যায়। এই সম্পূর্ণ তারাময়, যে বামাক্ষ্যাপা, যাঁর দিব্যদেহে স্বয়ং ত্রিলোকজননী তারামা সর্বদা বিরাজ করছেন, যাঁর মহাসিদ্ধি, অপরিসীম সাধন-শক্তি এবং অফুরন্ত অলৌকিক যোগবিভূতি সর্বজনবিদিত, সেই শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার সাথে জাগতিক ভেদজ্ঞান ও তুচ্ছ দেহবোধ নিয়ে দুর্বল প্রকৃতির এই তান্ত্রিক ভৈরব ভৈরবীগণ চক্রে বসেছিলেন তারামায়ের কৃপা ও সাধন শক্তি লাভের জন্য। তাঁর ফল হ'ল শোচনীয়।

তবু পরম করুণাময় শ্রীবাম তাঁদের নিয়ে চক্রে বসেছিলেন। তাঁদের এই অতি দুর্লভ মর্য্যাদা দিলেন যেহেতু তাঁরা সাধন পথের পথিক। কিন্তু উপরোক্ত 'শুদ্ধি'কে কেন্দ্র করে তাঁদের জানিয়ে দিলেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে তিলমাত্র ভেদজ্ঞান ও দেহবোধ থাকলে এই কঠিনতম তারাসাধনার অঙ্গস্বরূপ পবিত্র সাধনচক্রে বসা যায়না।

সর্বভূতে সর্বরূপে সর্ব অনু পরমানুতে এক নির্গুনা সগুনা ও ত্রিগুণাতীতা ব্রহ্মময়ী তারামাকেই দর্শন করতে হয়। উপলব্ধি করতে হয় পরমআনন্দে সর্বতোভাবে। তবেই বীর সাধক এই তারাচক্রে বসবার উপযুক্ত হয় এই মহাজ্ঞান ও মহান শিক্ষা শ্রীবাম তাঁদের উপরোক্ত 'শুদ্ধি'র ব্যাপারের মধ্যদিয়ে প্রদান করলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীবাম মহাশ্মশানে ফিরে এলেন তারাভাবে বিভোর হয়ে।

শ্রীবামের দিব্যকান্তি ও বিশাল নয়নদ্বয় যেন তারা জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। আত্মগ্লানিতে ও গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নতশিরে ভৈরব ভৈরবীগণ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার চরণে প্রণত হয়ে সর্বতোভাবে ক্ষমা ভীক্ষা চাইলেন।

অপার করুণাময় শ্রীবাম তাঁদের ক্ষমা করলেন। উপরন্তু আশীর্বাদ করলেন। তারপর তারামাকে প্রণাম করে ভৈরব ভৈরবীগণ তারাপীঠ থেকে বরিশালে ফিরে গেলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটি বাংলা ১৩৭৯ সনে শারদীয়া মহানবমীর দিন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার কৃপাধন্য ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত লেখককে বলেছেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবামদর্শনে পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি

তারামায়ের আদরের দুলাল সিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপাকে দেখবার বাসনা অনেকদিন ধরে অন্তরে রয়েছে বাংলার বিখ্যাত তন্ত্রসাধক ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির।

কিন্তু সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারছিলেন না তিনি। অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটে। এবার তারাপীঠ যাবেন স্থির করলেন। তিনি একাধারে তন্ত্রসাধক শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত এবং সুবক্তা। বঙ্গদেশে বিভিন্ন ধর্মসভায় তিনি নিয়মিত বক্তৃতা দেন। বাংলা তথা ভারতের অন্যতম ধর্মনেতা রূপে তিনি সুচিহ্নিত। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রদীপ্ত ভাস্কর বাংলার জনজীবনে ও ধর্মজীবনে ক্রমশঃ সপরিচিত হতে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে একাধিকবার সাক্ষাত করে তাঁর অধ্যাত্ম সঙ্গলাভ করে ধন্য হ'ন।

এই সাক্ষাত বাংলার ধর্মজীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়। বাংলা ১২৯১ সালের ১২ই আষাঢ় বুধবার (ইং—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন) রথযাত্রার দিন বিকেলবেলা কলেজ স্ট্রিটে ভক্ত ভূধরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রথম সাক্ষাত হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহে এই সাক্ষাত হয়। তাঁর ন্যায় একজন দেশবিখ্যাত সাধক, পণ্ডিত ও সুবক্তাকে দেখবার ইচ্ছে ঠাকুরের হয়। ঠাকুর স্বেচ্ছায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে ভূধরের গৃহে দেখতে আসেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাবমুখে' অবস্থান পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণির ভাল লাগে। তাঁর পাঁচদিন পর অর্থাৎ ১৭ই আষাঢ় সোমবার ১২৯১ (ইং—৩০শে জুন, ১৮৮৪) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর কয়েকজন অনুগত ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সাথে সাক্ষাত করে বিভিন্ন সৎপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পান করে এবং নানান আলোচনা করে তিনি সুখী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁর সাথে আলাপ করে তৃপ্ত হ'ন।

তাই পরমহংসদেব পুনরায় শশধর তর্কচূড়ামণিকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে এবং আলাপ করে খুশি হ'ন।

উল্টোরথের দিন (২০শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১২৯১ সাল, ইং—৩রা জুলাই, ১৮৮৪) এই তৃতীয় বার সাক্ষাতকারও মনোরম ও আনন্দদায়ক হয়েছিল উভয়ের মধ্যে।

তাঁর মধুর স্বাদ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীও লাভ করেন। পরবর্তী কালেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আসবার পূর্বে সাতদিনের জন্য বলরাম বসুর বাড়ীতে ছিলেন, সেই সময়ও শশধর তর্কচূড়ামণি পুনরায় (চতুর্থ তথা শেষবার) ঠাকুরকে দর্শনের জন্য বলরাম বসুর বাড়ীতে আসেন এবং যোগ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন।

যাহোক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখবার পর জগতজননী তারামায়ের আরেক পাগল ছেলে তথা মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দেখবার তাঁর খুবই ইচ্ছে হ'ল।

কিন্তু নানান কর্মব্যস্ততার জন্য বিলম্ব হলেও অবশেষে তিনি তারাপীঠ রওনা হলেন। আনুমানিক ১২৯৯ সনের হেমন্তকালের এক প্রসন্ন প্রভাতে মহান তন্ত্র সাধক ও সুপণ্ডিত এবং বিশিষ্ট ধর্মনেতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাপীঠ তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন।

তারামন্দিরে এসে ত্রিলোকতারিণী তারামাকে প্রণাম করলেন। তারপর তারামায়ের জীবন্ত বিগ্রহ শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষাপাকে দেখবার জন্য তারাপীঠের মহাশ্মশানে এলেন। শ্রীবাম কয়েকজন ভক্তবৃন্দ পরিবৃত অবস্থায় বসে আছেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে প্রাণভরে দেখতে লাগলেন। সাথে সাথে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলো সবমিলিয়ে দেখতে লাগলেন শ্রীবামের দিব্য অঙ্গ থেকে। তিনি দেখলেন "ভাবমুখ" অবস্থায় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে।

কখনো শ্রীবাম তারামায়ের সাথে আবদার করে কথা বলছেন, কখনো তারামাকে অত্যন্ত গালাগালি দিচ্ছেন, আবার কখনো 'তারা তারা' বলে চিৎকার করছেন এবং প্রাণ ভরে তারা নাম করছেন।

নাম করতে করতে তাঁর বিশাল নয়নদ্বয় থেকে অবিরল ধারায় 'প্রেমাশ্রু' ঝরে পড়ছে।

এই দিব্য স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। শাস্ত্রের জীবন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করলেন শ্রীবামের মধ্যে। একটুপরে শ্রীবাম তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

বেশ কিছুকাল তিনি শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য ও কপালাভ করে ধন্য হ'ন।

সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভাবমুখে অনবরত থাকা শ্রীরামকৃষ্ণে দেখিয়াছি ও শ্রীবামাচরণকে দেখিলাম।"

শ্রীবাম যথার্থ 'ভাবমুখে'ই সর্বদা থাকেন। অনেক মাতৃভাব মণ্ডিত মাতৃসাধকগণ অনেক সময় 'ভাবমুখে' থাকলেও, তাঁদের 'ভাব'-এর প্রকরণ ভেদ হয় কিন্তু এক মাত্র শিশুভাব নিয়েই শ্রীবাম সমগ্র জীবন

একভাবেই কাটান, যা জগতের সাধন ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। তিনি তাঁর বিশাল জীবন লীলার শুরু থেকে শেষ দিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক শিশু ভাব নিয়েই কাটিয়ে দেন।

জীবনের অজস্র ঘাত প্রতিঘাত, মান অপমান, সাধনা সিদ্ধি, অলৌকিক যোগবিভূতি, অজস্র যশ খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি, এবং দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, লোকগুরু এবং যুগগুরু প্রভৃতির পরস্পর বিপরীত ভাব তরঙ্গের মধ্য দিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে আসা সত্তেও তিনি একমাতৃভাব তথা শিশুভাবেই অর্থাৎ এই একভাবেই সমগ্র জীবন অবিচলভাবে অতিবাহিত করেন।

জগতে মাতৃসাধনার ইতিহাসে তা এক চিরস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার এই পরম শিশুভাবের মহান আলোক বর্তিকায় উত্তরকালে ভারতের অজস্র মাতৃসাধক সিদ্ধির আলোতে আলোকিত হ'ন।

—o—

শ্রীবামের বীরচন্দ্রপুরে গমন ও বিচিত্রলীলা

'মহাপীঠ তারাপীঠ' থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বে বীরচন্দ্রপর গ্রাম। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভেদ স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ক্ষেত্র একচক্রা গ্রাম। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গর্ভাবাস আজো সেখানে বিরাজমান। সেই গৃহে বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল সেই পূতপবিত্র গৃহে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর

'যন্ত্র' আজো বিদ্যমান রয়েছে। পাশেই রয়েছে এক বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ। কথিত আছে যে, এই পবিত্র ক্ষেত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু এসে নিত্যানন্দের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। উভয়ের অপ্রাকৃত লীলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বীরচন্দ্রপুর গ্রাম বৈষ্ণবদের কাছে এক মহাতীর্থ রূপে নিত্য পূজিত হয়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের নব কলেবর স্বরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর অভেদ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন এবং শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বম্ভরও তা জানতেন এবং এখানেই তিনি দীক্ষা লাভ করেন।

বীরচন্দ্রপুরের পাশেই 'বাঁকা রায়'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 'বাকা রায়' লীলা আজ সর্বজনবিদিত। অদূরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের মনোরম স্থানটি বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আজো মহাভারতীয় যুগের সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে বিরাজ করছে।

একবার এই বীরচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিখ্যাত আখড়ায় বৈষ্ণব ভক্ত সম্মেলন হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ভক্তকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ব্রহ্ম প্রভৃতি সকল ভাবসাধনার মহাসমন্বয় স্বরূপ মহাপীঠ তারাপীঠের মহাপুরুষ ও পরম ব্রহ্মবিদ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আখড়ার কর্তৃপক্ষ।

এই সুপ্রাচীন মহাপীঠ তারাপীঠে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতবার এসেছেন সারাজীবনে তাঁর ঠিক নেই। এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও একচক্রা যাবার পথে তারাপীঠ হয়ে যাননি তা কে বলতে পারে? তাঁর আসা যাওয়ার পথেই মহাপীঠ তারাপীঠ অবস্থিত। তাছাড়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তারাপীঠে নিয়ে আসাও স্বাভাবিক।

ত্রিলোকজননী তারামা-ই তো একাধারে পরমাবৈষ্ণবী ও রাসেশ্বরী এবং মহাভাবস্বরূপিনী। তা শ্রীকৃষ্ণের নবকলেবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চেয়ে আর কেউ বেশী জানতেন না।

তাই ভারতের ভাবসাধনার মূলাধার মহাপীঠ তারাপীঠে যুগ যুগ ধরে মহান বৈষ্ণব সাধক ও সাধিকাদের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। সেই মহান ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বীরচন্দ্রপুরের নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর

আখড়ার বৈষ্ণবগণও যাতায়াতের পথে জগতজননী পরমাবৈষ্ণবী ব্রহ্ম-ময়ী তারামাকে প্রণাম করে যান।

তাই তারাপীঠের ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ ও তারামায়ের অভেদ স্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিত্যানন্দ মহা-প্রভুর আখড়ার বৈষ্ণবগণ।

শ্রীবাম কয়েকটি ভক্তবৃন্দসহ উপস্থিত হলেন বীরচন্দ্রপুরে। আখড়ার বৈষ্ণব মোহান্ত ও বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

নামকীর্তনের শেষে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হ'ল।

শ্রীবামকে বৈষ্ণব পংক্তিতেই সাদরে বসান হ'ল। প্রসাদ সেবা শুরু হল। বৈষ্ণবীয় এই মহাপ্রসাদ স্বভাবতই নিরামিষ। শ্রীবামের দু'একটি ভক্ত এবং উপস্থিত কয়েকজন দর্শক ভাবলেন যে শ্রীবাম প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তায়ামায়ের যে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন, তা তো আমিষ। মাছ মাংস শ্রীবাম নিয়মিত সেবা করেন। তাই তাঁর পক্ষে এই সম্পূর্ণ নিরামিষ অন্নপ্রসাদ কি করে খাওয়া সম্ভব?

তাই তাঁরা শ্রীবামের এই নিরামিষ আহার্য্য বস্তুর ওপর নজর রাখলেন। কিন্তু শ্রীবাম তৃপ্তির সাথে সকল নিরামিষ খাদ্য বস্তু ক্রমে ক্রমে খেতে লাগলেন। তারপর শেষে আলু বখরার চাট্নী খেতে শুরু করলেন। একটি বড় আলুবখরা শ্রীবাম মুখে পুরে যখন বালকের মত মনের আনন্দে চিবুচ্ছেন তখন তাঁর জনৈক ভক্ত রহস্য করে তাঁকে বললেন, "ক্ষ্যাপা বাবা, আনন্দ করে এত কি চিবুচ্ছেন?"

চিররসিক শ্রীবাম কৌতুক করে বললেন, "পাঁঠার ঠ্যাং চিবুচ্ছি বাবা।" বলেই গলার মধ্য থেকে শব্দ করে একটি বড় পাঁঠার ঠ্যাঙ বের করে চিবুতে লাগলেন মনের সুখে।

বলাবাহুল্য পাঁঠার ঠ্যাঙটি যথার্থ রান্না করা ঝাল ঝোলে রসান্বিত। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

শ্রীবামের সাথে একই পংক্তিতে বসেছেন বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজী বৈষ্ণবগণ। শ্রীবামকে পাঁঠার ঠ্যাঙ খেতে দেখে বৈষ্ণবগণ খুবই অস্বস্তিতে পড়লেন। অনেক বৈষ্ণব চোখ বন্ধ করলেন। আবার অনেকে পংক্তি ছেড়ে উঠে যাবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

লীলাময় শ্রীবাম বৈষ্ণব ভক্তদের করুন অবস্থা দেখে সদয় হলেন। তাড়াতাড়ি পাঁঠার ঠ্যাঙটি গলার মধ্যে মুহূর্তে ঢুকিয়ে দিলেন এবং পরমুহূর্তে গলা থেকে বের করলেন অর্ধচর্বিত আলুবখরাটি।

তারপর সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সেই ভক্তকে বললেন, "পাঁঠার ঠ্যাঙ কোথায় দেখছিস?—ভালো করে দেখ, আলুবখরাই খাচ্ছি।"

তারপর আলুবখরাটি সম্পূর্ণ চিবিয়ে খেয়ে এবং মিষ্টান্ন খেয়ে উঠলেন।

শ্রীবামের এই অলৌকিক লীলা দর্শন করে বৈষ্ণবগণ যেমন স্বস্তি পেলেন তেমনি উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হলেন। শ্রীবাম এই অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে নিরামিষ আমিষ উভয়ই সমান।

অনন্ত লীলাময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা একদিকে মহাশক্তি অন্যদিকে পরমা বৈষ্ণবী।

তারাপীঠ মহা শক্তিপীঠ। মূলত শাক্তপীঠ রূপে বিখ্যাত। অথচ এই মহা সতীপীঠ তথা শক্তিপীঠ ও তন্ত্রপীঠে দশ মহা বিদ্যার দ্বিতীয় বিদ্যা তারাদেবী বিষ্ণুপর্বে রথে ওঠেন রথযাত্রার সময়ে।

আবার শারদীয়া শুক্লা চতুর্দশীতে তারাপূজা হয় মহা সমারোহে। এই শ্যাম শ্যামার অভেদ ভাব হ'ল ব্রহ্মময়ী তারামায়ের নিত্য লীলা নিকেতন মহাপীঠ তারাপীঠের চিরন্তন ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা এই অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রসাদ মাত্রই পবিত্র। তা নিরামিষ হোক আর আমিষ হোক। যিনি যথার্থ পূর্ণ জ্ঞানী তাঁর কাছে আমিষ নিরামিষ বলে কিছু নেই। অনেক বৈষ্ণব আছেন যাঁরা শাক্তদের প্রদত্ত আমিষ প্রসাদকে ঘৃণা করেন, অপবিত্র মনে করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে কৃষ্ণ কালী একই। কৃষ্ণকে নিরামিষ ভোগ দিলে তা কালীও গ্রহণ করেন। আবার কালীকে আমিষ ভোগ দিলে তা কৃষ্ণও গ্রহণ করেন।

সাধন পথে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাই হ'ল প্রধান ব্যাপার। অন্ধ গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়। অপরের ভাব সাধনা, আচার, ভোগ, প্রসাদ প্রভৃতিকে অপমান করলে নিজ ইষ্টকেই অপমান করা হয়। তাঁকে ছোট করা হয়। যিনি অসীম তাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। নিজ

ইষ্টের মধ্যেই সবার ইষ্ট দর্শন করতে হয় এবং নিজ ইষ্টই লীলা বৈচিত্র্যের জন্য সবার ইষ্টরূপে লীলা করছেন, এই উপলব্ধিই হ'ল সাধকের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি এভাবে সর্ব ইষ্টের সমন্বয় করতে পারেন তিনিই যথার্থ সিদ্ধপুরুষ এবং মুক্ত পুরুষ। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

এই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ হওয়াই হ'ল সাধকের পরম লক্ষ্য।

উপরোক্ত অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে পূর্ণ ব্রহ্মবিদ বামাক্ষ্যাপা এই পরম তথ্যই জানিয়ে দিলেন সমাগত বৈষ্ণবগণকে।

তাই তারামার অভেদ স্বরূপ শ্রীবাম নিরামিষ খেলেও তা আমিষে রূপান্তরিত হয়। আবার আমিষও নিরামিষে রূপান্তরিত হয়। শ্রীবামের ব্রহ্মঅগ্নিতে নিরামিষ আমিষ সবই এক হয়ে যায়।

তাই ইষ্ট নিয়ে দ্বন্দ্ব, নিরামিষ আমিষ নিয়ে দ্বন্দ্ব করা উচিত নয়।

ভেদ নয়, অভেদই হ'ল পরম লক্ষ্য, আর সার্বিক ঐক্যই হ'ল পরম কাম্য। এই মহাজ্ঞান উপরোক্ত লীলার মধ্য দিয়ে শ্রীবাম সমাগত বৈষ্ণব ভক্তগণকে সেদিন বুঝিয়ে দিলেন।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য সাধক বরদাকান্ত

বর্ষা নেমেছে। তারাপীঠের আকাশ বাতাস জুড়ে বর্ষার বিশাল সমারোহ। তারাপীঠের মাঠঘাট বৃষ্টির অবিরল ধারায় প্লাবিত। পবিত্র দ্বারকানদী দু'কূল প্লাবিত করে ছুটে চলেছে।

চাষীরা মনের আনন্দে মাঠে কাজ করে চলেছে। তাদের বহু প্রত্যাশিত বর্ষা নেমেছে। আর গ্রীষ্মের দুঃসহ উত্তাপ ও ভয়ঙ্কর খরার ভয় নেই।

প্রাণদায়িণী জীবন স্বরূপিনী বর্ষা এসে তাদের দেহমন প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে। তৃষিত তাপিত জীব জগতকে সুধা স্বরূপ বৃষ্টির অফুরন্ত ধারা দিয়ে আকন্ঠ পূর্ণ করে দিচ্ছে বর্ষা সুন্দরী।

তাই বৃষ্টির আনন্দময় অবিরল ধারা মাথায় নিয়ে চাষীরা মাঠে কাজ করে যাচ্ছে। চারদিকে স্নিগ্ধ সবুজ ধানের অফুরন্ত ঢেউ।

মাঝে মাঝে বাতাস ঢেউ দিয়ে যায় সবুজ ধানের বুকে। তারাপীঠের আকাশে বর্ষার সজল কাজল মেঘ, বাতাসে বর্ষার মধুর ধ্বনি আর মাটিতে অফুরন্ত সবুজের ঢেউ।

এই সবুজ ও কালোর মাঝখানে মাঝে মাঝে উড়ে যায় সাদা বকের সারি। এই শ্বেতশুভ্র বলাকারদল যেন বর্ষার আগমনের বার্তা দূর দিগন্তে বয়ে নিয়ে চলেছে পরম আনন্দ ভরে।

প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ মধুর সাজের মাঝে বসে শ্রীবামও আনন্দ-মুখর।

শ্রীবাম জলে স্থলে আকাশে বাতাসে পরমাপ্রকৃতি তারামায়েরই জগত রূপ প্রত্যক্ষ করে আনন্দে বিভোর হলেন। তারাপীঠ মহাশ্মানের শিমুল তলায় তাঁর ছোট্ট ঝোপড়ার ঘরটিতে বসে আপন মনে তারামাকে গান শোনাতে লাগলেন ভাবে বিভোর হয়ে।

মধুর সুকন্ঠের অধিকারী শ্রীবাম গান ধরলেন—

"ঘরে ঘর করে কি লাঞ্ছনা,
আমি তো আর সহিতে পারিনা।
পাপ ননদী সদাই বাদী
দেয় পিরীতের গঞ্জনা।
কালি তো দিয়াছি কুলে
কুল রেখেছি শিকায় তুলে
য।ক কুলমান কাজ কি কুলে
আর কুলনাশীরে ছাড়বো না।"

গানটি শ্রীবামের পিতৃদেব সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত। কৈশোরে ও যৌবনে শ্রীবাম একাধিকবার পিতার সাথে গানটি গেয়েছেন। গানটি শ্রীবামের বিশেষ প্রিয়। এই গানের ভাব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কামনা বাসনা পূর্ণ দুঃখময় সংসারের চিত্র এতে যেমন আছে তেমনি শরনাগতির মধ্য দিয়ে এসবের থেকে মুক্তি পাওয়ার ইঙ্গিতও আছে।

শ্রীবাম প্রাণভরে গানটি তারামাকে শুনিয়ে গভীর ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন।

এই সময় একটি তেজস্বী যুবক শ্রীবামের সামনে উপস্থিত হ'ল। যুবকের নাম বরদাকান্ত। ফর্সা ও বলিষ্ঠ চেহারার এই তেজদৃপ্ত যুবকটি শ্রীবামের চরণতলে প্রণত হলেন।

শ্রীবাম ভাব জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। তাঁর বিশাল নয়নদ্বয় সজল ও আরক্তিম। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন বরদাকান্তের দিকে।

অন্তর্যামী শ্রীবাম বুঝতে পারলেন তাঁর চিহ্নিত সাধক সন্তানকে। শ্রীবাম প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করলেন মুমুক্ষু বরদাকান্তকে। বরদাকান্ত কাতর নয়নে চাইলেন দীক্ষা। এই রোগ শোক জরা মৃত্যু ভরা সীমাহীন দুঃখময় সংসার সাগর পার হবার জন্য চাই তরী, চাই কাণ্ডারী।

দীক্ষা তথা মন্ত্র হ'ল সেই তরী আর গুরু হ'ল কাণ্ডারী।

মন্ত্র ও গুরুছাড়া এই জন্ম মৃত্যুর ঘোর আবর্তপূর্ণ কঠিন মায়াময় ভবসমুদ্র পার হ'বার আর অন্য কোন উপায় নেই। 'নান্যংপন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তাই প্রয়োজন মন্ত্রদীক্ষার। দীক্ষা কথাটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

'দিক্' মানে 'কর্ম' আর 'ক্ষা' মানে 'ক্ষয়'। অর্থাৎ যার দ্বারা কর্মক্ষয় হয় তাই হল দীক্ষা। জন্মজন্মান্তরের কামনাবাসনা পুঞ্জিভূত কর্মক্ষয় হলেই মুক্তিলাভ হয়। আর তাকে কামনা বাসনা থেকে সৃষ্ট জন্ম মৃত্যুর এই কালচক্রে আসতে হবে না। নিত্যধামে পরম শান্তিতে পরম আনন্দে সে থাকবে। এই নিত্য শাশ্বত শান্তিময় প্রেমময় আনন্দময় পরম ধামে প্রবেশ করতে পারেনা রোগ শোক জরা ব্যাধি ও মৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র এই পৃথিবীতেই আছে মৃত্যু। এই জগত তাই মৃত্যুভূমি। এই ভব সংসার তাই মৃত্যুময়।

আবার মৃত্যুর জন্যই এই জগত সংসার হ'ল কর্মভূমি। আবার এই কর্মভূমির জন্যই এই পৃথিবী হ'ল মুক্তিভূমি। পৃথিবী তাই একাধারে মৃত্যুভূমি, কর্মভূমি ও মুক্তিভূমি। তাই ত্রিজগতে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও আর মৃত্যুও নেই, কর্মও নেই। পৃথিবীতে দেহধারণ করে জীব যে কর্ম করে যায়, সেই অনুসারে পরলোকে তার গতি হয় এবং সেই গতি অনুসারে সে ভালমন্দ ভোগ করে। ভোগ শেষে আবার বাসনাতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেয়।

তাই সপ্তলোকের মধ্যে 'ভূ' অর্থাৎ ভূলোক মানে এই পৃথিবীতে একমাত্র কর্ম আছে। আর 'ভূবঃ' স্বঃ তপ, জন, মহ, হীরণ্য লোকে কর্ম নেই। পার্থিব কর্মজনিত ভোগ আছে মাত্র। পৃথিবীতে ভাল কাজ করে গেলে অর্থাৎ সৎকাজ তথা সাত্ত্বিক কাজ করে গেলে সৎগতি লাভ হয় এবং 'স্ব' লোক থেকে 'মহ' লোকের মধ্যে অবস্থান করে সৎকাজজনিত (অন্নদান, অর্থদান, সাধুসেবা, দেবসেবা, পিতামাতা ও স্ত্রী পুত্রের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন, তীর্থদর্শন, সৎপথে থাকা, ঈশ্বরীয় চিন্তা, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা' প্রভৃতি) কর্মের ফল ভোগ করে। আর পৃথিবীতে এসে অসৎ কাজ করলে অর্থাৎ উপরোক্ত সৎকাজের বিপরীত কাজ করলে অর্থাৎ তামসিক কাজ করলে তারা ভূ ও ভূব লোকের মধ্যবর্তী স্তরে অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবী থেকে তিন মাইল ঊর্দ্ধে ঘোর অন্ধকার প্রেতলোকে গমন করে এবং পার্থিব কর্মজনিত অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভোগশেষে আবার দেহধারণ করে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু অনেকেই বিশেষ করে তামসিক কাজ যারা করে, তারা অনেকেই মহামায়ার প্রাকৃতিক বিধানে আর দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করতে পারে না। তারা অনেকেই জড় অর্থাৎ পাথর প্রভৃতি হয়ে জন্মায়। অনেকে বৃক্ষ লতা প্রভৃতি হয়ে

জন্মায়। অনেকে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হয়ে জন্মায়। আবার অনেকে পশু পাখী হয়ে জন্মায়।

সুতরাং আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর অতি দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেও যে মানুষ মানবোচিত কাজ করে না, তাকে মহামায়া আবার ভীষণ আশী লক্ষ যোনিতে ফেলে দেন। এই আশী লক্ষ যোনি হ'ল—

প্রস্তর, বৃক্ষলতা, গুল্মাদি বিশ লক্ষ যোনি, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অর্থাৎ মশা, মাছি, পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি এগার লক্ষ কীট যোনি, মৎস, কূর্ম, কুম্ভীর প্রভৃতি নয় লক্ষ জলচর যোনি, দশ লক্ষ পক্ষী যোনি এবং তিরিশ লক্ষ পশু যোনি।

এই আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর জীব দুর্লভ মনুষ্য যোনি লাভ করে। এই মনুষ্য যোনি চার লক্ষ। এই দুর্লভ মানব জীবন চার লক্ষ বার ভ্রমণ করতে করতে মানুষ জন্ম জন্মান্তর ধরে ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হয়।

মানুষের মধ্যেও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের লোক আছে।

দেবমানব, ঋষি, মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, মনীষী যেমন আছেন তেমনি আছে পশুভাবাপন্ন তামসিক লোক। আহার নিদ্রা মৈথুন ছাড়া এরা আর কিছু চায় না। মানব সমাজে এদের সংখ্যাই বেশী।

যাহোক, দীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ একমাত্র এই চুরাশী লক্ষ যোনিজনিত জন্ম মৃত্যুর কালচক্র থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারে। মনের বাসনা থেকেই কর্ম তৈরী হয়। সেই কর্ম থেকেই এই জন্ম মৃত্যুর সংসারে আবদ্ধ হয় জীব।

তাই সকল কর্মবন্ধনের মূলে হ'ল বাসনা। সেই বাসনাকে ত্যাগ করতে পারলেই মানুষ ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হতে পারে এবং কালক্রমে ঈশ্বরের দর্শন ও কৃপালাভ করে এই জন্মমৃত্যু তথা আসা যাওয়া থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করে।

তাই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বলেন, "বাসনা ত্যাগ কর। বাসনা পূর্ণ হবে।" অর্থাৎ জাগতিক কামনা বাসনা ত্যাগ করলেই আধ্যাত্মিক বাসনা অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন ও মুক্তিলাভ হবে।

তাই এই জাগতিক বাসনা ত্যাগের জন্যই দীক্ষার প্রয়োজন। দীক্ষার ফলে জাগতিক কামনা বাসনা জনিত কর্মক্ষয় হবে।

এই কর্মক্ষয় হলেই আধ্যাত্মিক বাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ ও মুক্তি লাভ হয়। তাই দীক্ষা সর্বতোভাবে প্রয়োজন মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য।

সমগ্র জীবলোকের মধ্যে একমাত্র মানুষই দীক্ষার অধিকারী। কারণ কেবলমাত্র মানবদেহেই ঈশ্বর দর্শন হয় এবং মুক্তি লাভ হয়। মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা মানুষই করতে পারে এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য মাধুর্য আস্বাদ করতে পারে। ঈশ্বর তাই অবতার রূপে যুগে যুগে তাঁর পরম প্রিয় এই মানব দেহেই অবতীর্ণ হন।

তাই মানবজীবন সর্বাপেক্ষা দুর্লভ জীবন। এই মহাবিশ্বের অন্যান্য আশী লক্ষ জীবলোক এই দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

এই অন্তহীন জীবলোকের অর্থাৎ পশুপাখী কীট পতঙ্গের ঈশ্বর সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। ঈশ্বরকে পাবার জন্য কোন ব্যাকুলতাও নেই। আহার নিদ্রা মৈথুন ও বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু এদের ভাবনায় আসেনা। প্রকৃতির কঠিন নিয়মে এরা পরিপূর্ণ আবদ্ধ।

তাই এই দুর্লভ মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অপরিসীম মূল্যবান। এই মানবজীবনের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বর লাভ করা। ঈশ্বর লাভ করলেই মানুষ একমাত্র চিরমুক্তির পথে যেতে পারে। মানবজীবনের চরম সার্থকতা এখানেই। তাকে আর চুরাশী লক্ষ যোনির মধ্যে পড়ে বার বার জন্ম মৃত্যুর ঘোর আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবেনা। ঈশ্বর দ্রষ্টা সেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে জন্মমৃত্যুর ঊর্দ্ধে উঠে জীবত্ব থেকে শিবত্ব লাভ করে পরম আনন্দে পরম শান্তিতে নিত্যধামে চিরতরে থেকে যাবেন।

তাই দীক্ষা ছাড়া ঈশ্বর লাভ ও মুক্তি অসম্ভব। দীক্ষার প্রাণবন্ত রূপ হল 'মন্ত্র'।

এই মন্ত্রজপের মধ্য দিয়েই মানুষ সাধন পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধি লাভ করে।

'মন্ত্র' কথাটি-ও দীক্ষার ন্যায় গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

'মন্ত্র' মানে, যার দ্বারা মন থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই হল 'মন্ত্র'। 'মন' হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়রিপুর রাজা হ'ল মন। জীব তথা মানুষকে এই ষড়রিপু দিয়ে আবদ্ধ করে রাখে মন। তাই মন-ই হল মায়া। মনের কুহক জালে আবদ্ধ হয়ে ও বাসনাতাড়িত হয়ে মানুষ ষড়রিপুর দাসত্ব করে চলে জন্ম জন্মান্তর ধরে।

কারণ মনই বাসনার সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে তার ষড়রিপু দিয়ে। তার ফলে বাসনার বশে ষড়রিপুর দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ চুরাশী লক্ষ যোনীর মধ্যে অনন্তকাল ধরে ভ্রমণ করে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে।

তাই 'মন' থেকে মুক্তি লাভ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই মন থেকে ত্রাণ পাবার জন্যই মন্ত্রের প্রয়োজন। তবেই মন থেকে চিরতরে ত্রাণ পাওয়া যাবে। ষড়রিপুর হাতে থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

সিদ্ধমহাপুরুষ তথা সদগুরুর কাছ থেকে সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করে গুরু নির্দিষ্ট পথে জপ সাধন গভীর বিশ্বাস ও একাগ্রতার সাথে করলেই মানুষ এই ভীষণ দুরন্ত মন থেকে ত্রাণ পাবে। শুধু ত্রাণ পাবেই না, উপরন্তু মন ও তার ছয় অনুচর ষড়রিপুকেও নিজের বশে রাখতে পারবে।

সর্বোপরি লাভ করবে মন্ত্রনির্দিষ্ট ইষ্টকে এবং ইষ্টের কৃপায় মুক্তিও মিলবে। তাই সত্যদ্রষ্টা তথা ঈশ্বরদ্রষ্টা ভারতীয় মুনি ঋষিগণ এই দীক্ষা তথা মন্ত্র সাধনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য। 'দীক্ষা' এবং 'মন্ত্র'-র ন্যায় 'সাধন' কথাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। সাধন মানে সবিশেষ পূর্বক মনকে দমন, তাই হল সাধন।

তাই দীক্ষা তথা মন্ত্র তথা সাধনের দ্বারা মনকে দমন করতে পারলেই বাসনার নাশ হবে।

এই বাসনাকে নির্বাসন দিলে বাসনা থেকে সৃষ্ট কর্মেরও নাশ হবে। তার ফলে কর্মক্ষয় হবে। আর কর্মক্ষয় হলেই এই মৃত্যুময় পৃথিবী থেকে মুক্তি লাভ হবে, ঈশ্বরকে লাভ করে। তাই মানুষকে এই মন্ত্র জপ সাধনার কর্মকেই জীবনে সর্বপ্রধান স্থান দিতে হবে।

এই সাধন কর্ম করলেই কর্মক্ষয় হবে। রসিক বাউল সাধকগণ 'মন্ত্র' কথাটিকে মনোরম করে ব্যাখ্যা করেছেন সরস ভঙ্গিতে। তাঁরা বলেন, 'মন্ত্র' মানে 'মন্তোর' অর্থাৎ 'মন তোর' হবে। এখন তুই মনের বশে আছিস। মন্তোর জপ করলে মন তোর বশে আসবে। অর্থাৎ মন তোর হবে।"

চিররসিক শ্রীবাম বরদাকান্তের দীক্ষা তথা মন্ত্র চাওয়ার উত্তরে প্রসন্ন মনে বললেন, "এখানে থাক, মন তোর হবে।"

বরদাকান্ত আনন্দে অধীর হলেন। শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে তেজমণ্ডিত সিদ্ধমন্ত্র পাওয়া অসীম সৌভাগ্যের ব্যাপার। শ্রীবাম যে আদর্শ গুরু। দীক্ষা, মন্ত্র, ও সাধনের মত 'গুরু' কথাটিও তাৎপর্যমণ্ডিত। 'ক' বর্গের তৃতীয় বর্ণ হ'ল গ। সত্ব রজ তম। 'গ' হ'ল এই 'তম' অর্থাৎ অবিদ্যা, অন্ধকার। এই অন্ধকার থেকে যিনি 'উ' মানে উন্নত করে র 'মানে রবি তথা সূর্য তথা প্রজ্ঞাময় আলোতে উঠিয়ে দেন, তিনিই হলেন গ-উ-র-উ অর্থাৎ 'গুরু'। গুরু শ্রীবাম তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের সকলকেই যে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন তা নয়। অনেককে নাম দীক্ষাও দিয়েছেন। আধার অনুসারে তিনি কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন, কাউকে নামদীক্ষা দিয়েছেন।

কলিযুগে নামদীক্ষাও সিদ্ধি লাভের অন্যতম পথ।

তারানাম, কালীনাম, কৃষ্ণনাম, রামনাম, দূর্গানাম, শিবনাম, তারক ব্রহ্মনাম প্রভৃতি সিদ্ধনাম।

এই প্রসঙ্গে শ্রীবাম বলেন, "দশ মহাবিদ্যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা হ'ল তারাবিদ্যা। তারামন্ত্রের মত তারানামও মহাসিদ্ধনাম।" তাই অনেক শিষ্য ভক্তকে মহাসিদ্ধ মহানাম 'তারা' নাম জপ করতে দিয়ে বলেন, "তারা"নাম জপ কর্। সব পাবি। 'তারাই ব্রহ্ম ; তারাই ব্রহ্মময়ী'। জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি।"

সাধক বরদাকান্তকে শ্রীবাম যথা সময়ে দীক্ষা দিয়ে বরদাকান্তের মানব জীবনকে সার্থক করলেন। জপ সাধনে শিষ্য বরদাকান্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন।

শ্রীগুরুবাম নির্দিষ্ট সাধন পথে দ্রুত অগ্রসর হলেন। অবসর সময় শ্রীগুরুর সেবায় প্রাণ মন ঢেলে দিলেন।

শিষ্য বরদাকান্তের গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এবং তন্ময়তা দেখে

শ্রীবাম প্রসন্ন হলেন। তারাপীঠ মহাশ্মশানে একে একে মন্ত্রনির্দিষ্ট তন্ত্রোক্ত সাধন সকল স্বয়ং উপস্থিত থেকে শিষ্যকে সুসম্পন্ন করালেন।

যার গুরু স্বয়ং তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। তাঁর সিদ্ধিলাভ তো স্বভাবত অনিবার্য।

একে একে সাধনার প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে যেতে লাগলেন সাধক বরদাকান্ত।

অবশেষে এক শুভক্ষণে গুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা'র কৃপাশক্তিতে ত্রিলোক জননী তারামায়ের দর্শন ও কৃপা লাভ ক'রে সিদ্ধিলাভ করলেন সাধক বরদাকান্ত।

সিদ্ধিলাভের কিছুদিন পর শ্রীবামের নির্দেশে বরদাকান্ত গৃহে ফিরে যান। শ্রীবামের নির্দেশে যোগ ও তন্ত্রের নিগূঢ় সাধনের গভীরে প্রবেশ করেন।

উত্তরকালে শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ রূপে তিনি সাধক মহলে সুপরিচিত হ'ন। মাঝে মাঝে ইষ্ট ক্ষেত্র তারাপীঠে এসে ইষ্টস্বরূপ শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার স্নেহ সান্নিধ্যে তিনি কাটিয়ে যান কিছুকাল।

শ্রীবামের নির্দেশে তিনি গৃহাশ্রমে থাকেন। শ্রীবাম তাঁর বিরাট ঐশীলীলা সমাপ্ত করে অপ্রকট হলে পর সিদ্ধপুরুষ বরদাকান্ত নিজ সাধন গৃহেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধপুরুষ পাগল বাবা। তিনি সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়ে গুরু বরদাকান্তের নির্দেশে মহাপীঠ তারাপীঠে এসে সাধনা করেন এবং আপ্তকাম হ'ন।

যোগ ও তন্ত্রে পারদর্শী পাগল বাবার জীবন কাহিনী মধুময়। প্রেমশক্তির সমন্বয়স্বরূপ এই পাগল বাবার জীবন কথা যথাস্থানে (চতুর্থ খণ্ডে) বর্ণিত হবে।

পাগল বাবার সুযোগ্য শিষ্য পাগল যোগানন্দ বাবাও তারাপীঠে কৈশোরে ও যৌবনে এসে সাধনা করে তারামায়ের দিব্য কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন।

যথা সময়ে যথাস্থানে (চতুর্থ খণ্ডে) তাঁর অপূর্ব সাধনার কথা বর্ণিত হবে।

—o—

রামপুরহাট ষ্টেশনে লীলাময় শ্রীবাম

একদিন শ্রীবাম আপন খেয়ালে তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট ষ্টেশনে এলেন।

ষ্টেশনের টিকিট কাউন্টারে বসে যে লোকটি টিকিট বিক্রি করছিলেন, তার কাছে গিয়ে বামাক্ষ্যাপা বললেন যে তাঁর এক ভক্ত কোলকাতায় অসুস্থ। তাই তাঁকে কোলকাতায় যেতে হবে।

অতএব তাঁর একটি কোলকাতার টিকিট চাই।

তা শুনে লোকটি টিকিটের টাকা চাইলেন।

উত্তরে শ্রীবাম জানালেন যে তাঁর কাছে কোন টাকা পয়সা নেই।

টিকিট বিক্রেতা তখন উগ্রস্বরে শ্রীবামকে জানালেন যে তাহলে সে টিকিট দেবেন না।

টিকিট বিক্রেতাটি শ্রীবামকে চেনেন না। তাই শ্রীবামের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে অন্যলোককে টিকিট দিতে লাগলেন। শ্রীবাম তখন শান্ত স্বরে বললেন, "কি আর করা যাবে।" এই বলে রামপুরহাট ষ্টেশনের প্লাটফরমে গিয়ে বসে রইলেন।

এদিকে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। টিকিট কাউন্টারে থরে থরে সাজানো কেস ভর্তি ও বাক্স ভর্তি সব টিকিট নিমিষে উধাও হয়ে গেল। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। খোঁজ খোঁজ রব উঠলো চারদিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটায় সেই টিকিট বিক্রেতা ও অন্যান্য কর্মচারীগণ হতভম্ব হয়ে গেলেন।

এর পরিণতি কি ভীষণ হবে তাই ভেবে তাঁরা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। ওপরওয়ালা সাহেবরা তাঁদের চুরির দায়ে কঠিন শাস্তিতো দেবেনই, উপরন্তু রেলের চাকরীও যাবে। সাথে জেলও খাটতে হবে। পরিবারে ও সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। সকল মানসম্মান নষ্ট হয়ে যাবে চিরতরে।

দেশে ইংরেজ রাজত্ব চলছে। সাহেবরা শক্ত হাতে দেশ শাসন করছেন। সতরাং একটা বড় ষ্টেশনের সকল টিকিট চুরি যাওয়ার শাস্তি

অত্যন্ত কঠিন হবে। এসব ভেবে সেই টিকিট বিক্রেতা ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন।

এই সময় রামপুরহাট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার এসে টিকিট ঘরে ঢুকলেন। সেই টিকিট বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বামাক্ষ্যাপা বাবা প্লাটফরমে চুপচাপ বসে আছেন কেন? ওঁর সাথে কোন গোলমাল করেছ নাকি?"

তখন সেই টিকিট বিকেতাটি ষ্টেশন মাষ্টারকে সব কথা বললেন।"

তা শুনে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন, "এই জন্যই সব টিকিট উধাও হয়ে গেছে। শীঘ্রই চল, ক্ষ্যাপাবাবার কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে।"

এই বলে ষ্টেশন মাষ্টার তখনি সেই টিকিট বিক্রেতা ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে প্লাটফরমে ছুটে এলেন।

শ্রীবাম তখন একটি বেঞ্চে চুপচাপ বসে আছেন। ষ্টেশন মাষ্টার ও অন্যান্য সবাই তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন। ষ্টেশন মাষ্টারের নির্দেশে সেই টিকিট বিক্রেতাটি বামাক্ষ্যাপা বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীবামকে চিনতে না পারার জন্য এবং তাঁর সাথে কঠোর ভাষা ও কঠিন ব্যবহার করবার জন্য টিকিট বিক্রেতা সজল নয়নে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তখন কৃপাময় শ্রীবাম সেই টিকিট বিক্রেতাকে ক্ষমা করলেন। নিমেষের মধ্যে সব টিকিট আবার যথাস্থানে ফিরে এল।

এই অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা এই শিক্ষা দিলেন যে, অধ্যাত্ম জগতের মহান পুরুষ যাঁরা তাঁদের সাথে সব সময় জাগতিক ভাব নিয়ে উগ্র ও কঠিন ভাষা ও কঠোর ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্থিব জগতে তাঁরা বাস করলেও মূলত তারা অপার্থিব লোকের আনন্দময় অধিবাসী।

তাই তাঁরা সব সময় পার্থিব জগতের লোকদের নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসেন ও নানানভাবে করুণা করে তাদের ত্রিতাপ জ্বালা ও নানান বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তাই জাগতিক জগতের বিষয়ী লোকদের উচিত এই সব অধ্যাত্ম জগতের মহাত্মাদের যথার্থ সম্মান দেয়া এবং সেইভাবে তাঁদের সাথে

ব্যবহার করা। তার ফলে এই পার্থিব জগতের লোকদেরই সার্বিক কল্যাণ হবে।

• উপরোক্ত কাহিনীটি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রিয় শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র কালীদাস চট্টোপাধ্যায় লেখককে বলেন (বাংলা ১৩৮০ সনে)। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o-

করুণাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

একদিন বিকেলবেলা শ্রীবাম শিমুলতলায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শ্রীবাম কারণ পাত্রে কারণ পান করছেন। ভক্তগণও প্রসাদ পাচ্ছেন। অদূরে ধুনি প্রজ্বলিত। সহসা শ্রীবাম আপনমনে বিভোর হয়ে তারামাকে গান শোনাতে লাগলেন। রামপ্রসাদের এই গানটি হ'ল—

এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে পড়বে ধারা।।
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে আমি তারা বলে হবো সারা।।
ত্যাজি সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্বঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখনা মাকে, মা যে তিমিরে তিমির হরা।।

শ্রীবামের কন্ঠে এই মধুর গানটি শুনে ভক্তগণ আনন্দে মগ্ন হলেন।

একটু পরে একটি রুগ্ন মুসলমান যুবককে খাটিয়ায় করে নিয়ে এলেন কয়েকজন মুসলমান। তারা আসছে অদূরবর্তী মাড়গ্রাম থেকে।

খাটিয়াটি শ্রীবামের সামনে উপস্থিত করা হ'ল। রুগ্ন যুবকটির নাম শেখ আলিমুদ্দিন।

শ্রীবাম ওদের বললেন, "কিরে, তোরা কেন এসেছিস? আর 'ও' শালকেই বা কেন এনেছিস?"

উত্তরে বিনীতভাবে তারা জানালো যে মাড়গ্রামবাসী এই অসুস্থ যুবক আলিমুদ্দিন গত ছয় মাস ধরে কঠিন রোগের যন্ত্রনায় মৃতপ্রায়।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ছয় মাস ধরে মলত্যাগ হয় না। সব রকম হেকেমি, কবরেজী, ফকিরি চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। কিছুতেই রোগী সুস্থ হচ্ছে না। ফলে রোগী মৃতপ্রায় হয়ে এখন শেষ শয্যা নিয়েছে।

অবশেষে রোগী আলিমুদ্দিন বললো যে তারাপীঠের সাধুবাবা বামাক্ষ্যাপার কাছে নিয়ে যেতে। যদি বাবা কৃপা করে ভালো করেন তো ভাল, নইলে কবর দেবার দরকার নেই। এই জরাজীর্ণ রোগগ্রস্ত দেহ তারাপীঠের শ্মশানের শেয়াল কুকুরেই ছিঁড়ে খাবে। তাই এখানে আনা।

এখন যদি বাবা কৃপা করেন তবেই শেখ সাহেব বাঁচতে পারে। না হলে শেখ আলিমুদ্দিন সাহেব এখানেই মরে পড়ে থাকবে।

তাই বাবার কৃপার জন্য তারা মাড়গ্রাম থেকে খাটিয়া করে এই রোগীকে নিয়ে এসেছে তারাপীঠে।

সবশুনে শ্রীবাম একটু চুপ করে রইলেন। তারপর উঠে খাটিয়ায় শুয়ে থাকা রোগী শেখ আলিমুদ্দিনের কাছে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কিরে শাল, এখন তো বাঁচবার আশায় তারাপীঠে এসেছিস। শালা, গরু খাবার সময় মনে ছিল না? তোর গরু খাওয়া জন্মের মত বের করছি। আজই তোকে শেষ করছি।"

এই বলে শ্রীবাম তাঁর কয়েকটি ভক্তকে ডেকে বললেন, "তোরা ওটার দুই হাত দুই পা শক্ত করে ধরে থাক। শালাকে আজ জ্যান্ত পোড়াবো।"

এই বলে তিনি তাঁর বিশাল চিমটেটি ধুনির আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

এদিকে বামাক্ষ্যাপা বাবার আদেশ পাওয়া মাত্র চারজন বলিষ্ঠদেহী

ভক্ত লোক এসে রুগ্ন আলিমুদ্দিনের চারটি হাত পা শক্ত করে ধরলো। রোগীর অবস্থা তখন শোচনীয়, নড়বার ক্ষমতা নেই। কারণ যারা তার হাত পা ধরেছে তারা একে বলিষ্ঠ লোক তাতে শ্রীবামের প্রসাদী কারণ পান করে আনন্দে মত্ত রয়েছে।

তার ওপর বামাক্ষ্যাপার আদেশ। তাই তারা শক্ত করে ধরে আছে।

উপস্থিত খাটিয়া বহনকারী মুসলমানগণও ভয়ে বিহ্বল। এমনটি হবে ভাবেনি। ভাবছে কি কুক্ষণেই তারা এই ক্ষ্যাপার কাছে এসেছে। আজ বুঝি আর রেহাই নেই। ক্ষ্যাপাবাবা বুঝি জ্যান্ত পোড়াবে রোগীকে। কিন্তু কিছু করবারও আর নেই। সবাই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

ক্ষ্যাপাবাবা কি করেন তাই ভয়ে বিস্ময়ে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ বামাক্ষ্যাপা রোগীকে ধরে থাকা সেই ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ভাল করে ধরে থাক্। দেখিস যেন শাল না পালায়। আমি আসছি এখুনি।"

এই বলে শ্মশানের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

মিনিট দশেক বাদে তিনি ফিরলেন। হাতে ৮।১০ টি পান। এসে বললেন, "ঠিক করে ধরে আছিস তো?—আচ্ছা, এইবার শালাকে পোড়াবো। শালার গরু খাওয়া জন্মের মতো ঘুচাবো।"

এই কথা বলে ধুনির আগুন থেকে চিমটেটা বার করলেন। চিমটের অগ্রভাগ আগুনে লাল হয়ে গেছে। সেই লাল টকটকে ভীষণ গরম চিমটেটা হাতে নিয়ে বামাক্ষ্যাপা রোগীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

উপস্থিত সবাই ভয়ে আতঙ্কে তাকিয়ে আছে। এইবার বুঝি ক্ষ্যাপাবাবা রোগীকে পুড়িয়ে মারেন।

কিন্তু শ্রীবাম এক ভয়ঙ্কর কাজ করলেন। ডান হাতে সেই আগুনে লাল চিমটেটা ধরলেন। তারপর নিজের জিভটি বের করে তার ওপর এই আগুনে লাল চিমটেটা দিয়ে জিভের ওপর ক্রমাগত ঘষতে লাগলেন। অন্য সাধারণ লোকের জীভ হলে সাথে সাথে পুড়ে শেষ হয়ে যেত।

যাহোক, প্রায় দশমিনিট ধরে এই ভয়ানক কাজ শ্রীবাম করলেন এবং চিমটের সকল আগুন নিজের জিভে টেনে নিলেন।

তারপর বামহাতে ৮।১০টি পান নিয়ে তা থেকে একটি করে পান রোগীর তলপেটে দিয়ে তার ওপর জিভ দিয়ে গরম গরম 'ফু' দিতে লাগলেন। এইভাবে সবকটি পান রোগীর তলপেটে দিলেন এবং তার ওপর গরম 'ফু' দিতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে শ্রীবাম তাঁর গরম জিভ রোগীর তলপেটের ওপর রাখা পানের ওপর বোলাতে লাগলেন।

গরমে রোগী চিৎকার করতে লাগলো। বামদেবও নাছোড়বান্দা। 'ফু' দিতে দিতে রোগীকে গালাগালও দিয়ে চললেন, 'শালা, পেট ঠুসে গরু খাবার সময় মনে ছিলনা? এবার তোকে শেষ করবো।" ইত্যাদি বলে চললেন।

সাথে সাথে কখনো ফু দিতে লাগলেন কখনো রোগীর তলপেটে রক্ষিত পানের ওপর জিভ বোলাতে লাগলেন গভীর ভাবে।

একটু পরে রোগী আলিমুদ্দিনকে খাটিয়া থেকে তুলে শ্রীবাম জীবিত কুণ্ডে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "শালা, আজ তোকে চুবিয়ে মারবো।"

তারপর শ্রীবাম স্বয়ং নিজ হাতে রোগীকে তিনবার জীবিতকুণ্ডের পবিত্র জলে চুবিয়ে জল থেকে তুলে এনে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "যা শালা, বেঁচে গেলি।"

সাথে সাথে রোগী আলিমুদ্দিনের প্রচণ্ড মলত্যাগের বেগ এল এবং প্রচুর মলত্যাগ করলো। দীর্ঘ ছয়মাস পর তার মলত্যাগ হ'ল। মলত্যাগের সাথে সাথে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এই অভাবিত ব্যাপার দেখে রোগী ও অন্য সবাই আনন্দে অভিভূত হ'ল।

শ্রীবামের নির্দেশে তারামায়ের চরণামৃত পান করলো রোগী।

তারপর সুস্থ দেহে শেখ আলিমুদ্দিন সদল বলে হেটে মনের আনন্দে মাড়গ্রামে ফিরে চললো।

যাবার পূর্বে প্রাণদাতা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে জানালো অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

শ্রীবাম তাঁকে সস্নেহে জানালেন আশিস। শ্রীবামের স্বরূপ উপলব্ধি করে যুবক আলিমুদ্দিন গভীর ভাবে মুগ্ধ হ'ল। বাইরে শ্রীবামের রুদ্রমূর্তি রুক্ষভাষা আর অন্তরে করুণার মহাসিন্ধু।

সেই থেকে প্রায়ই শেখ আলিমুদ্দিন মাড়গ্রাম থেকে পায়ে হেটে

তারাপীঠে এসে শ্রীবামের কাছে এসে বসে থাকে। ক্রমে শ্রীবামের কৃপালাভ করে তাঁর অন্যতম ভক্ত হ'ল যুবক আলিমুদ্দিন।

শ্রীবাম মর্ত্যলীলা শেষ করে অপ্রকট হ'বার পরও প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতিদিন বৃদ্ধ মুসলমান ভক্ত শেখ আলিমুদ্দিন সাহেব তারাপীঠে এসে শ্রীবামের সমাধি মন্দিরে বসে থাকতেন। আর আপন মনে স্মৃতিচারণ করতেন সেই কাহিনী। শ্রীবামের শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী ও তারাপীঠের প্রাচীন ব্যক্তিগণ শ্রীবামের কৃপাধন্য এই বৃদ্ধ মুসলমান ভক্তটিকে গভীর সমাদর করতেন। তারাপীঠে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার লাঠি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ শেখ সাহেব ধীরে ধীরে ফিরে যেতেন তাঁর নিজ গৃহে। আমৃত্যু এভাবে তিনি কাটিয়ে গেছেন। তারাপীঠের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ওপর কত গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা থাকলে একজন মানুষ সারাজীবন ধরে এভাবে আসতে পারেন, তা উপলব্ধি করা যায়। আধ্যাত্মিক জগত এত সুন্দর ও পবিত্র যে সেখানে জাতপাতের তুচ্ছ ভেদাভেদ নেই। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রথম শিষ্য ছিলেন মুসলমান শাওন ফকির। শেখ আলিমুদ্দিনও তাঁর অন্যতম কৃপা প্রাপ্ত ভক্ত। আরো কতজন কতভাবে কৃপালাভ করেছেন তার হিসেব নেই।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর রূপের বৈচিত্র্য অনন্ত। তাই পথ ও মত অনন্ত। যিনি যে পথে থেকে সিদ্ধি লাভ করেন তিনিই সিদ্ধ, তিনিই প্রণম্য। সিদ্ধিলাভের পর সব সিদ্ধ পুরুষই এক। তখন আর হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতির ভেদ থাকেনা। তখন সবাই পরম আনন্দ স্বরূপ।

তাই দেখা যায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে কোল দিচ্ছেন। মহাত্মা কবীর মুসলমান ও হিন্দু শিষ্য'ভক্ত নিয়ে একই সাথে ধর্মচর্চ্চা ও গান করছেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সুফী সাধক গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজীতলায় উপাসনা করছেন। মরমিয়া সাধক লালন ফকীর হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যভাব নিয়ে উদার কন্ঠে মধুর বাউলগান গেয়ে চলেছেন। দেশ-প্রেমিক ও সাধক কবি নজরুল ইসলাম শ্যামাসংগীত রচনা করে গাইছেন,

"বলরে জবা বল
কোন সাধনায় পেলিরে তুই
মায়ের চরণ তল।"

এমনি ভাবে ভারতের মহান সাধক মনীষী কবি শিল্পীগণ মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত হয়েছেন যুগ যুগ ধরে।

ভারতীয় ভাব সাধনার ইতিহাস তাই চিরদিনই মানবতার জয়ধ্বনিতে মুখর ও উজ্জ্বল।

তাই ভারতীয় ঐক্য ও সাম্যের প্রাণবন্ত প্রতীক হলেন ভারতের মহান সাধক মনীষী ও শিল্পীগণ।

ভারতের সকল ভাবসাধনার মর্মকেন্দ্র মহাপীঠ তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব যুগগুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা এই ঐক্য ও সাম্যের চিরআনন্দময় বিগ্রহ।

উপরোক্ত কাহিনী তারই এক সার্থক নিদর্শন। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক মুর্শিদাবাদের ডালঝুপ গ্রামের শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

ভক্ত নিতাই মণ্ডলের আরোগ্য লাভ

তারপীঠের অদূরে বামদেবপুর থেকে অসুস্থ অবস্থায় প্রিয়জনের সাথে তারাপীঠে এলেন শ্রীবামের বাল্যবন্ধু নিত্যানন্দ মণ্ডল তথা নিতাই মণ্ডল।

আবাল্য সুহৃদ অসুস্থ নিতাই মণ্ডলকে দেখে শ্রীবাম একদিকে যেমন আনন্দিত হলেন অন্যদিকে বিষণ্ণ হলেন বন্ধুর রোগজর্জরিত কৃশ তনু দেখে।

শ্রীবাম নিতাই মণ্ডলের রোগ দূর করতে সচেষ্ট হলেন। তারাপীঠের পবিত্র মাটি ও তারামায়ের চরণামৃত দিয়ে তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত

নিতাই মণ্ডলকে ধীরে ধীরে আরোগ্য করতে লাগলেন। শ্রীবামের নির্দেশে নিতাই মণ্ডল কিছুদিন তারাপীঠে বাস করতে লাগলেন।

ত্রিলোকতারিণী তারামায়ের নিত্যলীলা নিকেতন এই মহাপীঠ তারাপীঠে বাস করতে করতে এবং তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সাহচর্য লাভ করতে করতে ভক্তপ্রবর নিতাই মণ্ডল দেহে মনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

নিতাই মণ্ডল যেন নবজীবন লাভ করতে লাগলেন।

নিতাই মণ্ডলের জীবন কাহিনী খুবই বিচিত্র। বাল্যকালেই নিতাই মণ্ডল তাঁর পিতাকে হারান। পিতৃবিয়োগের পর নিতাই মণ্ডল মাতুলালয় আটলাতে চলে আসেন। নিতাইয়ের জননী পিতৃগৃহে এসে আশ্রয় নেন।

সেখানে নিতাই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। তখন থেকেই শ্রীবামের সাথে পরিচয় হয়। শ্রীবামের সাথে একত্রে চিলে নদীর ধারে গরু চরানো ও নানান কাজ করেন।

ইতিমধ্যে নিতাই মণ্ডলের কাকা শ্যামমণ্ডলের দুই পুত্রই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। তখন শ্যাম মণ্ডল বংশ রক্ষার জন্য নিতাই মণ্ডলকে নিজ গৃহে আনতে চাইলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মাতুলগণ নিতাইকে দিলেন না। কিছুকাল পর একদিন শ্যাম মণ্ডল মাড়গ্রামের বাজার দিয়ে মিষ্টি কিনে এনে চিলা কাঁদুরের ধারে বসে থাকলেন। ঠিক সেই সময় নিতাই গরু চরাতে এলেন। তখন শ্যাম মণ্ডল কিশোর নিতাইকে মিষ্টি খাইয়ে চুরি করে নিজগৃহে নিয়ে এলেন।

সেই থেকে নিতাই মণ্ডল বামদেবপুরে কাকার কাছে থাকতে লাগলেন।

শ্রীবাম আবাল্য সুহৃদ নিতাই মণ্ডলের বামদেবপুরের গৃহেও একাধিকবার পদার্পণ করেছেন।

নিতাই মণ্ডল একাধারে ভক্ত, সরল ও উদার প্রকৃতির লোক। তাই তিনি শ্রীবামের বিশেষ কৃপালাভ করেন।

নিতাই মণ্ডলের চেহারা যথার্থ পুরুষসুলভ। খুব লম্বা ও মোটা সোটা চেহারা ছিল তাঁর। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো।

শ্রীবামের বাল্যলীলার সাথে নিতাই মণ্ডল বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন (দ্রষ্টব্য—প্রথম খণ্ড)।

যা হোক, তারাপীঠে কিছুকাল বাস করে নিতাই মণ্ডল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর শ্রীবামের নির্দেশে নিজগৃহ বামদেবপুরে ফিরে গেলেন।

শ্রীবামের কৃপায় এভাবে নবজীবন লাভ করে নিতাই মণ্ডল খুবই আনন্দিত হলেন।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছুকাল পর (বাংলা ১৩০০ সনে) শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জন্য একটি মাটির আটচালা ঘর তৈরী করে দেন।

এই খড়ের আটচালা যুক্ত ঘরটিই শ্রীবামের প্রথম আশ্রম ঘর রূপে সুচিহ্নিত। যথাসময়ে যথাস্থানে (তৃতীয় খণ্ডে) এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হবে। বাংলা ১৩১৪ সনে নিতাই মণ্ডল দেহত্যাগ করেন। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নিতাই মণ্ডলের প্রপৌত্র বামদেবপুর নিবাসী শ্রীরামগোপাল মণ্ডলের নিকট।

—o—

দূরদর্শী শ্রীবাম ও নরখাদক বাঘ

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা একদিন গ্রীষ্মকালে খুব ভোরে তারামন্দির থেকে বেরিয়ে তারামায়ের বিরামখানার পাশ দিয়ে মন্দিরের পশ্চিমমুখী সদর দরজা দিয়ে দশ পাঁচটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই দেখলেন একটি বাঘ দাঁড়িয়ে আছে।

বাঘ দেখে শ্রীবাম আশ্চর্য হলেন না। কারণ তারাপীঠ মহা-শ্মশান ঘোর জঙ্গলাবৃত এবং বিশাল।

তারামন্দিরের পাদদেশ থেকেই পশ্চিম ও দক্ষিন দিক জুড়ে বিরাট মহাশ্মশান বিরাজমান।

উত্তরে উদয়পুর থেকে দক্ষিণে কড়কড়িয়া গ্রাম পর্যন্ত এই দীর্ঘ তিন মাইল জুড়ে তারাপীঠ মহাশ্মশান বিস্তৃত।

এই মহাশ্মশানের পূর্ব প্রান্তে উত্তর দক্ষিণ বরাবর একমাত্র গ্রামের পায়ে হাঁটা পথ। এই পথের পূর্ব প্রান্তে তারামায়ের মন্দির। তাই তারামায়ের মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম জুড়ে অর্থাৎ প্রায় তিনদিক জুড়ে ঘোর জঙ্গলাবৃত বিশাল মহাশ্মশান বিরাজমান। এই সুপ্রাচীন ভারতবিখ্যাত ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে মাঝে মাঝে আশে পাশের জঙ্গল থেকে বাঘ চলে আসে। এই বাঘ মূলত নরখাদক বাঘ।

আবার অনেক সময় মহাশ্মশান ছেড়ে গ্রামে ঢুকে গরু বাছুর মুখে করে নিয়ে চলে যায়। কখনো কখনো মানুষকেও মুখে করে নিয়ে যায়। তাই তারাপীঠ মহাশ্মশানে মাঝে মাঝে বাঘ আসা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

তাই তারামন্দির থেকে নেমেই বাঘ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্রীবাম আশ্চর্য হলেন না। শ্রীবামের হাতে লাঠি রয়েছে। লাঠি দিয়ে শ্রীবাম বাঘটিকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। এই নরখাদক বাঘটি আকারে বেশ বড়। গায়ে বড় ডোরা কাটা দাগ। বাঘটি শ্রীবামের দিকে একবার তাকিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর শ্রীবাম তারাপীঠ থেকে হাটতে হাটতে আটলাগ্রামে এলেন।

গ্রামের পূব পাড়ায় হরিপদ মণ্ডলের সাথে দেখা হ'ল। হরিপদ মণ্ডল শ্রীবামের অন্যতম ভক্ত। শ্রীবামকে প্রণাম করলেন। শ্রীবাম ও হরিপদ মণ্ডল কথা বলছেন, সহসা শ্রীবাম একটি আতঙ্কসূচক শব্দ "হিস্" করে উঠলেন। হরিপদমণ্ডল অবাক হ'য়ে এর কারণ জানতে চাইলে শ্রীবাম কিছু পূর্বে তারাপীঠে দেখা বাঘের কথা বললেন।

শ্রীবাম বাঘকে 'জানোয়ার' বলেন। তিনি হরিপদ মণ্ডলকে বললেন যে এই মাত্র ডাবুক গ্রামের অমুক মণ্ডলকে জানোয়ারটা খেয়ে ফেললো।

পরে অনুসন্ধান করে হরিপদ মণ্ডল ও সবাই জানলেন যে বামাক্ষ্যাপা বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

যে সময় শ্রীবাম আটলাগ্রামে হরিপদ মণ্ডলের সামনে পূবপাড়ায়

'হিস' করে উঠলেন ঠিক সেই সময়ে ডানুক গ্রামের সেই হতভাগ্য লোকটিকে সেই বাঘটি হত্যা করেছে।

শ্রীবাম লোকটির নাম হরিপদ মণ্ডলকে বলেছিলেন কিন্তু উত্তরকালে হরিপদ মণ্ডল ও তাঁর দৌহিত্র আশুতোষ মণ্ডলের উভয়েরই তা স্মরণে নেই।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক আটলা গ্রামের শ্রীআশুতোষ মণ্ডল ও গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য (স্মৃতিতীর্থ) এবং খরুণ গ্রাম নিবাসী শ্রীঅম্বুজাক্ষ রায়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৭৯ সনের ১৫ই আশ্বিন উপরোক্ত কাহিনীটি সংগৃহীত হয়। সংযোগের জন্য শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ভ্রাতস্পুত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর নাতি শ্রীদেবকুমার রায়ের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ।

—o—

করুণাসিন্ধু শ্রীবাম

রামপুরহাটের একবিশিষ্ট ব্যবসায়ী (চালের আড়তদার) তারামায়ের ভক্তরূপে সুচিহ্নিত।

দেবসেবা ও নরনারায়ণ সেবার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। রামপুরহাট শহরে তাঁকে অনেকে সম্মান করেন। তাঁর বাস গৃহটি ইংরেজী নোট রচয়িতা জে. এল. ব্যানার্জীর বাড়ীর কাছে। আনুমানিক বাংলা ১২৯৯ সালে তিনি তারাপীঠে আসেন। তারাপীঠে যাতায়াত করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তারামন্দিব সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। কাজও যথাসময়ে সুন্দর ভাবে শুরু করলেন।

একদিন তিনি নিজে দাঁড়িয়ে তারা মন্দিরের সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর হাত দু'টো পেছনে যুক্ত রয়েছে।

এই সময় এক সন্ন্যাসী স্নান করে জীবিতকুণ্ডের ঘাট থেকে উঠে এলেন।

ভক্ত ব্যবসায়ীকে পেছন থেকে এসে সেই সন্ন্যাসী বললেন, "তারামায়ের মন্দিরের এই সংস্কার কাজ যদি তুমি জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে চাও, তবে মন্দির সংস্কার তাড়াতাড়ি শেষ কর।"

ভক্ত ব্যবসায়ীটি সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য্য কথাশুনে বিস্মিত হলেন।

তিনি সাগ্রহে সন্ন্যাসীর কাছে এই কথার কারণ জানতে চাইলেন।

সন্ন্যাসী তার উত্তরে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ব্যবসায়ীকে বললেন, আমি জীবিত কুণ্ড থেকে স্নান করে উঠে আসবার সময় পেছন থেকে তোমার ডান হাতের রেখা দেখতে পেলাম। আজ থেকে তিন মাস পর তোমার সর্পদর্শনে মৃত্যু হবে। তোমারই পূর্বজন্মের প্রারব্ধকর্মের ফলে এই অপঘাতে ম ত্যু যোগ রয়েছে।"

ভক্ত ব্যবসায়ীটি একথা শুনে ভীষণ শঙ্কিত হলেন। তিনি কাতরভাবে সন্ন্যাসীর কাছে এর প্রতিকার জানতে চাইলেন।

সন্ন্যাসী শান্তভাবে তার উত্তরে বললেন, "যদি ঐ সময় অর্থাৎ তিনমাস পূর্ণ হ'বার দিন কোন উচ্চকোটির মহাশক্তিধর মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে থাকতে পার, তবেই সর্পদংশন জনিত অবধারিত মৃত্যু যোগ থেকে রক্ষা পাবে। তা না হলে মৃত্যু নিশ্চিত হবেই।" এই বলে সন্ন্যাসী তারা মন্দিরে প্রণাম করতে চলে গেলেন।

ভক্ত ব্যবসায়ী বিষন্ন চিত্তে ভাবতে লাগলেন যে আর মাত্র তিনমাস পরমায়ু আছে তাঁর। কে এমন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন যে কালসর্পের মৃত্যুস্বরূপ দংশন থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, মহাপীঠ তারাপীঠে শিবাবতার তথা মহান রাজযোগী ও কুলনাথের নাথ স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা বিরাজ করছেন কিন্তু ব্যবসায়ীটি শ্রীবামকে একটি সাধারণ ক্ষ্যাপা সাধু ছাড়া আর কিছু ভাবেন না।

যাহোক, তারামন্দিরের যা কিছু সংস্কার বাকি আছে, তাঁর তদারকের ভার জনৈক বিশ্বাসী লোকের ওপর দিয়ে ব্যবসায়ীটি প্রথমে

ভারতবর্ষ পার হয়ে তিব্বতে গেলেন। তিব্বতে তারাবিদ্যায় সিদ্ধ বহু বিশিষ্ট লামা সন্ন্যাসী রয়েছেন।

তাই প্রতিকারের আশায় তিনি তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্যে এলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁরা প্রত্যেকেই বললেন যে তাঁর হাতে সর্পদংশনের আসন্ন মত্যু যোগ ঠিকই রয়েছে। কিন্তু এই ভীষণ সর্পদংশন থেকে ও মৃত্যু থেকে তাঁকে বাঁচাবার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

হতাশ হয়ে তিব্বত থেকে তিনি মহাচীনে গেলেন। তারাসাধনার প্রধান অঙ্গ যে চীনাচার তা এই চীন দেশ থেকেই মূলত এসেছে। তারাবিদ্যার অধিকারী বহু শক্তিধর সাধক এখানে সাধনরত রয়েছেন। আসন্ন মৃত্যু ভয়ে ভীত ব্যবসায়ীটি তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এই সাধকবৃন্দও তাঁকে জানালেন যে তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর নয়। তাঁরা তাঁকে ভারতবর্ষেই ফিরে যেতে বললেন।

অবশেষে হতাশ হয়ে ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ঘুরতে ঘরতে কামাখ্যায় বশিষ্ঠাশ্রমে এলেন। সত্যযুগে এখানেই মহামুনি বশিষ্ঠদেব তারাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোরতম তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অবশেষে দৈববাণী শুনে মহাচীনে গিয়ে বুদ্ধরূপী জনার্দনের কৃপায় চীনাচারে তারারহস্য জেনে তারাপীঠে এসে সিদ্ধিলাভ করেন।

যাহোক, ব্যবসায়ীটি বশিষ্ঠাশ্রমে এসে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলেন।

সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যবসায়ীকে বললেন, "তুমি অকারণে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করছো কেন? তুমি অবিলম্বে তারাপীঠে ফিরে যাও। তোমাকে বাঁচাতে যিনি পারেন তিনি তো তারাপীঠেই রয়েছেন। একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা আছে তোমাকে এই আসন্ন মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে বাঁচাবার।"

ব্যবসায়ীটি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বশিষ্ঠাশ্রমের সেই মহাপরুষের কথা শুনে। কাতরভাবে সেই মহাপুরুষের চরণ যুগল ধরে জানতে চাইলেন, কে সেই মহাশক্তিধর মহাপুরুষ যিনি তারাপীঠে রয়েছেন এবং যিনি তাঁকে বাঁচাতে পারবেন এই আসন্ন অবধারিত মৃত্যু থেকে।

বশিষ্ঠাশ্রমের সেই সিদ্ধ পুরুষ পরম শ্রদ্ধার সাথে বললেন, "তাঁর

নাম বামাক্ষ্যাপা। তিনি একাধারে মহাতান্ত্রিক ও রাজযোগী মহা-পুরুষ।”

একথা শুনে ব্যবসায়ীটি পরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

বামাক্ষ্যাপাকে তো তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছেন। বামাক্ষ্যাপাকে একজন সাধারণ ক্ষ্যাপা বা পাগল ছাড়া আর কিছু কখনো মনে হয়নি তাঁর। তবে তাঁর কাছে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও লোকজন আসেন এবং তাঁকে মানেন, এটা অবশ্য দেখেছেন। কিন্তু তাঁকে একজন সাধারণ পাগল বা ক্ষ্যাপা ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি তাঁর। তাই বামাক্ষ্যাপার ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধা ভক্তি কখনো আসেনি।

অথচ আজ সেই বামাক্ষ্যাপার পরিচয় সুদূর কামাখ্যার বশিষ্ঠাশ্রমে এসে নূতন করে তিনি জানলেন এবং আরো জানলেন যে তাঁর পরিত্রাতা ও জীবনদাতা আজ সেই বামাক্ষ্যাপা-ই।

সেই মহাপুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রনাম ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব্যবসায়ীটি কামাক্ষ্যা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন তারাপীঠে। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর মাত্র দু'সপ্তাহ তাঁর আয়ু আছে।

ব্যবসায়ীটি তারাপীঠে এসে দেখলেন যে তারামন্দিরের সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। তিনি সেই কাজ বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর বক্তব্য হ'ল যে, তারামা যদি তাঁকে কৃপা না করেন এবং বামাক্ষ্যাপা যদি তাঁকে সর্পদংশন ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা না করেন তবে মন্দির সংস্কারে বাকি কাজ সমাপ্ত করে তাঁর কি লাভ হবে? যদি তারামা ও বামাক্ষ্যাপা বাবা কৃপা করেন এবং তিনি বেঁচে যান তবেই মন্দিরের সংস্কারের কাজ শেষ করবেন। না হলে মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত রেখেই মরবেন।

ব্যবসায়ীর এই সিদ্ধান্তে অনেকে বিস্মিত হলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী তো সাধারণ মানুষ মাত্র। সাধারণত মানুষ ব্যবসায়ীর মতই লাভ লোকসানের অঙ্ক কষে ভগবানকে ডাকেন। তাই দেয়া নেয়ার দাঁড়ি পাল্লায় সব কিছু ওজন করেন। ব্যবসায়ী তো তারই প্রতিনিধি মাত্র।

যা হোক, ব্যবসায়ী তারামন্দিরের সংস্কারের কাজ বন্ধ রেখে

শিমুলতলায় এলেন। মহাশ্মশানের প্রাণকেন্দ্র শিমুলতলায় এসে বামাক্ষ্যাপার দর্শন পেলেন।

শ্রীবামের চরণতলে বসে সব কথা বললেন। শেষে শ্রীবামের চরণ কমল ধরে জানালেন সর্প দংশন ও মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য।

করুণাসিন্ধু বামাক্ষ্যাপা রাজী হলেন। আসন্ন মৃত্যু ভয়ে ভীত আর্ত ও শরণাগতকে শান্ত করলেন অভয় দিয়ে।

শ্রীবামের নিত্য সেবক ও পার্ষদবর্গ এবং পাণ্ডারা এবং স্থানীয় জনগণ একথা জানলেন। ক্রমে চারদিকে একথা রটে গেল। দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো একথা। অবশেষে তিন মাসপূর্ণ হ'ল। এল সেই ভয়ঙ্কর শেষের দিন।

আজই সর্পদংশনে ব্যবসায়ীর মৃত্যু হ'বার কথা। এদিকে তারা-পীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপা ব্যবসায়ীকে সর্পদংশন ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছেন। কিভাবে বিধির বিধান বামাক্ষ্যাপা বাবা খণ্ডন করেন তাই দেখবার জন্য হাজার হাজার মানুষ সকাল থেকেই তারাপীঠের নিকটবর্তী গ্রামগুলো থেকে এবং দূর দূরান্ত থেকে পদব্রজে ও গরুর গাড়িতে আসতে লাগলো তারাপীঠে। চারদিক থেকে জলস্রোতের মত এই জনস্রোত আসতে লাগলো। তারাপীঠের বিশাল বিরাট ভয়াবহ মহশ্মশান অজস্র জনসমাগমে পূর্ণ হ'ল।

শ্রীবাম এই বিরাট জনতা দেখে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন। সবাইকে শ্মশান থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করলেন। আরো বললেন, "যে শালা শ্মশানে ঢুকবে তাকেই সাপে দংশন করবে।"

বামাক্ষ্যাপা যে বাকসিদ্ধ তা সবাই জানেন। তাই ভয় পেয়ে সবাই শ্মশানের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দূর থেকেই দেখতে লাগলো শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও ব্যবসায়ীকে। বেলা যখন দুপুর ১২টা তখন শ্রীবাম আসন্ন মৃত্যুভয়ে মহাশঙ্কিত ব্যবসায়ীকে ডেকে বললেন, "ওরে তাড়াতাড়ি নদী থেকে স্নান করে আয়। তোর যম তো এল বলে।" ব্যবসায়ীটি ভয়কাতর দেহে কোন মতে দ্বারকা নদী থেকে স্নান করে এলে শ্রীবাম তাঁকে শিমুল তলায় বসিয়ে তাঁর চারদিকে গণ্ডি কেটে দিয়ে বললেন,"

এই গণ্ডির মধ্যে বসে তারা মাকে ডাক্। খবরদার উঠবি না, অহলেই-ই ফট্ হবি" (শ্রীবাম মৃত্যুকে 'ফট্' বলতেন)।

ব্যবসায়ীকে গণ্ডির মধ্যে বসিয়ে শ্রীবাম একটু দূরে বসে রইলেন।

ব্যবসায়ী প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তারানাম জপ করতে লাগলেন।

সহসা ব্যবসায়ীটি দেখলেন তাঁর সামনে এক বিকট কুকুর এসে দাড়িয়েছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। শ্রীবাম ধমক দিয়ে চুপ করালেন। এরপর ব্যবসায়ী আবার সভয়ে দেখলেন যে একটি বিশাল বাঘ তাঁকে খেতে আসছে। এবারও ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। দূর থেকে শ্রীবাম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গণ্ডির মধ্যে বসে থাকতে বললেন।

ক্রমে সেই চরম সংকট মুহূর্ত উপস্থিত হ'ল। দ্বারকানদীর দিক থেকে একটি বিরাট ছিপছিপে মিশমিশে কালো সাপ, লম্বায় প্রায় বার হাত, দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে লাগলো সেই গণ্ডির দিকে।

গণ্ডির ভেতর ভয়ে হতজ্ঞান অবস্থায় ব্যবসায়ী বসে কোনমতে তারা নাম জপ করছেন। অদূরে উপবিষ্ট মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা স্থির দৃষ্টিতে এই কালসর্পের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে 'তারা তারা' বলে ডাকলেন। তারপর দূর থেকে ব্যবসায়ীকে বললেন যে কোন কারনেই যেন গণ্ডী ছেড়ে বের না হয়।

সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বরূপ কালসর্প এগিয়ে এসে গণ্ডির মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলো কিন্তু এক অদৃশ্য প্রচণ্ড শক্তির বাধায় সে ঢুকতে না পেরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গণ্ডির চারপাশে ঘুরতে লাগলো ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করতে করতে। বহুক্ষণ ধরে ঘুরতে লাগলো। কালসর্পের ক্রুদ্ধ গর্জন ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অবশেষে বিশাল ফণা মেলে ধরলো ভয়ঙ্কর উগ্র কালসাপটি।

ফণার মধ্যে সাদা খড়মের চিহ্নটি পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট। এতে প্রমাণ হয় যে এই কালসর্পটি একটি ভয়ঙ্কর উগ্র বিষধর গোখুরা সাপ।

কিছুক্ষণ গণ্ডির সামনে বিশাল ফণা তুলে তারপর প্রবল আক্রোশে গণ্ডির ওপর দংশন করলো। তারপর দ্বারকানদীর দিকে ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করতে করতে দ্রুত এগিয়ে গেল এই ব্যর্থ

ও ক্রুদ্ধ কালসর্পটি। একটু পরে মিলিয়ে গেল এই মৃত্যু রূপী ভয়ঙ্কর বিষধর গোখরা সাপটি। শ্রীবামের আহ্বানে গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এল ব্যাবসায়ীটি। নবজন্ম লাভ করলো শ্রীবামের কৃপায়।

অসীম আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ব্যবসায়ীটি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার চরণে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীবাম শান্ত সমাহিত। ভয়ঙ্কর কালসর্পের সকল বিষ তিনি টেনে নিয়েছেন যোগ বলে তাঁর দিব্য দেহে।

অদূরে অবস্থিত বিশাল জনতার মধ্যে অনেকে দূরে থেকে এদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। কাল সাপ চলে যেতেই ব্যবসায়ী গণ্ডি থেকে সুস্থ দেহে শ্রীবামের চরণে প্রণিপাত করতেই জনতা ছুটে এল মহাশ্মশানে। অনেকে ব্যবসায়ীর মুখ থেকেও সব ঘটনা শুনলেন। তারামা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হ'ল তারাপীঠের মহাশ্মশান।

সর্পদংশন থেকে মুক্তি লাভ করে ও নবজীবন লাভ করে ধনী ব্যবসায়ীটি সহাসমারোহে তারামায়ের পূজো দিলেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকেও শিবজ্ঞানে পূজো করলেন। তারপর বাড়ী ফিরে গেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা মন্দিরের বাকি কাজে সুসম্পন্ন করলেন।

সেই থেকে প্রতিবছর এই সর্পদংশন থেকে মুক্তিপাবার দিনটিতে সেই মহাভাগ্যবান ব্যবসায়ীটি রামপুরহাটের বাড়ী থেকে প্রচুর পূজার উপাচার নিয়ে তারামাকে এসে পূজা দিয়ে যান। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সেবা পূজাও করেন।

আমৃত্যু তা তিনি পালন করে যান।

সৎ ও মহৎ কাজ করলে প্রারব্ধজনিত অবধারিত মৃত্যুও রোধ হয়ে যায়। বিধির বিধানও পাল্টে যায়। সর্বোপরি মেলে ঈশ্বরীয় মহাকৃপা। তারামায়ের মন্দির সংস্কারের মহৎকাজ করবার দরুণই ব্যবসায়ী রক্ষা পেলেন পূর্বজন্মের প্রারব্ধজনিত কর্মফল তথা সর্পদংশন জনিত অবধারিত মৃত্যু থেকে। শুনলেন সন্যাসীর ভবিষ্যতবাণী ও লাভ করলেন তারামা তথা বামাক্ষ্যাপার মহাকৃপা ও নবজীবন।

উপরোক্ত কাহিনীটি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্যতম ভক্ত ও পার্ষদ শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রিয় শিষ্য হুগলীর মওলাই গ্রাম নিবাসী হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও চক্রবর্তীবাবার শিষ্য কালীদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেন।

বৃদ্ধ কালীদাস চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১৩৮১ সালের ২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী, ১৯৭৫) উপরোক্ত কাহিনীটি লেখককে বলেন (লেখকের গৃহে বসে)। লেখক এজন্য চিরকৃতজ্ঞ। বৃদ্ধ কালীদাস বাবু যৌবনে নগেন পাণ্ডার কাছ থেকে এই কাহিনীটি শুনেছিলেন। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে কালীদাস বাবু ঐ ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা ভুলে গেছেন। কালীদাস বাবু তাঁর পিতার কাছ থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার একাধিক লীলাকথা শুনেছিলেন এবং নিজেও শিশুকালে বামাক্ষ্যাপার কৃপায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। যথা সময়ে যথাস্থানে (তৃতীয় খণ্ডে) সেসব বর্ণিত হবে।

—o—

বামদেবের রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা

একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীবাম শিমুলতলায় আপন মনে বসে তারামা'র গান গাইছেন। গানটি হ'ল

"আমার মন কেন করিলি এমন
বিষম ল্যাংটা মেয়ের আশা।
বেটী নাশে সুখ ঘটায় মোক্ষ।
শেষে শ্মশানেতে করায় বাসা।।
বেটীর নাম কালী কূলে দেয় কালী
ও যে ধর্ম কর্ম মর্ম নাশা।।"

শ্রীবাম আপন মনে গানটি বার বার গাইতে লাগলেন। শ্রীবামের বিশাল নয়ন দিয়ে অবিরত অশ্রুধারা বইতে লাগলো। মধ্যাহ্নের মহাশ্মশান সেই মধুর গানের ঝংকারে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

গান শেষ হতেই কয়েকজন লেট মজুর প্রচুর মদ খেয়ে এবং এক হাঁড়ি পচুই মদ নিয়ে এল বামাক্ষ্যাপা বাবার কাছে। শ্রীবামের সামনে মদের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বললে, "গোঁসাই, আপনার লেগে চারি লিয়ে আলছি, খুঁটিয়ে দেখুন জিনিষটা কেমন বটে।"

শ্রীবাম সানন্দে সেই পচাই মদের হাঁড়িটা খুলে সব মদ খেয়ে ফেললেন নির্বিকারভাবে। তারপর লেট মজুররা বললে, "গোঁসাই লোক, আপনে একটু রামায়ণ বলুন কেনে, আমরা মুখ্যুলোক একটু শুনি।"

শ্রীবাম তা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "রাম বড় ভাল লোক ছিল বটে। অ সমুখে দুগ্যোমাকে লিয়ে আলছিল। রাবণ টিন চেয়ে মদ গেলছিলেন, হনু লিয়ে গেলছিলো, রাবনের ঘর পুড়িইছিলো। রাম ভাল বটে। দশরথ লোকটা ভাল লয়"—এই কথা বলেই তিনি চুপ করলেন।

লেট মজুররা অনেকক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো, কিন্তু বামাক্ষ্যাপা বাবা আর কথা না বলায় ওরা ভাবলো গোঁসাই তারা ধ্যান করছে—এই ভেবে ওরা চলে গেল।

বামাক্ষ্যাপার এই কথার মধ্যে রামায়ণের নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। রামায়ণের মূল কথাটি বললেন তিনি।—

রাম পূর্ণ চিৎশক্তি। রাবণ হ'ল রামের লীলা-ক্ষেত্র। হনুমান হল রামের ভক্তিক্ষেত্র। আর দশরথ হ'ল দশবিধ গুণযুক্ত ভোগ দেহ —যা ভাল নয় অর্থাৎ মানুষের দশ অবস্থাস্বরূপ—যথা জন্ম, বৃদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, নিদ্রা, ভয়, আহার, মৈথুন, জরা, মৃত্যু। তাই এই দশ অবস্থা যুক্ত মানুষ অর্থাৎ দশরথ ভাল নয়।

উপরোক্ত সুন্দর ও নিগূঢ় তত্ত্বমণ্ডিত কাহিনীটির জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য কৃপা মণ্ডিত মহাসাধক শ্রীশ্রীভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থনাথের (তেলি খানাশ্মশান, হুগলী) কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

মা ও ছেলের অমৃত কথা

তারামা'র সাথে বামাক্ষ্যাপার সম্পর্ক পেটের ছেলের মতই। একদিন শ্রীবাম তারাভাবে বিভোর হয়ে আছেন। সহসা দেখলেন তারামা তারাপীঠ থেকে উত্তরে চলেছেন উদয়পুরের দিকে। তারাপীঠের কয়েক ক্রোশ দূরে উদয়পূরের কালীমন্দিরে রয়েছে সদা জাগ্রত কালীমূর্তি। তারামা মাঝে মাঝে যান সেখানে। কিংবদন্তী এই যে, তারামা ও উদয়পুরের কালী দুই বোন। মাঝে মাঝে উভয়ে সাক্ষাৎ করেন।

যা হোক, তারামাকে যেতে দেখে শিশুর মত বামাক্ষ্যাপা তারামা'র পিছু পিছু ছুটলেন আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "তারা মা তু এখন কুথা যাচ্ছিস! আমার যে হাগা পেয়েছে, আমি তো এখন হাগবো। তু গেলে আমাকে শৌচ করিয়ে দেবে কে?" এই বলে চিৎকার করতে করতে তারামা'র পিছনে পিছনে সরল শিশুর মত শ্রীবাম ছুটে চললেন। যাঁর সর্বস্বই তারামা, তারামা ছাড়া জগতে সে আর কিছুই চেনে না। সেই তারামা অন্ত প্রাণ, তারামার উপর সদা নির্ভরশীল শিশু বামাকে তারামা শৌচ করিয়ে না দিলে আর কে দেবে? ফলে তারামা তাঁর প্রাণের আদরের দুলালকে শান্ত করতে সচেষ্ট হলেন। তার অমৃতমাখা হাত দিয়ে শিশুসম বামকে শৌচ করিয়ে শান্ত করলেন। তারপর তারামা উদয়পুরে রওনা হয়ে গেলেন।

এই অপূর্ব দিব্য দৃশ্য উপলব্ধি করলে আনন্দময় অমৃত অশ্রুতে দর্শকের সমগ্র সত্তা পূর্ণ হয়ে যায়। বামদেবের দিব্যদেহ যে তারা-মায়েরই অমৃতভরা স্নেহ প্রেমের বিগলিত অঙ্গ—তা যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।

উপরোক্ত কাহিনীটি একদা তারামায়ের কৃপা প্রসঙ্গে স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা বাবা তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়কে (মণ্ডলাই, হুগলী) বলেছিলেন।

পরবর্তীকালে হরিসত্যবাবু তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কালীদাস চট্টোপাধ্যায়কে এই কাহিনীটি বলেন।

ইংরেজী—১৯৭৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বৃদ্ধ কালীদাসবাবু পুনরায় তা লেখককে বলেন।

লেখক এজন্য শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

তারাপীঠে রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

মহাপীঠ তারাপীঠের সারাবছরের পূজা পার্বণ ও উৎসবের মধ্যে রথযাত্রা হ'ল অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হ'ল তারাপূজা। শারদীয়া শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে শ্রীশ্রীতারাপূজা ও মহোৎসব হয়। এই উপলক্ষে সাতদিন ধরে মেলা উৎসবও হয়।

শ্রীশ্রীতারাপূজা ছাড়া অন্যান্য পূজা উৎসবের মধ্যে রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রটন্তী কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি ও আমবারুণী উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (দ্রষ্টব্য—তারাপীঠের পূজা পার্বণ, প্রথম খণ্ড)।

তারাপীঠে রথযাত্রা উৎসব বিশেষভাবে স্মরণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শ্যাম শ্যামার যে অভেদ ভাব তারাপীঠের অন্যতম ঐতিহ্য, সেই মহান ঐতিহ্য প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে তারাপীঠের রথযাত্রার মধ্যে। মহাপীঠ তারাপীঠের রথযাত্রার সাথে শ্রীক্ষেত্রের অর্থাৎ নীলাচল তথা পুরীর ভারতবিখ্যাত রথযাত্রার মধ্যে এক গভীর যোগাযোগ রয়েছে।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রাতেও তারামা রথে ওঠেন (সুভদ্রা দেবীর রথে) এবং জগন্নাথের রথের অগ্রে গুণ্ডীচা বাড়ী (মাসীর বাড়ী)

যান। আটদিন বাদে আবার জগন্নাথ ও বলরামের রথের মধ্যবর্তী সুভদ্রার রথে অবস্থান করে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসেন তারামা।

দারুব্রহ্ম জগন্নাথ ও ব্রহ্মময়ী তারাদেবী মূলত একই ব্রহ্মশক্তি ও অভিন্ন, তার নিগূঢ় সংকেত নীলাচলে ও তারাপীঠে রয়েছে। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

প্রধানত ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম রথযাত্রা উৎসব হ'ল নীলাচল তথা পুরীর রথযাত্রা।

বহু যুগ ধরে হাজার হাজার বছর ধরে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে রথযাত্রা উৎসব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে।

সারা দেশব্যাপী রথযাত্রা উৎসবের এই প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী বৌদ্ধদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব।

বৌদ্ধ যুগে এই রথযাত্রা উৎসব সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে দেখা যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে এসে পাটলীপুত্রে বৌদ্ধদের রথযাত্রা উৎসব প্রত্যক্ষ করেন। ফা-হিয়ান মুগ্ধ নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন যে মন্দিরের আকারে সুসজ্জিত রথে ভগবান বুদ্ধের প্রতিমা নিয়ে বৌদ্ধগণ এই বিশাল রথযাত্রা উৎসব করেন। ফাহিয়ানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বিশখানা রথ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হ'ত। বিভিন্ন গবেষক ও পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে এই বৌদ্ধ রথযাত্রা থেকেই কালক্রমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব প্রবর্তিত হয়।

অনেক পণ্ডিতের মতে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম মূলত বুদ্ধের ত্রিমূর্তি (ট্রিনিটি অব বুদ্ধ)

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি"

এই বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের ত্রিমূর্তি তথা তিন ভাবমর্তি হ'ল জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম।

যাহোক, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পুরীতেই জগন্নাথ সুভদ্রা ও

বলরামের তিনটি রথ রথযাত্রায় বের হয়। অন্যত্র একটি রথ বের হয়। রথযাত্রার তিথি সম্পর্কে পদ্ম পুরাণে লেখা রয়েছে, "আষাঢ়স্য দ্বিতীয় যাং রথং কুর্বাদ।"

অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় এই রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জাঁকজমক পূর্ণ।

এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীতে আসেন।

রথের ওপর দারুব্রহ্ম জগন্নাথকে দর্শন করে তাঁরা হন কৃতার্থ।

কথিত আছে,

'রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

অর্থাৎ রথের ওপর বামনরূপী পূর্ণ ব্রহ্ম জগন্নাথকে দর্শন করলে আর জীবকে এই জগতে আসতে হয় না।

কিন্তু এর মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। এই দেহরথের মধ্যে যে বামনরূপী পরমাত্মা আছেন তাঁকে দর্শন করলেই জীব মুক্তি লাভ করে। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হ'ন। প্রভু জগন্নাথ এই দেহরথের মধ্যে পরমাত্মাস্বরূপ বিরাজমান।

বহিরঙ্গে তিনি দারুব্রহ্মরূপে রথে বিরাজমান। বহিরঙ্গে তাঁর এই মনোমোহন রূপ দর্শন করলেও ভক্তগণ অপরিসীম পূণ্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হ'ন।

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ার মধ্যাহ্নে মাহেন্দ্রক্ষণে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম পুরীর মন্দির থেকে বের হয়ে রথে ওঠেন সেবক পাণ্ডাদের মাধ্যমে। প্রথমে বলরামের রথযাত্রা শুরু হয়। তারপর সুভদ্রার রথ ও শেষে জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়।

লক্ষ লক্ষ ভক্ত নামগানের মধ্য দিয়ে রথের পবিত্র দড়ি টেনে নিয়ে চলেন গুণ্ডিচা বাড়ী অর্থাৎ মাসীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। জগন্নাথের মন্দিরের প্রায় দু'মাইল পূর্বে মাসীর বাড়ী অবস্থিত।

জগন্নাথের রথের অগ্রে থাকেন সুভদ্রাদেবীর রথ। এই অপূর্ব সুন্দর রথে জগত জননী তারামা বিরাজ করেন।

বহু যুগের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সুভদ্রাদেবীর রথের নাম 'পদ্মধ্বজ।

এটি একুশ হাত উচু। চারহাত পরিধি। চৌদ্দভুবনের চিহ্নস্বরূপ রথের চৌদ্দটি চাকা।

সুভদ্রাদেবীর রথ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। সুভদ্রাদেবীর রথের রক্ষক বর্ণদূর্গা। রথের সারথী অর্জুন।

রথে চারটি ঘোড়া আছে। এই চার ঘোড়ার নাম যথা অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিষী।

সুভদ্রাদেবীর দক্ষিণে তারামা উগ্রতারা রূপে অধিষ্ঠিতা। পাশে চামুণ্ডাদেবী। পশ্চাতে বনদূর্গা, শালী দূর্গা ও বারাহী দেবী। বামদিকে শ্যামাকালী, মঙ্গলা ও বিমলাদেবী বিরাজ করেন।

সুভদ্রাদেবীর রথের দ্বারদেশে শ্রীদেবী ও ভূদেবী অবস্থান করেন।

প্রথমে বলরামের রথ, মধ্যে সুভদ্রাদেবীর রথ এবং শেষে জগন্নাথ দেবের রথ ভক্তগণ কর্তৃক মহাসমারোহে ধীরে ধীরে গুণ্ডিচা বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

আটদিন মাসীর বাড়ীতে সমারোহে অবস্হান করে নবম দিনে পূর্ণযাত্রা করে সবাই (উল্টোরথের দিন) আবার জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসেন।

পুরীর এই ভারতবিখ্যাত রথ ছাড়াও ভারতে আরো বহুস্থানে রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথের রথ বের হয়।

তার মধ্যে বঙ্গ দেশের রথ যাত্রা উৎসব সর্বাপেক্ষা বেশী। পুরীর জগন্নাথের রথের উৎসব ভারতে শ্রেষ্ঠ। পুরীর জগন্নাথের রথের পর পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার মাহেশের রথ বিখ্যাত ও প্রাচীন এবং আড়ম্বর পূর্ণ। বীরভূম জেলার তারাপীঠের রথও প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এছাড়া হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার ছয়শো বছরের প্রাচীন বৃন্দাবন চন্দ্রের রথ, মেদিনীপূরের মহিষাদলের রথ, নৈহাটির কাঠালপাড়ার শ্রীশ্রীবিজয়রাধাবল্লভজিউর রথ, ঢাকার ধামরাইয়ের শ্রীশ্রীযশোমাধবের রথ, ঢাকার টিকাটুলির রামসীতার রথ, ময়মনসিংহের কালীগঞ্জ বাড়ীর রথ কুমিল্লার সাচার গ্রামের জগন্নাথ দেবের রথ, মুর্শিদাবাদের লালগোলার রাজবাড়ীর রথ, মালদহের মকদমপুর ও জালালপুরের রথ বিখ্যাত।

কলকাতার সুরিলেনের গগন চাঁদ মল্লিকের শ্রীশ্রীআগল শঙ্কর

জিউর স্বর্ণরথ, ২৪ পরগণার দক্ষিন বিষ্ণুপুর গ্রামের রঘুনাথ সত্যনাম ঠাকুরের রথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া কলকাতার বলরামবোসের বাড়ীর রথ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীতে এসে রথযাত্রার দিন স্বয়ং রথ টানেন। হাওড়া জেলার শিবপুর, রামরাজতলা রামকৃষ্ণপুর, ব্যাটেরা, কদমতলা প্রভৃতির রথও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কলকাতার জানবাজার, শশীভূষণ দে স্ট্রীট ও কেওড়াতলার রথের খ্যাতিও আছে।

এছাড়া তেহট্টের রথ, শ্রীভূমি রথ (লেকটাউন), জয় নারায়ণের রথ (চাঁপা তলা), চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জের রথ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

আসামের শিলচরে বিলপদূর রাধামাধবের রথযাত্রাও বিখ্যাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের শ্রীশ্রীযশোমাধব দেবের প্রাচীন রথ এককালে মহেশের রথের চেয়েও বড় ও ঐতিহ্য-পূর্ণ ছিল। দেশবিভাগের পর কোলকাতার বেলগাছিয়ার দক্ষিণ দারী রেল কলোনীতে তারাশঙ্করী পীঠ (তারা মন্দিরে) থেকে এই রথযাত্রা প্রতিবছর সাড়ম্বরে পালিত হয়।

ভারতেব বাইরে সিসিলিতে (ইউরোপে) প্রতিবছর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই রথযাত্রা বহু প্রাচীন। প্রতি বছর রথযাত্রা উৎসবে চন্দ্র সূর্য ও জ্যোতিস্কের তিনটি প্রতীক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান কালে প্রভুপাদ ভক্তি বেদান্তের কৃষ্ণ কনসাস সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডন, মেলবোর্ণ, সান ফ্রান্সিসকো, টকিয়ো প্রভৃতি স্থানে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিরাট জাকজমক পূর্ণ ভাবে।

লক্ষ লক্ষ বিদেশী ভক্ত বর্তমানে ভারতে ও বিদেশে (পঞ্চ মহাদেশে) সুসজ্জিত রথ বের করে রথযাত্রা উৎসবকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছেন। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট কবিতাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ..

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে পড়ে করিছে প্রণাম।
রথভাবে আমি দেব পথভাবে আমি।
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।।”

পুরীর জগন্নাথদেবের রথ, সারা ভারতের সকল রথ ও বিদেশের রথ সকলের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও মূলত সর্বত্র এক জগন্নাথ তথা বৈষ্ণব মুর্তিই (শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রামসীতা, রাধামাধব প্রভৃতি) রথে আরোহন করেন।

কিন্তু মহাপীঠ তারাপীঠে রথের ক্ষেত্রে স্বয়ং মহাবিদ্যা কালী তথা তারামা রথে আরোহণ করেন। এই নজীর সারা ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে নেই।

বিষ্ণুপর্বের রথ যাত্রায় শক্তিময়ী মা-কালী তথা তারাদেবী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় রথে আরোহন করে বিহার করেন (উল্টোরথেও তাই), এই নজীর জগতে অনন্য সাধারণ।

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হলেন যথাক্রমে কালী ও তারাদেবী। তাই মহাশক্তি কালী ও তারা মূলত এক-ই। তাই তারামা মূলত কালীই।

এই কালীর পূজা ও উৎসব হয় কৃষ্ণপক্ষে। অথচ তারামা বিষ্ণুপর্বে অনুষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় তারাপীঠে রথে ওঠেন এবং সেই সময় পুরীতেও জগন্নাগের রথের অগ্রে সুভদ্রার রথে আরোহন করেন মহাসমারোহে, এই অভূতপূর্ব দৃশ্য ভারতে অতুলনীয়।

তাই মহাপীঠ তারাপীঠের রথযাত্রা উৎসব একাধারে প্রাচীন, বৈশিষ্টৎপূর্ণ, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং অনন্য সাধারণ। তারামা-ই যে শ্যাম তথা জগন্নাথ, এই শ্যাম শ্যামার অভেদভাব এই মহা সমন্বয় পীঠ মহাপীঠ তারাপীঠে যথার্থ উপলব্ধি হয়।

তারাপীঠে উল্টোরথেও তারামা আবার যথারীতি বিহার করেন।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে দেবী সুভদ্রা মূলত ভদ্রাদেবী। এই ভদ্রা দেবী মূলত ভদ্রকালী। এই ভদ্রকালী তারামায়ের অষ্টরূপের অন্যতম।

যথা—

> "তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী।
> কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিনী স্মৃতা॥"

অর্থাৎ তারা, উগ্রতারা, মহাউগ্রতারা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী, এই হ'ল তারাদেবীর অষ্টরূপ তথা অষ্টতারা।

তাই ভদ্রকালী মূলত তারামা।

অর্থাৎ দেবী ভদ্রা মূলত তারামা স্বয়ং। তাই একাধারে বৈষ্ণব ও শাক্ত ক্ষেত্র তথা শাক্তপীঠ হ'ল জগন্নাথ ধাম তথা নীলাচল। এই জগন্নাথ ক্ষেত্রেই দেবী বিমলা রয়েছেন জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পাশে পশ্চিম দিকে। সতীদেবীর নাভি এখানে পড়েছে। তাই এটি ভারতবর্ষের একশো আট সতীপীঠের মধ্যে অন্যতম সতীপীঠ।

আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই সতীপীঠের দেবী হলেন বিমলা আর ভৈরব হলেন স্বয়ং জগন্নাথ।

যেখানে ভারতের সকল সতীপীঠের ভৈরব হলেন শিব, সেখানে এক্ষেত্রে ভৈরব হলেন জগন্নাথদেব। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। শ্যামা ও শ্যাম এখানে এক হয়ে গেছেন। তাই নীলাচলের এই জগন্নাথ ক্ষেত্র একাধারে সতীপীঠ তথা শিবক্ষেত্র এবং বৈষ্ণব ক্ষেত্র।

সব মিলে জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'ল অভেদ ক্ষেত্র তথা ব্রহ্মক্ষেত্র।

মহাপীঠ তারাপীঠও শ্যাম শ্যামার অভেদ ক্ষেত্র তথা ব্রহ্মক্ষেত্র।

তাই মহাপীঠ তারাপীঠের সাথে নীলাচলের জগন্নাথ ক্ষেত্রের এক আশ্চর্য্য গভীর নিগূঢ় যোগ রয়েছে।

তাই পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রায় তারামা রথে ওঠেন (সুভদ্রার রথে) এবং জগন্নাথের অগ্রে থাকেন।

আবার তারাপীঠেও রথযাত্রায় তারামা রথে উঠে বিহার করেন জগন্নাথস্বরূপ।

তারামা ও জগন্নাথ যে এক ও অভিন্ন। তাই পুরুষোত্তমে অর্থাৎ পুরীতে জগন্নাথদেবের পাশে সুভদ্রা তথা ভদ্রাদেবী রূপে স্বয়ং তারামা-ই নিত্য পূজিতা হ'ন। তাই এই সতীপীঠ তথা মহাতন্ত্রপীঠে সগুণব্রহ্ম জগন্নাথদেবের নিত্য ভোগ নিবেদন হয় তারামন্ত্রে। কৃষ্ণমন্ত্রে নয়।

এই গভীর নিগূঢ় তত্ত্ব সর্বজনবিদিত নয়। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার জগন্নাথ ও সুভদ্রা তথা তারাদেবী এখানে শুধু শ্যাম শ্যামার অভেদ রূপই নন, জগন্নাথ ও সুভদ্রাদেবী এখানে শিবশক্তিস্বরূপও বটে।

তাই জগন্নাথ বিমলাদেবীর ভৈরবরূপে বিরাজ করছেন।

তাই পুরীতে জগন্নাথ একাধারে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং শিব-

স্বরূপ ভৈরব। সুতরাং একাধারে শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈবক্ষেত্রের মহা সমন্বয় হয়েছে এই শ্রীক্ষেত্রে। মূলত একই সগুণ ব্রহ্ম লীলা বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্নরূপে রয়েছেন।

বহিরঙ্গে এই রূপের বৈচিত্র থাকলেও অন্তরঙ্গে কিন্তু সবই এক ও অভিন্ন। তাই যেমন শ্রীক্ষেত্রে মহাবিষ্ণু জগন্নাথের ভোগ নিবেদন হয় শাক্ত তথা তারামন্ত্রে, তেমনি ভুবনেশ্বর ধামে মহাশিব ভুবনেশ্বরের ভোগ নিবেদন হয় গোপাল মন্ত্রে, শিবমন্ত্রে নয়। সকল সাধনার গভীরে এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি সাপেক্ষ।

এই অধ্যাত্ম বৈচিত্র্য মূলত ঐক্যেরই প্রতীক। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসমুদ্রে সকল বৈচিত্র্যের ধারা এসে মিশে গেছে। এই গভীর অধ্যাত্ম ব্রহ্ম অনুভূতিই ভারতীয় সাধনার সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই মহান অধ্যাত্ম সম্পদে ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে নীলাচলের শ্রীশ্রীজগন্নাথধাম ও মহাপীঠ তারাপীঠ সর্বতোভাবে মহা সমৃদ্ধ।

মহাপীঠ তারাপীঠে যখন হাজার হাজার ভক্তের আনন্দময় উপস্থিতিতে ত্রিলোক জননী তারামা রথে ওঠেন (ভোগ মূর্তিতে) তখন আরেকটি অপূর্ব দিব্য দৃশ্য সমবেত বিশাল সাধু সন্ত ও ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলে।

সেই পরম আনন্দময় দিব্য দৃশ্যটি হ'ল মহাভাবে বিভোর হয়ে হরি নামে মাতোয়ারা হয়ে শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা নৃত্য করতে করতে তারামায়ের রথাগ্রে চলেছেন ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে। তাঁর মুখে মধুর হরি নাম। যেমন নীলাচলে জগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনামে বিভোর হয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে যেতেন বিশাল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে।

এই রথযাত্রার পরম পবিত্র দিনে শ্রীবাম মধুর উদাত্ত কন্ঠে তারামায়ের রথাগ্রে নৃত্য করতে করতে গেয়ে চলেন,

"হরি বোলে গৌর নাচে।"

সেই দিব্য দৃশ্য দেখতে দেখতে সমবেত বিশাল জনতার মনে হয় যেন সত্যিই গৌর নাচছেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আজানুলম্বিত বিশাল বাহুদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন, নয়নদ্বয় শিবনেত্র, তার বদনে ধ্বনিত হচ্ছে 'হরি বোলে গৌর নাচে।' কখনো 'হরি বোল হরি বোল' ধ্বনি। তাঁর সাথে সমবেত কীর্তনীয়াবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ আখর দিয়ে চলেছেন।

তারাময় শ্রীবাম আজ রথযাত্রার পূণ্য দিনে 'তারা', 'জয় তারা', 'শ্রীদূর্গা জয় তারা' বলছেন না, বলছেন 'হরি' নাম, 'গৌর' নাম।

আসলে তারা-ই যে হরি, তারা-ই যে গৌর। শ্রীবাম তাই দেখালেন হরি নামে মাতোয়ারা হয়ে। তারা, কালী, হরি, গৌর, কৃষ্ণ, রাম, শিব প্রভৃতি সবই নাম ব্রহ্ম। মূলে সবই এক। একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ ও নাম মাত্র। তাই ব্রহ্মময়ী 'তারা'-র মধ্যে শ্রীবাম অন্য নামকে মিশিয়ে দিলেন মাত্র।

শিবস্বরূপ শ্রীবাম রথযাত্রার দিনে হরি নামের পরম অমৃতরস পানে বিভোর হয়ে যান।

এ যেন দ্বাপরে সেই বৃন্দাবনের রাস উৎসবে গোপবশে দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে শিবের সেই পরম আনন্দময় নৃত্য। সেই মহারাসে অভিমানহীন সদাশিব নটরাজের নৃত্য দেখে গভীর ভাবে মুগ্ধ হলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাসেশ্বরী শ্রীরাধা।

নৃত্য ও গীতের তথা সুরের ঈশ্বর যে স্বয়ং শিব। শিব তাই সুরেশ্বর।

তাই যেখানে হরিনাম, হরিসংকীর্তন, হরিকথা সেখানে হর অর্থাৎ শিব উপস্থিত থাকেন।

হরি হয় যে একাত্মা।

তাই বলা হয় শিবের গুরু হরি তথা রাম আর রামের গুরু শিব।

এ সম্পর্কে একটি ছোট্ট মধুর কাহিনী আছে। শ্রীরামচন্দ্র লংকা জয় করে সীতা দেবীকে নিয়ে লঙ্কা থেকে সমুদ্রপার হয়ে এপারে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন শিবমূর্তি। নাম দিলেন 'রামেশ্বর'।

সীতাদেবী এর কারণ জানতে চাইলে শ্রীরামচন্দ্র মৃদুহেসে বললেন, "রামের ঈশ্বর যে শিব, তাই রামেশ্বর।"

এদিকে কৈলাসে শিবপার্বতী বসে শ্রীরাম চন্দ্রের 'রামেশ্বর' শিবের পূজা ও প্রতিষ্ঠা দেখছেন। পার্বতী পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে শিবপূজা ও প্রতিষ্ঠা করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলেন শিবের কাছে।

শিব মৃদু হেসে বললেন, "রামই ঈশ্বর, তাই রামেশ্বর।'

শিবরামের এই মধুর নিগূঢ় লীলাকাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রমানিত

হয় যে উভয়ে একাত্মা ও অভিন্ন। তাই হরিনামে শিব আনন্দে মাতোয়ারা হ'ন। আর শিব নামে আনন্দে বিভোর হন রাম। তাই হরিহর এক।

বাংলা ১২৯৯ সালের শুভ রথযাত্রার দিন তারাপীঠে এই দিব্য মধুর চিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা তারামায়ের রথাগ্রে নেচে চলেছেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা হরিনামের অফুরন্ত অমৃত সুধা বিতরণ করতে করতে।

ভাবে গর্গর মাতোয়ারা শ্রীবাম।

চারপাশে শত শত সাধু সন্ন্যাসী ও কীর্তনীয়া বৃন্দ। তাঁদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে শ্রীবাম দু'হাত তুলে নেচে চলেছেন। মুখে অবিরাম হরিনাম। হরিনামের মদিরায় তাঁর পদ্মপলাশ লোচনদ্বয় ঢুলু ঢুলু। দিব্য অঙ্গ টলমল।

সমবেত বিশাল জনতা মুগ্ধ নেত্রে আনন্দবিহ্বল হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলেন এই দিব্য দৃশ্য।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। তারামন্দির থেকে তারা মায়ের ভোগমূর্তি নিয়ে সুশোভিত ও সুসজ্জিত রথ তারাপীঠ মহাশ্মশান হয়ে আবার ফিরে গেল মন্দিরে।

তারামন্দিরের বিরাট আঙ্গিনায় সমবেত হ'ল ভক্তমণ্ডলী। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ হরিনামে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন শ্রীবাম মহানন্দে নৃত্য করতে করতে।

শ্রীবাম আজ যেন এক সদা নৃত্যশীল। চিরন্তন শিশু। শ্রীবামের এই বিরলরূপ প্রত্যক্ষ করে সবাই খুব বিস্মিত হলেন। তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার গুরুগম্ভীর ভাব ও রূপ যেন আজ অদৃশ্য হয়েছে।

পঞ্চান্ন বছরের প্রবীন বামাক্ষ্যাপা বাবা যেন আজ হারিয়ে গেছেন। তার পরিবর্তে আজ আবির্ভূত হয়েছেন হরিনামে মাতোয়ারা এক নতুন শিশু। ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম নেঁচে গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিচ্ছেন।

সন্ধ্যা নেমে এল তারাপীঠের বুকে। শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে দেখা দিল হাসি মুখে। লক্ষ কোটি তারকার প্রদীপ জ্বলে উঠলো। মহাকাশ হতে তারামাকে যেন তারারা আরতি করতে শুরু করলো। তারামন্দিরেও শুরু হ'ল আরতি।

আরতি শেষে তারামায়ের চরণামৃত ও প্রসাদ নিলেন ভক্তগণ। তারপর শুরু হ'ল তারামায়ের নাম গান।

শ্রীবাম ভাববিহ্বল হয়ে তারামন্দিরের আঙ্গিনায় বসে আপন মনে তারামায়ের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

কখনো তারামায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন কখনো স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন আবার কখনো উগ্র দৃষ্টিতে তারামায়ের দিকে তাকিয়ে অভিমান করছেন। এক বিচিত্র রহস্যে ঘেরা শ্রীবামের এই বিভিন্ন রূপ। তারাপীঠে রথ যাত্রা উপলক্ষে শ্রীবামের বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসীগণ' তৃপ্ত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের মনে আশার আনন্দ রয়েছে যে আবার সাতদিন বাদে উল্টোরথে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বাবার এই হরিনামে পাগল করা ভাব ও রূপ তাঁরা পরম আনন্দে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

বাংলা ১২৯৯ সনে মহাপীঠ তারাপীঠে এই দিব্য বৈচিত্র্যময় রথযাত্রা উৎসব এভাবে সুসম্পন্ন হ'ল।

—o—

শ্রীবাম দর্শনে সস্ত্রীক কুলদানন্দ

১২৯৯ সালে শরতের এক সোনালী সকালে দক্ষিণ গ্রাম থেকে ডাবুকের কৈলাসপতির শিষ্য ও শিষ্যা, কুলদানন্দ স্বামী ও তাঁর পত্নী ত্রিপুরানন্দময়ীদেবী শ্রীবামকে দর্শণ করতে এলেন তারাপীঠে। শ্রীবাম তখন স্নানান্তে তারামন্দিরের সিড়িতে বসে আছেন। নগ্ন শিশুর মতই বিকারহীন। গুরুস্বরূপ শ্রীবামকে কুলদানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলেন। শ্রীবাম আশীর্বাদ করলেন এই সাধক দম্পতিকে। ত্রিপুরানন্দময়ী দেবী সর্বপ্রথম বাম দর্শনে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলেন।

শ্রীবামও ত্রিপুরানন্দময়ীকে দেখে কুলদানন্দের যে উত্তরসাধিকা তা বুঝতে পারলেন। তবু রহস্য করে বললেন, "সাধুবাবা আশ্চর্য্য বজরুকি করিয়াছেন, ভৈরবী মা আনিয়াছেন দেখছি। তা ঘরের মা, না পরের মা।" কুলদানন্দ মৃদু হেসে বললেন, "আপনি তো সব জানেন। তা দেখুন ঘরের না পরের।"

শ্রীবাম সানন্দে ত্রিপুরানন্দময়ী দেবীকে দেখে বললেন, "না ঘরের মা বটে, তা মা বটে, তারামা বটে।" শ্রীবাম সর্বভূতেই তারামা দেখেন। তার মা সম্বোধনে সন্তানহীনা ত্রিপুরাদেবীর মাতৃভাব জেগে উঠলো। মাতৃভাব নিয়ে শ্রীবামকে তিনি নাড়ু খাওয়াতে লাগলেন এবং তাঁকে "গোপাল" বলে ভাবলেন। শ্রীবামও তাঁর এই সম্বোধনে সাড়া দেন।

উত্তরকালে আরো অনেকবার ত্রিপুরাদেবী মাতৃভাব নিয়ে তাঁর প্রাণের গোপালের জন্য নানারকম খাবার তৈরী করে তারাপীঠে এসে শ্রীবামকে খাইয়ে যেতেন। শ্রীবামের কৃপায় এই পুত্রহীনা নারী বাৎসল্যভাবে বিভোর হয়ে গেলেন শ্রীবামকে গোপাল করে নিয়ে।

—০—

শ্রীধাম পরশ ধন্য একটি মহান সিদ্ধবংশের সাধকবৃন্দ

নীলাচল থেকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলা পরিকরবৃন্দসহ এসেছেন বঙ্গদেশের বর্ধমানে।

মহাপ্রভুর আগমনে সারাদেশ আনন্দে মাতোয়ারা। মহাপ্রভু সদল বলে চলেছেন রাঢ় অঞ্চল হয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে। ১৫৩৪ শকাব্দের (ইংরেজী ১৫১৩ খৃঃ) শরতের এক প্রসন্ন সকাল।

রাঢ়ভূমিতে অর্থাৎ বীরভূমে প্রবেশ করবার প্রাকলগ্নে এলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত কেতু গ্রামে।

মহাপ্রভুর ভুবন মোহন দিব্য উজ্জ্বল গৌরতনুর কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে শ্বেতশুভ্র স্ফটিকের মালা। দিব্য অঙ্গে শোভা পাচ্ছে গৈরিক বসন ও উত্তরীয়। করতলে হরি নামের ঝুলি। বদনে মধুর অমৃতময় হরি নাম। হরি সংকীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন কেতুগ্রামে। কেতুগ্রাম এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মহামিলন ক্ষেত্র। কেতুগ্রামে রয়েছে একটি বিখ্যাত সতীপীঠ। সত্যযুগে সতীদেবীর বামবাহু এই সতীপীঠে পতিত হয়েছে। দেবীর নাম বহুলা, ভৈরব হলেন ভীরুক।

কেতুগ্রামে বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের বাস। ঘরে ঘরে রাধা-গোবিন্দের প্রাণবন্ত বিগ্রহ নিত্য পূজিত ও সেবিত।

গ্রামে শাক্ত ও বৈষ্ণবের কোন দ্বন্দ্ব নেই। সবাই পরম শান্তিতে যাঁর যাঁর ইষ্ট সেবায় নিয়োজিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেতুগ্রামে সদলবলে সংকীর্তন করতে করতে প্রবেশ করতেই সমগ্র কেতুগ্রামে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের এবার গৌর অবতার। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাভাবে বিভোর হয়ে দ্বাপরের কানু এবার শ্যামল বরতনু ছেড়ে গৌরতনু ধারণ করে এসেছেন।

কলির জীব উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে।

শ্রীরাধার মহাভাব নিয়ে মহাপ্রভু সর্বদা বিভোর। মুখে সদাই কৃষ্ণ নাম। চৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে দুই পদ্মহস্ত উত্তোলন করে নৃত্য করতে করতে মধুর কন্ঠে গেয়ে চলেছেন—

"কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্॥"

মহাপ্রভুর সাথে নৃত্য করতে করতে সমস্বরে গেয়ে চলেছেন তাঁর লীলাপরিকরগণ।

মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপ ও ভুবন মঙ্গল নাম গানের মধুর স্বরে চারদিক পূর্ণ হয়ে উঠলো। চারদিকে আবাল বৃদ্ধ নরনারী প্রবল আকর্ষণে ছুটে আসতে লাগলো মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভু সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শন করছেন। যত ভক্ত সামনে আসছেন সবাইকে কৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করছেন আর কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা করে দিচ্ছেন।

কেতুগ্রামের ভক্তগণ মহাপ্রভুর দিব্যস্পর্শে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ ভাবে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

শ্যাম শ্যামা আজ এক হয়ে গেছে। সাক্ষাত ভগবত বিগ্রহ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মদনমোহন রূপের এমন অমোঘ আকর্ষণ যে তাঁর পরম পবিত্র দিব্য গৌরকান্তি দর্শনের সাথে সাথে সকল নর-নারীর মন থেকে সব ভেদাভেদ দূর হয়ে যাচ্ছে। আর যেসব মহা ভাগ্যবান ভক্তকে তিনি সানন্দে কোল দিচ্ছেন, সাথে সাথে তাঁরা পরম আনন্দে তাঁদের ইষ্টকে দর্শন করছেন মহাপ্রভুর মধ্যেই।

পুনরায় মহাপ্রভুকে একটু দর্শন ও স্পর্শনের জন্য অনেকে উন্মাদ হয়ে উঠলেন।

ক্রমে নাম কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন কেতুগ্রামের এক বিশিষ্ট ভক্ত সাধকের গৃহে। এই মহা সৌভাগ্যবান সাধক ভক্তের নাম শ্রীরামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

এই বীর সাধকের গৃহে একদিকে রয়েছেন রঘুনাথজী অন্যদিকে শক্তিমূর্তি কালী। বাড়ীতে প্রতিবছর সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হয়। বলি হয়। পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শ্যাম ও শ্যামার যুগল সাধনায় সিদ্ধ এই সাধক প্রবর রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। রামশঙ্কর সসম্মানে সপারিষদ চৈতন্য প্রভুকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামশঙ্করের পবিত্র গৃহে সানন্দে অতিথি হলেন।

রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে রয়েছে একটি বড় বেলগাছ।

সেই বেলগাছের নীচে চৈতন্য মহাপ্রভু আসন পাতলেন। তিনি সন্ন্যাসী তাই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন না।

তখন গোঁধুলী লগ্ন। কৃষ্ণ নাম গানে মুখরিত হয়ে উঠলো রাম শঙ্করের পরম পবিত্র গৃহ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর নাম গান ও ভাবাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্য দর্শন করতে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী রাম শঙ্করের গৃহের চতুর্দিকে সমবেত হলেন। সারা কেতুগ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে মহাভাগ্যবান রামশঙ্করের গৃহে।

এক সময় নাম কীর্তন শেষ হ'ল।

গ্রামের নরনারীগণ মহানন্দে মহাপ্রভুকে প্রনাম জানিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

মহাপ্রভু বেলতলায় বিশ্রাম করতে লাগলেন তাঁর ভক্তবৃন্দ সহ।

রামশঙ্কর মহাপ্রভুর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মধুর নাম গান ও অধ্যাত্ম আলোচনায় অনেকরাত পর্যন্ত অতিবাহিত হ'ল।

অবশেষে মহাপ্রভু শয়ন করলেন পবিত্র বিল্ব বৃক্ষ মূলে।

ক্রমে ভোর হ'ল। মহাপ্রভু সদল বলে স্নান করে এলেন। এবার রওনা হবেন। গৃহকর্তা রামশঙ্কর মহাপ্রভুর সেবার জন্য অনুমতি চাইলেন। মহাপ্রভু স্বেচ্ছায় চাইলেন রঘুনাথজীর প্রসাদ।

রঘুনাথজীর অন্নপ্রসাদ পান্তাভাত (জলভাত) ও লেবু চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেয়া হ'ল।

মহাপ্রভু সানন্দে লেবু দিয়ে পান্তাভাত খেলেন। তাঁর লীলা পরিবার-বৃন্দও সেই মহা প্রসাদ পেলেন।

এবার চৈতন্য মহাপ্রভু রাঢ় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করবেন সদল বলে।

যাত্রার পূর্বলগ্নে গৃহস্বামী রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে চৈতন্য মহাপ্রভু

কাছে ডাকলেন। সাধক প্রবর রামশঙ্কর সপরিবারে মহাপ্রভুকে প্রনাম করলেন।

মহাপ্রভু সাধক রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে মহাপ্রভু সানন্দে আলিঙ্গন করলেন। তারপর নিজকন্ঠ থেকে স্ফটিকের মালাটি খুলে রামশঙ্করকে উপহার দিলেন। মহাপ্রভুর দিব্য অঙ্গের পবিত্র স্পর্শ যুক্ত এই মহাপবিত্র স্ফটিকের মালাটি রামশঙ্কর দুইহাত ধরে মস্তকে ধারণ করলেন।

মহাপ্রভুর এই সস্নেহ উপহারে রামশঙ্কর অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু রামশঙ্করকে দিলেন কিছু নিগূঢ় অধ্যাত্ম উপদেশ। তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হরিনামের ঝুলিটি হাত থেকে খুলে রামশঙ্করকে উপহার দিলেন।

পরম আনন্দে ও বিস্ময়ে সাধক রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাপ্রভুর এই দ্বিতীয় উপহারও সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করলেন।

এবার চৈতন্য মহাপ্রভু সদলবলে বিদায় নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে রাঢ় ভূমি বীরভূমের পথে যাত্রা করলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম পবিত্র পদরজ স্পর্শে কেতুগ্রাম চিরতরে ধন্য হয়ে রইলো।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের জন্য কেতুগ্রামের সাধক রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীও চিরতরে অমর হয়ে রইলো। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বাড়ীতে আগমন ও একরাত্রি অবস্থানের জন্য এই বাড়ীর নাম হ'ল "বেল চ্যাটার্জী বাড়ী। রামশঙ্কর চ্যাটার্জীর বাড়ীর বেলগাছের নীচে মহাপ্রভু একরাত অতিবাহিত করেন। তাই কালক্রমে এই বাড়ী 'বেলচ্যাটার্জী' নামে বিখ্যাত হ'ল।

মহাপ্রভুর চিরস্মরনীয় আবির্ভাবের জন্য রামশঙ্করের এই বাড়ীতে সেই বছর থেকে (১৫১৩ খৃঃ থেকে) দুর্গাপূজায় পশুবলি বন্ধ হ'ল।

মাতৃসাধক হয়েও রামশঙ্কর মহাপ্রভুর আগমনের জন্য দুর্গাপূজায় পশুবলি বন্ধ করে দিলেন।

আজো সেই নিয়ম বংশ পরম্পরায় প্রায় পৌনে পাঁচশত বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই পরম পবিত্র স্ফটিকের মালা ও মহাপবিত্র নামের ঝুলি সেই থেকে প্রতিদিন নিত্যপজিত হচ্ছে বংশ

পরম্পরায়। বিগত প্রায় পৌনে পাঁচশত বছর ধরে এই নিত্য সেবা পূজা অব্যাহত রয়েছে।

আজো কেতুগ্রামের মহাপ্রভুর পদধূলি ধন্য ও অবস্থানধন্য 'বেল চ্যাটার্জী বাড়ী' সর্বস্তরের সাধক ভক্তের কাছে মহান তীর্থক্ষেত্র রূপে সূচিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সিদ্ধ সাধক রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়েয় বংশ সিদ্ধ বংশ রূপে সুপরিচিত।

এই পবিত্র সিদ্ধ বংশে একাধিক সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

সিদ্ধপুরুষ রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর যে সব সিদ্ধপুরুষ তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায়, অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় (দুলু ঠাকুর) ।

সাধক প্রবর ভূধর চট্টোপাধ্যায় জপ সিদ্ধ ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে "উদয় থেকে উদয়" পর্যন্ত অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা জপ করতেন একাসনে বসে। একদিন এভাবে জপ করতে করতে রাত দু'টোর সময় সহসা জ্যোতি দর্শন করেন।

জ্যোতির প্রভায় চারদিক আলো হয়ে যায়। তিনি ভোর হয়ে গেছে মনে করে রঘুনাথজীর ঘর থেকে ফুলের সাজি নিয়ে ফুল তুলতে রওনা হলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "এত রাতে কোথায় যাচ্ছ।"

তখন তাঁর খেয়াল হ'ল।

সাধক ভূধর চট্টোপাধ্যায় তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দর্শন ও কৃপালাভ করে ধন্য হন।

ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাতৃসাধক ও বীরাচারী শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বাকসিদ্ধ ছিলেন। অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় যৌবনে তারাপীঠে যাতায়াত শুরু করেন। আনুমানিক ১২৯৯ সন থেকে তিনি তারাপীঠ যাওয়া শুরু করেন। অচিরে তিনি তারাপীঠের প্রাণপুরুষ শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সঙ্গলাভ করে ধন্য হ'ন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার কৃপায় তিনি সাধন পথে দ্রুত অগ্রসর হ'ন।

একদিন তারাপীঠে মহাশ্মশানে শ্রীবাম ও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় বসে আছেন।

শ্রীবাম অভয়পদকে বললেন, "অভয় তুই এমন কারণ তারামাকে খাওয়াতে পারিস, যে কারণ খেলে মা'র বেশ স্ফূর্তি হয়?'

শ্রীবামের ইচ্ছে শুনে সাধক ভক্ত অভয়পদ বললেন, "ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করে দেখছি।" তার পরদিন অভয়পদ তারাপীঠ থেকে কেতুগ্রামে নিজ গৃহে ("বেল চ্যাটার্জীর বাড়ী"তে) ফিরে এলেন। তৈরী করলেন অত্যন্ত কড়া ধরনের 'কারণ'।

তারপর সেই কারণ নিয়ে তারাপীঠে এসে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দিলেন।

শ্রীবাম তারামাকে সেই কারণ নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সেই আগুনে কারণ পান করে অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন।

খুশি হয়ে তাঁর প্রিয় ভক্ত অভয়কে বললেন, "মা খুশি হয়েছেন কারণ খেয়ে। এমন কারণ অনেকদিন খাইনি। তোকে কিছু দেব। তাতে করে বাকসিদ্ধি হবে। যাকে যা বলবি তাই হবে।" এই বলে পুনরায় অভয়কে বললেন, "জিভটা দেখি।" অভয়পদ জিভটা বের করতেই শ্রীবাম জিভে একটা মন্ত্র লিখে দিলেন।

সেই মন্ত্র জপ করে সাধকপ্রবর অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমে সিদ্ধ পুরুষ রূপে খ্যাতি লাভ করেন। অভয়পদ 'কারণ' ও গাঁজা খুব খেতেন। মাঝে মাঝে তারাপীঠ মহাশ্মশান ছাড়া মরাঘাট শ্মশানেও সাধনা করতে যেতেন।

একবার তিনি কেতুগ্রামের বাড়ীতে তারাপীঠ থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে নিয়ে আসেন। মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজরিত এই পবিত্র গৃহে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ভক্ত সঙ্গে এলেন। শ্রীবামকে অভয়পদ দেখালেন বাড়ীর সেই বিখ্যাত বেলগাছ, যার মূলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে একরাত্রি অবস্থান করেছিলেন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত স্ফটিকের মালা ও নামের ঝুলিও দেখালেন। নিত্য পূজিত হয় এই স্ফটিকের মালা ও নামের ঝুলি। রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসনও দেখালেন। এই আসনে অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে বসেন। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা খুশি হলেন এই পবিত্র বস্তু সকল দেখে। কয়েকদিন আধ্যাত্মিক আলোচনা ও ধ্যান জপে অতিবাহিত হ'ল। শ্রীবাম অভয়পদকে নিগূঢ় ক্রিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন অভয়পদ শ্রীবামের প্রিয় সেই আগুনে কারণ তৈরী করলেন এবং সেই 'কারণ' ও গাঁজা দিয়ে শ্রীবামকে সেবা করালেন।

শ্রীবাম তারামাকে নিবেদন করে তা গ্রহণ করলেন এবং খুবই প্রসন্ন হলেন। অভয়পদকে একটি সুন্দর বাণলিঙ্গ শিব দিয়ে বললেন, "এটি নিত্য পূজা করিস। এটি কল্পতরু বাণলিঙ্গ শিব। খুবই জাগ্রত। যখন খুব প্রয়োজন হবে তখন এঁর কাছে চাইবি। যা চাইবি, তাই পাবি।"

ভক্ত অভয়পদ তা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সেই শিবলিঙ্গের নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করলেন।

অভয়পদ কেতুগ্রামের বাড়ী থেকে শ্রীবামকে নিয়ে মরাঘাট শ্মশানে গেলেন এবং মহাচক্র অনুষ্ঠান করলেন। আরো কয়েকজন সাধকও তাতে যোগ দিলেন। বলাবাহুল্য এই মহাচক্রের চক্রেশ্বর হলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা।

মরাঘাট থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে অভয়পদ তারাপীঠে ফিরলেন।

ক্রমে অভয়পদ মাতৃসাধনায় সিদ্ধ হলেন এবং তারামায়ের দর্শন লাভ করে ধন্য হলেন। অভয়পদ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার শ্রীমুখ থেকে তাঁর দীক্ষা এবং মাতৃশ্রাদ্ধে বৃষ্টি স্তম্ভনের কথা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তার সাথে সামান্য রান্না দিয়ে সকল নিমন্ত্রিতকে খাওয়ানোর বিস্ময়কর কথাও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার শ্রীমুখ থেকে শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেন (যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে)।

অভয়পদ শ্রীবামের বহু অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন।

অভয়পদ তারাপীঠে প্রধানত অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য সান্নিধ্যে থেকে।

তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত নিভৃতপ্রিয়। নিজের সাধনা ও সিদ্ধির কথাও প্রচার করতে চাইতেন না।

তাই আত্মপ্রচার বিমুখ এই বাকসিদ্ধ পুরুষকে অনেকে চিনতে পারে নি।

কেতুগ্রামের সাধারণ লোক এই তেজস্বী সিদ্ধ সাধককে চিনতে পারে নি। একাধারে বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের বংশধর এবং নিজেও শ্রীবামের কৃপায় সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। অথচ এসব কথা গ্রামের সাধারণ লোক ভাবতেন না।

একদিন অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় 'কারণ' পান করছেন। এমন সময় জনৈক গ্রামবাসী এসে তাঁকে 'কারণ' পান করতে দেখে নিন্দা করতে লাগলো।

লোকটি অসাধারণ বলশালী।

অভয়পদ 'কারণ' পান করতে করতে বললেন, "কি তুই মাকে গালি দিলি? এখান থেকে আর নড়তে পারবি না। এখানেই শেষ হয়ে যাবি।"

বাকসিদ্ধ এবং তারাময়-অন্তপ্রাণ অভয়পদের কথা মুখ থেকে বের হ'বার সাথে সাথে সেই লোকের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগলো। সেই রক্তবমি করতে করতে লোকটি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। লোকটির এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে গ্রামের লোকদের চৈতন্য হ'ল।

বাকসিদ্ধপুরুষ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হননি।

শ্রীবামের দেহরক্ষার পর মাঝে মাঝে তারাপীঠে যেতেন। জীবনের শেষ বার বছর কেতুগ্রামে নিজগৃহের পঞ্চমুণ্ডি আসনে এবং মরাঘাট শ্মশানে অতিবাহিত করেন।

আনুমানিক পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহাযাত্রার পূর্বে মরাঘাট শ্মশানে নিজ আসনে বসে "তারা ব্রহ্ম কালী ব্রহ্ম" বলতে বলতে জগত জননী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের চির-শান্তিময় শাশ্বত কোলে চলে গেলেন।

অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাইপো অর্থাৎ ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীদূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য হয়েছেন।

সিদ্ধপুরুষ দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১২৯৯ সনের ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। যৌবনে মাত্র আঠারো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৩১৭ সনে তিনি তারাপীঠে আসেন এবং অচিরে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপা লাভ করে কৃতার্থ হ'ন। তাঁর কাকা অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীবামের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান।

তাই শ্রীবামের করুণা এই সিদ্ধ বংশের সন্তান ও নবীন সাধক দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর অকাতরে বর্ষিত হয়।

পরবর্তীকালে শ্রীবামের দেহত্যাগের পরও দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

তারাপীঠে গিয়ে মহাশ্মশানে সাধনা করেন। তাঁর সাথে দাইহাট থেকে সাধক আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন সাধক যান।

তারাপীঠ মহাশ্মশানে উত্তরকালে তিনি ও তার সহযোগী সাধকগণ মাঝে মাঝে চক্রানুষ্ঠানও করতেন।

পরবর্তীকালে বক্রেশ্বর ও মরাঘাট শ্মশানেও তিনি সাধনা করে আপ্তকাম হ'ন।

তাছাড়া কেতুগ্রামের নিজগৃহের সিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসেও বিভিন্ন নিগূঢ় ক্রিয়া সাধনা সুসম্পন্ন করেন।

পরবর্তীকালে গৃহদেবতা রঘুনাথজীর সাধনা করেও তিনি সিদ্ধ হ'ন।

মূলতঃ মাতৃসাধক এই মহাপুরুষের হোমযজ্ঞ ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। হোম থেকে তাবিজ উঠতো অলৌকিক ভাবে। তাঁর বহু অলৌকিক কাহিনী কেতুগ্রামে ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কামারপাড়ায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর শিষ্য ভক্তের সংখ্যা প্রচুর। জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি কেতুগ্রাম থেকে কামারপাড়ায় এসে গৃহ তৈরী করে বসবাস করতে থাকেন। মাঝে মাঝে দেশের বাড়ী কেতুগ্রামেও যেতেন। বর্তমানে এই গৃহে প্রায় পৌনে পাঁচশো বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত স্ফটিকের মালা ও মহাপ্রভুর নামের ঝুলি নিত্য পূজিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা প্রদত্ত বাণলিঙ্গ কল্পতরু শিবলিঙ্গটিও এখানে নিত্য পূজিত হচ্ছে। তিনি একটি দু'লাইনের সিদ্ধমন্ত্র সবাইকে প্রতিদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে উচ্চারণ করতে বলতেন। তাতে সার্বিক কল্যাণ হয়। সব বিঘ্ন নাশ হয়। মন্ত্রটি হ'ল "তং দেবী জগতমাতঃ জগদানন্দ দয়াময়ী, রক্ষ মে মম সর্বদা প্রসীদ পরমেশ্বরী।"

তিনি তাঁর কাঁকা অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দীক্ষা (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য), মাতৃশ্রাদ্ধে বৃষ্টিস্তম্ভন ও সামান্য রান্না করে সাতশো নরনারীকে ভোজনের কথা শোনেন (যা অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে শুনেছিলেন)। ইংরেজী ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তা কামারপাড়ার গৃহে বসে লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা প্রদত্ত বাণলিঙ্গ শিব যে সদা জাগ্রত এবং কল্পতরু তার প্রমাণ একবার দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেন।

একদিন তাঁর গৃহে অনেক অতিথি এসেছেন। অথচ গৃহে সেদিন

অন্ন নেই। উপায় না দেখে তিনি বাধ্য হয়ে বাণলিঙ্গ কল্পতরু শিবকে তা জানালেন। একটু পরে গ্রামের জনৈক ধনী ব্যক্তির বাড়ী থেকে বিরাট সিধা এল তাঁর গৃহে। তাতে চাল ডাল তেল নুন সবই ছিল। যথা সময়ে ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল এবং সবাই প্রসাদ পেলেন। কিছু প্রসাদ সেই ধনী ব্যক্তির গৃহে পাঠানো হ'ল। তিনি প্রসাদ পেয়ে খুবই আশ্চর্য ও খুশি হলেন। আরো আশ্চর্য হলেন শুনে যে তাঁর বাড়ী থেকে 'সিধা' গেছে দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে। অথচ তিনি কোন 'সিধা'-ই পাঠান নি।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য সিদ্ধপুরুষ দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১৩৮৮ সনের ১২ই কার্তিক বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করে নিত্যধামে গমন করেন।

সিদ্ধসাধক রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বংশের পঞ্চম সিদ্ধপুরুষ হলেন ৺দূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম সুযোগ্য পুত্র শ্রীসন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দুলুঠাকুর নামে বর্তমানে সর্বত্র সুপরিচিত। তাঁর কথা চতুর্থ খণ্ডে (আধুনিক যুগে) বর্ণিত হবে।

এই সৌম্য মধ্যবয়স্ক সিদ্ধপুরুষের সাধন কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। তারাপীঠে তিনিও দীর্ঘদিন সাধনা করেন। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

১৯৮৫ সালের ১লা নভেম্বর শুক্রবার দুলুঠাকুর এবং তাঁর সাধক ভ্রাতাগণের সহযোগিতায় লেখক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত সেই স্ফটিকের মালা ও নামের ঝুলি তাঁদের ঘরে দর্শন ও স্পর্শ করেন।

তার সাথে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রদত্ত সেই বাণলিঙ্গ কল্পতরু শিবও দর্শন এবং স্পর্শ করেন। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থের জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার পরশধন্য এই দিব্য পবিত্র জিনিষগুলোর ফটো তুলবার অনুমতিও দুলুঠাকুর ও তাঁর সাধক ভ্রাতাগণ দেন এবং লেখকের সাথে থেকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

সুদীর্ঘ পৌনে পাঁচশত বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখককে মহাপীঠ তারাপীঠ গ্রন্থের জন্য তথা জগত কল্যাণের জন্য, এই সুদুর্লভ মহাপ্রভুর স্ফটিকের মালা ও নামের ঝুলি এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বাণলিঙ্গ কল্পতরু শিবের ছবি তুলতে দিয়েছেন তাঁরা। লেখক এজন্য তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

উপরোক্ত কাহিনীর যোগাযোগের ব্যাপারে লেখক কলকাতার রায়বাহাদুর রোড নিবাসী শ্রীদিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বালুরঘাট নিবাসী শ্রীপ্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

ফটো তোলার জন্য লেখক শ্রীপুলক সেনের কাছেও কৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবাম স্নেহধন্যা সিদ্ধ সাধিকা বুড়িমা

উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার মান্দারপর গ্রামে এসেছেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা।

গ্রামের এক ভক্ত বৈষ্ণব হরি কর্মকারের গৃহে এলেন তারাপীঠের সচল ভৈরব বামাক্ষ্যাপা। শ্রীবামকে দেখে হরি কর্মকারের গৃহে ভীড় জমে গেল।

গৃহকর্তা হরি কর্মকার শ্রীবামকে সাধ্যমত অভ্যর্থনা করলেন।

হরিকর্মকারের মন খুবই বিষন্ন।

তাঁর আদরের কন্যা রাজুবালা প্রায় বছর তিনেক পূর্বে বিধবা হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। মাত্র সাত বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছে বালিকা রাজুবালা। গ্রামের রঘুনাথ বাড়ীর কার্তিক কর্মকারের সাথে তিনবছর পূর্বে বিয়ে দিয়েছিলেন রাজুবালাকে। বিয়ের কিছুকাল পরেই সহসা জামাই কার্তিক কর্মকার মারা গেল। মাত্র সাত বছরে বিধবা হ'ল রাজুবালা। এতটুকু মেয়েকে হবিষ্যি করাতে বাবা মায়ের মনপ্রাণ ফেটে যায়। কিন্তু উপায় নেই। কঠিন বৈধব্যের রীতিনীতি সবই পালন করতে হয়।

বিশেষ করে গ্রামের সমাজ ব্যবস্থা বিধবাদের বিষয়ে খুবই কঠিন।

তাই মাত্র সাতবছরের বিধবা বালিকাকেও তা মেনে চলতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বিধবা বালিকা রাজুবালা সবই ঠিক ঠিক পালন করে।

বৈধব্যের কঠিন অনুশাসন যথারীতি সে মেনে চলে। কোন দুঃখ কষ্ট কান্না এজন্য রাজুবালার নেই। বিধির বিধান সে শান্তমনে গ্রহণ করেছে। সবাই বিস্মিত হ'ন বিধবা বালিকা রাজুবালার প্রশান্ত মূর্তি দেখে।

তবু সাতবছরের বিধবা বালিকার আগামী দিনের দীর্ঘ জীবনের কথা ভেবে পিতামাতার মন গভীর দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে।

মাত্র আটবছর তিনমাস বয়সে বিধবা বালিকা রাজুবালা কাঠের মালা ও তিলক ধারণ করলো। তারপর প্রায় দু'বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে ঠাকুরের সেবা ও নিত্যকর্ম এবং সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম সবই পালন করতে লাগলো। রাজুবালা ক্রমে দশ বছরে পড়লো।

এই সময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সহসা হরি কর্মকারের গৃহে পদার্পণ করলেন। সর্বজ্ঞ শ্রীবাম হরি কর্মকারের মনের বেদনা সবই বুঝতে পারলেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা দশবছরের বিধবা বালিকা রাজুবালাকে কোলে তুলে নিয়ে হরি কর্মকারকে বললেন, "বাবা তুমি কেঁদোনা, এই মেয়ে দিয়েই তুমি উদ্ধার হবে।"

তারপর ভক্তিমতী বালিকা রাজুবালাকে আশীর্বাদ করে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা চলে গেলেন। হরি কর্মকারের গৃহে কিছুই খেলেন না।

মাসখানেক বাদে বামাক্ষ্যাপা বাবা আবার 'এলেন ভক্ত হরি কর্মকারের গৃহে। তিনি হরি কর্মকারকে বললেন, "মেয়েটা কৈ?" হরি কর্মকার তাড়াতাড়ি রাজুবালাকে নিয়ে এল। শ্রীবাম রাজুবালাকে আশীর্বাদ করে হরি কর্মকারকে বললেন, "মেয়েটাকে আমায় দাও।" হরি কর্মকার বিনীতভাবে বললেন "বাবা, এই মেয়ে আপনারই। আপনি এর ভার নিন।"

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা প্রসন্ন হলেন। বললেন, "আজ এখানে খাব।"

হরি কর্মকার মহানন্দে আহারের ব্যবস্থা করলেন। বালিকা রাজুবালাও তার মায়ের সাথে রান্নার কাজে সহযোগিতা করলো।

ডাল তরকারী শাক প্রভৃতি দশরকমের রান্না শ্রীবামের সামনে উপস্থিত করা হ'ল।

তারাময় শ্রীবাম সব একত্রে মেখে তারামাকে নিবেদন করলেন। তারপর নিজে কিছু গ্রহণ করলেন। বাকি প্রসাদ উপস্থিত সবাইকে দিলেন।

যাবার পূর্বে রাজুবালাকে আশীর্বাদ করে কিছু সাধন নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

দিন মাস বছর কেটে যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে বিধবা বালিকা রাজুবালা বাল্য ও কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপায় বিধবা যুবতী রাজুবালা আপন মনে সাধনায় রত রয়েছেন।

নানান রকম দিব্য দর্শন ও দিব্য অনুভুতি হয় সাধিকা রাজুবালার।

ঘরে অভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী কিন্তু জগতজননী তারামা ও বামদেবের কৃপায় অদৃশ্যভাবে কারা যেন সব যুগিয়ে যায়।

নানান দেবদেবীর সূক্ষ্মদর্শন হল রাজুবালার। কখনো চণ্ডীদেবীর, কখনো কালী মায়ের কখনো মনসা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া বালগোপালও আছে।

চৈত্রমাস। পূজো করছেন রাজুবালা। পাশে পাশে জগতজননী মা চণ্ডী ঘুরছেন। সহসা মায়ের আঁচলটা তাঁর গায়ে লাগলো। জ্ঞান হারালেন সাধিকা রাজুবালা।

আরেক দিন। রাজুবালা দেবী ভোগ দিচ্ছেন মাকে।

সহসা এক দেবীমূর্তি এসে বললেন, "সাপ দেখবি?"

তাকিয়ে দেখলেন মা নেই। সামনে এক বিশাল গোখরা সাপ। তাঁর দিকে ফণা তুলে রয়েছে। তিনি বুঝলেন মা মনসাদেবী এসেছিলেন।

এমনি ভাবে নানানভাবে নানান রূপে দেবদেবীগণ তাঁর কাছে আসা যাওয়া করেন।

কিন্তু সাধিকা রাজুবালা দেবীর মনে দুঃখ রয়েছে যে মা চণ্ডী বা কালীকে মানবরূপে দেখতে পাচ্ছেন না।

মা যেন খেলা করছেন তাঁর সাথে।

মাঝে মাঝে নানান স্থানে ঘুরে বেড়ান সাধিকা রাজুবালা।

বহু সাধুসঙ্গ ও তীর্থদর্শন ঘটে তাঁর জীবনে। ক্রমে নিবিড় সাধনায় মগ্ন হ'ন দীর্ঘকাল ধরে। অবশেষে লাভ করেন জগতজননীর কৃপা ও দর্শন। সুদীর্ঘ সাধনার পর আপ্তকাম হলেন সিদ্ধসাধিকা রাজুবালা দেবী।

আত্মপ্রচারবিমুখ এই সিদ্ধ সাধিকা দীর্ঘকাল ধরে নীরবে নিভৃতে নিজেকে ঢেকে রাখেন। কিন্তু সুগন্ধ ফুল ফুটলে তার সৌরভ চারদিকে ছড়াবেই।

সিদ্ধসাধিকা রাজুবালা দেবীর মহাসিদ্ধির ফলস্বরূপ তাঁর যোগ-বিভূতির খ্যাতি চারদিকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো।

বহু আর্ত, পীড়িত নরনারী তাঁর কৃপায় নানান দুঃখ কষ্ট রোগ শোক ও বিপদ থেকে অলৌকিক ভাবে মুক্তিলাভ করেন। বহু ভক্ত নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু নাম যশ অর্থের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশবিভাগ হ'ল। তখন এই বৃদ্ধা সাধিকার বয়স চৌষট্টি বছরের ওপর।

দেশবিভাগের পর একটি স্থায়ী আশ্রমের কথা একদিন তিনি তাঁর দেশের বাড়ীতে বসে ভাবছেন। সহসা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপায় তিনি একটি বিশাল প্রাচীন অপরূপ আম গাছ দেখতে পেলেন ভাবনেত্রে।

বৃদ্ধা সিদ্ধসাধিকা রাজুবালা দেবী নিজের ঘরে বসেই জগত-জননীর কৃপায় তাঁর প্রজ্ঞানয়নে শত শত মাইল দূরের মানুষজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পান।

সাধনলব্ধ মহাশক্তির ফলেই এই দূরদর্শন শক্তি লাভ হয়।

সেই শক্তির অধিকারিণী শক্তিময়ী রাজুবালা দেবী। ইতিমধ্যে শিষ্য ভক্তদের কাছে তিনি 'বুড়িমা' নামে সুচিহ্নিতা হয়েছেন।

বুড়িমা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহান আম্রবৃক্ষের ধ্যানে মগ্না হলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন ইষ্টদেবী চণ্ডীদেবী তথা তারামা এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সূক্ষ্ম জ্যোতি মণ্ডিত এই অনন্যসাধারণ "যোগবৃক্ষ"। এই সময় তিনি সহসা দেখলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা যেন বলছেন,

"তুমি চল, আমি যাই।" তারপর ভাবনয়নে দেখতে পেলেন, আগে মা পিছনে জগৎপিতা চলেছেন। সহসা দৈববাণী শুনলেন, "মা'র, পাশে বসে পূজো করবি।"

আবার মানস নয়নে দেখতে পেলেন মহাসৌভাগ্যবতী মহাসাধিকা বুড়িমা সেই যোগবৃক্ষ প্রাচীন আমগাছটিকে।

বিশাল বিরাট গাছ। চারদিকে ডালপাতা এবং অপূর্ব সুন্দর সুন্দর আম হয়ে রয়েছে।

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, মা চণ্ডী এই যোগবৃক্ষে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। তারপর রাজসাহী থেকে ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে এলেন। এই শহরের পূর্ব প্রান্তে এক সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে দেখতে পেলেন এই মনোরম অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যমণ্ডিত যোগবৃক্ষস্বরূপ বিশাল আমগাছটিকে।

এক অদৃশ্য দিব্যশক্তি সিদ্ধসাধিকা বুড়িমাকে যেন পৌঁছে দিয়ে গেল এই অপূর্ব সাধন ক্ষেত্রে। বুড়িমা এই দিব্য স্থানটিতে প্রবেশ করেই এর স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে কোন এক সিদ্ধপুরুষ এই সুপ্রাচীন আম্রবৃক্ষ এনে এখানে স্থাপন করেন অলৌকিক ভাবে।

শোনা যায় মহাপীঠ তারাপীঠ থেকে অলৌকিক ভাবে এই মহান যোগবৃক্ষ এখানে স্থাপিত হয় এক মহাশক্তিধর মহাপুরুষের মাধ্যমে।

সিদ্ধসাধিকা বুড়িমা এই অপূর্ব অধ্যাত্মমণ্ডিত স্থানে তাঁর সাধন-কুটীর ও আশ্রম স্থাপন করলেন।

এই অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যমণ্ডিত যোগবৃক্ষস্বরূপ আম্রবৃক্ষকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে নানান' অলৌকিক ঘটনা। বহু দেবদেবীর আগমন ও ও সূক্ষ্মে বহু মহাত্মার আবির্ভাব ঘটতে থাকে এখানে বুড়িমাকে কেন্দ্র করে।

এই জ্যোতির্ময় ক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্য দেখে বুড়িমা গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং উপলব্ধি করলেন এর গভীর তাৎপর্য।

তিনি এই পরম পবিত্র ক্ষেত্রকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলে অভিহিত করলেন।

শ্যাম শ্যামা এখানে এক হয়ে যে নিত্য লীলা করেন তা বুড়িমা ভাবনয়নে উপলব্ধি করলেন। কিন্তু এই মহান ক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক

ঐশ্বর্যের কথা মা চণ্ডীর তথা মা দূর্গার নিষেধে তিনি কারো কাছে সুদীর্ঘকাল ব্যক্ত করেননি। ১৯৮৫ সালে ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার জগতজননী মা চণ্ডীর আদেশ পেয়ে সর্বপ্রথম তিনি এই লেখককে বলেন জগতের কল্যাণের জন্য। এই দিব্য পবিত্র আমগাছের গোড়া থেকে মাটি তুলে বুড়িমা সবাইকে দেন এবং এই মাটি খেয়ে সর্বরোগ নাশ হয়। এই মাটি সর্বরোগহর।

অনেককে বুড়িমা এই পবিত্র মাটি দিয়ে কবচ করে দেন। সেই কবচ ধারণ করে বহু রোগ ও বিপদ আপদ কেটে যায়।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই মাটি বিতরণ করে চলেছেন বুড়িমা। কত সহস্র সহস্র নরনারী যে এই মাটির গুণে রোগমুক্ত ও বিপদ মুক্ত হয়েছেন তার সংখ্যা নেই।

বুড়িমা এইখানে তাঁর সাধনকুটীর নির্মাণ করে তাঁর ঐশী নির্দিষ্ট লীলা চালিয়ে যেতে থাকেন।

এই সাধনকুটীর তথা আশ্রমে যে কত কি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। বুড়িমা প্রতি বছর এই আশ্রমে অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা করেন এবং চৈত্রমাসে মা চণ্ডী তথা দূর্গাপূজা করেন। এই দু'টি পূজা বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

বুড়িমার এই দু'টো মহাপূজা কিন্তু অলৌকিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মহান সিদ্ধসাধিকা বুড়িমার এই পূজার মন্ত্র হ'ল বুড়িমার প্রাণভরা কান্না। এই দিব্য অশ্রুর মধ্য দিয়েই বুড়িমার পূজা ও ভোগ নিবেদন হয়ে যায়।

বুড়িমার নিজের হাতে রান্না করা খিঁচুড়িভোগও একটি অলৌকিক ব্যাপার। শুধু ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরিয়ে বুড়িমা একটি লোহার কড়াইয়ে যথাক্রমে খিঁচুড়ি, তরকারী ও পায়েস রান্না করে ভোগ দেন। ভোগ শেষে একটি কলারপাতা দিয়ে ঢেকে রাখেন ঐ সামান্য ভোগ (সোয়াসের চালডালের খিঁচুড়ি, সামান্য তরকারী ও পায়েস)। তারপর এক পাশ থেকে তুলে নিয়ে সমাগত শত শত ভক্ত নর-নারীকে পেট ভরিয়ে খাইয়ে দেন। অনেককে বাড়ীর জন্যও দিয়ে দেন প্রচুর পরিমাণে।

সবার খাওয়া শেষে দেখা গেল বুড়িমা প্রথম যতটুকু ভোগ রান্না করেছিলেন, ঠিক ততটুকুই ভোগ রয়েছে। সবার শেষে বুড়িমা নিজে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

পূজার সময় বুড়িমার চেহারাও এক ঐশ্বরিক শক্তিতে অন্যরকম হয়ে যায়।

১৯৮৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা করছেন বুড়িমা। শতাধিক বছর বয়সা বুড়িমা ইদানিং চোখে ভাল দেখেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সেই অবস্থায় ভোগ রান্না নিজেই সব করলেন।

কালীপূজোর সময় একশো আট প্রদীপ জ্বেলে দেয়া হ'ল। যথারীতি প্রাণ ভরে কাঁদতে কাঁদতে পূজো সমাপ্ত করলেন বুড়িমা। এই বুক ভরা আনন্দের অশ্রুই হ'ল বুড়িমার মন্ত্র।

১৯৮৪ সালের বাসন্তীপূজায় একটি আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঘটে।

বুড়িমা যথারীতি ঘুঁটে জ্বালিয়ে ভোগ রান্না করলেন। তারপর মা দুর্গার পায়ের ওপর পড়ে প্রচণ্ড কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘক্ষণ কান্নার পর বুড়িমা কান্না থামিয়ে মা দুর্গার মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন জনৈক ভক্তকে, "মা'র পূজো হয়ে গেছে। প্রসাদ দিয়ে দে।"

একটু পরে বুড়িমা'র সামনে উপস্থিত তাঁর এক ভক্ত মেয়ে শ্রীমতী রাখী চট্টোপাধ্যায়কে বুড়িমা বললেন, "আমি তো চোখে দেখি না। শাক দেয়া হয়নি, মা আমাকে ভীষণ বকছিলেন।"

বুড়িমার কথা শুনে রাখী স্তম্ভিত হ'ল।

বুড়িমার এই সাধনকুটীর তথা এই পবিত্র আশ্রমে তারামা, মা চণ্ডী, মা কালী ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অফুরন্ত অলৌকিক লীলা সকল সূক্ষ্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রীষ্মকালে একদিন বুড়িমা বসে আছেন। সহসা এক নারীমূর্তী এলেন। লাল চওড়াপেড়ে কাপড় পরিধানে। হাতে শাঁখা। মাথা থেকে জটা নেমে এসেছে। বললেন, "আমাকে পান দে।"

বুড়িমা পান দিলেন। পানের মধ্যে মুসুরির ডাল ছিল। সেই অপূর্ব মাতৃমূর্তি বললেন, 'পানের মধ্যে মুসুরির ডাল দিলে আমায়?'

বুড়িমা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তাহলে বেছে খাও।"

তখন সেই মূর্তি বললেন, "কে আমি জান?" তারপর আসল রূপ দেখালেন। বুড়িমা সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

আরেকদিন একটি অপূর্ব দেবীমূর্তি এলেন। বুড়িমাকে বললেন, "দু'আনা দাও।"

বুড়িমা তাঁর সাধনকুটীরের ভেতরে গিয়ে কৌটার মধ্যে দেখলেন মাত্র একটি পয়সা আছে। তাই দিতে গেলেন। সহসা দেখলেন সেই দেবীমূর্তি অদৃশ্য। শুধু দু'খানা শাঁখাভর্তি হাত তাঁর সামনে। এমনিভাবে কতভাবে যে জগতজননী খেলা করেছেন তাঁর সাথে তার হিসেব নেই।

বুড়িমা অসাধারণ যোগবিভুতি লাভ করেও অর্থ মান যশের দিকে কখনো তাকান নি। তাই সারাজীবন কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটালেন। যেটুকু নিতান্ত দরকার, জগতজননী মা চণ্ডী ঠিক তা যুগিয়ে দেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই যুগিয়ে দেয়াটাও অনেক সময় অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

একদিন বুড়িমা ভোগ রান্নার জন্য ঘরে অন্য কিছু না থাকায় নিকট এক প্রতিবেশীর সরষের ক্ষেত থেকে চারটি কচি সরষে শাক নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে ক্ষেতের মালিকের বউ তা জানতে পেরে বুড়িমাকে এসে বকাবকি করতে থাকে। বুড়িমা তখন বললেন, "আমার সাথে এভাবে কথা বোল না। ঠিক আছে শাক নিয়ে যাও।" শাক নিয়ে মালিকের বৌ চলে গেল।

পরের দিন সকালে বুড়িমা মায়ের দরজা খুলে দেখেন মা চণ্ডীর ঘরে স্তুপাকার সরষে শাক। মায়ের মুখে গায়ে পর্যন্ত সরষে লেগে রয়েছে। এদিকে সেই ক্ষেতের মালিকের ঘরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বুড়িমা গিয়ে শুনলেন যে ওরা হাহাকার করে বলছে যে চোরে সব সরষেশাক কেটে নিয়ে গেছে।

বুড়িমা বুঝলেন যে মায়েরই সব কীর্তি। ওঁদের শাস্তি দেবার জন্যই মা চণ্ডী এ কাজ করেছেন। গতদিন বুড়িমাকে অপমান করবার জন্য এই শাস্তি। তখন তিনি ওদের কাছে গিয়ে সব বললেন। আরো বললেন, "দেখ্ তোদের খুব খারাপ সময় আসছে। শিঘ্রই মাকে পূজো দিয়ে আয়।"

তখন ওরা ভয় পেয়ে পূজার উপাচারসহ এগারটা ঢাক বাজিয়ে মা চণ্ডীকে পূজো দিয়ে, তারপর শান্তি পায়।

বুড়ীমার এই আশ্রমে পূজো দিতে দূর দূরান্তর থেকে অনেকে আসেন। অনেকের মানসিক থাকে। পূরণ হ'বার পরে পূজো দিয়ে

যায়। যদি কেউ মানসিক করে তখন থানের নীচে পূজো হয় ও তারপর বিসর্জন হয়।

শুধু বালুরঘাট নয়, অদূরবর্তী তপন থেকে, বাসন্তী থেকে ও পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে পূজো দিতে আসেন ভক্ত নরনারীগণ। বুড়িমা কোনদিন শ্মশানে যান নি। ঘরে বসে সাধনা করেই সব পেয়েছেন। বুড়িমা বিগত আশী বছর ধরে স্নান করেন না। এটি বুড়িমার বহু অলৌকিক শক্তির মধ্যে অন্যতম। লোকে একদিন স্নান না করে থাকতে অস্বস্তি বোধ করে অথচ শতাধিক বছর বয়স্কা সিদ্ধসাধিকা বুড়িমা বিগত সুদীর্ঘ আশীবছর ধরে স্নান করেন না। অথচ ফর্সা ধবধবে তাঁর গায়ের রং। শরীরে কোন ময়লা নেই। পরিস্কার উজ্জ্বল তাঁর দেহের কান্তি। বরং অনেক সময় তাঁর সিদ্ধ দেহ থেকে কখনো চন্দনের গন্ধ, কখনো পদ্মগন্ধ বের হয়।

একদিন বুড়িমা তাঁর সাধনকুটীরে বসে আছেন। সহসা দেখলেন দু'টি অপরূপ দেবীমূর্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। বুড়িমা বুঝলেন, মা চণ্ডী তথা দূর্গা এখানে সর্বক্ষণ অধিষ্ঠিতা রয়েছেন।

আরেকদিন দু'খানা চরণ পড়েছিল। বুড়িমা তা ঢেকে রাখেন।

১৯৮৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে বুড়িমা তাঁর সাধনকুটীরে বসে লেখককে এ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন। শেষে বললেন, "বাবা এটা নিগূঢ় লীলা। প্রথম তোমাকে বললাম।"

বুড়িমা আরো বলেন, "বামাক্ষ্যাপা বাবা এখানে সর্বক্ষণ বিরাজিত। সেই এসে আমাকে প্রয়োজনের সময় উদ্ধার করেন। কখনো আমার হয়ে মাকে বকেন। একদিন আমাকে অশেষ কষ্ট পেতে দেখে বললেন, "তোকে লাথি মারবো।"

আমি জানি বাবার তিরস্কারও আমার পক্ষে পরম আশীর্বাদ। তাঁর কৃপাতেই আমার যা কিছু হয়েছে।"

বুড়িমার সাধনকুটীর আর মায়ের মন্দিরের মধ্যে সেই মহা পবিত্র আম্রবৃক্ষ বিরাজমান।

এই দিব্য আম্রবৃক্ষ সম্পর্কে বুড়িমা বলেন লেখককে, "এই আম গাছের ভেতর একটা বিরাট ঐশ্বরিক শক্তি আছে। আর কিছু এখন

বলবো না। তাহলে দেহ চলে যাবে। যাবার সময় বলে যাব গাছটা কি জিনিষ। বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। নিষেধ আছে। যাবার সময় তোমাকে সব বলে যাব।"

একবার এই দিব্য পবিত্র আম্রবৃক্ষে একটি তরুণ ছেলে আম পাড়তে উঠেছিল না বলে। সহসা ছেলেটা গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। সেই থেকে আর কেউ এই আমগাছে ওঠে না। আম আপনা থেকে মাটীতে ঝরে পড়লে তবে লোকে কুড়িয়ে নেয়।

বুড়িমার জীবনাদর্শ অপূর্ব সুন্দর ও অনাড়ম্বর। শতাধিক বছর বয়স্কা এই মহান সিদ্ধসাধিকা বুড়িমা বলেন, "মা যে কি জিনিষ তা আজো বুঝতে পারলাম না। চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এই অতি দুর্ল্লভ মানব জন্ম।

সেই চুরাশিলক্ষ পশুযোনির কথা যদি মনে রাখতে না পারি তবে মানুষ জন্ম নিয়ে কি লাভ হ'ল?

তাই আমি শুধু মাকে চাই। আমি প্রচার চাইনে।"

বুড়িমা আরো বলেন, "শব্দ হ'ল ব্রহ্ম। তাই প্রত্যেকের বাক্য রক্ষা করা সাধ্যমত উচিত।

আমি যদি বলি এটা ত্যাগ করবো। তবে তখনি তা ত্যাগ করি। সত্যই হ'ল মা। তাই মা যা বলেন তাই বলি।

মায়ের কৃপায় নাম প্রচারের জন্য অর্থ ও যশের জন্য কাঙ্গাল নই।"

১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি বুড়িমা বাংলাদেশে রংপুরে যান ভক্তদের আগ্রহে। সেখানে প্রায় মাস তিনেক অতিবাহিত করে বুড়িমা বালুর-ঘাটে তাঁর আশ্রমে ফিরে আসেন।

বুড়িমা প্রতি বছর কালীপূজা ও বাসন্তীপূজায় নতুন মূর্তি দিয়ে পূজো করেন। এক মূর্তি পূজা হয়ে বিসর্জন হ'বার পর, পরের বছর নতুন মূর্তি না আসা পর্যন্ত মায়ের মন্দিরে থাকেন।

ফলে বুড়িমার মন্দিরে সারা বছরই কালীমূর্তি ও দুর্গামূর্তি থাকেন।

বুড়িমা'র দু'টো বিচিত্র বেড়াল আছে। একটি সাদা একটি কালো। সাদা বিড়ালটি একাধারে বুড়িমার সেবক ও পাহারাদার।

একদিন বুড়িমার কাছে বালুরঘাটের সেই ভক্তিমতী মেয়ে রাখী চট্টোপাধ্যায় এল। রাখীর বাবা, মা ভাই বোন সবাই বুড়িমার

ভক্ত ও শরণাগত। বুড়িমা এই পরিবারকে বহুবার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

রাখী বুড়িমা'র ঘরে ঢুকে দেখে বুড়িমা প্রচণ্ড অসুস্থা। জ্বর ও মাথা ব্যাথা ভীষণ।

বুড়িমা রাখীকে বললেন একটু মাথা টিপে দিতে। রাখী বুড়িমার মাথা সযত্নে টিপতে লাগলো। এমনি সময় সাদা বিড়ালটি ঘরে ঢুকে রাখীকে এসে ঠেলতে লাগলো এবং ম্যাও ম্যাও করতে লাগলো। বুড়িমা তখন রাখীকে বললেন, "ও আমার মাথা টেপে, পা টেপে। তোকে ওর সেবার ভাগ দিতে চায়না। তুই সরে আয়।" রাখী সরে এসে অবাক হয়ে দেখলো যে বেড়ালটা সামনের দু'টো থাবা দিয়ে সুন্দর ভাবে বুড়িমার প্রথমে মাথা টিপলো তারপর পা টিপলো।

একটু পরে বুড়িমা বললেন বেড়ালটাকে, "তোর জন্য দুধভাত মাখা আছে যা খা গিয়ে।" বেড়ালটি খাট থেকে নেমে দুধ ভাত মাখা বাটীর কাছে গিয়ে ম্যাও ম্যাও করলো। বুড়িমা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ খা, মায়ের প্রসাদ, তোর জন্যই রেখেছি।" বিড়াল এবার শান্ত চিত্তে প্রসাদ খেতে লাগলো।

বেড়ালের এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে রাখী স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুড়িমা তখন মৃদু হেসে বললেন, "এটা মায়ের বেড়াল।"

শতাধিক বছর বয়স্কা সিদ্ধসাধিকা বুড়িমার জীবন আজো এক রহস্যময় অলৌকিকতায় ঘেরা।

দেশবিদেশে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত শিষ্যদের সম্পর্কে তাঁর যে মহান বাণী, তা অনুধাবন করলে তাঁর অসীম অলৌকিক শক্তির পরিচয় মেলে।

সবার উদ্দেশ্যে বুড়িমা বলেন, "কোন চিন্তা কোরোনা। যখনি ডাকবে তখনি আমাকে পাবে। মাকে পাও বা না পাও আমাকে পাবে। তখনি বুঝবে আমি কে, মা কে। তবু আমি মাকে বলি, মা তোমাকেই চিনুক। তোমার সাথেই আগে সম্পর্ক হোক।" বুড়িমা'র এই মহাবাণী মহাআশ্বাস মনে করিয়ে দেয় দেবমানব লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সেই পরম আশ্বাস বাণীকে।

জগত কল্যাণে শতাধিক বছর বয়স্কা মহাসাধিকা বুড়িমা'র এই মহান উদার বাণী ভারতীয় সাধনার অপার ঐশ্বর্যকেই যেন নবরূপে প্রকাশ করছে। বুড়িমার আরেকটি মহাবাণীও চিরস্মরণীয়।

তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেছেন, "যখনি ঘর থেকে বের হবে, তখন, "দোহাই মা চণ্ডী" বলে বের হবে।

দেখবে সেদিন কোন বিপদ আপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। মা চণ্ডী স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করবেন।"

স্মরণীয় ১৯৮৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে বুড়িমার আশ্রমে বসে লেখক এই শতাধিক বছর বয়স্কা মহাসিদ্ধ সাধিকা বুড়িমার কাছ থেকে উপরোক্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। উপরোক্ত কাহিনীর সংযোগের ব্যাপারে বালুরঘাট নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রণব কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী গীতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং কন্যা শ্রীমতী রাখী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া লেখক ফটো তোলার জন্য শ্রীপুলক সেনের কাছেও কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি মহান সিদ্ধসাধিকা, শতাব্দী অতিক্রান্তা করুণাময়ী বুড়িমার অফুরন্ত স্নেহ প্রেম ও উদারতাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি, যিনি এই লেখকের ন্যায় একজন অতি সাধারণ গৃহীকে তাঁর কথিত এই মহা দিব্য পবিত্র ও 'গুপ্তবৃন্দাবন' স্বরূপ মহাক্ষেত্রে এসে আশ্রম স্থাপন করতে বলেছেন এবং এখানকার সকল ভার গ্রহণ করতে আন্তরিক অনুরোধ করেছেন। এ যেন "অমানীকে মান দেয়া" বৈষ্ণব ধর্মের সেই মহাবাক্যের একটি প্রত্যক্ষরূপ।

তাই পরমাবৈষ্ণবী ব্রহ্মময়ী তারামা'র কৃপাধন্যা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্নেহধন্যা মহাসাধিকা বুড়িমাও লেখকের ন্যায় একজন সার্বিক অযোগ্য লোককে যোগ্য মনে করে সেই আপ্ত বাক্য পালন করলেন। আসলে অমানী লেখককে অহেতুক মানী করে বুড়িমা তাঁর করুণার মহাসমুদ্রকেই সর্বতোভাবে প্রকাশ করলেন।

সিন্ধু যদি বিন্দুকে মান দেয় তবে সেই মান সিন্ধুর-ই হয়, বিন্দুর নয়।

করুণার মহাসিন্ধু বুড়িমা এই শাশ্বত সত্যেরই নিত্য প্রাণবন্ত বিগ্রহ।

—০—

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মধ্যলীলা সমাপ্ত।

[দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত]

গ্রন্থপঞ্জী

১। তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ (১—৩ খণ্ড)—প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। বামাক্ষ্যাপার জীবনী ও জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩। বামলীলা—শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪। মায়ের কৃপা—স্বামী নিগমানন্দ

৫। বামদেব দর্শন—ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দতীর্থাবধূত

৬। তারা—শিক্ষক মহিমাচরণ

৭। বামাক্ষ্যাপা—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৮। তারাপীঠ মাহাত্ম্য—যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা

৯। তারাপীঠ ভৈরব—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। ভারতের সাধক (১ম, ৪র্থ ও ১১শ খণ্ড)—শঙ্করনাথ রায়

১১। তারাতীর্থ তারাপীঠ—গুরুপদ পাণ্ডা

১২। পুণ্যতীর্থ তারাপীঠ—তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। তারাচরণ বামাচরণ—শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

১৪। পরমহংস মহানন্দগিরি—সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫। হিমারণ্য—রামকুমার বিদ্যারত্ন

১৬। হিমালয়ের পথে মানস সরোবর ও কৈলাস—প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৭। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা—(১ম ও ২য় খণ্ড)—গুরুপ্রিয়াদেবী

১৮। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)—গঙ্গেশ চক্রবর্তী

১৯। নীলকণ্ঠ হিমালয়—অবধূত

২০। বাংলার সাধক (৪র্থ খণ্ড)—গঙ্গেশ চক্রবর্তী

২১। বৃহৎ তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

২২। তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

২৩। তারা রহস্য—পরমহংস ব্রহ্মানন্দগিরি অবধূত

২৪। মহাবিদ্যাতন্ত্রম্ (তারাখণ্ড)—সঙ্কলন

২৫। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র—নাগভট্ট

২৬। গুপ্তচীনাচারক্রমতন্ত্র— সঙ্কলন
২৭। মহাচীনাক্রম তন্ত্র — ”
২৮। গুপ্ত সাধনতন্ত্র — ”
২৯। মহানির্বানতন্ত্র — ”
৩০। তারাতন্ত্র — ”
৩১। তারা নিগম — ”
৩২। আকাশ সংহিতা — ”
৩৩। প্রপঞ্চসার তন্ত্র — ”
৩৪। দেবী ভাগবত — ”
৩৫। প্রাণতোষণীতন্ত্র — ”
৩৬। পীঠমালা তন্ত্র — ”
৩৭। বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র — ”
৩৮। নারদ পঞ্চরাত্র — ”
৩৯। রুদ্রযামল তন্ত্র — ”
৪০। শিবচরিত — ”
৪১। হেবজ্রতন্ত্র — ”
৪২ যোগিনীতন্ত্র — ”
৪৩। পীঠনির্ণয় তন্ত্র — ”
৪৪। কালিকাপুরাণ — ”
৪৫। কুব্জিকাতন্ত্র — ”
৪৬। নীলতন্ত্র — ”
৪৭। মায়াতন্ত্র — ”
৪৮। জ্ঞানার্ণবতন্ত্র — ”
৪৯। তন্ত্রচূড়ামণি — ”
৫০। শক্তিমঙ্গল তন্ত্র — ”
৫১। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী — ”
৫২। অন্নদামঙ্গল—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র
৫৩। অষ্টাদশ পীঠ বর্ণনা—শঙ্করাচার্য
৫৪। মনসামঙ্গল—বি প্রদাস
৫৫। কুলার্ণবতন্ত্র—সঙ্কলন
৫৬। বাংলাভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
৫৭। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু

৫৮। তন্ত্রোক্ত কুলাচার—শ্রীশঙ্করতীর্থ জিউ মহারাজ
৫৯। শৈবদর্শন— ”
৬০। শিবপুরাণ— ”
৬১। বেদ—(সাম, ঋক, যজু ও অথর্ববেদ)
৬২। উপনিষদ মালা (কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, ছান্দ্যোগ্য, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি)
৬৩। শাক্ত উপনিষদ —
৬৪। মনুসংহিতা –
৬৫। অক্ষোভ্য সংহিতা—
৬৬। ব্রহ্মসূত্র—শঙ্করাচার্য্য
৬৭। উত্তর মীমাংসা—বেদব্যাস
৬৮। সাংখ্যযোগ—মহর্ষি কপিল
৬৯। যোগসূত্রম্—পতঞ্জলী
৭০। হঠযোগ দীপিকা—সঙ্কলন
৭১। রাজযোগ— ”
৭২। ক্রিয়াযোগ— ”
৭৩। পুরাণ ও বিজ্ঞান—প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী
৭৪। জপসূত্রম্— ”
৭৫। গীতা—নিগু´নানন্দ ব্রহ্মচারী
৭৬। প্রণব গীতা—শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭৭। শ্রীশ্রী চণ্ডী—যোগেশ ব্রহ্মচারী
৭৮। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—
৭৯। মহাভারতম্—বেদব্যাস
৮০। আচারঙ্গ সূত্র—
৮১। ত্রিপিটক—
৮২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৮৩। শ্রীমদ্ভগবত—
৮৪। স্বয়ংবেদন—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
৮৫। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (চার খণ্ড)— ”
৮৬। সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা—অঘোর চট্টোপাধ্যায়
৮৭। মৃত্যু ও মুক্তি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৮৮। মরণের পরে—স্বামী অভেদানন্দ

৮৯। তিব্বতের পথে স্বামী অখণ্ডানন্দ—উদ্বোধন

৯০। তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ— "

৯১। মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে—নিগমানন্দ

৯২। The Bible—

৯৩। The Life Divine—By Sri Aurobindo

৯৪। An Outobiography of a yogi—By Swami Yogananda

৯৫। Book of Daily thoughts and Prayers—By Swami Paramananda

৯৬। One life pilgramage—Srimati Gayatri Debi

৯৭। SAI AVATAR--By C. L. Gandhi

৯৮। Temple of Birbhum—By Sukhamay Bondopadhya

৯৯। দেবভূমি বক্রেশ্বর—প্রেমদাস তীর্থঙ্কর

১০০। বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি—দেবকুমার চক্রবর্তী

১০১। দেখা হয় নাই—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০২। সিদ্ধজীবনী—(লোকনাথ ব্রহ্মচারী)—ব্রহ্মানন্দ ভারতী

১০৩। সাধক কমলাকান্ত—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১০৪। সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ

১০৫। মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবনী ও বাণী—রমেন গুপ্ত

১০৬। কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা—নিধুলাল ভট্টাচার্য্য

১০৭। ভক্তমাল—দেবসাহিত্য কুটীর

১০৮। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১—৫ম খণ্ড)—শ্রীম

১০৯। শ্রীশ্রীমায়ের কথা (১—২ খণ্ড)—উদ্বোধন

১১০। শ্রীম দর্শন (১—২ খণ্ড)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

১১১। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মাহাত্ম ও তীর্থ পরিক্রমা—ব্রহ্মচারী শান্তি প্রকাশ

১১২। কামাক্ষ্যাতীর্থ—ধরণীকান্ত দেববর্মা

১১৩। ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বামী নিগমানন্দ—শ্রীমতী লেজল রেঁমা

১১৪। কর্মযোগী বহেরা বাবা—সপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ চক্রবর্তী

১১৫। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

১১৬। আপনারজন—স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

১১৭। শ্রীশ্রীরামঠাকুর—(শতবার্ষিকী সঙ্কলন)

১১৮। শ্রীশ্রীযোগানন্দ ভারতী (১০৮ মৌনীবাবা)—চরণদাস

১১৯। হরি যাকে রাখেন—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২০। শেরপাদের দেশে—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১২১। শ্রীশ্রীপাগল যোগানন্দ বাবা—চিত্তপ্রিয় রায়

১২২। Gita a great classic contemplation—By Dr. Radhakamal Mukherjee

১২৩। যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছি—সুদীন কুমার মিত্র

১২৪। দশমাতৃকা— ,,

১২৫। সাধু সন্তের মহাসঙ্গমে—শঙ্করনাথ রায়

১২৬। শ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত—স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

১২৭। উত্তর হিমালয় চরিত—প্রবোধ সান্যাল

১২৮। ত্রয়ী—বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য

১২৯। একটুখানি পরিচয়—কীর্তনসভা

১৩০। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন—ভূপতিরঞ্জন দাস

১৩১। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—অলকা চট্টোপাধ্যায়

১৩২। তীর্থপথিক মহাপ্রভু চৈতন্য ভূপতিরঞ্জন দাস

১৩৩। তিব্বতে সওয়া বছর—রাহুল সংকৃত্যায়ন।

১৩৪। চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস

—o—

পত্র-পত্রিকা

১। শিবম—(শ্রীশ্রীভোলাগিরি আশ্রম, কলিকাতা-২০)
২। উদ্বোধন—(মাতৃমন্দির, উদ্বোধন লেন, কলি-৩)
৩। ভাবমুখে—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, কলি-৩৬)
৪। অপাবৃণু—(শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, কলি-৩২)
৫। প্রণব –(ভারতসেবাশ্রম সংঘ, কলি-১৯)
৬। যুগান্তর—(ধর্মকর্ম)
৭। উল্টোরথ—(শ্রীশ্রী আনন্দময়ীমা সংখ্যা)
৮। পরিবর্তন—(ধর্ম)
৯। বিল্বদল—(শ্রীভূপেন্দ্র সান্যালের জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা)
১০। ভক্ত ও ভক্তি—(মৌনীবাবার আশ্রম, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ)
১১। ঢাকুরিয়া কালীবাড়ী –(রজত জয়ন্তী সংখ্যা)
১২। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা—(আনন্দ আশ্রম, বিডন স্ট্রিট, কলি-৬)
১৩। স্মরণিকা—(সত্যানন্দ দেবায়তন, কলি-৩২)
১৪। প্রেমপ্রবাহ—(প্রেমমন্দির আশ্রম, রিষড়া, হুগলী)
১৫। মাতৃবাণী—(মাতৃসংঘ, কলি-২০)
১৬। শৃণ্বন্তু—(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)

—o—

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

১। স্রষ্টা জানেন সৃষ্টি তাঁর অনন্ত নয় (কাব্যগ্রন্থ)

এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য—

(ক) "কবিতাগুলিতে সহজ সরল ভাষায়, ভাবের প্রকাশ ভঙ্গিতে, সত্যকার কবিদৃষ্টিতে ও আন্তরিকতায় মনবর্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতি আধুনিকতার উগ্রতা না থাকায় বইটি সুখপাঠ্য হইয়াছে"...

—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(খ) "কবিতাগুলিতে কবি মন ও কবি সত্তার এক স্নিগ্ধশান্ত শুচিশুভ্র ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছে। কবি প্রতিভার আলো রয়েছে দীপ্ত হয়ে।"...

—যুগান্তর

(গ) "অধ্যাত্মভাব ধারায় পরিপুষ্ট এই নিটোল কাব্যগ্রন্থখানি।"

—আকাশবাণী

(ঘ) "কবির লেখার স্টাইলটা যেন শ্রীঅরবিন্দের মত। চমৎকার কবির "তুমি আমি মিলে শুধু আমি। অথবা আমিই তুমি।"

"কবি একজন আর্টিস্ট। স্টাইল তাঁর ধাতে রয়েছে। অতএব তিনি ধন্য।"...

—শিল্পাচার্য প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—বার টাকা।

২। ততঃকিম্—(একাঙ্ক নাটক)—

ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে একাঙ্ক নাটক। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত।

বালরঘাট শিল্পীসংঘ কর্তৃক অভিনীত এবং পশ্চিমবঙ্গে একাধিক মঞ্চে সাফল্যের সাথে অভিনীত।

ততঃকিম নাটক সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য—

(ক) "নাটিকাটির বিষয়বস্তু যেমনি অভিনব, তার জীবনদর্শনও তেমনি সত্য ও সুন্দর।...

...চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতের বিশ্লেষণ গভীর। রচনা কৌশল মনোজ্ঞ।"

—ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
(প্রাক্তন উপাচার্য্য, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)

(খ) "বেশ একটা চমক। নাটিকাতে শুধু কল্পনা নয়, আছে ভাবনা, আছে চিন্তা, আছে জীবন দর্শন।" .

—মন্মথ রায়

(গ) "রোমান্টিকতাকে বাস্তবতায় ফেলে উপভোগ্য রসের সৃষ্টি করেছেন এই তরুণ নাট্যকার। এতে জীবনের পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ পেয়েছে।. .সাহিত্যের চরিত্র নাটকে এনে তার পূর্ণ মূল্যায়নে নাট্যকার অভিনব রসের সৃষ্টি করেছেন। নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাই।..."

—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) "নাটিকাটির মধ্যে জীবনের পূর্ণাঙ্গ আভাষ পাওয়া যায়। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন। এর বক্তব্য চিরন্তন। হাজার বছর পরেও এর মূল্য একই থাকবে।"...

—ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

মূল্য—সাত টাকা

৩। চলছে চলবে—(আত্মহত্যা, অষ্টগ্রহ সম্মেলন, ফলশয্যার রাতে, একটি গল্পের মৃত্যু—এই চারটি একাঙ্ক নাটকের সঙ্কলন)

মূল্য—দশ টাকা

বেতারে ও মঞ্চে একাধিকবার সঅভিনীত। বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

(ক) আত্মহত্যা নাটক সম্পর্কে একটি মন্তব্য—

"'বিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত, থিয়েটার সেন্টারে অভিনীত আত্মহত্যা নাটকটি চলমান সমাজ ব্যবস্থার ওপর অম্লমধুর চাবুকাঘাতে নাট্যকার অনেক সাহসী বক্তব্য হাজির করেছেন। সংলাপের

সরস অথচ সতেজ গতি নাটককে প্রাণবন্ত করেছে। স্যাটায়ারধর্মী নাটক হিসাবে এ নাটকের স্বীকৃতি অনিবার্য।" --যুগান্তর

(খ) 'ফুলশয্যার রাতে' (একাঙ্কিকা নাট্য কৌতুকী)—

বেতারে অভিনীত (৩০,৭,১৯৭২) ও উচ্চ প্রশংসিত।

(গ) 'একটি গল্পের মৃত্যু'—সম্পর্কে একটি মন্তব্য—

"একটি গল্পের মৃত্যু নাটকটি এক আশ্চর্য্য গভীর মননশীল নাটক। যা ইদানিংকালে দেখা যায় না। মৃত্যু শুধু প্রাণী বা মানুষেরই হয়না, মৃত্যু গল্পেরও হয়। লেখকের আদর্শ ও অনুভূতির মৃত্যু তো তাঁর মানসসৃষ্টি গল্পেরই মৃত্যু। একটি মনোরম রূপকের মধ্য দিয়ে গল্পের স্রষ্টা লেখক কি ভাবে দারিদ্র্যের কাছে তাঁর আদর্শের মৃত্যু ঘটালেন, তাই নিয়ে এই ইঙ্গিতধর্মী নাটক। নাটকের কাহিনী অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, সংলাপ সরস ও গতিশীল। সিনেমার এক গল্প লেখককে কেন্দ্র করেই এই আশ্চর্য নাটক। মঞ্চরথ কর্তৃক থিয়েটার সেন্টারে এই নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়।" —রূপমঞ্চ

(ঘ) অষ্টগ্রহ সম্মেলন—একটি মন্তব্য---

"মহাকাশে অষ্টগ্রহ সম্মেলনের প্রভাব পৃথিবীর ওপর এসেপড়েছে। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রতীক হিসাবে রয়েছে এই গ্রহগণ। যুদ্ধ ও শান্তির দ্বন্দ্বে তাই পৃথিবী আজ মুখর। নাটকটি প্রতীক ধর্মী। বক্তব্য অভিনব। প্রতিটি চরিত্র এক একটি গ্রহের প্রতীক। বিশ্বশান্তির জন্য নাটকটির প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।" —চিত্রবাণী

লেখকের আসন্ন প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

১। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিশাল অন্তলীলা। চতুর্থ খণ্ডে আছে তারাপীঠের আধুনিক রূপ রেখা ও বহু সাধকসাধিকার জীবনী

মূল্য প্রতিখণ্ড পয়তাল্লিশ টাকা

২। 'অলৌকিক লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-স্বামীজী'

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যুগজননী সারদা ও যুগজ্যোতি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের বিশাল জীবন লীলায় অজস্র অলৌকিকলীলা ঘটিয়েছেন। কখনো নিভৃতে কখনো প্রকাশ্যে। তারই মহাবিস্ময়কর দিব্য কাহিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও স্বামীজীর সমসাময়িক বহু প্রাচীন সাধক সাধিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই মহাগ্রন্থের এক বিশিষ্ট সম্পদ। লেখকের কাছে তাঁরা সানন্দে বর্ণনা করেছেন ঠাকুর শ্রীমা ও স্বামীজীর এই দিব্য অলৌকিক লীলাসকল। এই মহাগ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের দিব্যলীলার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। মূল্য—চল্লিশ টাকা

৩। সাধুসান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘজীবনে ভারতের বহু সাধু-সন্তের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। ভারতের এই মহান ঋষিকবির গভীর অধ্যাত্ম চেতনা ছিল সকল সংস্কারের ঊর্দ্ধে।

তাই ভারতীয় সাধনার সকল বিশিষ্ট পথের মহান সাধক সাধিকার নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি বার বার এসেছেন। নিরাকার ব্রহ্মবাদী হয়েও তিনি সাকারবাদী শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য সৌর প্রভৃতি ভাব সাধনার পথের পথিকদের সান্নিধ্যে সাগ্রহে এসেছেন। তাছাড়া ভারতীয় যোগী ও মরমিয়া বাউল সাধকদের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় একাত্মতা। তার দিব্য প্রভাব পড়েছে বিশ্বকবির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তার ফলে তিনি আরো গভীর ভাবে পরিপুষ্ট করেছেন তাঁর অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম অনুভূতি ও দিব্য উপলব্ধিকে। যা তাঁর লেখায়, রেখায় ও সঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়েছে। এই বিস্ময়কর গ্রন্থ ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের মহান সাহিত্য, সঙ্গীত, জীবনদর্শন ও অধ্যাত্ম চেতনার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত স্বরূপ।

মূল্য—তিরিশ টাকা

লেখকের পরবর্তী গ্রন্থরাজি

১। পূর্ণকুম্ভের অমৃতপথে

দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দেবভূমি হরিদ্বার এবং পরম পুণ্য ভূমি প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভমেলার পবিত্র স্নিগ্ধ মধুর কাহিনী।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে বিশেষভাবে রয়েছে।

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত এই ভ্রমণ কাহিনী বিচিত্র অলৌকিকতায়, গভীর নাটকীয়তায় ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

ভারত তথা বিশ্বের প্রাচীনতম, বৃহত্তম, মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম এই কুম্ভমেলায় দু'শো বছর থেকে দু'হাজার বছর পর্যন্ত সুপ্রাচীন সাধু মহাপুরুষদের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আসা এবং মহাযোগে মহাস্নানে অংশ গ্রহণ করবার কাহিনী এই গ্রন্থের এক অপূর্ব সম্পদ।

তাছাড়া ভারতের অতি উচ্চতর যোগসাধনার ক্ষেত্রে তথাকথিত জন্ম মৃত্যু বর্জিত মহাপবিত্র "কায়াকল্প" সাধনার নিগূঢ় কথা এই গ্রন্থে বিশদভাবে রয়েছে।

বহু দুর্লভ রঙিন ছবি এই মনোরম গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মূল্য—তিরিশ টাকা

২। সুমেরুতীর্থ কেদারবদ্রী ত্রিযুগীর পথে—সুপ্রাচীন

মহাহিমবন্ত তথা দেবতাত্মা হিমালয়ের বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী। অতি প্রাচীন মহাতীর্থ কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ, ত্রিযুগী নারায়ণকে কেন্দ্র করে উত্তর হিমালয়ের সকল বিশিষ্ট তীর্থের এবং উচ্চ কোটির সাধুসন্তের বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থের রয়েছে।

তার সাথে রয়েছে প্রাচীনপথের ধারে ধারে অবস্থিত বহু তীর্থের কাহিনী। বর্তমানে মটর রাস্তা হওয়ায় সেইসব প্রসিদ্ধ তীর্থ অবহেলিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে।

প্রতিটি বিশিষ্ট মহাতীর্থের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক কাহিনী এই গ্রন্থের এক বিশেষ সম্পদ। মূল্য—কুড়ি টাকা

৩। **সাধকরাজা রামকৃষ্ণ**—(তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক) নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের দিব্য জীবন কাহিনী। একাধারে ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক ও জীবনী নাটক। ভক্তিরস ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

মূল্য—বার টাকা

৪। **ঘটক বিদায়**—(তিন অঙ্কের সামাজিক নাটক) একটি অনাবিল হাস্যরসের সামাজিক নাটক। প্রতিটি চরিত্র বর্তমান সমাজ জীবনের এক একটি কৌতুককর দর্পন। প্রতিটি দৃশ্য রঙ্গব্যঙ্গে পরিপূর্ণ।

মূল্য—দশ টাকা

৫। **বৈদ্যুতিক চুল্লী**—(পঁচিশটি গল্পের সংকলন) জগত ও জীবনের তীব্র ছোঁয়া প্রতিটি গল্পে পরিপুষ্ট।

মূল্য—পনের টাকা

৬। **ঘেরাওলীলা**—(পঁচিশটি রম্য রচনার সংকলন) দেবতা থেকে মানুষ সবাই ঘেরাও হয়ে আছেন। ঘেরাও থাকা বা ঘেরাও করা কোনটা সুখের ? বিভিন্নস্বাদের রম্য রচনা এই গ্রন্থে রমনীয়।

মূল্য—বার টাকা

৭। **ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন**—(স্মৃতিকথা) ঋষিপর্ব, মনীষী-পর্ব, শিল্পীপর্ব ও গণপর্ব—এই চারপর্বে সমাপ্ত। দেশবিদেশের শতাধিক সাধক সাধিকা, মনীষী, শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে লেখকের নিবিড় অন্তরঙ্গতার বিচিত্র স্মৃতি কথা। অধ্যাত্ম, সাহিত্য, সংগীত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু বিষয়ের বহু তথ্য পূর্ণ আলোচনা ও কাহিনী সমৃদ্ধ এই বিশাল গ্রন্থ।

মূল্য---চল্লিশ টাকা

৮। **একসমুদ্র অসংখ্য ঢেউ**---(মহাপোন্যাস) এক জীবন-শিল্পীর মহাজীবনের বিশাল বৈচিত্র্যময় বিস্ময়কর কাহিনী। জীবন থেকে মহাজীবনের পথে উত্তরনের এক আশ্চর্য মনোরম কাহিনী। অসংখ্য চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে ও জীবন জিজ্ঞাসার অন্তহীন দ্বন্দ্বে নায়কের জীবনদর্শন নিত্য মুখর ও প্রাণবন্ত এই মহাপান্যাসে।

মূল্য—পয়তাল্লিশ টাকা

৯। বিবিধ—(প্রবন্ধ সংকলন)

অধ্যাত্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন

মূল্য—পনের টাকা

১০। জ্যোতিষ জগৎ—(জ্যোতিষ বিষয়কগ্রন্থ)

দেশ বিদেশের জ্যোতিষ বিষয়ক বহুতথ্যপর্ণ বিবরণ, আলোচনা ও বহু বিস্ময়কর কাহিনী সমৃদ্ধ। লেখকের বিগত তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রসূত বিরাট গবেষণা এই গ্রন্থে রয়েছে।

মূল্য পঁচিশ টাকা

১১। পত্রাবলী—(শতাধিক পত্রের সংকলন) বহু ভারত বিখ্যাত সাধক সাধিকা, মনীষী, শিল্পী ও সর্বস্তরের দেশ বিদেশের লোকের সাথে লেখকের বিচিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ অজস্র পত্রালাপের মনোরম বিবরণ সমৃদ্ধগ্রন্থ।

মূল্য—ষোল টাকা

১২। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা (গীতি আলেখ্য) মহাপীঠ তারাপীঠের প্রাণপুরুষ শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য মহাজীবনী।

স্তোত্র সঙ্গীত ও বন্দনায় মুখরিত।

মূল্য—দশ টাকা

১৩। গানগেয়ে যাই—(দু'শতাধিক গানের বিচিত্র সংকলন)

শ্যামাসঙ্গীত, স্তোত্র, ভজন, ভক্তিগীতি, আধুনিক, ব্রজবুলি ও বাউল গানের স্নিগ্ধ মধুর সংকলন। এ ছাড়া ত্রিলোক জননী তারামা ও বামদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্তোত্র ও একাধিক গান রয়েছে।

মূল্য—পনেরো টাকা

১৪। গোধুলীর গান—(কাব্যগ্রন্থ)

গভীর অধ্যাত্মভাব মণ্ডিত কাব্যগ্রন্থ। কবি মন ও কবিসত্তার বিশাল ব্যাপ্তি এই গ্রন্থের সর্বত্র ঘটেছে। ঈশ্বর জগত ও জীবনের নিবিড়

একাত্মতা এই কাব্যগ্রন্থে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। কবির ভাব ভাষা ও ব্যঞ্জনার সুষমায় জীবনদর্শনের গভীরতম উপলব্ধি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

মূল্য—ষোল টাকা

জয়তারা পাবলিশার্স

৭৫, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৬৮

এবং

সিটি অফিস

৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

লাহা পেইন্ট হাউস (দোতালা)

কলকাতা—৭০০০৭৩

—o—